বন ভন্তের দেশনা

প্রতি ____

নাম ____

ঠিকানা ____

মহান ত্যাগী পূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বন ভন্তে) মহোদয়ের মুখনিঃসৃত বাণী "বন ভন্তের দেশনা" শিরোনামের এ গ্রন্থখানা সৌজন্য কপি হিসেবে সবিনয়ে আপনাকে অর্পণ করলাম।

এ সৌজন্য পুস্তক দানের পুণ্য প্রভাবে জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক এবং আমাদেরও নির্বাণ লাভের হেতু হোক।

গভীর শ্রদ্ধান্তে-

ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া (সংকলক)

ও সজল কান্তি বড়ুয়া (প্রকাশক)

বন ভন্তের দেশনা

(১ম খন্ড)

গ্রন্থনায় ঃ **ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া**

প্রকাশ কাল ঃ **বুদ্ধ পূর্ণিমা ২৫৩৭ বুদ্ধাব্দ**
১ম সংস্করণ ঃ **১৪০০ বাংলা ২৩শে বৈশাখ**
১৯৯৩ ইংরেজী ৬ই মে

এ গ্রন্থখানা রচনায় যাঁরা বিভিন্নভাবে অকৃপণ সহযোগিতা এবং শ্রম দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা গেল।

পরলোকগত বাবু জ্যোতির্ময় চাকমা (অবঃ ম্যাজিষ্ট্রেট)
বাবু নির্মলেন্দু চৌধুরী, বাবু সুরেশ বড়ুয়া, বাবু কনক কুসুম বড়ুয়া

ও বাবু সুধীর কান্তি দে।

প্রচ্ছদ ঃ **বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা**

Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.
এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ **রাহুল কম্পিউটার**
৪১, কাটাপাহাড় লেইন, টেরীবাজার, চট্টগ্রাম।
ফোন ঃ ২২০৯৬২

উৎসর্গ

পরম কল্যাণ মিত্র ও ধর্মাচরণে সতীর্থ
পরলোকগত বাবু জ্যোতির্ময় চাক্‌মা
(অবঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) মহোদয়ের পূণ্য স্মৃতি
স্মরণে এবং আমাদের পরলোকগত
জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে "বন ভন্তের দেশনা"
নামক গ্রন্থখানা উৎসর্গ করলাম।

—সংকলক ও প্রকাশক।

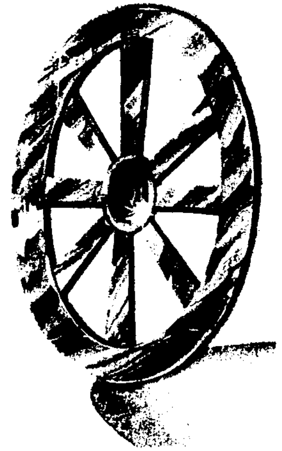

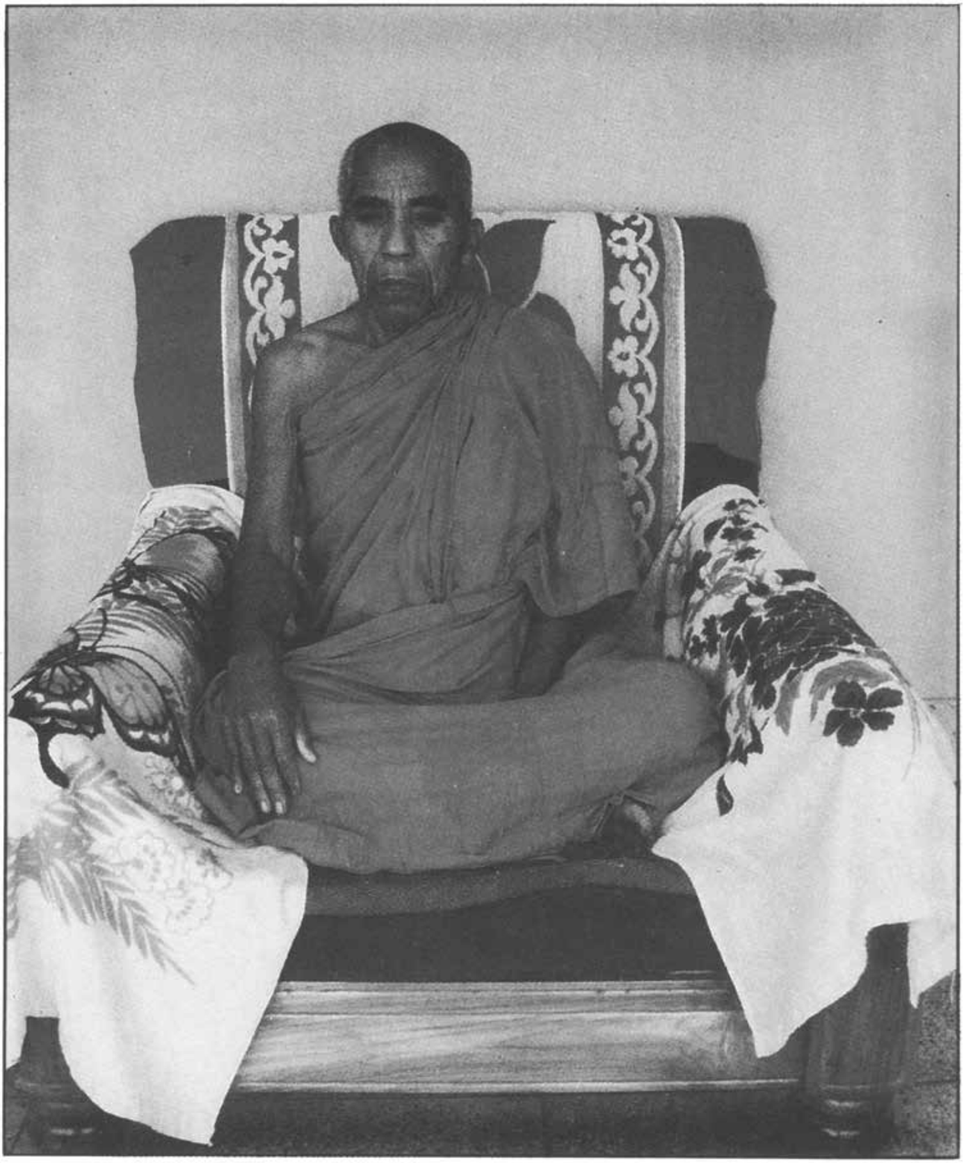

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির
(বন ভন্তে)

ভূমিকা

গুণীরা গুণীর গুণ বুঝে সর্বক্ষণ।
অগুণী গুণীর গুণ না বুঝে কখন।।

ডাক্তার শ্রীযুত বাবু অরবিন্দ বড়ুয়া আয়ুষ্মান বন ভিক্‌খু শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবিরের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর দেশনা লিখেছেন, সেই পান্ডুলিপিটি আমি আদ্যন্ত পাঠ করে পরম প্রীত হয়েছি। তাঁর লিখার ভাবভঙ্গী বড়ই সাবলীল, সহজবোধ্য ও যুক্তি উপমা সমুহ সহজতর।

শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয় মহাগুণ জ্ঞানী মহাপুরুষ। ডাক্তার অরবিন্দ বাবু তাঁকে বিশেষ ভাবে জেনেছেন ও বুঝেছেন। যেহেতু তিনিও গুণী। গুণীর গুণ গুণীরাই বুঝতে পারেন, নিগুর্ণীরা তা বুঝতে পারেনা। তাই জ্ঞানী সমাজে ডাক্তার বাবু ধন্যবাদ ও প্রশংসাবাদ প্রাপ্তির উপযুক্ত ব্যক্তি বলে আমি মনে করি।

বন ভিক্‌খুর গুণ প্রকটার্থ তিনি যা' লিখেছেন তা বড়ই আশ্চর্য ও চমৎকার বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। বনভিক্‌খুকে একজন বুদ্ধ প্রশংসিত ভিক্‌খু বললেও অত্যুক্তি হয়না। তখনকার কালে অনেক ভিক্‌খু বুদ্ধের নিকট হতে কর্মস্থান শিক্ষা করে গভীর অরণ্যে বাস করতঃ প্রব্রজ্যাকৃত্য সমাপন করে সার্থকতা সম্পাদন করতেন। বর্তমানকালেও বন ভিক্‌খুও তৎকালীন প্রিয়শীল ভিক্‌খুগণের অনুকরণ করে দীর্ঘদিনব্যাপী মহারণ্যে সাধনায় রত থেকে স্বীয় জীবনকে সাফল্য মন্ডিত করেছেন। এ যাবৎ বহু সজ্জন মন্ডলীকে তাঁর অনুকরণে গঠিত করে আদর্শ স্থান লাভ করছেন। ইহা তাঁর বহু মঙ্গলময় ব্যাপার।

এ সংক্ষিপ্ত জীবনীতে ডাক্তার বাবু বন ভিক্‌খুর যে বিষয়বস্তু সমূহের উল্লেখ করেছেন তা'তে অলৌকিক বিষয়েরও বহু ঘটনাবলীর বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। অলৌকিক জ্ঞান চিন্তা সাপেক্ষ। তিনি প্রয়োজন বোধে অনেক বিষয় চিন্তা করে অনেক স্থানে অনেক কিছু বলেছেন, তা' দেখেও অনেক শ্রদ্ধাবানদের শ্রদ্ধা আরো বর্ধিত হয়েছে। মার্গফল লাভ না হলে কেহ উক্তরূপ চিন্তা করতে সক্ষম হননা। ডাক্তার বাবুর লিখা বর্ণনায় দেখা যায় বন ভিক্‌খু কারো প্রতি কোন সময় কর্কশ বাক্য ব্যবহার করলেও লোভ দ্বেষ, তুচ্ছ ও তাচ্ছল্যতা বশে ব্যবহার করেন নাই। তা' শিক্ষা ও মঙ্গলের জন্যই বলেছেন, অমঙ্গলের জন্য নহে। ভাল, ভদ্র, বিনম্র ও মেধাবী ছাত্রকে প্রহার করতে হয়না। তারা স্বল্প কথাতেই শিক্ষা লাভ করে ভবিষ্যত ফল শুভ ফলপ্রদ করে নেয়। আর অবাধ্য ও উগ্র স্বভাব বিশিষ্ট ছাত্রকে প্রহারাদি করে শিক্ষা দিতে হয়। এর ফলে তারও ভবিষ্যৎ

ফল শুভপ্রদ হয়। বন ভিক্‌খুও অবস্থাভেদে শিক্ষার জন্যেই ক্বচিৎ অগত্যা কর্কশ বাক্যাদি ব্যবহার করেন মাত্র।

অরবিন্দু বাবু লিখার মাধ্যমে বন ভিক্‌খুর যে পরিচিতি দিয়েছেন, তদ্দ্বারা বহুগুণগ্রাহী, ভিক্‌খু, শ্রমণের, গৃহী, আবালবৃদ্ধবণিতাদের প্রভূত উপকার সাধন হবে বলে আমি মনে করি। যেহেতু হিতকল্যাণময় বিষয়বস্তু বহুলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার মাধ্যমে।

তিনি প্রত্যেক সন্দর্ভের পর স্বীয় মন্তব্যরূপে দুই লাইনের একটি পদ্য রচনা করে দিয়েছেন। সে পদ্য সমূহের শব্দ বিন্যাস অতি সরল ও সহজবোধ্য, কিন্তু ভাব অতিশয় পরমার্থভাব গাম্ভীর্যে সমৃদ্ধ। তাই তিনি ভাব কবিত্বেরও দাবীদার বল্লে অত্যুক্তি হবেনা। তাঁর রচিত আরো বহু কবিতার পান্ডুলিপি আছে, তাও ভাবগাম্ভীর্যে কল্যাণপ্রদ।

অরবিন্দ বাবুর বিরচিত বন ভিক্‌খুর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও উপদেশ নির্মাল্য পুস্তিকাটি গৃহী, আবালবৃদ্ধবণিতা ও ভিক্‌খু শ্রমণদের প্রত্যেকে বার বার পাঠ করলে সবাই উপকৃত হবেন বলে আশা করি।

তিনি আরো সুস্থ শরীরে দীর্ঘায়ু লাভ করতঃ বুদ্ধ শাসনের তথা বৌদ্ধ সমাজের মহা উপকার করার জন্য কায়মনোবাক্যে কামনা করছি। তাঁর আদর্শ অত্যন্ত সৎ ও কল্যাণপ্রদ।

সর্বসত্ত্বের প্রতি হিতকামী-
স্বাক্ষরঃ- **জিন বংশ মহাথেরো**
মহামুনি মহানন্দ সংঘরাজ বিহারাধ্যক্ষ
গ্রামঃ পোঃ মহামুনি, চট্টগ্রাম।
২৬/২/১৯৮৯ইং

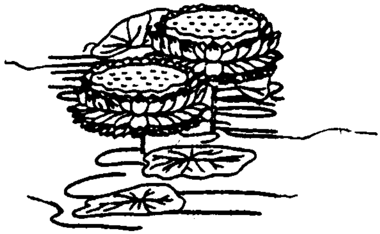

আশীষ বাণী

ধর্ম্মবোধ অর্জনে ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। কেহ যদি ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন তা' প্রকাশ করার মাধ্যম একমাত্র ভাষাই, সে ভাষা মৌখিক হোক অথবা লিখিতই হোক, বুদ্ধের সমকালে ত্রিপিটক গ্রন্থের জন্ম না হলেও মুখের ভাষাই ছিল জীবন্ত। তখনকার দিনে অন্যের কাছ থেকে শ্রবণ করেই অসংখ্য নরনারী ধর্ম দর্শন লাভ করেছেন। তাই ভাষাজ্ঞানের গুরুত্ব কিছুতেই কম নয়।গ্রন্থ সংকলন করাটা ভাষাজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্মজ্ঞানকে পাঠকবর্গের সামনে তুলে ধরা। সে একই উদ্দেশ্য নিয়ে ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া সাধকের জীবন কাহিনী এবং শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের দেশনা হতে সামর্থানুযায়ী আহরিত শিক্ষনীয় বিষয় গল্পকারে সংকলন করে এ গ্রন্থখানা সদ্ধর্ম প্রাণ মুক্তিকামী উপাসকগণের নিকট উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রচেষ্টায় অনেকেই উপকৃত হবে বলে মনে করি।

তিনি শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের একজন বিশিষ্ট উপাসক। ত্যাগের মহিমায় অনুপ্রাণিত হয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সংস্পর্শে এসে যা উপলব্ধি করেছেন সেই সত্যটুকুই তিনি বন ভন্তের দেশনাকারে সম্পাদন করেছেন। শ্রদ্ধাবান্ এবং বিশ্বাসীদের নিকট আর্য্যসত্য প্রকাশের জন্য তাঁর এ মহৎ উদ্দেশ্য- যদিও তিনি লেখক কিম্বা গ্রন্থকার নন, তবুও তাঁর এ বইখানা ভবিষ্যতে অনেকের উপকার সাধন করবে সন্দেহ নেই। পাঠক মহল আশা রাখে অরবিন্দ বাবুর কাছ থেকে চারি আর্য্যসত্যের বিশ্লেষণক্ষম আরও ধর্ম্ম গ্রন্থ যেন ভবিষ্যতে লাভ করা যায়।

লেখক যে ভাবে নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা মহা মনীষী সাধকদের প্রচারিত আর্য্যসত্যের সহজ, সরল প্রকাশনা মুক্তকামীদের হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হয়েছেন, তাতে মুক্তিকামী সকলে নিশ্চয়ই চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন।

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।

ইতি-
আশীর্বাদান্তে
স্বাক্ষরঃ- **শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষু**
তাংঃ ৪-২.৮৯ইং
রাজ বন বিহার, রাঙ্গামাটী।

শুভেচ্ছা বাণী

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের বাণী এবং বন ভন্তে ও বন বিহার সম্পর্কিত নিদর্শন সমূহ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনেকদিন ধরে অনুভব করছিলাম। বন ভন্তের ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য। এখন থেকে বন ভন্তে সম্পর্কিত তথ্য সমূহের সঠিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে না পারলে ভবিষ্যৎ বংশধরদের প্রতি আমাদের অন্যায় করা হবে। "বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনীও তাঁহার দেশনা" নামক এই প্রকাশনাটি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

বইটি ছাপানোর আগে কয়েকটি অধ্যায় পড়ে দেখলাম যে লেখক বাবু অরবিন্দ বড়ুয়া সহজ, সরল, সুন্দর ভাষায় বনভন্তের দেশনা সমূহ ব্যাখ্যা করেছেন। বন ভন্তের জীবনীর ব্যাপারেও কয়েকটি বিরল তথ্য উথাপন করা হয়েছে। বইটি নিঃসন্দেহে পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হবে।

স্বাক্ষরঃ- রাজা দেবাশীষ রায়
২৩-১-৮৯ইং

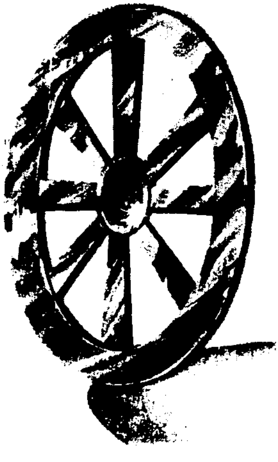

শুভেচ্ছা বাণী

পরম আর্য পুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বন ভন্তে) মহোদয়ের উপদেশ অবলম্বনে ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া (হোমিওপ্যাথ) মহাশয়ের লেখনী ধারণ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। দীর্ঘদিন আগে থেকে এ ধরণের প্রয়াস গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হচ্ছিল। এ সংকলনটি প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে সেই অভাব পূরণের কিছুটা সহায়ক হবে।

ডাঃ বাবু রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হিসেবে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সান্নিধ্যে ধর্মোপদেশ শ্রবণের সুযোগ পেয়েছেন। বহুদিন হতে সেই ধর্মোপদেশ সমূহকে ভিত্তি করে এ হেন সংকলন প্রকাশের ইচ্ছা পোষণ করে আসছিলেন। তাঁর সেই মহান সদিচ্ছা পূরণ হতে যাচ্ছে দেখে আমি ব্যক্তিগত ভাবে খুবই আনন্দ বোধ করছি। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের মুখনিঃসৃত ধর্মোপদেশ লেখনীতে ধারণ করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করা কঠিন কাজ হলেও দীর্ঘ দিনের প্রয়াসের সার্থক যথাযথরূপে ডাক্তার বাবুর পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। তাঁর এ মহান উদ্যোগে ধর্ম পিপাসুরা বিশেষ উপকৃত হবেন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মও এতে উপকৃত হবেন। অধিকন্তু উহা শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের মুখনিঃসৃত বাণী প্রচারে বিশেষ সহায়ক হবে।

আমি তাঁর উদ্যোগের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

সকল প্রাণী সুখী হউক।

সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা
সভাপতি
রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি,
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।
তারিখঃ-২৭-২-৯৩ইং

প্রচার, যোগাযোগ ও প্রকাশনা দপ্তর থেকে

শ্রদ্ধেয় "বন ভন্তের দেশনা" গ্রন্থের লেখক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের একজন সক্রিয় সদস্য। গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের একনিষ্ঠ শ্রদ্ধাবান উপাসক হিসেবে প্রায়ই রাজবন বিহারে তিথি অনুসারে উপোসথ পালন করেন ও মহান ত্যাগী জ্ঞান সাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বন ভন্তে) এর দেশনা শ্রবণ করেন। তিনি তাঁর সাধ্যানুযায়ী শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের মূল্যবান দেশনা শ্রবণ করে যতটুকু পারেন তা গ্রহণ, ধারণ ও অনুশীলন করার চেষ্টা করেন। বিগত কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন ধর্মীয় স্মরণিকায় এবং বিশেষ পত্র পত্রিকায় তিনি চতুর্দশ পদী

ধর্মীয় কবিতাও লিখেছেন। তিনি বন ভন্তের মুখনিঃসৃত বাণীও লিপিবদ্ধ করেন। সংগৃহীত বাণীই গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ। তাঁর নিজ জ্ঞানের পরিধিতে বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর দেশনা পুস্তকে যা লিপিবদ্ধ করেছেন আমার মনে হয় সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক-উপাসিকার বহু উপকার সাধন করবে। উক্ত পুস্তকের অনেকগুলো দেশনা আমি নিজেও শ্রবণ করেছি। লেখকের লেখনী হউক আরও সচল এ কামনা করি।

আরও আনন্দের বিষয় যে, এ পুস্তক প্রকাশ করতে আগ্রহী প্রকাশক বাবু সজল কান্তি বড়ুয়া মহোদয়ের উদ্যোগ ও কর্মের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় এবং তিনি এ পুস্তক প্রকাশ করে বিনামূল্যে বিতরণের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ গ্রন্থের বহুল প্রচার সদ্ধর্ম প্রাণ ব্যক্তিবর্গের লোকোত্তর জ্ঞান লাভের সহায়ক হবে এ প্রত্যাশা করি।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের আদর্শের অনুসারীদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ যদি কোন শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকা "বন ভন্তের দেশনা" বহুল প্রচারণার্থে পুনঃ প্রকাশ করতে ইচ্ছুক গ্রন্থকারের অনুমতি সাপেক্ষে বিনামূল্যে সৌজন্য কপি হিসেবে পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে বিতরণ করতে পারেন।

স্বাক্ষরঃ- **সজ্জিত কুমার চাক্‌মা**
প্রচার সম্পাদক
রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি
তাং-৯-৭-৮৯ইং

আমার দু'টি কথা

পরম পূজনীয় বন ভন্তে লংগদুর তিনটিলায় থাকাকালীন ১৯৭০ ইংরেজীতে আমি তাঁর প্রথম দর্শন লাভ করি। মধ্যে মধ্যে তাঁর লোকোত্তর দেশনা শ্রবণ করার জন্যে সেখানে যেতাম। এমন কি বন ভন্তের প্রধান দায়ক বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মার (হেডম্যান) বাড়ীতে কয়েকদিন পর্যন্ত অবস্থান করতাম। তাঁর দেশনাগুলো এতই গভীর যে সামান্য মাত্রও বুঝে অত্যন্ত প্রীতি অনুভব করতাম। সে সময় হতে তাঁর দেশনা লেখার জন্য মনে উদয় হলেও সাহস পেতাম না।

১৯৭৪ ইংরেজীতে যখন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে রাজবন বিহারে পদার্পণ করেন তখন হতে প্রায় নিয়মিতভাবে তাঁর দেশনা শুনতাম কিন্তু তাঁর দেশনাগুলো প্রাঞ্জল হওয়া সত্বেও আমার পক্ষে কঠিন ও সংক্ষেপ বিধায় হৃদয়ঙ্গম করা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল।

১৯৭৮ ইংরেজীতে আমি চিন্তা করলাম বন ভন্তের দেশনাগুলো যথাযথভাবে লিখতে না পারলেও সামান্যটুকু বুঝে সামান্য জ্ঞানের পরিধিতে দেশনা লেখা একান্ত দরকার এ মনোভাব পোষণ করে একদিন তাঁর নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করে চতুঃদশপদী কবিতা এবং গদ্যাকারে তাঁর দেশনাগুলো লিখতে আরম্ভ করি।

একদিন বন ভন্তে আমাকে বললেন–তুমি আমাকে কিভাবে দর্শন কর জান? উত্তরে বললাম–না ভন্তে। তিনি বললেন–সূর্য্য ডুবন্ত অবস্থায় বা সন্ধ্যার সময় অনেক দূর হতে কোন লোক অন্য লোককে অস্পষ্ট ভাবে দর্শন করে, তদানুযায়ী তুমি আমাকে দর্শন করে থাক। বাস্তবিক পক্ষে তাঁর দেশনাগুলোও আমার পক্ষে সামান্য দর্শন মাত্র।

সামান্য দর্শনে ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে বেশী। সে জন্য শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করতেছি। পাঠক-পাঠিকার প্রতি আমার ভুল ত্রুটিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ রইল। বিগত দশ বছরে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষে তাঁর দেশনাগুলো লিপিবদ্ধ করেছি। অনেকস্থানে নাম ঠিকানা না জেনেও উদাহরণ স্বরূপ লিখেছি। সামান্যতম লিখায় যদি কারও উপকারে আসে আমি সে পূণ্যের অধিকারী হবো আশা করি। এ পূণ্যের প্রভাবে ভবিষ্যতে দেশনাগুলো আরও যথাযথ ভাবে লিখে দ্বিতীয় খন্ডে লিপিবদ্ধ করার পরিকল্পনা রইল।

বন ভন্তের দেশনা

গত ২-১২-৮৮ইংরেজী তারিখে মাননীয় চাক্‌মা রাজা দেবাশীষ রায়ের সভাপতিত্বে তাঁর রাজভবনে রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতির ভাষণে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের নিত্য ব্যবহার্য জিনিস পত্র ভিডিও ক্যাসেট, ক্যামেরায় ফটো সংগ্রহ, টেপ রেকর্ডার এবং তাঁর মুখনিঃসৃত বাণীগুলো যথাযথ সংরক্ষণের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন। রাজা বাহাদুরের উৎসাহ উদ্দীপনায় আমার পূর্বের লিপিবদ্ধকৃত নোট হতে বনভন্তের দেশনা ক্ষুদ্র গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করি।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের উপসম্পদা গুরু, নব্বই বছরেরও অধিক বৃদ্ধ,বহু বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ প্রণেতা ও বিনয়াচার্য শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির মহোদয় মৃত্যুর পূর্বে কম্পমান হস্তে অতীব স্নেহ প্রদর্শন পূর্বক বইটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। তজ্জন্য তাঁর প্রতি রইল আমার প্রাণঢালা শ্রদ্ধাপূর্ণ বন্দনা। এ বইয়ের ব্যাপারে বন ভন্তের একনিষ্ঠ উপাসক পরলোকগত শ্রদ্ধেয় দাদা বাবু জ্যোতির্ময় চাক্‌মা (অবঃ ম্যাজিষ্ট্রেট) মহোদয় আমার ভুল ত্রুটি সংশোধন করেছেন। তজ্জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

বিশিষ্ট সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ ও শাহ্ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বাবু নির্মলেন্দু চৌধুরী মহোদয়ের পরামর্শ ও আমার লেখার ভুল সংশোধনের জন্য তাঁর কাছে অনেকাংশে ঋণী। রাঙামাটি সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সুযোগ্য শিক্ষক বাবু সুরেশ বড়ুয়া হতে লেখার সাহায্য পেয়ে তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বন ভন্তের শ্রদ্ধাবান উপাসক স্নেহের সজল কান্তি বড়ুয়া উক্ত পুস্তক প্রকাশ করায় পাঠক-পাঠিকাদের মহোপকার সাধন করেছে। এ পূণ্যের প্রভাবে তার নির্বাণ লাভের হেতু হোক।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা-আমি যেন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে দূর হতে সন্ধ্যার সময় অস্পষ্ট দর্শনের পরিবর্তে অতি সন্নিকটে মধ্যাহ্ন সময়ে সুস্পষ্টভাবে দর্শন করে তাঁর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত অতিবাহিত করতে পারি এবলে আমার দুটি কথার পরিসমাপ্তি করলাম।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

বিনীত
অরবিন্দ বড়ুয়া

নিরাময় হোমিও নিকেতন
তবলছড়ি বাজার, রাঙ্গামাটি
তাং-৩-২-৯৩ইং

বিঃ দ্রঃ— পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ শ্রদ্ধেয় "বন ভন্তের দেশনা" নামক এই গ্রন্থখানা পাঠ করে আপনাদের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করলে উৎসাহ বোধ করব এবং ভবিষ্যতে দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশ করার উদ্যোগ গ্রহণ করব।

প্রকাশকের বক্তব্য

রাঙ্গামাটির প্রাণকেন্দ্র রাজবাড়ীর অতি সন্নিকটে প্রায় চতুর্দিকে জলবেষ্টিত ষোল একর বন ভূমিতে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে রাজবন বিহার অবস্থিত। পাহাড়ের স্থানে স্থানে বনরাজীর ফাঁকে ফাঁকে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের শিষ্যবর্গের বিবেক কুঠির পরিশোভিত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমন্ডিত রাজবন বিহারে আমি কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে অথবা নিরিবিলিতে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের মুখ নিঃসৃত অমুল্য ধর্ম্মদেশনা শ্রবণার্থে গমন করি। প্রথমতঃ রাজবন বিহারের প্রাকৃতিক শোভা দর্শনে বিমোহিত হই। দ্বিতীয়তঃ শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের লোকোত্তর দেশনা শ্রবণ করে ক্ষণিকের জন্যে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করি। তাতে আমি মনে চিন্তা করি শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের বাণীগুলো কিভাবে সংরক্ষণ করা যায়।

একদিন আমার বড় দাদা শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের একনিষ্ঠ উপাসক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার সহিত বন ভন্তের দেশনা সম্বন্ধে আলোচনা হয়। কথা প্রসঙ্গে তাঁর লিখিত "বন ভন্তের দেশনা" প্রকাশনার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। আমার আকাংখিত বিষয় অবগত হয়ে প্রকাশনার জন্য সানন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করি। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে টাকা-পয়সা স্পর্শ করেন না বলে তিনি উক্ত পুস্তক বিনামূল্যে সৌজন্য পুস্তক হিসাবে বিতরণ করার জন্য বিশেষ শর্ত আরোপ করেন। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের আশীর্বাদে এ অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে প্রকাশনার কাজে উৎফুল্ল চিত্তে নিজেকে নিয়োজিত করলাম।

অতএব, শ্রদ্ধেয় "বন ভন্তের দেশনা" প্রকাশনায় যদি পাঠক-পাঠিকাদের কিঞ্চিৎ মাত্র জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাতে আমার পূণ্য বীজ বপিত হবে আশা করি। সে পূণ্যের প্রভাবে আমার লোকোত্তর জ্ঞান বা মার্গফল লাভের হেতু হউক।

বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হউক।
সকল দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করুক।।

ইতি-

নিবেদক -
সজল কান্তি বড়ুয়া
প্রকাশক

৬ নং প্রবর্ত্তক পল্লী নাসিরাবাদ বায়েজিত বোস্তামী রোড
চট্টগ্রাম। তাং-৩-২-৯৩ইং

বৌদ্ধ পতাকা সংগীত

রচনায় ঃ— শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বন ভন্তে)

(ক)

বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন সঙ্গীত

জয় জয় বৌদ্ধ পতাকা
অহিংসার বিজয় নিশান,
গাওরে সকলে ঐক্য বিতানে,
অহিংসার মহান মিলন গান।
আজি বিশ্ব ব্যাপিয়া অহিংসা হিল্লোলে
জাগে মহা বিশ্ব সাম্য মৈত্রী সলিলে (২বার)
আকাশে বাতাসে বন উপবনে
নদী কল্লোল ধরেছে টান (২ বার)

জাতি ভেদাভেদ বৈষম্য হিমাদ্রী-
লংঘিয়াছিল মহান জলধি-
সকল বন্ধন করি অবসান-
গাওরে সকলে ঐক্য বিতান (২বার)
ছয় রং পতাকার শান্তি নিশান।
জয় জয় বৌদ্ধ পতাকা -ঐ (৩ বার)

(খ)

বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উদ্বোধনী সংগীত

এসো সবে মিলি নমো নমো বলি,
নমো নমো ভগবান।
অহিংসা পতাকা বুদ্ধের নিশান,
শত শ্বাশত বার মৈত্রীর আঁধার,
বিশ্ব শান্তি প্রেমের বিধান।
ধর্ম পতাকা এ যে মোদের,
সদায় শান্তি একতা নিশান।
আদি অন্ত মাঝে আনিতে কল্যাণ,
নমো নমোহে বিজয় নিশান,
নমো নমোহে বৌদ্ধ নিশান,
পঞ্চ, অষ্ট দশশীল নিবন্ধন।

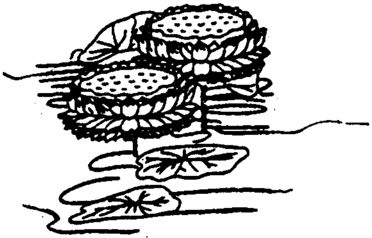

বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকার ছয় রশ্মির বর্ণনা

আজ হতে শত বৎসর আগে এমনি এক শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশ্ব পতাকা উত্তোলন করা হয় শ্রীলংকায়। সেদিন ছিল ১৮৮৫ সনের ২৮শে এপ্রিল। ধর্ম অর্থে যদি নীতি হয় তাহলে নীতি কোন ব্যক্তি বিশেষ কিম্বা ধর্মকে বুঝায়। সে অর্থে ধর্মীয় পতাকা নির্ধারণ বৌদ্ধ নীতির পরিপন্থী। কিন্তু শ্রীলংকার বিশেষ পরিস্থিতিতে ধর্মীয় চেতনাকে সমুন্নত রাখার মানসে বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকার উদ্ভব ও উত্তোলন করা হয়। এ পতাকা সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের পূর্ণ প্রতীক। আজ এ বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকার মানোন্নয়নে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক।

একদা ভগবান বুদ্ধ অনাথপিন্ডিক নির্মিত জেতবন আরামে বাস করছিলেন। তখন একবার "চারিপাদ ঋদ্ধি" (অলৌকিক শক্তি) প্রদর্শন করেছিলেন। ঋদ্ধি প্রদর্শন কালে ভগবানের শরীর হতে ছয়রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। ছয়রশ্মি যথাঃ নীল, পীত, লোহিত, ওদাত, মুঞ্জিষ্ঠা ও প্রভাস্বর।

১) নীল ঃ ভগবান বুদ্ধের কেশ রাশি ও চক্ষুদ্বয়ের নীলবর্ণ স্থান হতে প্রথম জ্যোতি নীল রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। অনন্ত আকাশের নীল বর্ণ সদৃশ সর্বপ্রাণীর প্রতি সীমাহীন মৈত্রী পরায়ণতা। ইহা তথাগত বুদ্ধের বিমুক্তির চিহ্ন। এই নীল রশ্মি মৈত্রী পরামী।

২) পীত বা হলদে ঃ সম্যক সম্বুদ্ধের গেরুয়া চীবর হতে দ্বিতীয় পীত রশ্মি বিচ্ছুরিত হয়েছিল। ইহা ত্যাগ বা সাধুতা ও বৈরাগ্যের চিহ্ন। এই রশ্মির অর্থ নৈষ্ক্রম্য পারমী।

৩) লোহিত বা লাল রশ্মি ঃ তৃতীয় জ্যোতি বুদ্ধের ত্বকের মধ্য হতে বের হয়েছিল। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সংসারে জন্ম জন্মান্তর তেজবলে আপন জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কোন সময় তেজচ্যুত হননি। এর অর্থ তেজস্বান, ধৈর্য্য ও বীরত্বপূর্ণ গুণ। এই লোহিত বর্ণ বীর্য্য পারমী।

৪) ওদাত বা শ্বেত বর্ণ ঃ চতুর্থ জ্যোতি বা শ্বেতবর্ণ সম্বুদ্ধের ৪০টি শ্বেতবর্ণ দন্তরাজি, চক্ষুদ্বয়ের শ্বেতস্থান হতে এই রশ্মি প্রকাশিত হয়েছিল। এর অর্থ সরলতা ও উদারতা। ইহা দান পারমীর চিহ্ন।

৫) মুঞ্জিষ্ঠা বা কমলা ঃ পঞ্চম জ্যোতি মুঞ্জিষ্ঠা (ঈষৎ লাল বা পাতলা লাল মিশ্রিত হলদে রং) ভগবান বুদ্ধের শরীর ও চীবরের সমন্বিত প্রতীক এর অর্থ সাম্য, অহিংসা ও মুক্তি মার্গে উপনীত হবার চিহ্ন। ইহা ক্ষান্তি পারমী।

৬) প্রভস্বর বর্ণ ঃ ইহা উপরোক্ত সমস্ত রশ্মির মিশ্রিত জ্যোতি। উপরোক্ত পাঁচ বর্ণের উজ্জ্বল আলো পর পর পাঁচ বর্ণ যুক্ত রং উপর থেকে নীচের দিকে যথাক্রমে নীল, পীত, লোহিত, ওদাত ও মুঞ্জিষ্ঠা সজ্জিত। ইহা মহামানব বুদ্ধের ৩২ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণের চিহ্ন। এই ষড়রশ্মি, দশ পারমী, দশ উপপারমী ও দশ পরমার্থ পারমী পূর্ণ সম্যক সম্বুদ্ধের প্রজ্ঞা পারমী।

এ ষড়রশ্মি যুক্ত বিশ্ব বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা ভগবান বুদ্ধের প্রদর্শিত দুঃখ হতে মুক্তি লাভের পথ নির্দেশক। যারা মুক্ত পুরুষ তাঁরা চারি আর্য সত্য ও জ্ঞানের পতাকা সদৃশ সমুন্নত। যাঁরা জ্ঞানে উন্নত তাঁরাই সুখী। যেই জ্ঞান দুঃখ বৃদ্ধি কারক সেই জ্ঞান কখনো উন্নত নয়। কাজেই ষড়রশ্মি যুক্ত বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা জ্ঞানী মানবের সকল দুঃখ বিনাশের প্রতীক স্বরূপ। যাঁরা মুক্তিকামী ও সত্যলাভী তাঁরাই এই পতাকাতলে আশ্রয় লাভের অধিকারী। দুঃখকে যাঁরা বৃদ্ধি করবে তাঁরা কখনো উন্নত নহে এবং তাদের দুঃখ হতে মুক্তিলাভ করা সুদূর পরাহত। যাঁরা দুঃখ নাশকারী ও সুখী তাঁরা দেবমানব সবার উর্দ্ধে।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠ
১। সাধক শিবচরণ -	১
২। সাধক যম -	২
৩। বন ভন্তে প্রশস্তি -	৫
৪। মহান সাধক বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী -	৫
৫। নির্বাণ গমনের চাবিকাঠি -	১১
৬। কঠিন চীবর দানোৎসবে দেশনা	১১
৭। পর্যটকের সাথে বন ভন্তের আলাপ -	১৩
৮। বন ভন্তের শাসন পদ্ধতি -	১৪
৯। বন ভন্তে কী রাগী? -	১৫
১০। বন ভন্তে কি রাগ মুক্ত? -	১৭
১১। রসিকতায় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের উপদেশ -	১৯
১২। ত্যাগেই সুখ -	২১
১৩। উচ্চ পদস্থ অফিসারের সাথে আলাপ -	২৩
১৪। সঠিক প্রার্থনা -	২৫
১৫। জন্ম নিয়ন্ত্রণ -	২৬
১৬। সংগ্রাম -	২৭
১৭। যথার্থ দর্শন -	২৮
১৮। কিসে সুখ কিসে দুঃখ? -	২৯
১৯। বন ভন্তে ডি সি? -	২৯
২০। বন ভন্তের দৃষ্টি? -	৩০
২১। আগন্তুক ও বন ভন্তে -	৩২
২২। সদ্ধর্ম পুকুর -	৩৫
২৩। নির্বাণ যাত্রী -	৩৬
২৪। সাধারণ-অসাধারণ -	৩৭
২৫। চিত্তের অনুকূলে দেশনা -	৩৮

বিষয়	পৃষ্ঠ
২৬। মুক্তির পথে বাঁধা -	৪১
২৭। মান এর পরিণতি -	৪২
২৮। সদ্ধর্ম ও পরধর্ম -	৪৩
২৯। শ্রদ্ধারূপ মূল্য -	৪৪
৩০। সূতার মিস্ত্রীর যন্ত্র -	৪৪
৩১। তাল-মাত্রা-সুর-ছন্দ -	৪৫
৩২। মারজয় -	৪৫
৩৩। শিক্ষিত-অশিক্ষিত -	৪৬
৩৪। নির্বাণ কার জন্য? -	৪৬
৩৫। বিশ্বাসী কে? -	৪৭
৩৬। ইন্দ্রিয় দমন -	৪৭
৩৭। চিত্ত দমন -	৪৮
৩৮। মদ্যপায়ীর পঞ্চ অবস্থা -	৪৮
৩৯। বন ভন্তের শর্ত	৪৯
৪০। কে পায় কে পায়না? -	৫১
৪১। তাবিজের সন্ধানে -	৫২
৪২। দেহ কলসী তুল্য-	৫৩
৪৩। বন ভন্তের ভবিষ্যদ্বাণী -	৫৪
৪৪। ধর্ম বাবা -	৫৭
৪৫। বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত উপদেশ গুচ্ছ -	৫৯
৪৬। নির্বাণ কোথায়? -	৬৩
৪৭। বন ভন্তে কি অর্হৎ? -	৬৬
৪৮। উপযুক্ত পরিবেশ -	৬৮
৪৯। পঞ্চনিমিত্ত ও দিক নির্ণয় -	৭০
৫০। অনিচ্ছা সত্বেও অনিয়ম -	৭২
৫১। শত্রুর জন্য মঙ্গল কামনা -	৭৩
৫২। জ্ঞান চক্ষু -	৭৬
৫৩। ওলট পালট -	৭৭

বিষয়	পৃষ্ঠ
৫৪। অপ্রিয় সত্য -	৭৮
৫৫। যেখান থেকে যাত্রা আবার সেখানে -	৮০
৫৬। খোঁড়ার গিরি লংঘন -	৮৩
৫৭। ভূতের কান্ড -	৮৪
৫৮। ভূতের দুষ্টামি -	৮৫
৫৯। স্বপ্নে কুকুরে কামড়ায় -	৮৬
৬০। দেবতা-যক্ষ-প্রেত -	৮৬
৬১। অজ্ঞানতার কারণে -	৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠ
৬২। যক্ষের ভয় -	৮৮
৬৩। দিব্য চোখে দেখে! -	৮৯
৬৪। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে কতটুকু লেখাপড়া করেছেন? -	৮৯
৬৫। ভাল না মন্দ ? -	৯০
৬৬। ইহকাল-পরকাল -	৯১
৬৭। সবাই ভাল চায় -	৯২
৬৮। ট্রেক্টর জোগাড় কর -	৯৩
৬৯। ধর্মজ্ঞান -	৯৪

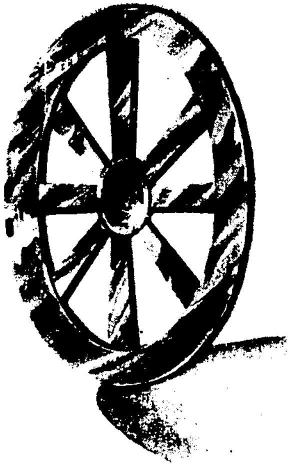

নমো তস্‌স ভগবতো অরহতো সম্মা সম্বুদ্ধস্‌স
(সেই ভগবান অরহত সম্যক সম্বুদ্ধকে নমস্কার)

সাধক শিবচরণ

ইতিহাসে দেখা যায় যুগে যুগে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের সাধকদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের ধ্যান ধারণা, মত ও পথ বিভিন্ন ধরণের পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে বৃহত্তর পার্বত্য জেলায় তিন জন সাধকের কীর্তি এবং ধ্যান ধারণা সম্বন্ধে জানা যায়।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে শিবচরণ নামে এক সাধক এই পার্বত্য জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কীর্তিকলাপ সাধনা সম্বন্ধীয় নানা উপখ্যান, পুঁথি ও পালা গান চাক্‌মা ভাষায় দেখা যায়। তাঁর জীবনীর উপর ভিত্তি করে রচিত নানা ধরণের গান পার্বত্য জেলার জনসাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন ও ঐতিহ্য সংরক্ষিত করেছে। কথিত আছে শিবচরণ এক স্থান হতে অন্য স্থানে অলৌকিক ভাবে চলে যেতেন। তাঁর মায়ের দেওয়া পাতায় পুটুলি বাঁধা ভাত এক স্থানে রেখে দিয়ে ১২ বৎসর পর গরম গরম অবস্থায় আহার করেছিলেন।

বর্ষার ঢলের সময় ছোট খালের বা ছড়ার উপর একটা বাঁশ রেখে ছড়ার পানি বন্ধ করতেন। বাঁশের সমান উঁচু বাঁধ তৈরী হলে এ বাঁধের নীচু দিয়ে শুকনা অবস্থায় লোকজন পারাপার হতো। আরো দেখা যায় কারো অসুখ হলে পানি পড়া অথবা সামান্য শিকড় দিলে রোগ নিরাময় হতো। মধ্যে মধ্যে তিনি দেশবাসীর প্রতি সৎ উপদেশ দিয়ে মহা উপকার সাধন করতেন। জনশ্রুতিতে জানা যায় সাধক শিবচরণ স্বাভাবিক ভাবে মৃত্যুবরণ না করে অলৌকিক ভাবে অন্তর্ধান হয়ে যান। মৃত্যুকালে তিনি বলে গেছেন- যেদিন পার্বত্য অঞ্চল ধনে-ধান্যে পরিপূর্ণ হবে, জ্ঞানে বিজ্ঞানে উন্নত হবে, সেদিন তিনি উচ্চকুলে জন্ম গ্রহণ করবেন।

সাধক যম

(যম চুগ বন বিহার ও বন ভন্তের নির্বাণ দেশনা)

রাঙ্গামাটি হতে প্রায় ১৪ মাইল উত্তর পূর্বদিকে ঘন গাছ বাঁশে পরিপূর্ণ সর্বোচ্চ যম পাহাড় অবস্থিত। যম পাহাড় এমন জায়গায় অবস্থিত যার চার পাশে চারটি ইউনিয়ন। আবার থানা হিসাবে ভাগ করেছে তিন দিকে তিনটি থানা। উত্তর পূর্বকোণে লংগদু থানা, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে রাঙ্গামাটি সদর ও উত্তর পশ্চিম কোণে নানিয়ার চর থানা অবস্থিত। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় মধ্যে দেখা যায় প্রথমে সাপছড়ি পাহাড়ের চূড়া, উত্তরে বরকল পাহাড়ের চূড়া এবং মধ্যখানে যম পাহাড়ের চূড়া বা যমচুগ। যমচুগে উঠলে দেখা যায় দক্ষিণে কাপ্তাই পর্যন্ত এবং উত্তরে বরকলের ভারত সীমান্ত পর্যন্ত।

যম পাহাড়টি মনুষ্য বসতিহীন ভাবে পড়ে আছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ। তন্ত্র-মন্ত্র ধারী জটাচুল বিশিষ্ট যম নামে এক চাক্‌মা সাধক তাঁর পরিবার নিয়ে এই পাহাড়ে বসবাস করতেন। তাঁর আসল নাম ইমিলিক্যা চাক্‌মা। তন্ত্র-মন্ত্র শক্তি বলে হিংস্র প্রাণীরা তাঁর পরিবার এবং গরু মহিষের ক্ষতি করতনা। কথিত আছে গরু মহিষ বাঘের সাথে চড়ত। সেই পাহাড়ের চূড়ায় বা চুগে আগুন জ্বালিয়ে যম তপস্যা করতেন।

এ ভাবে অনেক বছর অতি বাহিত করার পর পরিণত বয়সে যম মারা যান। মারা যাওয়ার পূর্বে এক ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন যে, এই পাহাড় একদিন তীর্থস্থানে পরিণত হবে। সেই সময় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে শ্রমণ অবস্থায় কাপ্তাই এর কাছে ধনপাতায় গভীর বনে ধ্যান সমাধি করতেছিলেন। ভন্তের নাম উল্লেখ করে বলেছেন ধনপাতার শ্রমণই একদিন এখানে আসবেন।

যম মারা যাওয়ার পর তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে সেই পাহাড় ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। বর্তমানে যমের নাতি জগৎ কিশোর চাক্‌মা এক গ্রামে বাস করে। তার বয়স প্রায় ৫০ বছর। সে ভাল বাঁশী বাজাতে জানে। যমের ভাগিনী জামাই চাক্‌মা ভাষায় যমের পুঁথি আবৃত্তি করে সকলের আনন্দ প্রদান করে।

স্থানীয় লোকজন রাঙ্গামাটি বন বিহারে আসলে সব সময় যমের ভবিষ্যত বাণীর কথা বন ভন্তের নিকট স্মরণ করায়ে দেয় এবং অনুরোধ করে "আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের যম পাহাড়ে একখানা বিহার স্থাপন করুন"। বহুবার অনুরোধ করার পর শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে বিহার নির্ম্মাণের সম্মতি দেন।

যম পাহাড়ের চারিদিকে বসতিগুলি প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। চার ইউনিয়নের সমন্বয়ে অধিবাসীরা কঠোর পরিশ্রম করে দক্ষিণে মাইশ্যা পাড়া হতে যম পাহাড় পর্যন্ত প্রায় চার মাইল দীর্ঘ এক বনপথ নির্ম্মাণ করে। যমচুগে যমের লাগানো

এক অশ্বথ বৃক্ষের পাশে বন বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। বন বিহারের দক্ষিণ পার্শ্বে ভান্ডার ঘর স্থাপন করা হয়। যমচুগের পূর্বদিক একটু নীচে মধ্য পাহাড়ে যাত্রীদের থাকার এক অতিথিশালা নির্ম্মিত হয়। পূর্ব দিকে নীচের পাহাড়ের প্রায় সমান জায়গায় মেলা বসানোর জন্য ছোট ছোট ঘর এবং কঠিন চীবর তৈয়ার করার জন্য প্রায় দুইশত হাতের বিরাট শনের ঘর তৈয়ার করা হয়।

যমচুগ বন বিহার উদ্বোধন করবেন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে। জ্যৈষ্ঠ মাসের একদিন সকালে ছোট লঞ্চে করে সশিষ্য বন ভন্তে প্রায় দুই ঘন্টায় মাইশ্যা পাড়া বিহারে পৌঁছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা দায়ক ছিলাম বিশজনের মত। সেখানে দুপুরের ভোজন করার পর বিকাল ২ ঘটিকায় আমরা যমচুগের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। স্থানীয় শ্রদ্ধাবান দায়ক শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে দোলায় করে জয়ধ্বনি দিতে দিতে যমচুগে নিয়ে যায়। আমরা চার মাইল পথ কয়েকটা পাহাড় অতিক্রম করে সন্ধ্যা ছয়টায় যমচুগে পৌঁছি।

চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিংএ উঠলে চট্টগ্রাম শহর এবং বঙ্গোপসাগরের যে রকম সুদৃশ্য দেখা যায় সে রকম যমচুগে উঠে চারি পার্শ্বের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে সত্যই বিমোহিত হই। গ্রামগুলি দুই তিন মাইল দূরে হলেও মনে হয় অতি সন্নিকটে অবস্থিত। যমচুগের উত্তরে ও দক্ষিণে ধাপে ধাপে সাজানো পাহাড় অতি মনোরম লাগে। পশ্চিম ও পূর্ব দিকে জলাশয়ে ছোট বড় বহু নৌযান এবং ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর আনাগোনা খুবই মনোমুগ্ধকর। রাতে রাঙ্গামাটি এবং কাপ্তাই এর বিদ্যুৎ বাতিগুলি হ্রদের জলে প্রতিবিম্বিত হয়ে আকাশের তারার মত চমৎকার দেখায়। এ রকম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পরিশোভিত নির্জন যমচুগে যে কোন ভাবুক ব্যক্তি বা সাধকের পক্ষে ভাবনার অতীব উপযোগী স্থান হিসাবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। যেমন মনে হয় কোন এক সুদক্ষ চিত্র শিল্পীর মনোময় তুলির আঁচড়ে আঁকা এক বৈচিত্রময় পূর্ণ এক চিত্র। আরো স্মরণ করায়ে দেয় ত্রিপিটকে বর্ণিত গোশৃঙ্গ পর্বতের মনোরম দৃশ্যের এবং ভগবান বুদ্ধের দেশনার কথা।

সন্ধ্যার সময় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে প্রথমে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে ধর্ম দেশনায় বলেন–আজ তোমরা মাইশ্যা পাড়া হতে যে পথ দিয়ে অতিকষ্টে কয়েকটা পাহাড় অতিক্রম করে যমচুগে পৌঁছেছ। যম চুগে উঠে খালি চোখে চারিদিকে সুস্পষ্ট ভাবে যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছ তাতে সত্যই তোমাদের বিপুল আনন্দ উপভোগ হচ্ছে। যারা সমর্থবান অর্থাৎ স্বীয় চেষ্টার ফলে মাইশ্যা পাড়া হতে যমচুগে পৌঁছেছে। আর যারা শিশু, বৃদ্ধ ও দুর্বলা নারী তারা যমচুগে উঠতে পারে নাই ঠিক সেই রকম যারা দুর্বল, উদ্যম হীন ও শীল সমাধি প্রজ্ঞাহীন তারা নির্বাণ লাভ করতে সমর্থ হবেনা। নির্বাণ লাভ করা, প্রত্যক্ষ করা অতি কঠিন ব্যাপার, কিন্তু দুর্লভ নয়। নির্বাণ লাভ করতে পারলে যমচুগের মত স্বত্বগণের সুখ-দুঃখ, হীন-উত্তম, স্বর্গ-নরক, দেবলোক ব্রহ্মলোক, এমনকি একত্রিশ লোক ভূমি সম্বন্ধে জ্ঞান দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ নির্বাণ গমনের রাস্তা বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ আবিষ্কার বা নির্মাণ করেছেন। সেই পথ অনুসরণ করেই নির্বাণ লাভ করা যায়। নির্বাণ লাভ করতে হলে প্রথমে শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে পঞ্চ পাহাড় অতিক্রম করে প্রজ্ঞারূপ অস্ত্র দ্বারা সপ্ত অনুশয় বা ক্লেশ শত্রুকে পরাজয় করে সর্বদুঃখ মুক্ত নির্বাণ লাভ করা যায়। নির্বাণ লাভের পথ সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক প্রচেষ্টা, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি এই আটটির সমন্বয়ে নির্বাণ লাভ করা যায়। যাঁরা আর্য তাঁরা এই বুদ্ধ নির্দেশিত পথে অগ্রসর হয়ে নির্বাণ লাভ করতে পারেন।" বন ভন্তে যমচুগ উপমা নির্বাণ দেশনা শুনে আমাদের যাবতীয় শারীরিক পরিশ্রম, ক্লান্তি আপাততঃ দূরীভূত হয় এবং সংগে সংগে এক অপূর্ব প্রীতি অনুভব করলাম।

কমিটির আতিথেয়তায় অতিথিশালায় রাত্রি যাপনের পর সকালে আমাদের পাশেই জাগরিত ব্যক্তিরা অমনুষ্যের এক বিরাট শব্দ শুনতে পায়। আমরা আগে থেকেই শুনেছি এখানে হিংস্র প্রাণী, ভূত, প্রেত ও যক্ষের উপদ্রব আছে। আরও জানলাম ভান্ডার ঘরের দরজার সামনে কয়েকটি বাঘ এসেছিল। সেই দিন সকাল থেকেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হচ্ছিল। মনে মনে চিন্তা করলাম বাহিরের লোক বৃষ্টির জন্য আসতে পারবেনা। দেখা গেল দশটার সময় আকাশ প্রায় পরিস্কার হওয়ায় দশটা তিরিশ মিনিটে বুদ্ধ পূজা সংঘদান ও বিহার উৎসর্গ সম্পন্ন হয়। দুপুরে ধর্ম সভায় বিপুল সংখ্যক লোক অংশ গ্রহণ করে। দায়কদের প্রার্থনায় বন ভন্তে সেই রাতে নানাবিধ উপদ্রব বন্ধ হওয়ার জন্য সুত্র পাঠ করেন। তৃতীয় দিন সকালেও ধর্মসভা হয়। দুপুরে ভোজনের পর বন ভন্তে দোলায় করে মাইশ্যা পাড়া বিহার ঘাটে আসেন। সেখান থেকে আমরা লঞ্চযোগে রাত আটটায় রাঙ্গামাটি বন বিহারে পৌঁছি।

যমচুগে কঠিন চীবর দান অথবা বিশেষ কোন ধর্ম অনুষ্ঠানে বন ভন্তে পদার্পণ করেন। সেখানে বনভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ নন্দপাল স্থবিরসহ আরো চারজন ভিক্ষু এবং তিনজন শ্রমণ ধ্যান সমাধিতে রত থাকেন। স্থানীয় দায়কবৃন্দ পালাক্রমে খাদ্য ও জলের ব্যবস্থা করেন।

বন ভন্তে প্রশস্তি

নমি আমি বন ভন্তে ; নমি শ্রীচরণে।
তমঃ তৃষ্ণা ক্ষয় হোক তোমায় স্মরণে।।
দূরে থাক কাছে থাক সর্বদাই স্মরি।
ভব সাগর পার হব তব শিক্ষা ধরি।।
করুণার নিধি তুমি মুক্তি–প্রদর্শক।
অন্ধকারে আলো তুমি সদ্ধর্ম ধারক।।
তোমার পরশ পেয়ে দেব নরগণে।
চিত্তমল দূর করে আনন্দিত মনে।।

অবিদ্যার বিকর্ষণে জ্ঞানলোকে থাকি।
চারি আস্রব নাশে হয়েছ চির সুখী।।
ধর্ম পিপাসুর প্রাণে দিয়ে ধর্ম তত্ত্ব।
নির্বাণ বারিতে সবে হোক শান্ত চিত্ত।।
তব আয়ু দীর্ঘ হোক জীবের হিতার্থে।
দিবানিশি স্মরি আমি দুঃখ বিনাশীতে।।
যে সম্পদ পেয়ে তুমি আছ তৃপ্ত মনে।
অকাতরে দিতে থাক তব ভক্ত গণে।।

মহান সাধক বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী

বৃহত্তর পার্বত্য জেলা তথা বাংলার ভাগ্যাকাশে উদিত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, ভিক্ষুকুল গৌরব, বৌদ্ধ ধর্মের ধ্বজাধারী, মহান ত্যাগী, পঞ্চমার বিজয়ী এবং দেব মনুষ্যের পূজনীয়, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বন ভন্তে) মহোদয় কাপ্তাই এর সন্নিকটে মগবান মৌজার মোরঘোণায় ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মর্তধামে আবির্ভূত হন। তাঁর পিতার নাম হারুমোহন চাক্‌মা এবং মাতার নাম বীরপতি চাক্‌মা। তাঁর পিতা মাতা উভয়ে ছিলেন সেই যুগের শীলবান ও ধর্মপ্রাণ দম্পতি। শ্রদ্ধেয় ভন্তের গৃহীনাম ছিল রথীন্দ্র চাক্‌মা।

শিশু রথীন্দ্র যখন পাঁচ বৎসরে পদার্পণ করলেন, তখন উপবেশনে চোখ বন্ধ করা অবস্থায় এক উজ্জ্বল আলোর দৃশ্য দেখে বিমোহিত হতেন। প্রথমে তিনি ভয়ার্ত হয়ে চিন্তা করতেন। পরিশেষে তিনি নিজে নিজেই বুঝতে পারলেন যে, ইহা একটি আলোক নিমিত্ত মাত্র।

অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সঙ্গে খেলাধূলার সময় অতিবাহিত করতেন না, বরঞ্চ ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন নিমিত্ত দেখে নীরবে বসে চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। মধ্যে মধ্যে ছোট নদী বা খালের কূলে পাহাড়ের উঁচু চূড়ায় অথবা বৃহৎ গাছের মূলে নানা প্রকার পশু বলির বা পূজার দৃশ্য দেখে হতভম্ব হতেন এবং বিয়ে (চুবলং) এর সময় মুরগী বলি দিয়ে সেই মুরগীব পা ও ঠোঁট পূজায় উপস্থাপন করা হলে ছেলে মেয়েরা খুব খুশী ও আনন্দিত হতো কিন্তু তিনি বিষাদ চিত্তে চিন্তা করতেন। কেননা বিয়ের পরে দম্পতি কিছু সময়কাল বেশ হাসি ও আনন্দোল্লাসের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করার পর পরেই

দেখা যায় প্রায় অনেকেই নানাবিধ পারিবারিক কারণে কলহ এবং মারামারি করত। মানুষের এসব দুঃখ তিনি গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করতেন।

তদানিন্তন বৃটিশ আমলে তিনি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া শিখে ছিলেন। তিনি উক্ত লেখা পড়ার দ্বারা বাঙলা ভাষায় যে কোন বই অনায়াসে পড়তে পারতেন এবং সহজেই আয়ত্ব করতে পারতেন। তাই গৃহী অবস্থায় তিনি বহু ধর্মগ্রন্থ এমনকি রামায়ণ, মহাভারতও অধ্যয়ন করেছেন।

একদিন এক নামধারী মাত্র বৈষ্ণব সাধু গান গেয়ে শুনালেন "হরির নাম যার মুখে নেই, তার মুখ পানে চেয়োনা।" তা শুনে তিনি মনে মনে ভাবলেন–এই সাধু আমাদেরকে ঘৃণা করে। কারণ আমরা তো হরির নাম লই না। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন– তা' ঐ নামধারী সাধুর অজ্ঞানতা।

তিনি বৌদ্ধ ধর্মীয় পুস্তক সংগ্রহ করে মনোযোগের সাথে অধ্যয়ন করতেন। তা'ছাড়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কামিনী রায় এবং অন্যান্য বিখ্যাত কবিদের কবিতাও পড়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল, তাই তাঁদের কবিতাগুলো এখনো অনর্গল মুখস্থ বলতে পারেন। তিনি পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, পন্ডিত, কবি ও সাহিত্যিকের জীবনী পুনঃ পুনঃ পড়তে ভাল বাসতেন।

প্রবীণ ব্যক্তির মুখে শুনেছি তিনি যখন গৃহস্থালীর কাজ করতেন সেই সময় মাঝে মাঝে গভীর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন এবং অনেক সময় কাজের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতেন। গৃহীকালে তিনি খুব সরল, ধর্মপ্রাণ, ভাবুক এবং সর্ববিষয়ে অনাসক্ত ছিলেন, তাই কোন জিনিসের প্রতি তাঁর লোভ ছিলনা।

আরো উল্লেখ্য যে, রথীন্দ্রের বয়স যখন ছাব্বিশ বৎসর তখন তিনি একখানা ছোট নৌকা নিয়ে নদীর কূলের পাশে পাশে স্রোতের অনুকূলে যাচ্ছিলেন, এমন মুহূর্তে এক বৃদ্ধ লোক নদীর অপর পাড়ে পাড় করে দেয়ার জন্য তাঁকে ডাকলেন। জ্ঞাতব্য যে লোকটি সকলের সাথে হাসি ঠাট্টা এবং ব্যঙ্গ কথা উচ্চারণ করে বলে কেহ বিশ্বাস করতনা তাই তিনি লোকটার ডাক শুনেও না শুনার মত রইলেন। পরে চিন্তা করলেন ঐ ব্যক্তিকে নদী পার করে দিলে আমার অশেষ পূণ্য সঞ্চয় হবে। তা' ভেবে নৌকাতে তাকে তুলে নিলেন। লোকটি নৌকাতে উঠার পর বল্লেন–"আমাকে অমুক জায়গায় নিয়ে যাও।" তিনি তার প্রত্যুত্তরে বল্লেন– এই মাত্র আমাকে বল্লেন নদী পার করানোর জন্য, আবার এই মুহূর্তে বলছেন অমুক জায়গায় দিয়ে আস। এটা কেমন কথা? লোকটি হেসে বলল–তুমি তো প্রথম ডাকে আস নাই তাই ওখানে যাওয়ার কথা বল্লে তুমি কখনো আসতেনা। এই কথা শুনে রথীন্দ্র একটু মৃদু হেসে তাকে নিয়ে নদীর উজানে নৌকা চালাতে লাগলেন। নৌকার দুপ্রান্তে দু'জন সামনাসামনি বসে তিনি নৌকা চালাতে লাগলেন। নদীর এক বাঁক যাওয়ার পর সেই ব্যক্তি রথীন্দ্রকে ক্ষীণ স্বরে, চোখের ইশারা ও ভঙ্গিমায় সুন্দরী রমনী দেখার জন্য বার বার ইঙ্গিত দিতে লাগল। তিনি তার দিকে দৃষ্টি না যায় মতো নৌকা চালাতে লাগলেন। একটু পর ঐ

ব্যক্তিকে দেখলেন যে, অপলক নেত্রে সুন্দরী রমনীর দিকে তাকিয়ে আছে।

এ সব কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এক সময় বন ভন্তে উদাহরণ স্বরূপ বল্লেন- ঐ ব্যক্তি যেমনি ভাবে রমনীর দিকে তাকায়ে ছিল ঠিক তেমনি ভাবে শিয়ালেরাও মহিষের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভন্তে কথা বলতে না বলতে উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে হাসির সোরগোল পড়ে গেল। তখন ভন্তে বলেন-আচ্ছা তোমরা বল, শিয়াল মহিষ ধরতে পারে কিনা? আমরা বল্লাম-না ভন্তে। তা হলে ঐ ব্যক্তিও অপলক নেত্রে রমনীর দিকে তাকিয়ে ছিল কেন? আমরা বললাম সেটা দুষ্টামি মাত্র। উনি বল্লেন- এটা হল কামাসক্তি। এতে চিত্ত কলুষিত হয়। চিত্ত অস্থির হয় এবং কামাসক্তিতে চিত্তের বিকার প্রাপ্তি ঘটে। এতে বুঝা যায় যে তিনি যৌবন কালেও অত্যাধিক সরল ও সাধু জীবন যাপন করেছিলেন।

ছোট বেলা থেকে তিনি বুদ্ধ কীর্তন, কবিগান ও যাত্রাগান আগ্রহের সাথে শুনতেন। ঐসব শুনে তিনি গভীর ভাবে উপলব্ধি এবং চিন্তা করতেন- এই সংসারটাই যাত্রার মঞ্চ। কত সুখ, দুঃখ, হাসি কান্না ইত্যাদি নানাবিধ সংঘাতের ভিতর দিয়ে চলতে হয়। সংসারটাই যে দুঃখময় তা তিনি সব সময় নিরীক্ষণ করতেন। তাই সংসারের দোষ ছাড়া গুণ কিছুই দেখতেন না।

এ পরিপ্রেক্ষিতে তিনি আরো লক্ষ্য করলেন-এক সময় জনৈক ব্যক্তির এগার বৎসরের এক মাত্র কন্যা মৃত্যু বরণ করেছে। সবাই দলে দলে সেখানে উপস্থিত হচ্ছে দেখে তিনিও ঐ মৃত কন্যার পিতার বাড়ীতে উপস্থিত হন। সেখানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন মৃত কন্যাকে বারান্দার এক পাশে শায়িত অবস্থায় রাখা হয়েছে। অন্যদিকে পিতা মাতা কখনো উচ্চস্বরে কেঁদে উঠছে, কখনো বুকে হাত দিয়ে আঘাত করছে, কখনো গাছের সাথে মাথাকে সজোরে আঘাত করছে, কখনো অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর উপস্থিত লোকজন মৃত কন্যার পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে বুঝাচ্ছে ও সেবা যত্ন করছে। যুবক রথীন্দ্র ঐ সময় চিন্তা করলেন আমারও একদিন এই ভাবে মৃত পুত্র কন্যার জন্য কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হতে হবে। তিনি সেখাই মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন যে, তিনি আর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ যেমন জরা, ব্যাধি, মৃত ব্যক্তি ও সন্ন্যাসী এ চতুর্বিধ দৃশ্য দেখে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক তেমনি বন ভন্তেও অপরের এক মাত্র মৃতকন্যা দেখে গৃহত্যাগ করার সংকল্পবদ্ধ হন।

গৃহ ত্যাগ করার সংকল্প নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জায়গায় গেলেন, পরবর্তীতে পটিয়া নিবাসী এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু গজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সহায়তায় ১৯৪৯ ইংরেজীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবিরের নিকট তিনি প্রব্রজ্যা লাভ করেন। দীপংকর ভন্তে ছিলেন সে যুগের প্রথম বি.এ পাশ ভিক্ষু এবং ত্রিপিটক বিশারদ। বন ভন্তে ১৯৪৯ ইংরেজীর কিছু সময় পর্যন্ত সেখানে ছিলেন এবং সেই বিহারে থাকালীন তাঁর গুরুর

নিকট যেসব বাঙলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মীয় গ্রন্থ ছিল তা' সব আগ্রহের সাথে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি চিন্তা করলেন-শুধু ত্রিপিটক অধ্যয়ন করলে লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায়না। তাঁকে মুক্তির পথ নিশ্চয় খুঁজতে হবে। তিনি মনে মনে চিন্তা করতেন মস্তক মুন্ডন করে কাষায় বস্ত্র পরিধান করার মূল্যই বা কি? গুরুর নিকট তিন মাস যাবৎ শ্রমণ ধর্ম শিক্ষা করে গুরু ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করলেন-"লোকোত্তর ধর্ম কি রকম?" ভন্তে উত্তরে বললেন-"আমি নির্বাণ দর্শন করি নাই, আমার লোকোত্তর জ্ঞান নাই সুতরাং তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানে নির্বাণ গবেষণা করে লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হও।"

১৯৫৫ ইংরেজীতে গুরু ভন্তের নির্দেশ মতে তিনি কাপ্তাই এর পাশে ধন পতায় চলে আসেন। প্রথমে তিনি চিন্তা করলেন গুরু ছাড়া কিভাবে তিনি ভাবনা করবেন। তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি? মরণ পণ উদ্যম নিয়ে যেমন বৈজ্ঞানিক নিউটন আবিস্কার করেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ আবিস্কার করেন নির্বাণ, ঠিক তেমনি ভাবে মরণ পণ উদ্যম নিয়ে তিনিও তথাগতের ন্যায় নির্বাণ সাক্ষাৎ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। বৈজ্ঞানিক জগদীশ চন্দ্র বসু বিজ্ঞান গবেষণা করতে করতে যেমন ঘুম যাননি, তিনিও নির্বাণ গবেষণা করতে করতে ঘুমাতেন না। মহাত্মা গান্ধী যেমন অল্পহার ও শীতোষ্ণ সহ্য করতেন ঠিক তেমনি তিনিও তাই করতেন। ডুবরী নিজের জীবন উপেক্ষা করে সমুদ্রের তলদেশ হতে মণি মুক্তা আহরণ করে, সেরূপ তিনিও গভীর বনে (ধনপাতায়) চারিমার্গ, চারিফল ও নির্বাণ অর্থাৎ লোকোত্তর ধর্ম আহরণ করবেন। যুদ্ধে সৈনিকেরা যেমন পিছু না হটে সামনের দিকে শত্রুদের সাথে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে জয়ী হয়, তেমনি তিনিও ক্লেশমার, দেবপুত্র মার, অভিসংস্কার মার এবং স্কন্ধ মারের সাথে যুদ্ধ করবেন। এই পঞ্চমার জয় করতে পারলেই নির্বাণ অধিগত হবে। তিনি পাঁচটি ব্রত গ্রহণ করে কঠোর সংযমের মাধ্যমে ধ্যানে মনোনিবেশ করলেন।

গ্রাম হতে অনেক দুরে ধ্যান স্থানে (ধনপাতায়) বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে, নানাবিধ পোকার উপদ্রব, গ্রীষ্মকালে প্রখর রৌদ্র এবং শীতকালে অসহ্য শীত সহ্য করতেন। অনেক সময় আলস্য বা ঘুম আসলে গ্রীষ্মকালে শনবনে বর্ষাকালে বৃষ্টিতে এবং শীতকালে ঝর্ণা বা খালের পানিতে নেমে বলতেন-"ঘুম এইবার তুমি আস।" এ ভাবে ব্রতচ্যুত না হয়ে ১৯৬০ ইংরেজীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কঠোর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। তিনি কয়েক দিনে একবার মাত্র আহার করতেন। অনেক সময় গ্রামে ভিক্ষা করতে দেরী হলে আহার ফেলে জলপান করতেন। তাঁকে গ্রামবাসীরা রথীন্দ্র শ্রমণ হিসাবে ডাকতো এবং গভীর বনে সাধনা করেন বলে তিনি বন সাধক হিসাবে অন্যত্র পরিচিতি লাভ করেন।

গভীর বনে ধ্যান অবস্থায় শ্রমণের পরনে এক পোশাক মাত্র চীবর ছিল তাও অধিক পুরাতন হওয়ায় একবার তাঁর চীবর ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। বিনয়ে

উল্লেখ আছে যে কারো নিকট হতে চেয়ে দান গ্রহণ করতে নেই এ বলে তিনি কারো কাছ থেকে চীবর চেয়ে নেননি। ফলে উক্ত ছেঁড়া চীবর দ্বারা তাঁর নড়াচড়া করতে নানা অন্তরায় বা অসুবিধা হয়েছিল। এ সব অসুবিধা ভেবে তিনি তাঁর জমাকৃত একখানা সাদা বস্ত্র চীবর হিসাবে সেলাই করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরক্ষণে হঠাৎ তাঁর মনে বোধদয় বা জ্ঞানোদয় হলো সাদা চীবর সেলাই করে পরিধান করার বিধান নেই। তাই তিনি তা' না করে একাগ্র চিত্তে ধ্যানবস্থায় দিন যাপন করতে লাগলেন। দু'য়েক দিন পরে দেখলেন কয়েক জন বড়ুয়া উপাসক দল বেঁধে কযেক খানা চীবর নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। সত্যিই তারা ঐ সময় ভন্তেকে চীবর দান করে পূণ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। বড়ুয়া সেজে ঐ সময় দেবতারাই আগমন করেছেন বলে আমার ধারণা।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রদ্ধেয় ভন্তে (শ্রমণ) যেই বনে ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন, সেই বনে (ধনপাতায়)) নানা প্রকার হিংস্র জন্তুর উপদ্রব ছিল। এক বাঘ একটা মহিষ মেরে তাঁর সামনে আহার করতে ছিল কিন্তু ভন্তের পূর্ব জন্মের পূণ্যকৃত সঞ্চিত পারমী এবং ইহ জন্মের সত্য এবং জ্ঞানের প্রভাবের দ্বারা ধ্যানে কোন হিংস্র জন্তুর উপদ্রব হয়নি। অর্থাৎ তিনি অপ্রমত্ত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ করার প্রত্যাশায় ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন বলে কোন অন্তরায়ও সৃষ্টি হয়নি।

তবে কাপ্তাই হ্রদের জলে তাঁর বনাশ্রম নিমজ্জিত হয়ে যাওয়ার ফলে ১৯৬০ ইংরেজী ধনপাতা নিবাসী দিঘীনালায় অবস্থানরত ধর্মপ্রাণ দায়ক বাবু নিশিমনি চাক্মার প্রার্থনায় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে দিঘীনালায় চলে যান। দিঘীনালার জনগণ তাঁর জন্য লোকালয় হতে একটু দূরে এক বন বিহার স্থাপন করে দিয়েছিলেন। তথায় শ্রমণ অবস্থায় কিছুকাল ধ্যান করার পর ১৯৬১ ইংরেজী শ্রীমৎ জিনবংশ মহাস্থবির, শ্রীমৎ আনন্দমিত্র মহাস্থবির, শ্রীমৎ গুণালংকার মহাস্থবির, শ্রীমৎ অগ্রবংশ মহাস্থবির শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির সহ অনেক পন্ডিত ভিক্ষুর উপস্থিতিতে তিনি উপসম্পদা লাভ করেছিলেন।

ধনপাতা ও দিঘীনালায় থাকাকালীন তিনি দেশনার সময় অথবা অন্য সময় কথা বলার সময় আমি আমার বলতেন না। কারণ আমি অর্থ মান ধ্বংস করা এবং আমার অর্থ তৃষ্ণা ধ্বংস করা অভ্যাস করতেন। আমি আমার পরিবর্তে তিনি শ্রমণ অথবা শ্রমণের বলতেন।

ভিক্ষু জীবনে তিনি ধ্যান সমাধির কঠোরতা থেকে ভগবান বুদ্ধের উপদেশানুযায়ী মধ্যপথ অবলম্বন করেন। তাই তাঁর উপমার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, কোন লোক পথ হারিয়ে বন জঙ্গল, কাঁটাবন, উঁচু, নীচু, ঝর্ণা, পাহাড়ের খাড়া জায়গা অতিক্রম করে হঠাৎ রাস্তার সন্ধান পেলে লোকটি সে রাস্তা দিয়ে গন্তব্য স্থানে যেতে পারে তেমনি তিনিও গুরু ছাড়া বহু শ্রমের মাধ্যমে শমথ ধ্যান করে পরে বিদর্শনে উপনীত হন। আর বিদর্শন ভাবনার দ্বারা যাবতীয় মার জয়, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মান ইত্যাদি ত্যাগ করে

নির্বাণ সুখ প্রত্যক্ষ করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ১৯৭০ ইংরেজীতে দিঘীনালা হতে দূরছড়িতে চলে আসেন। সেখানে ছয় সাত মাস থাকার পর লংগদুর বিশিষ্ট ধনাঢ্য ও ধর্মপ্রাণ বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মা (হেডম্যান) এর প্রার্থনায় তিনটিলায় ঐ সালেই চলে আসেন।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের দেশনায় জানা যায় যে ১৯৭১ সালে তিনিটিলায় থাকাকালীন তাঁর অভিষ্ঠ লক্ষ্য ও ধ্যানের পূর্ণতার বিকাশ ঘটে। তাঁর লোকোত্তর দেশনায় বহু নরনারী (যারা ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিশ্বাসী) প্রীতি সুখানুভব করেন।

১৯৭৪ ইংরেজীতে চাক্‌মা রাজা দেবাশীষ রায়ের শ্রদ্ধাশীলা মাতা আরতি রায় ও রাঙ্গামাটির বিশিষ্ট উপাসকের আকুল আবেদনে রাজবন বিহারে অবস্থান করার সম্মত হন। তাই ১৯৭৬ ইংরেজীতে তিনটিলা থেকে সশিষ্যে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে শুভাগমন করেন। তাঁর এ আগমনের ফলে বহু আবাল বৃদ্ধ বণিতার বহু পূণ্য চেতনার জোয়ার আসে। প্রায় দিনেই পুণ্য সঞ্চয় করার সুযোগ পেয়ে অনেকেই লোকোত্তর জ্ঞান লাভেরও সক্ষম হচ্ছেন বলে আমার বিশ্বাস। ১৯৮১ ইংরেজীর ১৪ই ফেব্রুয়ারী তাঁকে মহাস্থবির পদে বরণ করা হয়।

(মহান সাধক বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী সমাপ্ত)

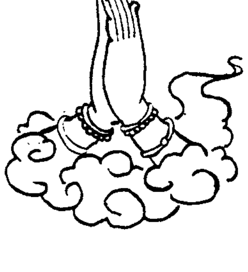

নির্বাণ গমনের চাবিকাঠি

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনায় বলেছেন- নিজের কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা চারি আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পটিচ্চ সমুপ্পাদ এবং সাঁইত্রিশ প্রকার বোধি পক্ষীয় ধর্ম আয়ত্ব করা যায়। যা আমি প্রকাশ করি তা' আমার অভিজ্ঞতার দ্বারা ব্যক্ত করি। যা' দৃষ্ট ও শ্রুত তা' সম্যক জ্ঞানের দ্বারা উপলব্ধি করি। আমি আমার জন্ম জন্মান্তরের অনুগমনকারী অবিদ্যা ও তৃষ্ণাকে ক্ষয় করেছি এবং অঙ্গ জীবনও ত্যাগ করে পরম সুখ অনুভব করছি। গভীর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয় সংযম ও চিত্ত সংযমই নির্বাণ গমনের একমাত্র চাবিকাঠি। তিনি বলেন-আমি যে ভাবে কঠোর হতে কঠোরতম ভাবনা করেছি তা' আমার নির্দেশ অনুসরণকারী অনায়াসে সর্বদুঃখের অন্ত সাধনা করতে পারবে। নির্বাণ লাভেচ্ছু ভিক্ষু শ্রমণ আমার নির্দেশিত পথে চল্‌লে অচিরেই অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত এবং উপাসক- উপাসিকারা শ্রোতাপত্তি ও সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে নিশ্চয়ই পারবে।

পর্ব পাপ ধ্বংস কর নব কর বন্ধ।
ভন্তের পথে চল্‌লে নির্বাণের সম্বন্ধ।

কঠিন চীবর দানোৎসবে দেশনা

তাঁর দেশনার প্রারম্ভে বল্‌লেন,

বুদ্ধের শিক্ষা কাকে বলে?

শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

বুদ্ধের শাসন কি?

অপ্রমাদই বুদ্ধের শাসন।

ধর্ম কথা কি?

চারি আর্য সত্যকে ব্যাখ্যা করা ধর্ম কথা।

বুদ্ধের দেশনা কি?

সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম সমূহ পুংখানুপুংখরূপে ব্যাখ্যা করতে পারাই দেশনা বলা হয়।

ত্রিবিধ শিক্ষা কি?

শিল শিক্ষা, সমাধি শিক্ষা ও প্রজ্ঞা শিক্ষা।

ত্রিবিধ অভ্যাস কি?

শীল অভ্যাস, সামাধি অভ্যাস ও প্রজ্ঞা অভ্যাস।

ত্রিবিধ পুরণ কি?

শীল পুরণ, সামধি পুরণ ও প্রজ্ঞা পুরণ।

যতদিন পর্যন্ত পাপ কলুষ ধ্বংস না হয় ততদিন যাবৎ শীল শিক্ষা করতে হবে। যেমন ১। প্রাণী হত্যা ২। চুরি ৩। ব্যাভিচার ৪। মিথ্যা কথা ৫। পিশুন ৬। কর্কশ ৭।

সম্প্রলাপ ৮। অন্যায় জীবিকা (পাপ জীবিকা)

এইগুলি শিক্ষা করার পর শীল অভ্যাস করতে হবে। এবং পরে শীল পুরণ করে পাপ কলুষ ধ্বংস করতে হবে। সমাধি শিক্ষাঃ- যতদিন পর্যন্ত উদ্ধত স্বভাব ধ্বংস না হয় ততদিন পর্যন্ত সমাধি শিক্ষা করতে হবে। (পঞ্চনীবরণ) (পর্যটন ক্লেশ) যথাঃ-১। কামছন্দ ২। ব্যাপাদ ৩। ঔদ্ধত্য-(কৌকৃত্যচার ৪। স্ত্যনমিদ্ধ ৫। বি-চিকিৎসা। এইগুলি শিক্ষা করার পর সমাধি অভ্যাস করতে হবে এবং পরে সমাধি পুরণ করে পর্যটন ক্লেশ ধ্বংস করতে হবে।

প্রজ্ঞা শিক্ষা ঃ যতদিন পর্যন্ত সপ্ত অনুশয় ধ্বংস না হয় ততদিন পর্যন্ত প্রজ্ঞা শিক্ষা করতে হবে (অনশয় ক্লেশ) যথা ১। কামরাগ ২। ভাবরাগ ৩। মানানুশয় ৪। দৃষ্টি ৫। প্রতিঘ ৬। বি-চিকিৎসা ৭। অ-বিদ্যা।

এসবকে অনাগত ক্লেশও বলা যেতে পারে। কেননা অরভমাণ পেলে উহারা জেগে উঠে। এরা অন্য সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে।

এগুলি শিক্ষা করার পর প্রজ্ঞা অভ্যাস করতে হবে এবং পরে পুরণ করে সপ্ত অনুশয় ধ্বংস করতে হবে।

কামছন্দ ঃ— কামভোগ করলে অপরের লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগ করতে হবে।

দুঃখ নিরোধে ঃ— সৎকায় দৃষ্টি উচ্ছেদ হয়।

সমুদয় নিরোধে ঃ উচ্ছেদ দৃষ্টি উচ্ছেদ হয়।

মার্গসত্য নিরোধেঃ— অক্রিয়া দৃষ্টি উচ্ছেদ হয়।

সৎকায় দৃষ্টিঃ— পঞ্চ স্কন্ধে আমি আছি বা আমার।

উচ্ছেদ দৃষ্টি ঃ বহুদোষ পূর্ণ, একগুয়ে, পুনঃ জন্ম নাই। মরলে দুঃখও নাই। মরলে সব শেষ হয়।

শ্বাশ্বত দৃষ্টি ঃ কিছু ধার্মিক পরকালও বিশ্বাস করে। তাদেরকে বুঝানো খুবই কঠিন।

অক্রিয়া দৃষ্টি ঃ — দান, শীল, ভাবনা ও পাপ পূণ্যের বিশ্বাস নাই। আমার দেশনাগুলি কারো কারো খারাপ লাগে, অসুবিধা লাগে কারণ যারা লোভ, দ্বেষ ও মোহগ্রস্ত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করে তাদের অসুবিধা লাগবে।

উপমা ঃ জ্বর ভোগ করে যদি কেহ যে কোন খাবার খায় তবে তার পক্ষে সব খাবার তিতো লাগবে। খাবার তিতো লাগে, জিহ্বার স্বাদ নষ্ট হয়, সেরূপ লোভ দ্বেষ মোহপূর্ণ ব্যক্তি আমার দেশনায় অসুবিধে অনুভব করবে।

পর্যটকের সাথে বনভন্তের আলাপ

১৯৮২ সালে যখন বৃটেন এবং আর্জেন্টিনার সাথে ফোক্‌ল্যান্ডে যুদ্ধ চলছিল ঠিক সেই সময় চারজন ফরাসী নাগরিক রাংগামাটিতে পর্যটনের উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে দু'জন পুরুষ ও দু জন মহিলা একজন চাক্‌মা দোভাষী সহ তাঁরা বন বিহার পরিদর্শন করার জন্য এসেছিলেন। বন ভন্তের সংগে অনেক আলাপ করার পর কথা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হয়।

১ম পুরুষ ঃ আপনি কি পৃথিবী সম্বন্ধে জানেন?

বন ভন্তে ঃ জানি ও জানিনা।

১ম পুরুষ ঃ তা কি রকম?

বন ভন্তে ঃ ইচ্ছা করলে জানতে পারি। ইচ্ছা না হলে জানিনা।

১ম পুরুষ ঃ তা কি রকম?

বন ভন্তে ঃ প্রয়োজনবোধে জানি।

১ম পুরুষ ঃ ফোক্‌ল্যান্ডে যে যুদ্ধ চলছে তা আপনি কি জানেন?

বন ভন্তের ঃ হ্যাঁ জানি।

২য় পুরুষ ঃ আপনি কোন পক্ষকে সমর্থন করেন?

বন ভন্তে ঃ কোন পক্ষকে না।

২য় পুরুষ ঃ আচ্ছা, কোন পক্ষ জয়ী হবে?

বন ভন্তে ঃ এ প্রশ্নটি সাধারণ লোকের নিকট উত্তর পাবেন।

২য় পুরুষ ঃ তা কি রকম?

বন ভন্তে ঃ সাধারণ লোক যে কোন এক পক্ষকে সমর্থন করে। বন ভন্তে পাল্টা প্রশ্ন করে বলেন, আপনারা কোন পক্ষকে সমর্থন করেন?

২য় পুরুষ ঃ আমরা বৃটেনকে সমর্থন করি।

বন ভন্তে ঃ আপনাদের মত সাধারণ লোক যে কোন একপক্ষকে তো সমর্থন করবেনই। এ পৃথিবীতে যারা যুদ্ধ বিগ্রহ করে তারা সাধারণ ও হীন।

২য় পুরুষ ঃ তা হলে বৃটেনও হীন?

বন ভন্তে ঃ হ্যাঁ,হীন এ কথা আপনারা দেশে গিয়ে বলবেন। যাঁরা অসাধারণ ও মহৎ তাঁরা কখনও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হন না।

১ম মহিলা ঃ আমি পৃথিবীর প্রায় জায়গায় ভ্রমন করেছি। এমনকি যে জায়গা একটু ভাল লেগেছে সেখানে কয়েক বার গেছি।

বন ভন্তে ঃ ভ্রমণ করাতে কষ্ট হয় না?

১ম মহিলা ঃ হ্যাঁ কষ্ট হয়।

১ম মহিলা ঃ দর্শনীয় জায়গার মধ্যে বৌদ্ধ তীর্থ স্থানগুলি আমার খুবই ভাল লাগে। কেন যে ভাল লাগে তা' বলতে পারেন?

বন ভন্তে ঃ দর্শনীয় জায়গার মধ্যে বৌদ্ধ তীর্থগুলি নিরিবিলি এবং কোলাহল মুক্ত। অন্য কারণ হলো, আপনার বোধ হয় পূর্ব জন্মের বৌদ্ধ সংস্কারও থাকতে পারে।

২য় মহিলা ঃ আপনি কত বৎসর সাধনা করে আসছেন?

বন ভন্তে ঃ পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবৎ।

২য় মহিলা ঃ সুদীর্ঘ সময়ে আপনি কি অভিজ্ঞতা লাভ এবং অনুভব করেছেন?

বন ভন্তে ঃ সত্য সমূহকে উপলব্ধি এবং অবিদ্যা-তৃষ্ণাকে ধ্বংস করে নিরোধ জ্ঞান অনুভব করছি।

বন ভন্তের সাথে ফরাসী পর্যটকরা আলাপ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।

বন ভন্তের শাসন পদ্ধতি

বন বিহারে একজন শ্রমণ হলে একজন ধুতাঙ্গধারী শ্রমণের যা যা প্রয়োজন বন ভন্তে ক্রমান্বয়ে পুংখানুপুংখরূপে তা ব্যাখ্যা করে থাকেন। দশশীলের বিশদ ব্যাখ্যা এবং ৭৫টি শেখিয়া ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করেন। প্রত্যেক দিন ভোর পাঁচটায় এবং সন্ধ্যার পরে ভিক্ষু শ্রমণদিগকে নিত্য প্রয়োজনীয় কর্মস্থান সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করে থাকেন। প্রত্যেক অমাবস্যায় ও পূর্ণিমার উপোসথের দিন সীমা ঘরে তাঁর শিষ্য ভিক্ষুদেরকে বিনয় শিক্ষা প্রদান করেন। যদি কেহ বিনয় লংঘন করে থাকে এক ঘন্টা পর্যন্ত রৌদ্রে দাঁড় করান, বোধিবৃক্ষের গোড়ায় জল ঢালা এবং বিভিন্ন শাস্তির বিধান করে থাকেন। প্রত্যেক ভিক্ষু শ্রমণদিগকে রাত এগারটা হতে রাত তিনটা পর্যন্ত ঘুমানোর নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হয়।যদি কেহ গুরুতরবিনয় লংঘন করে থাকে, সংগে সংঘেই শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিয়ে বহিস্কার করেন। বন ভন্তের শিষ্য ভিক্ষু শ্রমণদের অনেক বহিস্কৃতের মধ্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছিঃ

এক বার এক যুবক শ্রমণ কোন এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাঙ্গামাটির বিশিষ্ট এক মহিলার প্রতি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। হঠাৎ শ্রমণের প্রতি বন ভন্তের চোক পড়ল। ঠিক দুই দিন পর শ্রমণকে ডেকে রসিকতার সহিত জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি রাঙ্গামাটির কোন্ কোন্ মহিলাকে চিনো? শ্রমণ কয়েকজনের নাম বলার পর বল্লেন- অমূক মহিলাকে চিনো নাকি? হ্যাঁ, ভন্তে, চিনি। সে সুন্দরী কিনা? হ্যাঁ, ভন্তে, তা হলে তুমি একটা কাজ কর, সাদা কাপড় পড়ে এস। শ্রমণের বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত পঞ্চশীল গ্রহণ করে চলে গেল। এখানে ভন্তে দেখতে পেলেন যে এ ব্যাপারে সহজে সংশোধন হবেনা এবং ভবিষ্যতে সমস্ত ভিক্ষু শ্রমণও বন বিহারের নিয়ম লংঘন করতে সাহস পাবে না।

বনভন্তে কি রাগী ?

আপনারা বোধ হয় কেহ্ কেহ্ জানেন আমি শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের মুখ নিঃসৃত ধর্মদেশনাগুলি আমার সাধ্য ও সামর্থ্য অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করতে চেষ্টা করেছি। বন ভন্তের দেশনাগুলি লিপিবদ্ধ করতে হলে তিনটি বিষয় সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকা দরকার। এই তিনটির মধ্যে প্রথমে গভীর লোকোত্তর জ্ঞানের দরকার, দ্বিতীয় সুতীক্ষ্ম স্মৃতি শক্তির অধিকারী হওয়া এবং তৃতীয়তঃ বাংলা ভাষার উপর দক্ষতার প্রয়োজন।

এ তিনটি বিষয়েই আমার যৎ সামান্য ধর্ম জ্ঞান, স্মৃতি শক্তি ও ভাষা জ্ঞান দিয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের একটি বিষয়ে দেশনার ভিত্তি করে আপনাদের নিকট প্রবন্ধাকারে বিষয়টি উপস্থাপন করছি। বিষয়টি হ্ল–বন ভন্তে কি রাগী? কেহ্ কেহ্ মনে করেন

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সবকিছু ত্যাগ করেছেন কিন্তু রাগ ত্যাগ করতে পারেন নি। গভীরভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করলে এবং বন ভন্তের মুখ নিঃসৃত এই বিষয়ের উপর দেশনা যাঁরা শুনেছেন তাঁরা বুঝতে পারবেন এটি তাঁর রাগ নয়, বিনয় সম্মত বুদ্ধের অনুশাসন। বন ভন্তে ইচ্ছা করেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম অনুসারীরা তাঁদের চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে যেন ধর্মের সামান্যতম পরিহানী না করে কেননা বিন্দু বিন্দু জলের ফোঁটায় যেমন বিশাল সাগরের সৃষ্টি হয় তেমনি ধর্ম আচরণে ফাঁক থাকলেও ধর্মের গ্লানি হবে এবং ক্রমে ক্রমে এই অভ্যাস বিশাল আকার ধারণ করে ধর্ম ও সংঘকে কলুষিত করবে। সে জন্য ধর্মের অনুশাসন রক্ষার্থে বন ভন্তে সময় সময় কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন। বিষয়টিকে আরো পরিস্কারভাবে উপস্থাপন করার জন্য নিম্নে দুটি উদাহরণ তুলে ধরছি। তা হতে আপনারা নিজেরাই বুঝতে পারবেন ইহা শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের রাগ নয় লোক শিক্ষার জন্য অনুশাসন মাত্র। প্রথম উদাহরণঃ–

একদিন আমি বুদ্ধ বন্দনা করার পর আমার অজ্ঞানতা বশতঃ একখানা ধর্মীয় পুস্তক নীচে (ফ্লোরে) রেখে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে বন্দনা করার উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি দাঁড়িয়ে বললেন– তুমি আমাকে বন্দনা করনা বুদ্ধকে অবমাননা করে আমাকে বন্দনা করবে কেন? তুমি জাননা বুদ্ধের অবর্তমানে বুদ্ধের ৮৪ হাজার ধর্ম স্কন্ধই স্বয়ং বুদ্ধ স্বরূপ? আমাকে বন্দনা করার প্রয়োজন নেই। উপস্থিত উপাসক উপাসিকারা হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো। আমি পুস্তকটি টেবিলের উপর রেখে বললাম–ভন্তে আমার ভুল হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। তারপর বন ভন্তে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘকে কিভাবে সম্মান ও মর্যাদা দিতে হয় তা উপদেশ দিয়ে আমার ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। তিনি এরকম পদক্ষেপ না নিলে আমার জীবনেও শিক্ষা হতো না। দ্বিতীয় উদাহরণঃ শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে কোন জায়গায় কেহ্ আমন্ত্রণ করলে আমন্ত্রণের দিন সঠিক সময় এবং গাড়ীর সংখ্যা ডায়েরীতে লিখে দিতে হবে। অবহেলা অথবা ভুলক্রমে দেরীতে

উপস্থিত হলে এবং গাড়ীর সংখ্যা কম হলে বন ভন্তে সেদিন অনুষ্ঠানে যাননা। তাঁর ভাষায় আমার ধ্যান সমাধিতে অথবা ধর্মে কোন কৃত্রিমতা নেই। কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে অভিজ্ঞান লাভ করেছি। তোমাদের কাজে ও কথায় মিল নেই কেন? তোমাদের ভেজাল ধর্মে যাবনা। অনেক জায়গায় কথা আর কাজে অমিল থাকাতে তিনি অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। সে সময় কেহ কেহ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ বা প্রার্থনা করলেও সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেন।

একবার বন বিহারে বাইরে দুই জন ভদ্রলোক চোখের পানি মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন-আমাদের লোকদেরকে কিভাবে সান্ত্বনা দেবো? হয়তো আমাদেরকে মারতেও পারে। আমি আর বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মা তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্‌লাম-আপনারা একটু অপেক্ষা করুন দেখি, আমরা বন ভন্তেকে বুঝিয়ে নিতে পারি কিনা। অতঃপর আমরা বন ভন্তেকে বন্দনা করে অনুরোধ করার সাথে সাথেই তিনি বলে উঠলেন-অনুরোধ করো না, অনুরোধ করোনা। আমরা বল্‌লাম, ভন্তে ভুল যখন হয়েছে, আর কি করা যায়? ক্ষমা করে সেখানে যাওয়া ভাল মনে করি। ভন্তে তৎক্ষণাৎ আসন হতে উঠে বল্‌লেন-ভেজালের জন্য অনুরোধ করোনা। বিহার হতে বের হয়ে যাও। আমরা বিহারের উঠানে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে আছি। তিনি আবার বল্‌লেন-বিহার এলাকা হতে চলে যাও। তারপর আমরা চলে যাওয়ার সময় ছোয়াইং ঘরে বসে রইলাম। আর একদিন বন ভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে বল্‌লেন-তোমাদের অনুরোধে যদি সেদিন যেতাম, দায়কদের অভ্যাসে পরিণত হত। ভেজাল আমার সহ্য হয়না। ভেজাল কি? নির্ভেজাল কি? তা' পারমার্থিক ভাবে তিনি বুঝিয়ে দিলেন। পরিশেষে বুঝতে পারলাম বন ভন্তের এটা রাগ নয় অনুশাসন মাত্র। আমার মনে হয় অন্য কেহ বন বিহারের ধারে কাছেও আসতোনা। যেমন বর্তমানে কেহ কেহ ভুল ধারণা বশতঃ বন বিহারে আসেনা।

অনেক সময় বনভন্তে বলেন, আমার রাগটা কি রকম জান? ডাক্তারের ফোঁড়া অপারেশন করা, শিক্ষকের দোষী ছাত্রকে শাস্তি প্রদান করা ও কর্মকারের লোহা পিটানোর মত। তিনি আরো বলেন, মার তাড়াতে হলে জোর গলায় বা শক্ত ভাবে না বল্‌লে হয়না। অনেকে মনে করে এটা বন ভন্তের রাগ, আসলে তা রাগ নয়। এতে প্রমাণ হয় যে বন ভন্তে রাগশূণ্য। রাগ প্রকৃতির লোক সব সময় রাগ দেখায় কিন্তু বন ভন্তের বেলায় তা' নয় যেখানে ভুল, ত্রুটি, দোষ অথবা গুরুতর অপরাধ পরিলক্ষিত হয় সেখানে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বজ্র কণ্ঠে শিক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

বন ভন্তে কি রাগ মুক্ত?

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে মহোদয়কে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করলে এবং তাতে তিনি অনুমোদন দান করলে আমন্ত্রণের তারিখ, সময় ও যানবাহনের সংখ্যা ডায়েরীতে লিখে দিতে হয়। ডায়েরীতে লিখা অনুযায়ী শর্ত পুরণ না হলে তিনি প্রায় আমন্ত্রণে যান না বিশ্লেষণে তিনি বলেন-কথা আর কাজে মিল থাকা দরকার। ভেজালে আমি যাব কেন? আমি কোন কাজে বা কথায় ভেজাল দিই না। একবার মাঘ মাসের কন্‌কনে শীতের দিনে মহামুনি পাহাড়তলী হতে বন ভন্তেকে আমন্ত্রণ জানানো হলো। ভন্তের জন্য দুইখানা মোটর কার এবং গৃহীদের জন্যে একখানা কোচের ব্যবস্থা করা হল। অনুষ্ঠানের আগের দিন বেলা দুই ঘটিকায় রওনা হওয়ার সময় নির্ধারিত হল। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে নদীর ঘাটে এসে, গাড়ী দেখে বললেন-আমি যাব না। দুইটা কার আনার কথা, একটা কার ও একটা জীপ এনেছ। তোমাদের কথা ও কাজে মিল নেই, এই বলে তিনি বিহারে চলে গেলেন। আমি সহ বহু লোকে অনুরোধ করার পরও তিনি যেতে রাজী হলেন না। তিনি শুধু বল্‌লেন- আগামীকাল সকাল বেলা পাঁচখানা কার আনলে আমি যেতে পারি। বনভন্তে এই কথা বলার পর পাহাড়তলীর উপাসকেরা সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন। এদিকে আমাদিগকে বলে দিলেন-তোমরা আজকে চলে যাও। সন্ধ্যার সময় গিয়ে দেখি শত শত ধর্মপ্রাণ নারী পুরুষ বনভন্তের আগমনের অপেক্ষায় আছেন। তাঁকে না দেখে সবার চেহারা সঙ্গে সঙ্গে মলিন হয়ে গেল।

রাত দুইটায় পাহাড়তলীর জনৈক উপাসক আমাকে ঘুম থেকে ডেকে বল্‌লেন- অনুগ্রহ পূর্বক চলুন আমার সাথে। রাত তিনটায় যাত্রা করলাম। কুয়াশার জন্যে পথ দেখা যাচ্ছে না। খুব ভোরে রাণীর হাট এসে চা পান করে ভোর ছয়টায় বন বিহারে পৌঁছি।

সকাল নয়টায় মহামুনি বিহারে পৌঁছার পর বিপুল সংখ্যক উপাসক-উপাসিকা সাধুবাদ ধ্বনিতে বিহার এলাকা মুখরিত করলেন। প্রথমেই তিনি কাজে রত জনৈক উপাসককে জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কতটুকু লেখাপড়া করেছ? উপাসক বল্‌লেন-অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ভন্তে বল্‌লেন-তাহলে তুমি এখান থেকে চলে যাও। এম, এ, পাশ ব্যতীত কেহ আমার অবস্থানকালীন সময়ে কাজ করতে পারবেনা। উপস্থিত ক্ষেত্রে পাওয়া গেল দুইতিন জন এম, এ পাশ লোক মাত্র। বিকাল বেলা সাত আট জনে দাঁড়াল। আমি একজনের মত জিজ্ঞাসা করে দেখতে পেলাম তিনি খুব খুশী। বল্‌লেন-তিনি এরকম না বল্‌লে আমরা পূণ্যাংশ থেকে বাদ পড়তাম। তাতে আমি বুঝলাম ভগবান বুদ্ধও সেরকম শাক্যদেরকে প্রথমেই মান ভঙ্গ করেছিলেন। এ ঘটনা পাহাড়তলীতে ছড়িয়ে পড়ার পর জনমনে অসন্তোষের পরিবর্তে বেশ আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। সকাল বেলা যথাসময়ে

সংঘদান, বিকালে ধর্মসভা ও রাত্রে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ মঞ্চস্থ হয়। পরের দিন সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রশ্নের সমাধানের জন্য কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ উপাসক বন ভন্তের সমীপে উপস্থিত হন। প্রথমে তাঁরা প্রশ্ন করেন- আমাদের ধারণামতে আপনি লোভ, দ্বেষ, মোহ ত্যাগ করেছেন। তার প্রমাণ আপনি টাকা পয়সা স্পর্শ করেননা এমনি কি বহু বৎসর যাবৎ ধ্যান সাধনা করেছেন। আমাদের মতে আপনি রাগ ত্যাগ করেন নি? বন ভন্তে একটু হেসে বল্‌লেন-গাড়ীর ব্যাপারে। তারপর বন ভন্তে বল্‌লেন-মন দিয়ে শুনুন, যদি ঐদিন সে গাড়ী যোগে আসতাম, আর একদিন আপনারা একখানা ভাঙ্গা জীপ নিয়ে আসতেন। এটা অভ্যাসে পরিণত হতো। এরকম করার উদ্দেশ্য হল আপনাদেরক শাস্তি দেওয়া। ভবিষ্যতে যেন এরকম পুনরাবৃত্তি না ঘটে। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষক ছাত্রকে অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন। তৃতীয়তঃ চিকিৎসক রোগীর ফোঁড়া অপারেশন করলে রাগ ধরা যায়না। তদ্রুপ ঐদিন আমার ঐরূপ নির্দেশ ছিল। ইহা আপনাদের অপরাধের জন্য শিক্ষামূলক শাস্তির ব্যবস্থা মাত্র।

তিনটি উপমামূলক দেশনা করার পর উপসকরা সন্তুষ্ট হন। তারপর শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে চতুর্থ উপমা দিয়ে বল্‌লেন-ভগবান বুদ্ধের সময়ে পাঁচশত তীর্থীয় সন্ন্যাসী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। তাঁরা একদিন বুদ্ধ দর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে উপস্থিত হয়েছেন। সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। ভগবান দেশনায় রত আছেন। নবদীক্ষিত ভিক্ষুরা বিনয় না জেনে কোলাহল করায় তাদেরকে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। ভিক্ষুরাও কেঁদে কেঁদে বিহার থেকে বাহির হয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বিহারের সামনে জনৈক শাক্যপুত্র যুবক জিজ্ঞাসা করলেন-ভদন্তগণ, আপনারা এই মাত্র এসে পুনারায় চলে যাচ্ছেন কেন? উত্তরে বলেন-ভগবান আমাদেরকে বহিস্কার করেছেন। যুবক উৎকণ্ঠিত হয়ে বল্‌লেন-আপনারা একটু দাঁড়ান। ভগবান বুদ্ধ আমার গোত্রীয় ভাই তাঁকে বুঝায়ে আপনাদিগকে পুনরায় নিয়ে যাব। তারপর যুবক ভগবান বুদ্ধকে বন্দনা করে বলেন- ভন্তে, অনুগ্রহ পূর্বক নব দীক্ষিত ভিক্ষুদের অপরাধ ক্ষমা করুন। যদি তারা চলে যান পুনারায় তীর্থীয় হয়ে যাবেন। যুবকের সুপারিশে ভগবান নীরব রহিলেন। তারপর ভগবান বুদ্ধের সেবক আনন্দ বল্‌লেন-ভগবান, আপনি তীর্থীয়দের মাতা সদৃশ, সদ্যজাত শিশুকে মা দুগ্ধ দান না করলে শিশু মারা পরবে। ভগবান তাতেও নীরব রহিলেন। তারপর স্বর্গের ইন্দ্র রাজা বল্‌লেন-ভাগবান অংকুর হতে উত্থিত চারাগাছ জল না পেলে বাঁচবেনা, তীর্থীয়গণ চারা সদৃশ। ভগবান তাতেও নীরব রহিলেন। সর্বশেষে সারিপুত্র মোদ্‌গলায়ন এসে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

তখন ভগবান বুদ্ধ তাদিগকে বল্‌লেন-কি জন্যে তাদেরকে বহিস্কারের নির্দেশ দিয়েছি জান? তাঁরা উত্তর দিলেন-নব দীক্ষিত ভিক্ষুগণ অজ্ঞ বলে শাস্তি স্বরূপ বহিস্কার করেছেন। অবশেষে ভগবান বুদ্ধ তাদেরকে ডেকে আনার জন্য নির্দেশ দেন। নবদীক্ষিত ভিক্ষুগণ ভগবান সমীপে আসার পর যে ধর্ম দেশনা দেয়া হয় তাতে তারা সঙ্গে সঙ্গে অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আকাশ পথে অন্য বিহারে চলে যান।

পরিশেষে বন ভন্তে বল্‌লেন-আচ্ছা, এখন আপনারা বলুন, ভগবান বুদ্ধ কি রাগ করেছেন না তাঁদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন? উত্তরে উপাসকরা বলেন-শিক্ষা দিয়েছেন। পুনরায় বন ভন্তে বল্‌লেন-তা হলে আমার রাগ কোথায়? বন ভন্তের ধর্ম দেশনায় তাঁরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তার পর উপাসকরা আরো তিন চারটা প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পেয়ে রাত এগারটায় সকলে বন্দনা করে চলে যান।

রাগ রূপে শিক্ষা হয় বুঝহ্ সুজন।
অন্যথায় অন্য অর্থ বুঝিবে কুজন।।।

রসিকতায় (শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের) উপদেশ

প্রায় দেখা যায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক উপাসিকাদিগকে গভীর তথ্যমূলক ও লোকোত্তর ধর্ম দেশনা করে থাকেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যায় বাস্তব উদাহরণ সহ রসিকতায় উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাতে মূল রহস্য উৎঘাটন ও জ্ঞান অর্জনের সহায়ক হয়।

১। একদিন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আমাকে উদ্দেশ্য করে বল্‌লেন- আচ্ছা তুমি যদি ভিক্ষু হও, তোমার স্ত্রী তোমার চায় ভুলে যদি চিনি না দেয় তাকে লাঠি দিয়ে মারবে নাকি? আমি একটু চিন্তা করে বললাম যদি আমি ভিক্ষু হই আপনার নিকটই হব। এখানে মারামারির সুযোগ কোথায়? তারপর ভন্তে বললেন-জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষুর গৃহী কালের স্ত্রী তার চা-এ ভুলে চিনি না দেওয়ায় খুব মার ধর করেছে। "যারা হীন ও নীচ প্রকৃতির তারা বিনয়ের বহির্ভুত কাজ করে থাকেন।"

২। আর একদিন তার যুবক শিষ্য ভিক্ষু শ্রমণদেরকে দেখিয়ে বল্‌লেন-এগুলি আমার হাতীর দাঁত। হাতীর দাঁত কেমন জান? হাতীর দাঁত অত্যন্ত গোপনীয় জিনিষ। হাতীর দাঁত দারোগা থেকে লুকিয়ে রাখি। শিষ্যের দিকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন- নারী দারোগাকে ভয় করো। কোন সময় নারী দারোগা কপাল পোড়া দেয়। আমরা সবাই হেসে উঠলাম। আর বল্‌লেন-এ বুড়া ভিক্ষু আমার ছাগলের শিং, দারোগা কেন কারো প্রয়োজন নেই।

তারপর তিনি আরো উপদেশ দিয়ে বল্‌লেন-"বাঘকে ভয় করোনা নারীকে ভয় করো।" বাঘ তোমাদের রক্ত মাংস খাবে আর নারী খাবে তোমাদের জ্ঞান-পূণ্য। বিদ্যুৎ স্পর্শ করলে লোক মারা যায়। তেমনি ভিক্ষু শ্রমণ নারী স্পর্শ করলে ব্রহ্মচর্য নষ্ট হয়।

তাল গাছের আগা ভেঙ্গে যাওয়া আর ব্রহ্মচর্য নষ্ট করা একই কথা। সাপে কাটলে লোক মারা যায়। নারীর সংস্পর্শে ভিক্ষু শ্রমণের অপায় গতি ব্যতীত অন্য উপায় নেই।

৩। আর একদিন ভোর বেলায় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে জনৈক বুড়া শ্রমণকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন-ভগবান বুদ্ধের সময়েও তোমাদের মত বুড়া শ্রমণ ছিল। কেহ কেহ ধ্যান সমাধি করে অগ্রফলের অধিকারী হন। কেহ কেহ তোমাদের মতো গল্প আলাপ করে সময় অতিবাহিত করে যা' তা' রয়ে যায়। হঠাৎ একদিন বুড়া শ্রমণদের কাঁদতে দেখে এক ভিক্ষু তাদের কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। অন্য এক বুড়া শ্রমণ উত্তরে বল্‌লেন-এই শ্রমণের গৃহী কালের স্ত্রী মারা গেছে। তা শুনে উক্ত ভিক্ষু বল্‌লেন-তাতে কি আসে যায়? শ্রমণ হয়ে কান্না করা শোভা পায় না। সেই শ্রমণ আবার বল্‌লেন-তার স্ত্রী খুব ভাল উপাসিকা ছিল, ভালো ভালো খাদ্য ও পিঠা নিয়ে আসত, আমরা সবাই বসে বসে আহার করতাম। এখন থেকে আর খেতে পারবনা সেজন্য বসে বসে কাঁদছি।

এ গল্পটি বলার সাথে সাথেই আমরা হেসে উঠলাম। তারপর বন ভন্তে বল্‌লেন-"যৌবন কালে মানুষের পাওয়ার ইচ্ছা হল নারী, আর বুড়া কালে খাওয়ার ইচ্ছা বিভিন্ন প্রকার খাদ্য দ্রব্য। তাদেরও খাওয়ার ইচ্ছা আছে, তা কি জান? আসক্তি ত্যাগ না করলে মুক্তি পাবে না।" তিনি আবারও রসিকতা করে বল্‌লেন-আচ্ছা, যদি তোমাদের ঘরের বুড়ী মারা যায়, শুনে কান্না করবে নাকি? আমরা হেসে বল্‌লাম-তা কি করে হয়? লজ্জার ব্যাপার। এ ভাবে অনেক সময় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে রসিকতার ভিতর দিয়ে উপাসক উপাসিকা এবং ভিক্ষু শ্রমণদেরকে উপদেশ দিয়ে থাকেন।

হাসি নহে খুশী নহে নহে রসিকতা।
হাসিতে খুশীতে জ্ঞান আর শিক্ষকতা।।

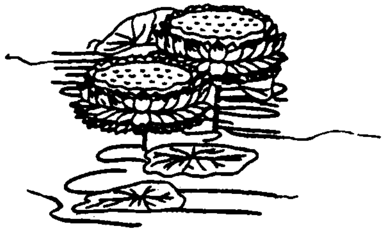

ত্যাগেই সুখ

দেশনার প্রারম্ভে বল্লেন-একটা বাগান করতে হলে প্রথমে বন-জঙ্গল কাটতে হয় এবং সেগুলির মূল উৎপাটন করতে হয়। পরে লতা পাতা ঘাস ইত্যাদি পরিষ্কার করতে হয়। পরিশেষে শস্যাদির চারা রোপণ করতে হয়। তেমনি পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে হলে প্রথমে ত্যাগ করতে হবে এবং পরিশেষে দমিত হয়ে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে হয়।

ত্যাগে কি হয় জানতে হবে। ত্যাগ কে কে করেছে, কি কি ত্যাগ করেছে, কি কি ফল লাভ করেছে? তোমাদেরও সে রকম ভাবে ত্যাগ করতে হবে।

প্রথমে পঞ্চ আসক্তি ত্যাগ করতে হবে। যেমন কামাসক্তি, কর্মাসক্তি, নিদ্রাসক্তি, ইন্দ্রিয়াসক্তি, মিত্রাসক্তি। ১। কামাসক্ত কোন কোন ব্যক্তি যৌন বিষয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে। এরকম হীন আচরণে মানুষের মুক্তির পথে এক বিরাট বাঁধার সৃষ্টি হয়। সুতরাং কামাসক্তি ত্যাগ করা একান্ত উচিৎ।

২। কর্মাসক্ত ব্যক্তি সারাদিন-রাত, সপ্তাহ-মাস, বৎসর এবং সারা জীবন নানা কর্মে ব্যস্ত থেকে মুক্তির পথ পায়না। সুতরাং কর্মাসক্তি ত্যাগ করা প্রয়োজন।

৩। অনেক লোক দেখা যায় তারা অধিকাংশ সময় শুধু ঘুমায়ে ঘুমায়ে কাটায়। তারা কোন কারাগারে আছে জানেনা। কাজেই মুক্তির পথ খুঁজতে হলে নিদ্রাসক্তি ত্যাগ করা দরকার।

৪। কোন কোন লোক দেখা যায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ে অত্যধিক আসক্ত। তারা চক্ষুদ্বারা সুদর্শনীয় বস্তু গ্রহণ করে লোভ মোহ পরায়ণ হয়। কর্ণ দ্বারা শ্রুতি মধুর শব্দ গ্রহণ করে লোভ মোহ পরায়ণ হয়। জিহ্বা দ্বারা সব সময় ভাল দ্রব্যের স্বাদ গ্রহণ করে লোভ মোহ পরায়ণ হয়। কায় বা ত্বক দ্বারা কোমল বা আরামদায়ক বস্তু গ্রহণ করে লোভ মোহ পরায়ণ হয়। পঞ্চ আসক্তি বা লোভী ব্যক্তিরা তাদের ইন্দ্রিয় ভোগের বিপরীত হলে দ্বেষ মোহ পরায়ণ হয়। তারা লোভ দ্বেষ, মোহ পরায়ণ হয়ে নানা দুঃখ ভোগ করে এবং মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে পারেনা। সে জন্য ইন্দ্রিয় আসক্তি ত্যাগ করা উচিৎ।

৫। কেহ কেহ সব সময় সঙ্গী বা মিত্রদের সাথে নানা আলাপ করে সময় কাটায়। তারা অমূল্য জীবন বা সময় সম্বন্ধে জানেনা। মিত্রাসক্ত ব্যক্তিরা মুক্ত কি করে হয় তা বোঝেনা। সুতরাং মিত্রাসক্তি ত্যাগ করা একান্ত দরকার।

অবিদ্যাসক্তগণ দুঃখ যন্ত্রণায় পরে। অবিদ্যা বা অজ্ঞানতা অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে, অবিদ্যায় চতুরার্য সত্য, কর্ম ও কর্মফলকে বুঝা বা জানার জন্য বাধা হয়। অজ্ঞানের অন্ধকারে আবদ্ধ রাখে বলে একে ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

তৃষ্ণাসক্তদেরকে জন্ম জন্মান্তরে নদীর স্রোতের মত একবার ভাসিয়ে একবার ডুবিয়ে

নানা জন্মে অসহ্য দুঃখ প্রদান করে। সুতরাং যন্ত্রণাদায়ক তৃষ্ণাকে সর্বোতভাবে পরিত্যাগ করা উচিৎ।

লৌকিক হীন সংস্কার বলতে সংসারের যাবতীয় লৌকিক কর্মকে বুঝায়। মানুষ নানাবিধ হীন সংস্কারে জন্ম জন্মান্তরে ঘুরে ঘুরে নানা দুঃখ ভোগ করে। অতএব হীন সংস্কার ত্যাগ করা দরকার।

কোন লোক হীন মনুষ্যত্বের দরুন কুশল অকুশল জানেনা বা তাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। তারা মুক্তির পথ খুঁজে পায়না। সুতরাং হীন মনুষ্যত্ব ত্যাগ করা একান্ত দরকার।

জাতীয়তাবাদে মানুষের মনে হিংসা, নিন্দা ও ঘৃণার উদ্রেক হয়। এতে মন কলুষিত থাকে। কলুষিত মনে সত্য সমূহ অবগত হওয়া যায়না। সুতরাং জাতীয়তাবাদ ত্যাগ করা দরকার।

আত্মবাদী বা মানবাদী ব্যক্তিরা দেহের মধ্যে আমি নামে এক সংজ্ঞা দেখতে পায়। তাতে রমিত হয়ে নানা লাঞ্ছনা, গঞ্জনা ভোগ করে। নয় প্রকার মান পরিত্যাগ করা একান্ত কর্তব্য।

লোভী ব্যক্তি মরণের পর প্রেতলোকে গমন করে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে। সুতরাং লোভ ত্যাগ করা একান্ত দরকার।

হিংসা মানুষের চিত্তকে সব সময় কলুষিত রাখে। মৃত্যুর পর নরকে পতিত হয়ে অনন্তকাল দুঃখ ভোগ করে। যন্ত্রণাদায়ক হিংসাকে ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

এই দেহ অনিত্য, দুঃখপূর্ণ অনাত্ম, অশুচি, বহুদোষ পূর্ণ এবং মুক্তির বিঘ্নকারক সুতরাং সাধু পুরুষেরা সর্ব দুঃখের আধার দেহকে ত্যাগ করে পরম শান্তিপদ নির্বাণ লাভ করে থাকেন। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা জীবনকে তৃণ তুল্যও মূল্য না দিয়ে সত্য সমূহে প্রতিষ্ঠিত পরম সুখ নির্বাণ লাভ করেন সুতরাং মিথ্যা জীবিকা পরিত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। কুশল কর্মে লজ্জা ত্যাগ ও ভয় ত্যাগ,উদ্যমশালী হয়ে তন্দ্রা, আলস্য ত্যাগ, কৃতকর্মের অনুশোচনা ত্যাগ করা একান্ত দরকার।

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরণের ধর্ম আছে। তদ্‌মধ্যে পাপ ধর্ম ও পূণ্য ধর্ম বিদ্যমান। পাপ ধর্ম অপায়ের দিকে নিয়ে যায় এবং পূণ্য ধর্ম স্বর্গের দিকে নিয়ে যায়। পূণ্য ধর্মও ত্যাগ করা উচিৎ কারণ স্বর্গ ভোগ করার পরও অপায়ে পতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেমন দান করলে দানের ফল ভোগ করতে হবে। ফলের ভোগ যতদিন পর্যন্ত শেষ না হয় তত দিন পর্যন্ত বিভিন্ন যোনিতে বা জন্মে পরিভ্রমণ করে নানা দুঃখ ভোগ করতে হয় সুতরাং পূণ্যধর্ম ত্যাগ করা উচিৎ।

মিথ্যা দৃষ্টি সম্পন্ন লোক সত্য পথে চলতে পারেনা বলে বিভিন্ন মতবাদে জড়িত থেকে বহু দুঃখ পায়। মহা অনিষ্টকারী মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

ত্রিরত্নের প্রতি অবিশ্বাস বা সন্দেহ পরায়ণ তা'কে বি-চিকিৎসা বলে। বি-

চিকিৎসা থাকলে সত্য ধর্মে প্রবিষ্ট হতে পারে না। সুতরাং বি-চিকিৎসা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন।

ত্যাগ ধর্ম বলতে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা শীল সমাধি প্রজ্ঞাকে বুঝায়। শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শমথ এবং বিদর্শন ভাবনাকে বর্দ্ধিত করলে ত্যাগ ধর্ম পরিপূর্ণ হয়। ত্যাগ ধর্মে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করা যায়। ত্যাগ ধর্ম মহা কঠিন কিন্তু দুর্লভ নয়। ত্যাগ ধর্ম অনুশীলন করা প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজন।

ত্যাগ কর ত্যাগ কর ত্যাগে মহাসুখ।
জমালে জন্ম বাড়বে জন্মে মহাদুখ।।

উচ্চ পদস্থ অফিসারের সাথে আলাপ

একদিন বন বিহারে জনৈক উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারী তাঁর বন্ধু-বান্ধবকে সংগে নিয়ে আসলেন। গেইটে অন্য সবাই জুতা খুলে রাখলেন কিন্তু তিনি খুল্লেন না। তিনি বন বিহারে উঠতে প্রথম ধাপেই তাঁর মন পরিবর্তন করে জুতা খুলে রাখলেন। দেশনালয়ে একজন বললেন-ইনি আমাদের অমুক অফিসার। পরিচয়ের সাথে সাথেই বন ভন্তে বল্লেন মাথা হতে টুপি নামিয়ে ফেলুন। একটু পরে টুপি নামিয়ে অফিসার বল্লেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করব, উত্তর দিবেন কি? বন ভন্তে ঃ প্রশ্ন করতে পারেন।

অফিসার ঃ আচ্ছা, অহিংসা বৌদ্ধ ধর্মের সারমর্ম। আমি দেখি ইহা হিংসায় পরিপূর্ণ।

বন ভন্তে ঃ কি দেখে বল্লেন বুঝায়ে বলুন।

অফিসার ঃ যেমন এ মাত্র আপনি আমার টুপি নামানোর জন্য বল্লেন। আমাদের মসজিদে টুপি নেওয়ার বিধান আছে। এটা হিংসা নয় কি?

বন ভন্তে ঃ আপনি কেন, রাজা মহারাজাদের পর্যন্ত আমাদের বৌদ্ধ বিহারে রাজ মুকুট খুলে আসতে হয়। খোলা মাথায় বিহারে আসা আমাদের নিয়ম। এটি হিংসা নয়, যে নিয়ম যেখানে প্রযোজ্য সেখানে সে নিয়ম মানা উচিৎ। আর কি প্রশ্ন আছে বলুন।

অফিসার ঃ রাঙ্গামাটিতে এসে দেখলাম চাক্‌মারা মাছ, মুরগী, ছাগল, শুকর এমনকি মানুষ পর্যন্ত হত্যা করে। ইহা কি বৌদ্ধ ধর্মের নীতি?

বন ভন্তে ঃ তারা বৌদ্ধ নয়।

অফিসার ঃ তাহলে তারা কি?

বনভন্তে ঃ তারা নামে মাত্র বৌদ্ধ। যেমন ধরুন, হযরত মোহাম্মদ ইসলাম ধর্মের প্রচারক। তাঁর নীতি অনুসারীকে মুসলমান বলে। আর যারা মদ, লুটতরাজ, নারী নির্যাতন এবং নানাবিধ অবৈধ কাজে লিপ্ত থাকে, তাদেরকে নামেমাত্র মুসলমান বলবেন, তা নয় কি?

অফিসার ঃ হ্যাঁ।

বন ভন্তে ঃ যাঁরা ভগবান বুদ্ধের নীতি পালন করে তাদেরকে বৌদ্ধ বলে অন্যেরা নামে মাত্র বৌদ্ধ।

অফিসার ঃ আপনাকে আর একটা প্রশ্ন করব।

বন ভন্তে ঃ একটা কেন, আপনার ইচ্ছামত প্রশ্ন করতে পারেন। উত্তর দিতে প্রস্তুত আছি।

অফিসার ঃ আচ্ছা , যদি আপনাকে গালি অথবা কর্কশ বাক্য বলি কি করবেন? বা কি বলবেন?

বন ভন্তে ঃ (একটু হেসে) এ খুঁটি দেখছেন তো?

অফিসার ঃ হ্যাঁ।

বন ভন্তে ঃ আপনি এ খুঁটিকে সারাদিন গালিগালাজ অথবা কর্কশ বাক্য বলুন, খুঁটি যে ভাবে সাড়া না দিয়ে থাকে, আমিও খুঁটির মত চুপ করে থাকব। কিন্তু একটা কথা আছে যারা সংসারে অজ্ঞানী ও মুর্খ তারা সবাইকে গালি অথবা কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে। অন্যদিকে আপনাকে মনে করব একজন ছোট শিশু। ছোট শিশুরা কোলে পায়খানা প্রস্রাব করে দেয়। ছোট শিশুকে ফেলে দেয় নাকি?

অফিসার ঃ না।

বন ভন্তে ঃ যে রকম ছোট শিশুকে পায়খানা ধোয়াইয়া আবার কোলে তুলে নেয়। সেরূপ আপনাকেও ছোট শিশু তূল্য ধারণা করব।

তখন অফিসার মহোদয় আর প্রশ্ন না করে দাঁড়িয়ে বললেন–আমাকে ক্ষমা করুন। এখন আমি আপনার নিকট ছোট শিশু।

বন ভন্তে ঃ বস, বস, বস। তারপর বনভন্তে অফিসার মহোদয়কে উপলক্ষ্য করে বহু উপদেশ প্রদান করলেন। সে সময় হতে তাঁরাও খুব সন্তুষ্ট হয়ে বন বিহারে যাতায়াত করতেন।

সঠিক প্রার্থনা

একদিন দেশনালয়ে কয়েকজন উপাসক সহ বনঃভন্তের দেশনা শুনছি। এমন সময় ঘাগড়ার এক ভদ্রলোক বন্দনা করে বলে উঠলেন-ভন্তে, আমার পরিবারে সর্বদা যে কোন একজন ভীষণ রোগে ভুগতে থাকে। রোগ মুক্তির জন্য আপনার নিকট আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। বন ভন্তে আমাকে বল্লেন-দেখত কি বলে? লোকটি হতবাক হয়ে চেয়ে রইলো। আমি হেসে হেসে তাকে শিখিয়ে দিলাম নির্বাণ প্রার্থনা বড় করে বলবেন। আর অন্য প্রার্থনা মনে মনে করুন। বন ভন্তে অন্য প্রার্থনা পছন্দ করেন না। তারপর বন ভন্তে হীন প্রার্থনা সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা করে বল্লেন-কেহ পরীক্ষায় পাশ করার জন্য, কেহ ভোটে জয়ী হবার জন্য, কেহ বড় লোক হবার জন্য আর কেহ যে কোন একটির জন্য প্রার্থনায় বসে।

এ পৃথিবীতে মনুষ্যরা টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, ধন-সম্পত্তি, স্ত্রী-পুত্র, মান-যশ-স্বাস্থ্য, পদ-রাজ্য এমনকি আপন সমৃদ্ধির জন্য নানাবিধ প্রার্থনা করে থাকে। এইগুলি হল হীন প্রার্থনা। কেবল একটি প্রার্থনা করা উচিৎ। যে প্রার্থনায় সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করা যায়। তা হল নির্বাণ প্রার্থনা। দেশনা শেষে আমি বনভন্তের নিকট প্রার্থনা করলাম-ভন্তে, আপনার দেশনা খুবই সংক্ষেপ। আরো বিশদ ভাবে চাক্মা ভাষায় ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলে উপাসকেরা সহজে বুঝতে পারবে-এ প্রার্থনাটি করছি। ভন্তে বল্লেন-বেশীক্ষণ দেশনা করলে আমার শক্তি থাকেনা একবেলা অল্পাহার করে আর কত পারব? তুমি তাকে বুঝিয়ে বল। আমি তাকে প্রার্থনা সম্বন্ধে বুঝালে তিনি আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না। তারপর শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে বল্লাম-দেখুন, আপনি থাকতে আমার কথা শুনবে কেন? একটু পরে ভদ্রলোকটিকে লক্ষ্য করে পারমার্থিক ভাবে প্রার্থনা সম্বন্ধে গভীর তথ্যপুর্ণ দেশনা করলেন। ঘটনাচক্রে আর একদিন সেই ভদ্রলোকের সাথে আমার দেখা হয়। উৎফুল্ল চিত্তে তিনি বল্লেন- এই আমার বৃদ্ধ মাতা, স্ত্রী, পুত্রকন্যা সবাই আপাততঃ ভাল আছে। তৎপর ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করলাম। ভন্তে, তাঁর প্রার্থনা হাতে হাতে ফল পেয়েছে। ভন্তে আমাকে বল্লেন-এগুলি সত্যের প্রভাবে ফল হয়ে থাকে। নির্বাণ প্রার্থনাই সঠিক প্রার্থনা।

ধন্জন সব কিছু অনিত্যই ভবে।
প্রার্থনাই সঠিক তবে তাহা কর সবে।।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ

একদিন বন বিহারে জেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার আসলেন। বন ভন্তের সাথে বহু আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা ও জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। বন ভন্তে তাঁর বক্তব্যে জবাবে বলেন–এগুলি হল হীন ব্যক্তি ও সাধারণ লোকের জন্য ব্যবস্থা মাত্র। যাঁরা উত্তম ও অসাধারণ ব্যক্তি তাঁরা এগুলির বাইরে থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে থাকেন। এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করা দুঃখজনক। দুঃখ কি জানেন? জন্ম গ্রহণ করা দুঃখ, জন্ম গ্রহণে নানা ব্যাধিতে ভোগে, এমনকি মারা পর্যন্ত যায়। বৃদ্ধ হলে দুঃখ, প্রিয় বিয়োগে দুঃখ, আহার অন্বেষণে দুঃখ এবং মৃত্যু দুঃখ। দেখুন জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের কত যে দুঃখ মৃত্যুর পর আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। মনুষ্য জন্ম হলে ভাল কথা। নানাবিধ প্রাণী হয়ে জন্ম নিলে দুঃখের সীমা থাকেনা জন্ম হলে বার বার দুঃখ আর কত সহ্য হয়? তা হলে দুঃখের পরিত্রাণ কি? দুঃখের পরিত্রাণ হল নির্বাণ। নির্বাণই প্রকৃত জন্ম নিয়ন্ত্রণ। নির্বাণ প্রাপ্ত হলে বার বার জন্ম হবেনা। অফিসার মহোদয় বনভন্তের জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সামান্য মাত্র বুঝে সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

নির্বাণ লাভ হইবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ।
জন্ম লভিয়া না কর দুঃখ আমন্ত্রণ।।

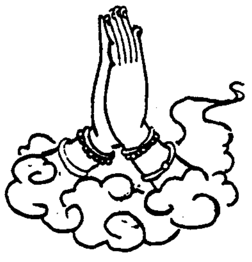

সংগ্রাম

একদিন জনৈক সমবায় অফিসার বন ভন্তের নিকট এসে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। বন ভন্তে উত্তর দিতে কার্পণ্য করলেন না। আমি মনে মনে লোকটিকে ধন্যবাদ দিলাম। কারণ তাঁর প্রশ্নের মধ্যে আমারও অনেক প্রশ্ন ছিল। লোকটি মনে হয় পন্ডিত। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন। কিন্তু একটা মুখ্য প্রশ্নে সন্তুষ্ট হননি। সে প্রশ্ন হল, সৃষ্টিকর্তা আছে কি নাই? বন ভন্তে উপমা দিয়ে বলেন-ধরুন, আপনার শরীরে হঠাৎ আগুন লেগে গেল এখন আগুন নিভাবেননাকিকে দিল? কি জন্য দিল? নাকি কখন দিল খোঁজ খবর নিবেন? ভন্তে আগে আগুন নিভাতে হবে। ঠিক সে রকম আগে নিজেকে জানতে হবে। নিজেকে জানলে অপরকে জানতে পারা যায়। আত্মশুদ্ধি হলে সৃষ্টিকর্তাকে দেখা যায়। সৃষ্টিকর্তা কে জানেন? আমাদের মতে সৃষ্টিকর্তা অবিদ্যা ও তৃষ্ণা জন্মগ্রহণ করায়। যে কোন প্রাণীকে সৃষ্টি করে অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। মানবগণ সৃষ্টি করে যাবতীয় খাদ্য ভোজ্য, আসবাবপত্র ব্যবহার্য বস্তু সমূহ। মানুষই এসব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা ও ঈশ্বর। আপনি যে সৃষ্টিকর্তার কথা বার বার বলছেন, তা হল শুধু মুখে। আমাদের মতে ব্যক্তি বিশেষের কোন সৃষ্টিকর্তা নাই। যে অবিদ্যা তৃষ্ণা আমাদের পুনঃ পুনঃ দুঃখ প্রদান করে থাকে তার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে থাকি। অবিদ্যা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা সত্ত্বদিগকে জন্ম-জন্মান্তেরে নানা দুঃখ যন্ত্রণা প্রদান করে বলে তার বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করে থাকি। সুতরাং অবিদ্যা, কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা সত্ত্বদিগকে জন্ম-জন্মান্তেরে নানা দুঃখ যন্ত্রণা প্রদান করে বলে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা একান্ত কর্তব্য।

সংগ্রামী হও সবে নির্বাণ লাগিয়া,
বিদর্শনে রত হও নিশীথে জাগিয়া।।

যথার্থ দর্শন

তবলছড়ি বাজারের পরলোকগত ডাঃ আশুতোষ মিশ্র (বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ)। ভদ্রলোক আমার সমবয়সী না হলেও আমার সাথে বেশ হৃদ্যতা ছিল। তিনি কয়েক বার আমাকে বলেছেন আপনি বন বিহারে গেলে আমাকেও সংগে নিবেন। কিন্তু আমি যখন যেতাম তখন তিনি ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকতেন। হঠাৎ আর একদিন বল্লেন- এইবার আপনার সাথে যে কোন সময় যাব। বন ভন্তের দর্শন কোন দিন পাইনি। যথাসময়ে তাঁকে নিয়ে বন বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। রাজ ঘাটে হাত ধরে নৌকা পার করালাম। বুদ্ধ বন্দনার পর ভন্তেকে বন্দনা করে নিয়ে যত্ন সহকারে তাঁর জন্য একটি পাটি বিছায়ে দিয়ে তাঁকে বসার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি আমাকে বল্লেন-এখন বসবোনা আমি আগে বন ভন্তেকে ভাল করে দেখি। বনভন্তেও তাঁকে বসার জন্য বল্লেন। কিন্তু তিনি ভন্তের শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাল করে নিরীক্ষণ করে বল্লেন- বহুদিন পর্যন্ত আপনার নাম শুনেছি, আজকে ভাল করে দেখছি। বন ভন্তে আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন- "ভগবান বুদ্ধকেও এই রকম এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিরীক্ষণ করেছিলেন। বুদ্ধের বত্রিশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও আশী প্রকার অনুব্যঞ্জন লক্ষণ নিয়ে অতুলনীয় তাঁর দেহ।" সেই ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ বল্লেন-বুদ্ধ দর্শন হয়েছ ত। ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে বল্লেন- হ্যাঁ, ভন্তে আমার চোক সার্থক হয়েছে। শাস্ত্রে যা আছে তা দেখলাম। বুদ্ধ বল্লেন-"তাহলে তুমি কিছুই দেখনি, মিথ্যা বলছ।" ব্রাহ্মণ বল্লেন-"সত্যই আমি বুদ্ধকে দেখেছি।" তখন বুদ্ধ আবার বল্লেন-"বুদ্ধ অর্থ কি?" ব্রাহ্মণ একটু চিন্তা করে বল্লেন- বুদ্ধ অর্থ জ্ঞান। বুদ্ধ বললেন- তা হলে জ্ঞানকে তুমি দেখেছ? বুদ্ধ এ উক্তিটি করার সাথে সাথেই ব্রাহ্মণ অর্হত্ব ফল লাভ করলেন। অতঃপর বন ভন্তে বল্লেন- আমার মধ্যে বুদ্ধের কোন লক্ষণই নেই। আমাকে দেখে কি লাভ? "জ্ঞান দর্শন করাই যথার্থ দর্শন" ইহা বলার পর ডাক্তার বাবু আমার পাশে বসে পড়লেন। আসার সময় জিজ্ঞাসা করলাম- "ডাক্তার দাদা, কি বুঝলেন?" তিনি শুধু বললেন-"বন ভন্তে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।

কিসে সুখ কিসে দুঃখ?

১। যত আমার বলা হয় ততই দুঃখ।
২। পরের জিনিষ নিজের বলায় দুঃখ।
৩। সব পরের বলতে পারলে সুখ।
৪। আমার কিছুই নাই বলে সুখ।
৫। অজ্ঞানী সব সময় বলে আমার আছে।
৬। জ্ঞানী বলে আমার কিছুই নাই।
৭। পরের জিনিষ বল্‌লে দুঃখ নাই।
৮। কিন্তু নিজের বল্‌লে দুঃখ।
দুঃখ দুঃখ মহা দুঃখ দুঃখের কারণ।
দুঃখের নিরোধ সত্য দুঃখের বারণ।।

বনভন্তে—ডি সি

একদিন বনভন্তে উপাসক উপাসিকাদের বিরাট সভায় দেশনায় রত এমন সময় এক উপাসক ভন্তের সাথে কথা বলার অবকাশ পাচ্ছিলনা। হঠাৎ দেশনার ফাঁকে ঐ উপাসক বল্‌লেন-ভন্তে আমার বাবা মারা গেছেন, কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছেন একটু জানতে চাই। বনভন্তে আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌লেন-দেখত ডি,সি'র কাছে কেরানীর কাজ নিয়ে আসছে। আমি বল্‌লাম-ভন্তে, আমি কি? ভন্তে বললেন-তুমি পিয়ন। কেরানী কি রকম জান? কেরানী হল চ্যূতি উৎপত্তি সম্বন্ধে জানে ও দেখে। যাঁরা প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান ও চতুর্থ ধ্যানে বুৎপত্তি লাভ করেন, তাঁরা সত্বগণের চ্যূতি উৎপত্তি স্বয়ং জ্ঞাত হন। এগুলি হল কেরানীর কাজ। আমি ডি,সি, নির্বাণের কথা বলব। চতুর্থ ধ্যান লাভীরা চ্যূতি উৎপত্তির সংগে সংগে জানতে পারেন বা দেখেন কিন্তু দেরী হলে সহজে বলতে পারেন না। যেমন ধর, এই বিহার হতে একজন লোক বাজারের দিকে চলে যাচ্ছে। পেছনে পেছনে গেলে হয়ত নদীর ঘাটে নতুবা রাস্তায় দেখা পাবে। যদি সকাল বেলা চলে যায়? রাঙ্গামাটি হতে খুঁজে বের করা অনেক সময় ও কষ্টসাধ্য।

অনেক সময় দেখা যায় ডিসিও দয়া করে কারো কেরানীর কাজ করে দেন। তেমনি বন ভন্তেও উপাসকের বাবার গতি সম্বন্ধে পরোক্ষ ভাবে বলে দিলেন। আমার মনে হয় পরোক্ষভাবে বলাতে লোকটি ভাল করে বুঝতে পারেন নি। তারপর বন ভন্তে ডিসির দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে বল্লেন যেমন প্রত্যেক মুক্তিকামী ব্যক্তি মুক্ত কিভাবে হয় এবং কোন পথে গেলে মুক্ত হওয়া যায় তার বিশদ ব্যাখ্যা করলেন। জেলার মধ্যে সর্বোচ্চ পদ হল ডিসি। পারমার্থিক ভাবে প্রত্যেকের লক্ষ্য ও শেষ গন্তব্য হল নির্বাণ। সে জন্য বন ভন্তে ডিসি।

ডিসি হয়ে বড় হও পিয়নে থাকনা।
ছোট হলে বড় দুঃখ জীবন বাঁচেনা।

বন ভন্তের দৃষ্টি?

দৃষ্টি বলতে সম্যক দৃষ্টিকে বুঝায় কিন্তু সাধারণ চোখের দৃষ্টি এবং জ্ঞানের দৃষ্টির মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যার দৃষ্টি যেমন তেমন করে দেখে বা কলম দিয়ে লেখে। রঙিন চশ্‌মা পরিধানকারীর রঙিনই দৃষ্টি হবে। জনডিস রোগীরা স্বাভাবিক না দেখে সকল বস্তু হলুদ বর্ণ দেখে। একজন ছোট শিশু টাকাকে তার খাওয়ার বিনিময় বা খেলনার বিনিময় হিসেবে দেখে। একজন সাধারণ লোকের নিকট টাকা তার সংসার চালানোর উপকরণ মাত্র। কিন্তু রাষ্ট্র প্রধান টাকাকে আন্তর্জাতিকভাবে দেখে থাকেন। সুতরাং দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি ও জ্ঞানের পরিধি। ব্রহ্মজাল সূত্রে বর্ণিত ৬২ প্রকার মিথ্যা দৃষ্টি পরিহার করে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হলে লোকোত্তরে উন্নীত হওয়া যায়। এখানে বন ভন্তে দৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে যা ব্যক্ত করেছেন তা লিপিবদ্ধ করা হল। (১) শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দিঘীনালা এবং লংগদুর তিনটিলায় থাকতে পর্দা ব্যবহার করতেন। তিনটিলায় আমি নিজেও দেখেছি তাঁর কামড়ায় উপাসক ব্যতীত উপাসিকারা বাহিরে অবস্থান করে বন্দনা এবং তাঁর দেশনা শুনতেন। এখন অনেকে প্রশ্ন করেন বন ভন্তে পর্দা ব্যবহার করেন না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বন ভন্তে বলেন-"আগে আমি পিচ্ছিল জায়গায় ছিলাম। সবসময় পতনের আশংকা ছিল। কিন্তু এখন শক্ত এবং নিরাপদ জায়গায় আছি। উপমায় আরো বলেন-"খারাপ রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালানো বিপদ। কোন সময় গাড়ী পড়ে যায় ঠিক নাই। এখন তিনি খারাপ রাস্তা পার হয়ে বিপদ মুক্ত রাস্তায়

আছেন, সুতরাং এখন ও ভবিষ্যতে তাঁর পতনের কোন সম্ভাবনা নেই। তিনি আরো পরিস্কার ভাবে বলেন–তাঁর দৃষ্টিতে শুধু নারী কেন পুরুষও নেই। বর্তমানে তিনি নারী পুরুষকে আগুন, পানি, মটি ও বায়ু বা চতুর্মহাভূত হিসাবে দেখে থাকেন।

(২) একদিন দেশনায় বলেন–এই পৃথিবীতে তিনি রাজা–প্রজা, ধনী–দরিদ্র, শিক্ষিত–অশিক্ষিত, পন্ডিত–মূর্খ, ভিক্ষু–শ্রমণ সকলকে প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় দেখেন। এ কথার প্রকৃত অর্থ হল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞারূপ বস্ত্রহীনতা।

(৩) আর একবার ভোটের সময় বন ভন্তে দেশনায় বলেন–সকল শ্রেণীর লোকদেরকে তিনি শিশুর মত দেখেন। শিশুরা ধূলাবালি অথবা নানা ধরনের খেলনা নিয়ে খেলায় রত থাকে। মধ্যে মধ্যে মারামারি ও নানা বিবাদে লিপ্ত হয়। এর অর্থ কামভোগী গৃহীরা বিষয় সম্পত্তি নিয়ে মত্ত থাকে এবং কলহ বিবাদে রত থাকে।

(৪) চতুরার্য সত্য সম্বন্ধে দেশনা করার সময় একদিন বন ভন্তে বলেন, অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যা দেখা যায়, খালি চোখে তা দেখা যায় না, তেমনি তিনিও আমাদের অসংখ্য দুঃখরাশি দেখতে পান। তিনি আরও বলেন–একশত ভাগের এক ভাগ সুখ ভোগ করে আমরা হাসিতে খুশিতে জীবন কাটাই কিন্তু একশত ভাগের নিরানব্বই ভাগ দুঃখের বোঝা কোথায় আছে জানিনা। তাঁর দষ্টিতে আমরা শুধু দুঃখের বোঝা বহন করেই চলেছি।

(৫) দেশনা প্রসঙ্গে একদিন বন ভন্তে বলেন–কোন এক গ্রামে একজন লোক এম, এ পাশ করে গ্রামের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদিগকে যে ভাবে দর্শন করে থাকে, সেরূপ তিনিও আমাদেরকে দর্শন করে থাকেন।

(৬) মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, বৃষ্টিতে ভিজে এবং কড়া রোদ সহ্য করে কাঠুরিয়া কাঠ কেটে বাজারে বিক্রির জন্য রাস্তা দিয়ে গান গেয়ে গেয়ে কাঠ নিয়ে যায়। তখন ডি,সি কাঠুরিয়াকে যে ভাবে দেখে থাকেন, সেরূপ ভন্তে ও কামভোগীদেরকে ডিসির মত দেখে থাকেন।

উপরোক্ত ছয়টি উপমামূলক বনভন্তের মুখঃনিসৃত বাণী লিপিবদ্ধ করে উপাসক উপাসিকাদের নিকট ব্যক্ত করলাম।

স্কন্ধের উদয় ব্যয়ে স্ত্রী পুরুষ নাই।
স্কন্ধের বিলীন হয় নির্বাণেতে যাই।।

আগন্তুক ও বন ভন্তে

মহান সাধক শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের আবাস পূত রাজবন বিহার দেশের একটি অন্যতম আদর্শ বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে প্রতিবছর মহা সমারোহে কঠির চীবর উদ্‌যাপিত হয়। ২৪ ঘন্টার মধ্যে তূলা থেকে সূতা কাটা, বস্ত্র বয়ন ও সেলাই শেষে চীবর দান কার্য সম্পাদন এ দানোৎসবের মূল বৈশিষ্ট্য যা বুদ্ধকালীন সময়ের এক সুপ্রাচীন পদ্ধতি। বর্তমান বিশ্বে কোথাও এধরনের দানোৎসব অনুষ্ঠিত হয় কিনা জানা নেই। এ উপলক্ষ্যে অগণিত বৌদ্ধ নর-নারীর সমাগম হয। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বহু দর্শনার্থীও এ দানোৎসব দেখতে আসেন।

সেই রাজ বন বিহারে এক কঠিন চীবর দানোৎসবের জনাকীর্ণ সন্ধ্যা। তখন দেশনালয় লোকে লোকারণ্য। শান্ত সমাহিত গম্ভীরভাবে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ধর্মাসনে উপবিষ্ট। সে মুহূর্তে জন পনের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা এসে উপস্থিত। আমি লোকের ভীড় ঠেলে তাঁদের এক প্রান্তে বসিয়ে দিলাম। তাঁদের সঙ্গে আলাপে জানা গেল তারা ঢাকা থেকে এসেছেন। তাঁদের মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক কোরান, বাইবেল ও বেদ সম্বন্ধে যথেষ্ট চর্চা করেছেন। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না বলে প্রকাশ করলেন। তিনি অনুসন্ধিৎসু হয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সঙ্গে আলাপ করার অভিপ্রায় জানালেন। আমি তাঁর অভিপ্রায় সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে অবহিত করলাম। শ্রদ্ধেয় ভন্তের সম্মতিক্রমে উভয়ের মধ্যে আলাপকালীন ভদ্রলোকের প্রশ্ন ও শ্রদ্ধেয় ভন্তের উত্তর গুলো প্রত্যেকের পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয় মনে করে এ লেখার অবতারণা।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন ঃ রাম বনে যাবার সময় সীতাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন কিন্তু সিদ্ধার্থ বনে যাবার সময গোপাকে সঙ্গে নিলেন না কেন?

বন ভন্তে ঃ রাম গিয়েছিলেন বনবাসে, আর সিদ্ধার্থ গিয়েছিলেন ধ্যান-সাধনা করার জন্য। গাট্‌টি (এখানে নারী লোককে গাট্‌টি বা বোঝা বলা হয়েছে) কি জন্যে নেবেন?

ভদ্রলোকের প্রশ্ন ঃ গাট্‌টি কি?

বন ভন্তে ঃ এইতো আপনারা গাট্‌টি নিয়ে এসেছেন। তিনি ভদ্র মহিলাদের দিকে দৃষ্টি ফিরায়ে বললেন-তারা আমাদের কথাগুলো না শুনে শুধু গল্প করছেন তখন গাট্‌টির অর্থ বুঝতে পেরে ভদ্র মহিলারা বিরক্তি বোধ করে উঠে পড়ার জন্য সঙ্গীদের তাগিদ দিলেন। কিন্তু ভদ্রলোকেরা ভন্তের সাথে আলাপ করার জন্য আগ্রহী হওয়ায় মহিলা সঙ্গীদেরকে বিহার এলাকায় ঘুরে দেখার জন্য বল্‌লেন।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন ঃ সিদ্ধার্থ বনে গিয়ে কি ধ্যান করেছিলেন?

বন ভন্তে ঃ কায় বিবেক, চিত্ত বিবেক ও উপধি বিবেকই ছিল তাঁর ধ্যানের মুল উদ্দেশ্য।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন ঃ এগুলোর অর্থ কি?

বন ভন্তে ঃ কায় বিবেক হলো জনসঙ্গ বর্জন অর্থাৎ লোকালয় বর্জ্জিত স্থানে ধ্যান মগ্ন হওয়া, চিত্ত বিবেক হচ্ছে মানুষের চিত্ত সদা চঞ্চল ও অস্থির। স্বীয় অস্থির চিত্তকে অচঞ্চল ও স্থির করে ধ্যানে মনোনিবেশ করা। উপধি বিবেক হচ্ছে চিত্তকে বিভিন্ন ক্লেশ হতে মুক্ত করে নির্বাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করা। এগুলো তত্ত্ব মূলক বিষয়। ভদ্রলোক ঃ আচ্ছা নারী জাতি মুক্ত হতে পারে কিনা? সিদ্ধার্থ গোপাকে মুক্তি দিলেন না কেন?

বন ভন্তে ঃ ধরুন, আপনার নিকট এ ভদ্রলোক কিছু টাকা পাবেন। আপনি তাঁকে হাতে হাতে না দিয়ে অপর জন মারফৎ টাকাগুলো দিলেন। তিনি টাকাগুলো পাবেন কি?

ভদ্রলোক ঃ হ্যাঁ পাবেন।

বন ভন্তে ঃ সেই সিদ্ধার্থ ও বুদ্ধ হয়ে তাঁর বিমাতা গৌতমীকে দীক্ষা দিয়ে মুক্তি বা অর্হৎ করেছিলেন। গোপাও গৌতমী হতে দীক্ষা নিয়ে অর্হৎ হয়েছিলেন। বুদ্ধের সময়ে নারীও মুক্ত বা অর্হৎ হতে পারতো কিন্তু এখন সেরূপ উপযুক্ত পরিবেশ নেই।

ভদ্রলোক ঃ হযরত মোহাম্মদ আল্লাহর দূত বা বন্ধু, যীশু গড এর প্রেরিত পুত্র এবং যুগে যুদে ঈশ্বরের প্রেরিত অবতার রূপে পৃথিবীতে এসে সৃষ্টিকর্তার ধর্ম প্রচার করেন। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ কে?

বন ভন্তে ঃ গৌতম বুদ্ধ কারো দূতও নহেন, অবতারও নহেন। তিনি হলেন নির্বাণের আবিষ্কারক। তিনি স্বয়ং মুক্ত হয়েছেন। তাই অপরকেও মুক্ত করতে পারেন। তিনি মুক্তির পথ প্রদর্শক।

ভদ্রলোক ঃ আপনাদের মতে সৃষ্টিকর্তা আছে কি নেই তা জানতে চাই?

বন ভন্তে ঃ আছে বললেও ভুল হবে এবং নেই বললেও ভুল হবে।

ভদ্রলোক ঃ তা কি রকম?

বন ভন্তে ঃ অবিদ্যা-তৃষ্ণা প্রাণীদেরকে সৃষ্টি করায়। মানুষেরাই নানাবিধ বস্তুর সৃষ্টিকর্তা।

ভদ্রলোক ঃ তা কি রকম?

বন ভন্তে ঃ সংক্ষেপে বলতে গেলে-অবিদ্যা অর্থ অজ্ঞানতা। তৃষ্ণা অর্থ কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। আগে নিজেকে নিজে দেখতে হবে। যেমন প্রথমে ইন্দ্রিয় সংযম, আত্ম দমন ও চিত্ত দমন করতে হবে। সংযমী ও দমিত হলে জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়। জ্ঞানচক্ষু দ্বারা ভাল-মন্দ, সম্বন্ধে বুঝতে পারা যায় ও সত্য জ্ঞান উদয় হয়।

সত্য জ্ঞান উদয় অর্থে দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্বন্ধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ-নিরোধ প্রতিপাদন জ্ঞান বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ জ্ঞানই সত্য জ্ঞান। জ্ঞান ও সত্য উদয় হলে অবিদ্যা-তৃষ্ণা ধ্বংস হয়, অর্থাৎ আরো সত্য উদয় হয়।

ভদ্রলোক ঃ তাহলে প্রত্যেকে কি জন্ম গ্রহণ করবে?

বন ভন্তে ঃ হ্যাঁ, জন্ম বীজ থাকলে জন্ম হবে। আর জন্মবীজ নষ্ট হলে জন্ম গ্রহণ বন্ধ হবে।

ভদ্রলোক ঃ কে জন্ম গ্রহণ করায়?

বন ভন্তে ঃ কর্মফল।

ভদ্রলোক ঃ আপনাকে কে এই পৃথিবীতে পাঠালেন?

বন ভন্তে ঃ আমার কর্মফল। কর্মফলে আপনাকেও পাঠিয়েছে। যেমন, পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, সবাই আপন আপন কর্মফলে জন্ম গ্রহণ করেছে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও আপন আপন কর্মফলে ঘুরছে। কর্মফল সত্ত্ব সমূহকে হীনত্বে ও মহত্বে রূপান্তরিত করে।

ভদ্রলোক ঃ মানুষ কি জন্তুতে পরিণত হয়?

বন ভন্তে ঃ হ্যাঁ, মৃত্যুর পর দেহ পড়ে থাকে। চিত্ত রূপান্তরিত হয়ে অন্য দেহ ধারণ করে।

ভদ্রলোক ঃ এগুলোর সমাধান কি?

বন ভন্তে ঃ অবিদ্যা তৃষ্ণার নিরোধ হলে নির্বাণ হয়। যেমন তেলের অভাবে দীপ নির্বাপিত হয় এক্ষেত্রে তা উপমা করা যায়।

ভদ্রলোক ঃ দেবতা ব্রহ্মার পুনঃ জন্ম হয় কিনা?

বন ভন্তে ঃ নির্বাণ না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ জন্ম থেকে কেহই রক্ষা পায় না।

এভাবে কথোপকথনের সময় সঙ্গী মহিলারা যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। তখন বন ভন্তে বল্লেন-এইতো আপনাদের গাট্টি চলে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোক বল্লেন-সত্যি আপনি যে তাদেরকে গাট্টি বলেছেন সেকথা ঠিক। আগে জানলে এই গাট্টিগুলো নিয়ে আসতাম না। ভদ্রলোকের আরো বহু জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু সঙ্গীনীদের পীড়াপীড়িতে তাঁরা শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে সম্মান প্রদর্শন পূর্বক সন্তুষ্ট চিত্তে বিদায় নিলেন।

সুতর্কে বাড়ায় জ্ঞান, কুতর্কে অজ্ঞান।
জ্ঞান আর ধ্যান দিয়ে পাবে বুদ্ধ জ্ঞান।।

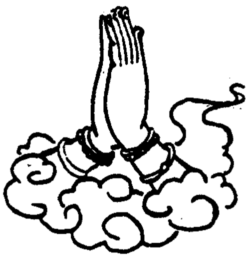

সদ্ধর্ম পুকুর

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বল্‌লেন- তোমরা প্রত্যহ পুকুরে বা নদীতে স্নান করে থাকো তাতে শরীরের ময়লা পরিষ্কার হয়। আসল হল চিত্তের ময়লা। চিত্তের ময়লা দূর করতে হলে সেই প্রকার পুকুরও লাগবে। সেই সদ্ধর্ম পুকুর হল নির্বাণ। আবার সদ্ধর্ম পুকুরের নাম কেউ কেউ শোনেও নাই। আবার কেউ কেউ নাম শুনেছে। কেউ কেউ কোথায় আছে জানেনা, কেউ কেউ বই পুস্তকে বা লোকের মুখে শুনেছে। যেমন সাত সাগর তের নদী পার হয়ে টেম্‌স নদী পাড়ে লন্ডন শহর আছে, তা জানে কিন্তু সেখানে যায় নি। যারা লন্ডনে গিয়েছে তাদের লন্ডনের অভিজ্ঞতা আছে। সে রকম কেউ ত্রিপটক অধ্যয়ন করে নির্বাণের কথা বলে। আর কেউ নির্বাণ অধিগত করে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি প্রকাশ করেন। আর এক ধরনের লোক আছে মধ্যে মধ্যে পুকুর পাড়ে আসে এবং আবার চলে যায়। আর কেউ পুকুর পাড়ে ঘুরাফেরা করে। যেমন তোমরা নির্বাণ পুকুর পাড়ে ঘুরাফেরা করছ। কিছু সংখ্যক লোক ঘাটে বসে পানি নাড়া চাড়া করছে। কেউ কেউ মধ্যে মধ্যে পুকুরে নেমে স্নান করছে। খুব কম সংখ্যক লোকে নির্বাণ পুকরে নিত্য স্নান করে। সদ্ধর্ম পুকুর বা নির্বাণ পুকুরে যারা নিত্য স্নান করে তাঁদের চিত্তের ময়লা দুরীভূত হয় পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করেনা, পঞ্চ মারের দৃষ্টিশক্তির বাহিরে চলে যায়। অর্থাৎ নাগাল পায় না। এ সদ্ধর্ম পুকুর বা নির্বাণ কোথায়? তার একটা জায়গা নয়। শুধু যাঁদের জ্ঞানচক্ষু বা সত্য সমুহ অধিগত হবে তারাই চিত্তের দ্বারাই উপলব্ধি করতে পারবেন। দেশনা শেষে বল্‌লেন- আমি ত নিত্য স্নান করি। আমার কোন প্রকার দুঃখ, ক্ষুধা, দুর্বলতা, আলস্য নেই।

চির শান্ত হও সবে সদ্ধর্ম পুকুরে।
স্নানে পরিষ্কার কর চিত্তের মুকুলে।।

নির্বাণ যাত্রী

বন ভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে বলেন-গয়া যেতে হলে অনেক টাকার প্রয়োজন। নির্বাণ লাভ করতে হলেও টাকার প্রয়োজন। সে টাকা কি রকম জান? অল্প শ্রদ্ধা নয়, মধ্যম শ্রদ্ধাও নয় বিপুল শ্রদ্ধার প্রয়োজন। বিপূল শ্রদ্ধা না থাকলে কেহ্ নির্বাণ যেতে পারে না। আবার যেতে হলে সঙ্গী সাথীর প্রয়োজন। ভগবান বুদ্ধের সময়ে প্রায় সকলে নির্বাণ যাত্রী ছিল অথবা বুদ্ধ স্বয়ং নির্বাণ যাত্রীদেরকে মারের রাজ্য অতিক্রম করে দিতেন। বর্তমানে সে রকম যাত্রী এবং বুদ্ধও উপস্থিত নেই। অর্থাৎ উপযুক্ত পরিবেশ নেই। নির্বাণ যাত্রীদের কি করা কর্তব্য। অনেকে নির্বাণ যাত্রী হওয়ার আশা পোষণ করে কিন্তু সাধ্য নেই। কেউ কেউ ত্রিপিটক মুখস্থ করে নির্বাণের বর্ণনা করেন। কিন্তু সত্যিকারের যাত্রী নয়। কেউ কেউ আসবাদি নানা উপকরণ নিয়ে নির্বাণ যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। যেমন তোমরা সব সময় যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব কিন্তু সাহস পাচ্ছনা।নির্বাণের পথে না চললে নির্বাণে কি যাওয়া যায়? নানা পথে চলে ঘুরাফেরা করলে তার জন্য নির্বাণ যাওয়া দুঃসাধ্য। নির্বাণ যাওয়ার একমাত্র রাস্তা হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সে রাস্তা দিয়ে চললে রাস্তায় কতগুলি বোঝা ফেলে যেতে হবে। সংক্ষেপে বোঝাগুলি লোভ, দ্বেষ, মোহ, মিথ্যা দৃষ্টি, সৎকায় দৃষ্টি, শীলব্রত পরমার্শ, তন্দ্রা, আলস্য, অবিদ্যা-তৃষ্ণা, মান ইত্যাদি। সেই রাস্তা দিয়ে যারা $\frac{১}{৪}$ চার ভাগের একভাগ অতিক্রম করে তাদের মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ ও শীলব্রত পরমার্শ খসে পড়ে যায়। অন্যান্য বোঝা $\frac{৩}{৪}$ চার ভাগের তিন ভাগ থেকে যায়। তাদেরকে শ্রোতাপত্তি বলে। তাঁরা সাত জন্মের অধিক জন্ম গ্রহণ করেনা। দুর্বার আগ্রহ ও শক্তি নিয়ে যাঁরা আরও শক্তি সঞ্চয় করে আরও অগ্রসর হন তারা অর্ধেক রাস্তা অতিক্রম করেন। অর্থাৎ $\frac{২}{৪}$ চারভাগের দুই ভাগ রাস্তায় অন্যান্য বোঝাগুলো অর্ধেক খসে হালকা হয়। তাঁরা একবারের অধিক জন্মগ্রহণ করেন না। তাঁদেরকে সকৃদাগামী বলে। তারপর যাঁরা আরও অগ্রসর হয়ে $\frac{৩}{৪}$ চার ভাগের তিন ভাগ অতিক্রম করেন তাঁদের বোঝামাত্র একভাগ থেকে যায়। তাঁদেরকে অনাগামী বলে। তাঁরা শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে পরিনির্বাপিত হন। আর যাঁরা শেষ প্রান্তে পৌছেন তাঁদের সম্পূর্ণ বোঝা খসে পড়ে। বোঝা শূন্য বা নির্বাণ যাত্রী হয়ে আর জন্ম গ্রহণ করবেন না।

পরিবেশ গড় তুমি যাত্রার প্রাক্কালে।
পাইবে পরম সুখ তৃষ্ণা মুক্ত হলে।।

সাধারণ—অসাধারণ

একদিন বন বিহারে দেশনালয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন। অনেক উপাসক-উপাসিকা বন্দনা করে বসে অপেক্ষমান। দুই জন ভদ্রলোক বন ভন্তের মুখনিঃসৃত বাণী শুনার জন্য আমাকে বল্লেন। আমি ভন্তের প্রতি প্রার্থনা করার পর আদর্শ গৃহী ধর্ম সম্বন্ধে দেশনা করলেন। ভদ্রলোকদ্বয় শুধু একটা কথাই বল্লেন- প্রয়োজনে প্রাণী বধ করা যায় কিনা? তারপর বন ভন্তে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- এই প্রাণী খাও, এই প্রাণী খাইওনা। এই প্রাণী মার ঐ প্রাণী মেরোনা। নিজ জাতিকে ভালবাস, অপর জাতিকে ভিন্ন মনে কর একজনকে জান আপন, অন্যজনকে জান পর। হিংসাকারীকে হিংসা কর, পাপীকে ঘৃণা কর, একজন আমাকে উদ্ধার করবে, এই আশায় বসে থাক। ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, অনিত্যকে নিত্য, নিত্যকে অনিত্য। এ জীবন শেষ হলে পরকাল নাই ইত্যাদি সাধারণ লোকের কথা। যেমন চোখ থাকতে অন্ধ এবং রোগ মুক্তির জন্য ভুল ঔষধ খাওয়া একই ব্যাপার। সুতরাং ইহাই সাধারণ।

অতঃপর তিনি বল্লেন-এ পৃথিবীতে ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্বজাতি-ভিন্নজাতি, হিংসুক-পাপী· দৃশ্য-অদৃশ্য প্রাণী, শত্রু-মিত্র, জ্ঞাতী-অজ্ঞাতী সর্বজীবের প্রতি আত্মবৎ জানতে হবে। এ পৃথিবীতে যত কিছু আছে তদ্‌মধ্যে আপন শরীরই প্রধান। আপন শরীরের মত সকল কিছু আত্মভাব পোষণ করতে হবে। জাতিবাদ কি জান? জাতিবাদ হল একটা আবরণ। আপনার চোখ দুইটা কাপড় দিয়ে বন্ধ করলে যেমন দেখতে পাবেন না,তেমনি জাতিবাদও সেরূপ শুধু পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা অসাধারণ হওয়া যায়না। মনকে খুব উদার করতে হবে। নীল আকাশের মত মুক্ত ও উদার হতে হবে। বাতাসের মত আশ্রয়হীন হতে হবে। এ রকম বিভিন্নভাবে যুক্তি উপমা দিয়ে লোকোত্তর দেশনা করে অসাধারণ সম্বন্ধে বুঝিয়ে দিলেন।

চিত্তের অনুকূলে দেশনা

পরচিত্ত বিজনন সম্বন্ধে বন ভন্তে বলেন– এটা একটা আয়না বিশেষ। সে আয়না কেমন জান? যেমন তোমার এক আয়না আছে। সে আয়নায় তোমার প্রয়োজনে মুখ দেখতে পার। সেরূপ পরচিত্ত বিজনন জ্ঞান ও অপরের চিত্তে কোথায় কি আছে তা পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। পরচিত্তকে দেখে, জেনে ও বুঝে দেশনা করলে শ্রোতার মহাউপকার সাধিত হয়। যেমন সুদক্ষ চিকিৎসক রোগের উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করে রোগ আরোগ্য করেন, তেমন সুদেশক পরচিত্তের অনুকূলে দেশনা করে শ্রোতাদের মহাউপকার সাধিত করেন। আন্দাজ বা অনুমানে ধর্ম দেশনা করলে ব্যর্থ শিকারীর মত ব্যর্থতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি পর চিত্তের অনুকূলে দেশনা সম্পর্কে বলেন– এই হ্রদের জল কেহ সারাজীবন ব্যবহার করলে নিঃশেষ করতে পারবেনা। আমার জ্ঞান ভান্ডারও হ্রদের জলতুল্য। আমি তোমাদের নিকট উদাত্ত কণ্ঠে জানাই– তোমরা ক্ষমতা অনুযায়ী জ্ঞান পাত্র নিয়ে আস। আমি তোমাদের জ্ঞান পাত্র অনুযায়ী পরিপুর্ণ করে দেবো। এক প্রসঙ্গে বলেন– আমার নিকট কেউ এসে শুধু জ্ঞান জল পান করে চলে যায়। সংগে কিছু নিয়েও যায়। কেউ কেউ ছোট পাত্র, কেউ মধ্যম পাত্র নিয়ে আসে। খুব কম সংখ্যক লোকই বড় পাত্র নিয়ে আসে। আমি তাঁদের পাত্রের আয়তন বুঝে পরিপুর্ণ করে দিই।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে উপাসক উপাসিকাদের প্রতি প্রায় চিত্তের অনুকূলে দেশনা করে থাকেন। তাঁর বহু দেশনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশনা আপনাদের নিকট প্রকাশ করছি।

(১) আপনারা বোধ হয় কেউ কেউ জানেন বন বিহারে যাওয়ার সময় কয়েকটা নিয়ম আছে। যেমন দানীয় সামগ্রী ঝুলাইয়া ঝুলাইয়া না নেওয়া, পায়ে স্পর্শ না করা, কোন জিনিষ নেওয়ার আগে বিতর্ক না করা, যাওয়ার সময় অপলাপ না করা ইত্যাদি। এগুলি স্বয়ং তিনি দেখে অনেক সময় সংগে সংগে বলে থাকেন। একদিন আমি আমার এক আত্মীয় বাবু সাধন চন্দ্র বড়ুয়ার সাথে বন বিহারে যাচ্ছিলাম। যাওয়ার পথে আমার সঙ্গীকে অন্য লোকের সাথে বৃথালাপ করতে বাঁধা দিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমিও তাদের সাথে বৃথালাপ রত হয়ে বন বিহারে উপস্থিত হই। বন ভন্তে প্রথমেই দেশনা করলেন–নির্বাণ লাভেচ্ছু ব্যক্তির ক্ষেত্র বিশেষে চোখ থাকতে অন্ধের মত, মুখ থাকতে বোবার মত এবং কান থাকতে বধিরের মত থাকতে হয়। না হয় সদ্ধর্ম হতে অনেক দূরে তাঁর অবস্থান। যেমন তোমাদের হতে চন্দ্র সূর্য অনেক দূরে অবস্থিত.ঠিক সেরকম তোমাদের হতে সদ্ধর্ম লাভও একই কথা। বনের বানরকে মণি–মুক্তার হার দিলে তা ফেলে বেগুন নিয়ে সন্তুষ্ট হয়। তেমন মানুষ হয়ে সদ্ধর্ম রূপ মণি–মুক্তা ফেলে নানা বিষয়ে রত থাকা একই ব্যাপার। এ ভাবে ধর্মদেশনা করে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বল্‌লেন–তুমি কেন পথে বাজে আলাপে রত থাক? এ কথা বলার সাথে সাথেই আমার

কৃতকর্মের কথা স্মরণ পড়ল। অতঃপর বন ভন্তে আমার চিত্তের অনুকূলে দেশনা করে উপস্থিত সকল উপাসক-উপাসিকার চিত্ত সম্বন্ধে প্রকাশ করলেন।

(২) নব বর্ষের ১লা বৈশাখের দিন। বন বিহারে যাওয়ার সময় নদী ঘাটে জনৈক ভদ্রলোক আমার সঙ্গী হন। নদী পার হতে হতে রাজনৈতিক আলাপ করতে লাগলেন। আলাপের এক পর্যায়ে হিংসাত্মক মনোভাবের কথাও জানালেন। আমি মনে মনে চিন্তা করছিলাম এখন ভন্তে কি বলেন কি জানি? বন্দনাদির পর ভন্তে সে লোকের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন-হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খৃষ্টান এবং সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী ভাবাপন্ন হও। সামান্য প্রাণীকেও আত্মবৎ জানিও। হিংসা পরিত্যাগ করে অহিংসার নীতি গ্রহণ কর তা হলে ইহকাল-পরকাল পরম সুখে থাকবে। পরে দেখা গেল সে লোক ভন্তের অনুগত উপাসক হয়ে জীবনের গতি পরিবর্তন করেছেন।

(৩) মিথ্যা মামলায় জড়িত এক যুবক বন ভন্তের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করল। বন ভন্তে বল্‌ল, পৃথিবীতে কোথাও প্রকৃত আশ্রয় নেই। একমাত্র জ্ঞানের আশ্রয় ও সত্যের আশ্রয়ই প্রকৃত আশ্রয়। জ্ঞান আর সত্য মানুষকে রক্ষা করে। ক্ষমাশীল হও। যেমন এ পৃথিবী ক্ষমাশীল। কারো প্রতি প্রতিহিংসা নেই। পৃথিবীর মত ক্ষমাশীল হলে শত্রু ও বিপদ তিরোহিত হবে। ভীত যুবক বন ভন্তের দেশনা শুনে নির্ভয়ে চলে বিপদ মুক্ত হয়েছিল।

(৪) একদিন বন বিহার হতে আসার সময় গেইটে আমার এক পরিচিত লোক ভন্তের নিকট আশীষের জন্য যাচ্ছিল। আমি আবার তার সঙ্গে গেলাম। লোকটি পাকা কাজের জন্য বালি সরবরাহ করে, বল্‌ল-ভন্তে, আমাকে আশির্বাদ করুন আমি যেন সুখে শান্তিতে থাকতে পারি। ভন্তে বল্‌লেন-আমার দুটি কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন কর। প্রথমঃ মিথ্যা কথা বলো না। দ্বিতীয়ঃ চুরি করোনা। সে বলল, ভন্তে, আমি চুরি করিনা। ভন্তে আবার বললেন-অনেক প্রকার চুরি আছে। আমার এ দু'টো উপদেশ পালন করলে তোমার ইহকাল, পরকাল সুখে শান্তিতে কাট্‌বে। তবুও সে লোক পুনর্বার আশির্বাদ চাইলে, ভন্তেও বল্‌লেন-আগে আমার দুটি কথা রক্ষা কর, পরে আশির্বাদ।

(৫) একদিন দেশনালয়ে এক দম্পত্তি আসলেন। বন ভন্তে জিজ্ঞাসা করলেন-আপনারা কোথা হতে এসেছেন?

ভদ্রলোক ঃ ঢাকা হতে এসেছি।

বন ভন্তে ঃ ঢাকার লোক মদ খায়। আচ্ছা, ঢাকার লোক বেশী মদ খায় তা কি ঠিক?

ভদ্রলোক ঃ কেউ কেউ খায়।

বন ভন্তে ঃ কি ভাবে খায়?

ভদ্রলোক ঃ কেউ ঘরে বসে খায়, আর কেহ্ মদের দোকানে বসে খায়।

বন ভন্তে ঃ আচ্ছা, মদ খেয়ে রাস্তা ঘাটে পাগলামি করেনা?

ভদ্রলোক ঃ খুব কৃচিৎ।

বন ভন্তে ঃ আপনি খান কিনা?
ভদ্রলোক ঃ নিশ্চুপ, নির্বাক।
বন ভন্তে ঃ এ লোক তোমার কি হয়?
ভদ্র মহিলা ঃ আমার স্বামী।

বন ভন্তে ঃ এতক্ষণ আমার সাথে কথা বলে আবার বোবা হয়ে গেল কেন?
ভদ্র মহিলা ঃ উনারও অভ্যাস আছে সেজন্য।
বন ভন্তে ঃ অপরের কথা বলতে বড় গলা, নিজের ব্যাপারে কেন বোবা?
ভদ্র মহিলা ঃ লজ্জা লাগে সেজন্যে।

বন ভন্তে ঃ মদ খেতে লজ্জা লাগে না। মদ পান করা কোন ধর্মে বিধান নেই। ইহকাল-পরকাল দুঃখ ছাড়া আর কিছুই নেই। অতিরিক্ত মদ পানে সন্তানও হয়না।

দম্পতি কেঁদে ভন্তেকে বল্লেন-আমরা অপুত্রক। পুত্রের জন্য আপনার নিকট দোয়া প্রার্থী।

বন ভন্তে ঃ বসুন, বসুন। বেশী কথা বলবেন না। ভদ্র মহিলার প্রতি লক্ষ্য করে বল্লেন-আপনার স্বামী কি করেন?

ভদ্র মহিলা ঃ ঢাকায় কয়েকটা দোকান ভাড়া ও কয়েকটি বাড়ী ভাড়া পান। তদুপরি একটা হোটেল পরিচালনা করেন।

বন ভন্তে ঃ তা হলে বড় লোক?
ভদ্র মহিলা ঃ হ্যাঁ
বন ভন্তে ঃ আপনার বিবাহ হয়েছে কত বৎসর?
ভদ্র মহিলা ঃ প্রায় এগার বৎসর।
বন ভন্তে ঃ কত বৎসর যাবৎ আপনার স্বামী মদ পানে অভ্যস্থ?
ভদ্র মহিলা ঃ বিবাহের আগে হতে।
বন ভন্তে ঃ দৈনিক কত টাকা মদ পান করে?
ভদ্র মহিলা ঃ কম পক্ষে দেড়শত টাকা।
বন ভন্তে ঃ বেশী কত?
ভদ্র মহিলা ঃ বন্ধু বান্ধব সহ অনেক টাকার প্রয়োজন।

বন ভন্তে ঃ আচ্ছা, আমাকে হিসাব করে দিন, এ যাবৎ কত টাকার মদ পান করেছেন?

ভদ্র মহিলা ঃ কয়েক লক্ষ টাকার কম হবেনা।

বন ভন্তে ঃ তা হলে তাঁর পেটে এক রাজার সম্পত্তি ঢুকানো হয়েছে।

ভদ্র মহিলা ঃ আমার একমাত্র পুত্র সন্তান লাভের জন্য এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদীয় এবং কত কি ঝার ফুঁক করা হয়েছে। তাতে কোন ফল না পেয়ে লন্ডন যাওয়ার মনস্থ করেছি। যাওয়ার আগে দেশে দেশে ফকির-দরবেশ, সাধু-সন্যাসীদের দোয়া কামনা করছি। সেজন্য আপনার নিকটও এসেছি। অনুগ্রহ পূর্বক আমাদের দোয়া করুন।

বন ভন্তে ঃ আমি দুই একটা কথা বলছি। মনোযোগের সাথে শুনে পালন করবেন। আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী ও মা - বাবাকে আমার কথা বলবেন। আপনার স্বামী দুটার মধ্যে একটা যেন খায়। সে দুটা কি? মদ আর ভাত। হয়তো শুধু মদ্ খাবে নতুবা শুধু ভাত খাবে। দোয়া পরে, আগে আমার দুইটা শর্তের মধ্যে যে কোন একটা পুরণ করতে হবে। ভদ্রমহিলা হাস্যবদনে ও ভদ্রলোক অধোবদনে চলে গেলেন।

চিত্তের অবস্থা বুঝে করিলে দেশনা।
চিত্ত-অনুকূলে যায় পূরিবে বাসনা।।

মুক্তির পথে বাঁধা

লোভ, দ্বেষ, মোহ, সৎকায়-দৃষ্টি, বিচিকিৎসা শীলব্রত পরামার্শ, স্ত্যান-মিদ্ধ, উদ্ধত্য, অহ্রী ও অনপত্রপা মুক্তির পথে বাঁধা।

কিন্তু শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে তাঁর জ্ঞান-দৃষ্টিতে বর্তমানে আরো চারটি মুক্তির পথে বাঁধা দেখেছেন।

(১) নানা কবির কল্পনা।

বর্তমানে বিভিন্ন কবি বা চিন্তাবিদের চিন্তনীয় বিষয়াদি নিম্নতম জ্ঞানের প্রকাশমাত্র।

(২) অফুরন্ত খাদ্য ভান্ডার।

বর্তমানে মানুষের খাওয়ার তৃষ্ণা পূর্বের তুলনায় বেড়ে গেছে। সুতরাং পৃথিবীর অফুরন্ত খাদ্যে আকর্ষিত হয়ে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করার অন্যতম কারণ।

(৩) প্রাকৃতিক মনোরম দৃশ্য।

পূর্বে পৃথিবীতে পর্যটকের সংখ্যা খুবই কম ছিল। বর্তমানে পর্যটকেরা সারা পৃথিবীময় ঘুরে ঘুরে প্রাকৃতিক মনোরম সুদৃশ্য দেখে বিমোহিত হচ্ছে কারণ বর্তমানে পর্যটনের সুযোগ সুবিধা অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

(৪) ইন্দ্রজালের ভেল্কির মত বিজ্ঞানের কর্ম।

বর্তমানে মানুষেরা জড় বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করে ইন্দ্রজালের ভেল্কির মত শুধু জড় বিজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান সীমাবদ্ধ রেখেছে। মনোবিজ্ঞান গবেষণা খুব কমই হচ্ছে।

সুতরাং এই চারটি নিয়ে মানুষেরা লোভ দ্বেষ, মোহগ্রস্ত হয়ে সুখ দর্শন করে থাকে। বর্তমানে এগুলি হতে যাবতীয় দুঃখের সৃষ্টি হচ্ছে, দেখলেই হতভম্ব হতে হয়।

অতএব লোকোত্তর বা উচ্চতম জ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত কেহ বিবিধ দুঃখ হতে পরিত্রাণ লাভ করবেনা।

মান এর পরিণতি

সুঠাম দেহ, লম্বাচুল-দাড়ি, শরীরে জামা বিহীন এবং একখানা কালো কাপড় পরিহিত জনৈক ধ্যানী ব্যক্তির সাথে আমার পরিচয় হয়। তাঁর গুরুর পরিচয় পেয়ে কথা প্রসঙ্গে আমার গুরু বন ভন্তের কথা উথাপন করি। কিন্তু সে ব্যক্তি খুব কৃচিৎ অন্য লোকের সাথে আলাপ করেন। একদিন তিনি বন বিহারে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। যথা সময়ে তাঁকে বন বিহারে দেশনালয়ের পূর্ব পার্শ্বে পাটিতে বসালাম। এদিকে বন ভন্তে ধর্মদেশনায় রত আছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর উদ্দেশ্যে কিছু উপদেশ দেওয়ার জন্য ভন্তেকে অনুরোধ জানালাম। বন ভন্তে শুধু একটা কথা জিজ্ঞাসা করলেন-তুমি কতটুকু লেখাপড়া করেছ? উত্তরে বললেন-বি.এ. পাশ করেছি। দেশনার প্রারম্ভে বললেন-অহংকার সব সময় বড় হতে চায়। কিন্তু মান কি জান? মান হল একবার বড়, একবার ছোট, একবার সমান হয়ে চলাফেরা করা। যদি তোমার একজন বি. এ. পাশের সাথে দেখা হয়, তার সাথে সমান মনে করোনা। যদি তোমা হতে কম লিখাপড়া ব্যক্তির দেখা হয়, তার সাথে বড় মনে করোনা। আর যদি তোমা হতে বেশী লিখাপড়া ব্যক্তির সাথে দেখা হয়, তার হতে ছোট মনোভাব পোষণ করো না। এতে তোমার চিত্ত কলুষিত হবে। কলুষিত চিত্তে ধ্যান সমাধি হয়না। মান নয় প্রকার আছে। আপাততঃ বড়, সমান এবং ছোট এই তিন প্রকারের মান ধ্বংস করতে চেষ্টা কর। দেখবে তোমার ধ্যান সমাধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। নতুবা মান এর পরিণতি অধোগতি।

আমি নামে কিছু নাই মানের আকর।
আয়ু শেষে হয় শুধু যমের চাকর।।

সদ্ধর্ম ও পরধর্ম

প্রথমে বন্দনা করি ভন্তের চরণে।
সংঘকে জানাই নতি আর গুরু জনে।।
উপাসক-উপাসিকা যত ভক্ত গণে।
নির্বাণ পথে চলুক লজ্জা ভয় মনে।।
সদ্ধর্ম ও পরধর্ম ত্রিলোকের মাঝে।
ছায়া সম চলে সদা পাপ-পূণ্য কাজে।।
পরধর্ম মারধর্ম অপায়ে চালিত।
সুখ ভোগ অগ্নিপিন্ড সর্বদা গিলিত।।
পরধর্ম মুক্ত নয় বহুদোষ তার।
বার বার ঘুরে ভবে শুধু দুঃখ সার।।
চারি মার্গ চারি ফল নির্বাণ দর্শনে।
নব লোকোত্তর সদ্ধর্ম বলে মুক্তগণে।।
শীল সমাধি প্রজ্ঞার করিলে পূরণ।
সদ্ধর্ম হবেনা পর হইলে মরণ।।
সর্বধর্ম সর্বকর্ম ক্ষয় ব্যয় শীল।
অনিত্য দুঃখ অনাত্ম সর্বদা আবিল।।
সদ্ধর্ম পরম সুখ নিত্য সুখময়।
চিরতরে করে ফেলে পঞ্চমার জয়।।
জাতি ধর্ম বর্ণ গোত্র তাতে মিশে যায়।
সাগরে নদীর জল খুঁজিয়া না পায়।।
বৈশাখী পূর্ণিমা লগ্নে মাগি এই বর।
সদ্ধর্মে থাকিতে পারি দূরে থাক পর।।

এই কবিতাটি শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের "সদ্ধর্ম ও পরধর্ম" নামক দেশনা হতে লিখিত।

শ্রদ্ধারূপ মূল্য

পটিয়া হতে আগত জনৈক উপাসক শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করলেন- ভন্তে, বিদর্শন কি রকম? বিদর্শন ভাবনা কি ভাবে করতে হয়?

প্রত্যুত্তরে বন ভন্তে উপমা সহকারে বল্লেন-ধরুন, আপনি একটা কাপড়ের দোকানে উপস্থিত হয়ে আপনার জন্য একখানা শাল, স্ত্রীর জন্য শাড়ী এবং ছেলে মেয়েদের জন্য অন্যান্য কাপড় চেয়ে না কিনে চলে গেলে দোকানদার দুঃখ প্রকাশ করবেন ত? উত্তরে হ্যাঁ ভন্তে। আপনার পকেটে প্রয়োজন মত টাকা না থাকলে শুধু শুধু কাপড় দেখা কি উচিৎ? উত্তরে-না, ভন্তে। সেই রকম আপনার অল্প শ্রদ্ধা নিয়ে বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছেন কেন? বিদর্শন ভাবনা করতে হলে গভীর শ্রদ্ধার প্রয়োজন। সুতরাং আমার বিদর্শন রূপ দোকানে চাহিদা মত শমথ-বিদর্শন জমাকৃত আছে। আপনি উপযুক্ত শ্রদ্ধারূপ মূল্য দিয়ে মহামূল্য বিদর্শন ক্রয় করুন। সাগর পাড়ি দিতে বড় জাহাজের প্রয়োজন, ছোট নৌকা দিয়ে সম্ভব নহে। সে রকম মৃদু শ্রদ্ধা নিয়ে বিদর্শন ভাবনা হয়না। গভীর শ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তিকে যে কোন সময় বিদর্শন ভাবনা প্রদানে প্রস্তুত আছি।

শ্রদ্ধারূপ মূল্য দাও, যদি চাও মুক্তি।
মুক্তির লগিয়া চল, নাই অন্য যুক্তি।।

সূতার মিস্ত্রীর যন্ত্র

একজন সূতার মিস্ত্রীর বহু সংখ্যক যন্ত্রের প্রয়োজন। প্রয়োজনে যেটা যেখানে প্রযোজ্য সেটা সেখানে লাগিয়ে তার কাজ সম্পন্ন করে থাকে। যেমন প্রথমে হাতুড়ীর প্রয়োজন, পরে বাটালির, এরপর করাতের প্রয়োজন। এ ভাবে সমস্ত যন্ত্র বিভিন্ন সময়ে ব্যবহার করে থাকে। ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ শমথ ভাবনা করার জন্য যোগীদের চল্লিশটি উপকরণ তৈয়ার করেছেন। মিস্ত্রীর মত প্রথমে কায়গত স্মৃতি ভাবনা একজন যোগীর প্রযোজ্য। দ্বিতীয়ে মৈত্রীর ভাবনা। তৃতীয়ে আনাপান স্মৃতি ভাবনা। ক্রমান্বয়ে সমস্ত ভাবনা একজন সুদক্ষ যোগীর জন্য একান্ত প্রয়োজন।

তাল—মাত্রা—সুর—ছন্দ

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে বিদর্শন ভাবনা সম্বন্ধে বলেন-ইহা খুব গভীর ভাবে অনুশীলন করতে হয়। বিদর্শনে লোকোত্তর স্তরে উপনীত হওয়া যায়। তাতে সর্বদুঃখের অবসান হয়। যেমন একজন বিখ্যাত গায়ক বহুদিন পর্যন্ত অভ্যাসে তার গানের সংগে তাল, মাত্রা, ছন্দ মিলায়ে গানের সাফল্য অর্জন করেন। ঠিক সে রকম একজন বিদর্শন ভাবনাকারী চতুর্বিধ ঈর্য্যা পথে যে কোন একটিতে কায়ে কায়ানুপস্সি, বেদনায় বেদনানুপস্সি, চিত্তে চিত্তানুপস্সি এবং ধর্মে ধর্মানুপস্সি হয়ে স্মৃতি সহকারে বিদর্শন ভাবনা করতে পারলে সাফল্য অর্জন করতে পারেন।

তাল মাত্রা সুর ছন্দ জানিলে গায়ক।
স্মৃতিতে চলিলে যোগী ধ্যান সহায়ক।।

মারজয়

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁর পঞ্চব্রতের মধ্যে সৈনিকের ব্রত হল পঞ্চমব্রত। সে ব্রতের দ্বারা মারজয় করেছেন। একদিন তিনি একজন সেনাপতির ভঙ্গিমায় মারজয় দেশনা করেছেন। প্রস্তুত হও। অন্ধকারে আলো জ্বালাও। বুকে অসীম সাহস নিয়ে এগিয়ে চল। আপদ বিপদ নানাবিধ ভয় আসুক, তবুও সামনের দিকে এগিয়ে যাও। তোমাদের শক্তিশালী অস্ত্র নিয়ে মারের দিকে এগিয়ে যাও। তোমাদের দুর্বলতা দূরে ফেলে রাখ। পথ চলতে সুখ অনুভব করলে আনন্দে ডুবে যেওনা। দুঃখে পড়লে গর্তে পতিত হয়েছ মনে করোনা। নিন্দাতে ফিরে তাকাবেনা। প্রশংসায় স্ফীত হইওনা। যশে আকাশে উঠিও না, অযশে পাতালে নামিও না। লাভে নাচিও না, অলাভে কাঁন্দিও না। এই অষ্টবিধ বাঁধা অতিক্রম করে মারের রাজ্য জয় করে আস। অনেক রাস্তা আছে, তৎমধ্যে শুধু একটি সঠিক রাস্তা আছে। সে রাস্তায় মারের রাজ্য জয় করা যায়। যেমন ইতিপূর্বে যাঁরা জয় করেছেন। সে জয় কেমন জয় জান? সারা পৃথিবী তথা দেবলোক ব্রহ্মলোক জয় অপেক্ষা মারজয় শ্রেষ্ঠ জয়। এ জয়ে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করা যায়।

সর্বদাই থাক যদি পাপে লজ্জা ভয়।
ক্রমান্বয়ে জয় কর হবে মার জয়।

শিক্ষিত—অশিক্ষিত

শিক্ষিত-অশিক্ষিত সম্বন্ধে বন ভন্তে দেশনায় বলেন-বর্তমানে আমাদের দেশে প্রায় বি.এ. পাশ করলে শিক্ষিত হিসাবে,পরিগণিত হয়। কিন্তু এ শিক্ষা শুধু সংসারের কাজে প্রয়োজন হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে যিনি শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা, অভ্যাস ও পুরণ করেন তিনিই প্রকৃত শিক্ষিত। একজন ডিগ্রীধারী শিক্ষিত বা ত্রিপিটক বিশারদ যদি অপকর্মে লিপ্ত থাকে, তাকে কি করে শিক্ষিত বলা যায়? বন ভন্তে প্রায়ই তাঁর দেশনায় উপমা স্বরূপ শ্রীমৎ ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাস্থবিরের কথা বলে থাকেন। রাষ্ট্রপাল ভন্তে একজন ত্রিপিটক বিশারদ, এম. এ. পি. এইচ. ডি এবং বুদ্ধ গয়ার আন্তর্জাতিক বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্রের অধ্যক্ষ। একবার বন ভন্তে তাঁকে তাঁর ডিগ্রীগুলি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। রাষ্ট্রপাল ভন্তে উত্তরে বল্লেন- কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং ত্রিপিটক বিশারদ হল হীন জ্ঞান ও নীচু জ্ঞান। বৌদ্ধ মতে তা কাজে লাগেনা। লোকোত্তর জ্ঞানই উত্তম জ্ঞান ও উচ্চতর জ্ঞান। সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়। সেজন্য বন ভন্তে শিক্ষিত কাকে বলে পুনঃ পুনঃ ব্যাখ্যা করে থাকেন। আমি নিজেও শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপাল ভন্তের দেশনা শুনেছি। তাঁর দেশনায় অন্যান্য ডিগ্রীগুলিকে হীন, তুচ্ছ, নীচু অস্পৃশ্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। বুদ্ধজ্ঞান অর্থাৎ লোকোত্তর জ্ঞানই আসল শিক্ষিতের জ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন।

লিখাপড়া শিখে তুমি গর্ববোধ কর।
মান তৃষ্ণা ত্যাগী বুদ্ধ পথ ধর।।

নির্বাণ কার জন্য?

বন ভন্তে দেশনায় বলেন-নির্বাণ উচ্চ শিক্ষিতের জন্য নহে। ধনী দরিদ্রের জন্যও নহে। প্রার্থনাকারী বা যজ্ঞকারীর জন্যও নহে। কোন অজ্ঞ অথবা পন্ডিতের জন্যও নহে। পঞ্চ ইন্দ্রিয় বিকল ব্যক্তির জন্যও নহে। তবে নির্বাণ কার জন্য?

সরল সোজা, উদ্যমশীল মুক্তিকামী, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মান ধ্বংসকারী এবং অষ্টবিধ লোক ধর্মে অকম্পিত আর্য্যগণের জন্য নির্বাণ। ক্ষমাশীল, দয়াশীল, দয়ালু, নির্ভীক, ধীর ও স্থির ব্যক্তির জন্য নির্বাণ প্রত্যক্ষ বা লাভ করার জন্য তৎপর হওয়া উচিৎ। ঘরে আগুন লাগলে প্রাণ ভয়ে লোক বাহিরে চলে যায়। সেরূপ তোমরা অবিদ্যা-তৃষ্ণা হতে বাহির হয়ে মুক্ত হও। তিনি আরো বলেন-নীচের এই তিনটির সমন্বয়ে নির্বাণ লাভ করা যায়।

পূর্বের সঞ্চিত পূণ্য[১] বুদ্ধের নির্দেশ[২]।
নিজের চেষ্টায়[৩] হয় নির্বাণ উন্মেষ।।

বিশ্বাসী কে?

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন-এ পৃথিবীতে মাতা-পিতা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, দেশবাসী, ভিক্ষু-শ্রমণ, স্ত্রী-পুরুষ, যুব-বৃদ্ধ, পন্ডিত প্রভৃতি সকল জাতীয় মানুষ বিশ্বাসী নয়। এমন কি যে দান করে তাঁকেও বিশ্বাস করা যায়না। যে ধ্যান সমাধি করে তাঁকেও বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাঁরা ধর্মেরও অধীন কর্মেরও অধীন। মৃত্যুর পর তাঁদের চারি অপায়ে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাঁরা জন্মে জন্মে বিভিন্ন যোনিতে ভ্রমণ করে অনন্ত দুঃখের ভাগী হন। তা হলে তাঁদেরকে কিভাবে বিশ্বাস করা যায়?একমাত্র বিশ্বাসীকে?বিশ্বাসী হল যিনি কর্মফল বিশ্বাস, ইহকাল ও পরকাল বিশ্বাস এবং চতুরার্য্য সত্যকে বিশ্বাস অর্থাৎ চারি অপায় বন্ধ করে মার্গফলে প্রতষ্ঠিত হয়েছেন তাঁকেই বিশ্বাসী বলে। তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হওয়ার জন্য চেষ্টা কর, প্রকৃত বিশ্বাসীরাই পরম সুখী ও স্বাধীন।

আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকল অলাভ।
কেবল বিশ্বাস কর মার্গফল লাভ।।

ইন্দ্রিয় দমন

বন ভন্তে ইন্দ্রিয় দমন সম্বন্ধে উদাহরণ স্বরূপ বলেন-যেমন ধর একজন রাখাল পাঁচটি গরু নিয়ে চারদিকে ধানক্ষেতের মাঝখানে খালি জায়গায় গরু চড়াচ্ছিল। তার গরুগুলি সে জায়গায় ঘাস খেতে খেতে ধান ক্ষেতে চলে যায়। এভাবে পাঁচটি গরু চড়াতে তার কষ্ট হচ্ছিল এবং ধানেরও ক্ষতি হচ্ছিল। যেখানে বিস্তীর্ণ ঘাসময় এলাকা এবং কোন ধান ক্ষেতও নেই সেখানে গরু চড়াতে কোন কষ্ট হয়না এবং ধানেরও ক্ষতি হয়না।

বর্তমানে যারা ইন্দ্রিয় দমন করতে তৎপর, তারা অনেক কষ্টের মধ্যে ইন্দ্রিয় দমন করে থাকে। যেমন চারিদিকে দুঃশীল পরায়ণ এবং নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে ইন্দ্রিয় দমন করতে হয়। চিত্তরূপ রাখালেরও চক্ষু,কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক রূপ পঞ্চ গরু নির্জনে ও প্রতিবন্ধকতাহীন জায়গায় ইন্দ্রিয় দমন করতে অত্যন্ত সহজসাধ্য হয় এবং মহা সুখে কাল যাপন করতে পারে।

মহাসুখে থাকবে তুমি ইন্দ্রিয় দমিয়া।
পুনঃ পুনঃ না জন্মিবে নির্বাণ লভিয়া।।

চিত্ত দমন

বন ভন্তে চিত্ত দমন সম্বন্ধে উপমায় বলেন- বৃষভ (ষাঁড়) কি করে জান? একটু সুযোগ পেলে লোকের ক্ষেত-চাষ নষ্ট করে দেয়। এমন কি শক্ত ঘেরা-বেড়া পর্যন্ত ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। এত শক্তিশালী যে তাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কেহ্ রাখেনা। বুদ্ধির জোরে লোকে একে গলায় ও মুখে শক্ত রশি দিয়ে বেঁধে রাখে এবং ইচ্ছামত শিক্ষা দিতে থাকে। বিভিন্ন প্রকারে শিক্ষা দিয়ে বাধ্যগত করে ও দমিত হয়ে শান্ত প্রকৃতির হয়। পরিশেষে হাল ও গাড়ীর কাজে ব্যবহৃত হয়। সে রূপ চিত্ত হল বৃষভের মত কিন্তু চিত্তের শক্তি বৃষভ হতে লক্ষগুণ বেশী। চিত্ত লোভ, দ্বেষ, মোহের স্রোতে পড়ে কোথায় যে চলে যায় তার কোন সীমা থাকেনা। এমন কি এক মুহূর্তে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে চলে যায়। তার কোন পাসপোর্ট-ভিসারও প্রয়োজন হয়না। চিত্তকে দমন করা কঠিন ব্যাপার। জ্ঞানীরা চিত্তকে সুক্ষ্ম স্মৃতি রশি দিয়ে শক্ত ভাবে বন্ধন করে সংযম শিক্ষা দিতে থাকেন। সংযমিত চিত্ত শান্ত ও স্থির হয়। শান্ত ও স্থির চিত্ত কুশল উৎপন্ন করে নির্বাণ অভিমুখী হয়। বন ভন্তে আরো বলেন- চিত্ত দমন করা মহাসুখ। তা' তোমাদের সর্ব দুঃখ মোচনের সহায়ক হবে।

দান্ত চিত্ত কুশল চিত্ত করে উৎপাদন।
জ্ঞান ধ্যানে সদা কর মার্গফল পুরণ।।

মদ্যপায়ীর পঞ্চ অবস্থা

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে মদ্যপায়ী সম্বন্ধে বলেন-যারা মদ পান করে তারা সহজে মদ ছাড়তে পারে না। কারণ তারা এক প্রকার আবর্তে পড়ে। সে আবর্ত থেকে খুব কম লোকই উঠতে পারে। তারা মদ ছাড়তে পারবে একদিন। কোন দিন জান? যেদিন মনুষ্য দেহ ত্যাগ করে গরু, মহিষ, নানাবিধ পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ, ভূত-প্রেত ও যক্ষ হয়ে জন্ম গ্রহণ করবে সেদিন মদ ছাড়বে। তির্যক্ প্রাণী বা যক্ষেরা মদ কোথায় পাবে? ইহজীবনে যা' পারে তা' পান করছে। ইহ জীবনে মদ খোরের পাঁচ রকম অবস্থা হয়ে থাকে। যেমন শুকর যেখানে সেখানে শুয়ে থাকে, অন্য প্রাণীর মত নির্দিষ্ট কোন থাকার জায়গা নেই তারাও মদ পান করে যেখানে সেখানে শুকরের মত পড়ে থাকে ও হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা। বাঁদুর মুখে খায় আবার মুখে পায়খানা করে। বাঘ সব সময়

হিংস্র স্বভাবের হয়ে থাকে। মদ্য পায়ীরা মদ পান করে হিংস্র হয়ে উঠে। শকুন পঁচা মাংস খেয়ে আকাশে উঠে এবং নীচের পঁচা দ্রব্যের দিকে তাকিয়ে থাকে সে প্রকার তারাও ক্ষণিকের জন্য বড় লোক সেজে অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করে। কুকুর পথে ঘাটে যেখানে সেখানে কামভাব চরিতার্থ করে। তারাও মদ পান করে কুকুরের স্বভাবে পরিণত হয়। মদ পানের ফলে পশু অবস্থায় পরিণত হয় এবং মৃত্যুর পর পশুকুলে জন্ম গ্রহণ করে। কেহ কেহ ভূত, প্রেত, যক্ষ ও অন্যান্য তির্যক্ কুলে জন্ম গ্রহণ করে। এমন কি ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক নরকে পতিত হয়। মনুষ্য জন্ম খুবই দুর্লভ। এ দুর্লভ জন্ম হারালে বর্ণনাতীত অপায় দুঃখ ভোগ করতে হয়। সুতরাং যাদের মদ পান করার কু-অভ্যাস আছে, তাদের অনতিবিলম্বে মদ ত্যাগ করা একান্ত উচিত। জনৈক মদ খোর মারা যাওয়ার পর আমি বন ভন্তের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম সে ব্যক্তি যক্ষ বা অন্য কিছু হয়েছে কিনা? বন ভন্তে সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন-সেই ব্যক্তি আগে থেকে নরকে পাঁচ একর জমি বন্দোবস্তি করে রেখেছে যক্ষ হলে অনেক ভালই হতো।

বনভন্তের শর্ত

বন বিহারে যদি কেহ প্রব্রজ্যা বা উপসম্পাদার জন্যে আসে, প্রথমে বনভন্তে কতগুলি শর্ত আরোপ করেন। যেমন টাকা-পয়সা গ্রহণ না করা। ক্রয় বিক্রয় না করা। রাত্রে চার ঘন্টা ব্যতীত অন্য সময় ঘুমাতে পারবেনা। নারীর সাথে আলাপ করতে পারবেনা। কি খাবো? কোথায় খাবো? আমার বিছানা কোথায়? কে আমাকে পালন করবে? এগুলি চিন্তা হতে বিরত থাকতে হবে। বাড়ীতে লিখাপড়া যা হয়েছে তা যথেষ্ট, এখানে লিখাপড়া করতে পারবেনা। গল্প বা বাজে আলাপ থেকে বিরত থাকতে হবে। বন ভন্তের অনুগত হয়ে শ্রমণ-ভিক্ষুর যা যা প্রয়োজন তা অবশ্যই পালন করতে হবে। প্রব্রজ্যা বা ভিক্ষু হওয়ার জন্য আসলে মধ্যে মধ্যে বলেন-তুমি কি রকম? দুর শিরা না ছিড়কার? দুর শিরা অর্থ কচ্ছপের মাথা একবার ভিতরে ঢুকায় আবার বাহির করে। এ ভাবে ঢুকানো আবার বাহির করা কচ্ছপের কাজ। সে রকম অনেকে একবার ভিক্ষু হয়, আবার গৃহী অবস্থায় ফিরে যায়। এ ভাবে পুনঃপুনঃ ভিক্ষু এবং গৃহী হওয়াকে বন ভন্তে দুরশিরা বলেন। ছিড়কার অর্থ হল একখানা রশি দুই মাথায় দুইজনে টানলে বা মধ্যখানে অন্যজনে কেটে দিলে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ সংসার ধর্ম সম্পূর্ণ ভাবে বিচ্ছিন্ন করে পারমার্থিক ধর্মে চলে যাওয়াকে বনভন্তে ছিড়কার বলেন। বহুশর্ত আরোপের পর উপমায় বলেন-ধর, ঢাকা যাওয়ার জন্যে গাড়ীতে উঠেছ হঠাৎ পথে

নেমে গেলে, ঢাকা যাওয়া হবে কি? যাওয়া হবেনা, সুতরাং তোমার উচিত না নেমে ঢাকায় পৌঁছা সে রকম প্রত্যেক মুক্তিকামী নির্বাণ লাভ না হওয়া পর্যন্ত শমথ-বিদর্শন ভাবনা বা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করতে পারবেনা। এভাবে যাবতীয় শর্ত আরোপের পর স্বীকারোক্তিপত্রে দস্তখত করতে হয়।

একদিন জনৈক পৌঢ় ব্যক্তি আগে থেকেই ভিক্ষু হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। বন ভন্তে তাকে বল্‌লেন-তুমি ত বিবাহিত। তোমার ছেলে মেয়ে এবং সব কিছু আছে। আচ্ছা তুমি ভিক্ষু হওয়ার পর তোমার স্ত্রী বিহারে আসলে কি মনে করবে? তিনি বললেন- উপাসিকা মনে করবো। বন ভন্তে আবার বললেন-আচ্ছা, বহুদিন পর তোমার স্ত্রী অন্য জনের সাথে প্রণয়ে আবদ্ধ হলো, সে লোকের সাথে চলে যাওয়ার সময় তোমাকে বন্দনা করে বল্‌ল-আমি এ লোকের সাথে চলে যাচ্ছি। তখন কি করবে? তিনি বল্‌লেন-লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দেবো। বন ভন্তে বল্‌লেন- তা হলে ঠিক আছে। তুমি আগে মারামারি শেষ করো, এখন তোমার ভিক্ষু হওয়ার দরকার নেই। তোমার মত শিষ্য আমার প্রয়োজন নেই। বন ভন্তে বিভিন্নসময়ে এ ভাবে পরীক্ষা করে হীন ভিক্ষু না হওয়ার জন্য বলেন,। যারা উদ্যমশীল, মুক্তিপরায়ণ এবং ভন্তের শর্তগুলি পুংখানুপুং খরূপে প্রতিপালনে প্রতিজ্ঞ, তারা প্রব্রজ্যা বা উপসম্পদা লাভ করতে পারে।

অংক মিলিলে হয় ছাত্রের আনন্দ অপার।
বন ভন্তের শর্ত পূরিলে হয় পরাজয় মার।।

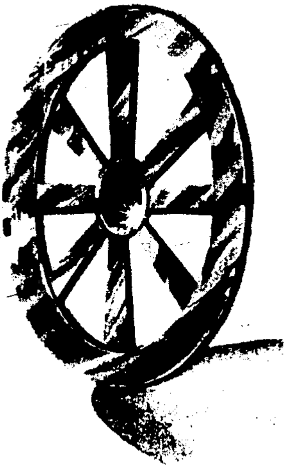

কে পায় কে পায়না?

বহুদিন যাবৎ এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার সমবয়সী না হলেও আমার সাথে দোকানে বসে নানা শাস্ত্র আলোচনা করতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি এমন প্রশ্ন কতেন যা যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হতাম না। কারণ তিনি পন্ডিত লোক। একদিন তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন-"আমরা মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে যা কিছু ধর্ম কর্ম করে থাকি তা কে পায় কে পায়না? প্রশ্নটির উত্তর আমি নিজে বুঝি, অথচ পন্ডিত বৃদ্ধকে ভাল ভাবে বুঝাতে পারি না। তিনি বল্লেন-চলুন তা' হলে বন ভন্তের নিকট যাই। একদিন বন্দনার পর বন ভন্তেকে আমাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত করলাম। তিনি প্রথমে সংক্ষিপ্ত এবং পরে বিশদ ভাবে তা ব্যাখ্যা করে বলেন-মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ধর্ম করা প্রত্যেকের কর্তব্য। তা শাস্ত্রে বিধান আছে। তিনি উপমায় বলেন-ধরুন, আপনাদের ভাই ঢাকা থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্যে পাঁচশত টাকা মনিঅর্ডার করলেন। আপনার ভাই সে ঠিকানায় থাকলে টাকাগুলি পাবেন ত? তিনি বল্লেন-হ্যাঁ ভন্তে। যদি সে ঠিকানায় না থাকেন, আপনার টাকা আপনার নিকট ফেরত আসবে ত? তিনি বললেন-হ্যাঁ, আসবে ভন্তে। তা হলে মৃতব্যক্তির বেলায়ও সে রকম হবে। যদি থাকে পাবে, আর যদি না থাকে পাবেনা। অর্থাৎ পুণ্য কর্মদাতার কাছে ফেরৎ এসে পুণ্য বর্ধিত হবে। ভন্তে আবার বল্লেন-মানুষ মারা যাওয়ার পরে বিশেষ প্রেত বা পরদত্ত ভোগী ব্যতীত একত্রিশ লোক ভূমির মধ্যে যে কোন ভূমিতে জন্ম গ্রহণ করলে সে পূণ্য দান পাবে না। শুধু সে প্রেত লোকেই পাবে। আবার প্রেতলোকের মধ্যেও না পাওয়ার অবস্থা আছে। সুতরাং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পূণ্যদান করা প্রত্যেকের কর্তব্য। এ উদ্দেশ্যে বহু দেশনার পর বৃদ্ধলোক বল্লেন-কে পায় কে পায়না কিভাবে জানা যায়? বন ভন্তে উত্তরে বল্লেন-যার চক্ষু খোলা তিনি জানেন। যার চক্ষু বন্ধ তিনি জানেন না। অর্থাৎ চর্ম চক্ষু দিয়ে দেখা যায়না। জ্ঞান চক্ষু দিয়ে দেখা যায়। জ্ঞান চক্ষু যার নাই তার মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ধর্মকর্ম করা উচিৎ। এরপর আরো আলাপ আলোচনার পর বৃদ্ধ ভদ্রলোক সহ চলে আসলাম।

আর একদিন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আমাকে লক্ষ্য করে বল্লেন-তুমি এমন প্রশ্নকারী আনিও, সে যেন শুধু জানার উদ্দেশ্যেই আসে। উপমায় বল্লেন-ঐ দেখ সাপছড়ি পাহাড়। সেটার সাথে কেহ যেন ধাক্কা খেয়ে না যায়।

জ্ঞান তরে প্রশ্ন কর অন্যথায় নয়।
জন্মে জন্মে জ্ঞানী হও কর মারজয়।।

তাবিজের সন্ধানে

জনৈক মহিলা আলুথালু বেশে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সমীপে উপস্থিত হয়ে অন্যান্য উপাসিকাদের পাশে বসে আছে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বন ভন্তের দেশনা শুনেও চাক্‌মা ভাষা কিছু বুঝতে সক্ষম হয়নি। বন ভন্তেকে মহিলা কাতর কণ্ঠে বল্‌ল- ভন্তে, আমি আপনার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছি। বন ভন্তে বল্‌লেন- কি ব্যাপার। মহিলা বল্‌ল-ভন্তে ব্যাপারটি আপনার কানে কানে চুপে চুপে বল্‌তে হবে। বন ভন্তে বল্‌লেন- আমাদের বৌদ্ধ বিনয় মতে যে কোন মহিলা ভিক্ষুর সাথে কানে কানে চুপে চুপে কথা বলতে পারে না। মহিলা বল্‌ল- ভন্তে, সেটা অতীব গোপনীয় ও লজ্জার কথা। তারপর তোমার পাশের মহিলাকে খুলে বলো। সে আমাকে বড় করে বুঝিয়ে বলবে। তখন পাশের চাক্‌মা মহিলা তার বিষয়টি শুনে বন ভন্তেকে বুঝিয়ে দিল। তার বাড়ী ময়মনসিংহ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে। অধ্যয়নরত একছেলের সাথে তার ভালবাসা জন্মে। শেষ পর্যন্ত তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার অঙ্গীকার করে। কিন্তু ছেলেটি অন্য আর এক মেয়ের সাথে ভালবেসে তার কথা একেবারে ভুলে যায়। শত চেষ্টার ফলেও তার বশবর্তী হয়না। আজ অনেক দিন যাবৎ এ কারণে মানসিক কষ্টে ভুগতেছে। ঢাকায় আপনার নাম শুনে একটা তাবিজের জন্য এসেছি। সে তাবিজের গুণে যেন তাকে পুনবার ভালবেসে বিয়ে করতে পারি। সমস্ত বিষয়বস্তু শুনে বন ভন্তে বল্‌লেন-সে ছেলেটি হল অবিশ্বাসী ও বিশ্বাসঘাতক। তোমার ভাগ্য ভাল। যদি তোমাকে বিবাহ করে ছেড়ে দিত কি অবস্থা হত? বিশ্বাসঘাতকের সাথে পুনঃবার বিশ্বাস স্থাপন করা তোমার উচিৎ হবেনা। সে যখন তোমাকে ভুলে গেছে, তুমিও তাকে একেবারে ভুলে যাও। যেমন টেপরেকর্ডারে গান বা অন্য কিছু অপছন্দ হলে সেগুলি মুছে পছন্দ মত গান বা অন্য কিছু রেকর্ড কর, সে রকম, তোমার মন থেকে তার কথা মুছে ফেল। মনে কালিমা রাখা দুঃখজনক। যেমন তুমি মনে কষ্ট পেয়ে পেয়ে ভুগতেছ। আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি-তুমি শান্ত চিত্তে পুনঃবার লেখাপড়া আরম্ভ কর-মানসিক কষ্টে আর ভুগতে হবেনা, তোমার নিশ্চয় সুখ এবং মঙ্গল হবে। ইহাই তোমার উত্তম তাবিজ। অতঃপর উক্ত উৎকণ্ঠিত মহিলা উপাসিকাদের সাথে পঞ্চশীল গ্রহণ এবং বন ভন্তের গভীর ধর্ম দেশনা শুনে উৎফুল্ল চিত্তে চলে যায়।

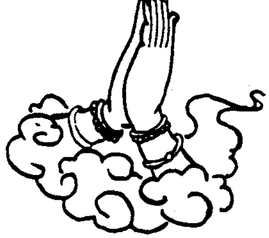

দেহ কলসী তুল্য

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নশ্বর দেহ সম্বন্ধে দেশনায় বলেন–দেহ হল কলসী তুল্য। যেমন মাটির কলসী, এলুমিনিয়ামের কলসী এবং পিতলের কলসী। মাটির কলসী দামেও কম স্থায়ীত্বও কম। এলুমিনিয়ামের কলসী দামেও বেশী স্থায়ীত্বও বেশী। পিতলের কলসী দামে আরো বেশী স্থায়ীত্ব আরো বেশী তাহলে দেখা যায় কলসীর মধ্যে দামে ও স্থায়িত্বে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। মনুষ্য দেহ হল মাটির কলসী। মাটির কলসী কখন ভেঙ্গে যায় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। না ভাঙ্গলে বেশ কিছু দিন ব্যবহার করা যায়। ঠিক তেমনি মনুষ্য দেহ কখন ধ্বংস হয় তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কেহ শিশু কালে, কেহ কিশোর কালে, কেহ পৌঢ় কালে এবং কেহ বৃদ্ধকালে বা যথা সময়ে মৃত্যু বরণ করে। যদিও শত বৎসর জীবিত থাকে তবুও স্বর্গের তুলনায় স্বল্প আয়ু। যদি কোন লোক মনুষ্য লোকে সৎকর্ম ও শীল পালন করে স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়, স্বর্গে উৎপন্ন হলে এলুমিনিয়ামের কলসীরূপে দেহ ধারণ করে থাকে। পৃথিবীতে এলুমিনিয়ামের কলসী যেমন অনেকদিন পর্যন্ত স্থায়ী তেমনি স্বর্গে হাজার হাজার বৎসর স্বর্গভোগ করে থাকে। তাও ব্রহ্মালোকের তুলনায় স্বল্প আয়ু।

যদি কোন লোক মনুষ্যলোকে দান, শীল, ভাবনা কর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়। তার দেহ ধারণ পিতলের কলসী তুল্য হয়। পিতলের কলসী যেমন বহুদিন স্থায়ী থাকে তেমনি ব্রহ্মালোকেও লক্ষ লক্ষ বৎসর আয়ু সম্পন্ন হয়ে ব্রহ্মালোকে থাকে।

মনুষ্যলোকের যাবতীয় সুখ ভোগকে তৃতীয় শ্রেণীর সুখ বলা হয়। কারণ এখানে সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত। দেব সুখ বা স্বর্গভোগ দ্বিতীয় শ্রেনীর সুখ পরিলক্ষিত হয়। সেখানে শুধু সুখই বিরাজমান। দুঃখ মিশ্রিত নেই। ব্রহ্মসুখ হলো প্রথম শ্রেনীর সুখ। সবসময় প্রীতি সুখে কাল যাপন করে।

ভগবান বুদ্ধের মতে মনুষ্য সুখ, দেব সুখ ও ব্রহ্মসুখ তেমন কিছু নয় বিমুক্তি সুখ আসল সুখ। যাঁরা শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণতা লাভ করে শ্রোতাপত্তিমার্গ, শ্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামীমার্গ, সকৃদাগামীফল, অনাগামীমার্গ, অনাগামীফল, অর্হত্ব ও অর্হত্ব ফলের অধিকারী হয়েছেন তাঁরাই প্রকৃত সুখের অধিকারী। তাঁদের দেহ ধারণ বা যে কোন কলসী রূপে গঠন হওয়া দুঃখজনক। যাঁরা অবিনাশী সুখ বা নির্বাণ লাভ করার উদ্দেশ্য থাকে তাঁরা কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোককে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম ভাবে দর্শন করা উচিৎ। মুক্তিকামী ব্যক্তিরা ত্রিলোককে জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ড হিসাবে দেখিয়া থাকেন।

ফেনতুল্য দেহ সব দুঃখের আগার।
অনিত্য দর্শনে হয় ভব পারাপার।।

বন ভন্তের ভবিষ্যদ্বাণী

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংস্পর্শে যাঁরা আছেন তারাই উত্তমরূপে বন ভন্তে সম্বন্ধে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অবগত থাকবেন। প্রথমেই তাঁর শিষ্যমন্ডলীর মধ্যে ভিক্ষু শ্রমণই প্রধান। দ্বিতীয়তঃ উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে কেহ কেহ বিক্ষিপ্তাকারে তাঁর মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যত বাণীগুলি স্মৃতিপটে ধারণ করে রাখেন। আবার কেহ কেহ তাঁর বাণীগুলি সযত্নে লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তিনি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন উপলক্ষে এবং বিভিন্ন প্রসঙ্গক্রমে প্রজ্ঞাচোখে নিরীক্ষণ করে ভবিষ্যদ্বাণী দিয়ে থাকেন। তন্মধ্যে আমার জানা মতে তাঁর বহু ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্যে মাত্র গুটিকয়েক উদাহরণ হিসেবে পাঠক-পাঠিকার জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করছি।

১। স্বাধীনতার যুদ্ধ ঃ-

১৯৭০ ইংরেজীতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দিঘীনালা হতে লংগদুর তিনটিলায় চলে আসেন। তখন হতে আমি মধ্যে মধ্যে তাঁর দর্শনার্থে যেতাম। এমন কি বনভন্তের প্রধান দায়ক বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মার (হেডম্যান) বাড়ীতে কয়েকদিন পর্যন্ত অবস্থান করতাম। ১৯৭১ ইংরেজীর মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের আহ্বানে তৎকালীন সারা পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন চলছিল তখন আমি সেখানে ছিলাম। একদিন দেশনার ফাঁকে তিনি বললেন-"দুঃখ, দুঃখ, দুঃখ, রক্তপাত, রক্তপাত রক্তপাত নয় মাস থাকবে!" দেখা গেল, কয়েকদিন পর ঠিক নয় মাস পর জন্ম হল এক নূতন বাংলাদেশ। তখন হতে তাঁর প্রত্যেকটি ভবিষ্যদ্বাণী অব্যর্থ সত্যে পরিণত হতে লাগল।

২। শেখ মুজিবের মৃত্যু ঃ-

১৯৭৫ ইংরেজীর ১৩ইং আগষ্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র উদ্বোধন করেন। সে সময় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে বন বিহারে দেশনালয়ে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে দেশনা করছিলেন। দেশনার মাঝখানে তিনি বল্‌লেন-"অনেক সময় পঞ্জিকার কথাও সঠিক থাকে।" জনৈক উপাসককে পঞ্জিকা খুলে দেখার জন্যে নির্দেশ দিলেন। পঞ্জিকাতে লিখা আছে বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদের অপমৃত্যু। ১৬ই আগষ্ট সকাল বেলা রেডিওতে শুনতে পেলাম সেনাবাহিনী কর্তৃক শেখ মুজিব নিহত হয়েছেন। দেশনালয়ে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন-তাঁদের মধ্যে বাবু জ্যোতির্ময় চাক্‌মা (অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট) ও বাবু রাজমঙ্গল চাক্‌মা উল্লেখযোগ্য।

৩। জনৈক ভিক্ষু সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ-

বন ভন্তের বিরুদ্ধবাদী জনৈক ভিক্ষু তাঁর বিরুদ্ধে নানা প্রকার কুৎসা রটনা ও অপপ্রচার চালাচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে উপাসকদের মধ্যে মারামারি হওয়ার উপক্রম হয়।

এমনকি বন ভন্তের অনুসারীদের মধ্যে অঞ্চল ভেদে আমরা একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলাম। এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে জানানোর পর তিনি আমাকে বললেন- "শৃগাল সিংহ কোনদিন দেখেনি। না বুঝে না জেনে শৃগাল শুধু লাফালাফি করতেছে। সিংহ চিন্‌তে পারলেই শৃগাল পালিয়ে যাবে" সত্যি সত্যিই কয়েকমাস পর উক্ত বিরুদ্ধবাদী ভিক্ষু হঠাৎ অন্যত্র চলে যান।

৪। জেনারেল মঞ্জুরের মৃত্যু ঃ-

জেনারেল মঞ্জুরের মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন-"জেনারেল মঞ্জু নির্দোষী লোক হত্যা করেছে। তাঁর অকাল মৃত্যু অনিবার্য।" শেষ পর্যন্ত দেখা গেল প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যার পর তিনিও গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

৫। রাজীব গান্ধীর মৃত্যু ঃ-

১৯৮৪ ইংরেজীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস্ ইন্দিরা গান্ধী তাঁর দেহরক্ষীর হাতে নিহত হওয়ার পর রাজীব গান্ধী অস্থায়ীভাবে প্রধানমন্ত্রী হন। এ খবর বন ভন্তেকে জানানোর পর তিনি সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে বল্‌লেন-"রাজীবকেও মেরে ফেলবে।" অনেক দিন পর আমি চিন্তা করলাম-অনেক সময় দেখা যায় মানুষ পূণ্য কর্মের দ্বারা বিপদ কেটে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯৯০ ইংরেজীতে জনৈক তামিল মহিলার হাতে রজীব গান্ধী নিহত হন।

৬। কতিপয় ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে ভবিষ্যদ্বাণী ঃ-

কতিপয় লাভ-সৎকার লাভী ভিক্ষু শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কর্তৃক তিরস্কৃত হওয়ায় তাঁকে একঘরে করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে বন ভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন- "আমি পরমার্থ সংঘকে সম্মান, শ্রদ্ধা ও বন্দনা করি। সত্যকে যেমন মিথ্যা চিরদিন ঢেকে রাখতে পারেনা তেমনি চন্দ্র সূর্যকেও মেঘে চিরদিন ঢেকে রাখতে পারেনা।

কালক্রমে দেখা গেল উক্ত লাভ সৎকারী লাভী ভিক্ষুর লাভ-সৎকার দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে এবং শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের প্রতি উপাসক-উপাসিকাদের গভীর শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭। ইরাকের যুদ্ধ ঃ-

ইরাক যুদ্ধের পূর্বে আমার মনে উদয় হল যদি বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যায় সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষ মারা পড়বে। এ উৎকন্ঠা নিয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করি তাতে তিনি নীরব রহিলেন। দ্বিতীয় বার আর একদিন জিজ্ঞাসা করার পর তিনি বল্‌লেন "বিশ্বযুদ্ধ হবেনা। অজ্ঞানে অজ্ঞানে যুদ্ধ হবে"। বনভন্তের ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি অনেকের নিকট ইরাক যুদ্ধের ভবিষ্যত নিয়ে কথাপ্রসঙ্গে প্রচার করেছি। পরবর্তীতে দেখা গেল তা বিশ্ব যুদ্ধের পর্যায়ে যেতে পারেনি।

৮। বেঁচে থাকলে শ্রমণ হতে পারো ঃ–

বাবু সুভাষ চন্দ্র বড়ুয়া কাপ্তাই এ চাকুরী করেন। তিনি আমার মামা শ্বশুর হন। মধ্যে মধ্যে বন বিহারে দেখা হয়। এমন কি তিনি সস্ত্রীক উপোসথও পালন করে থাকেন। একবার তাঁর মনে উদয় হল–অষ্ট পরিস্কার দান করবেন এবং ভন্তের নিকট শ্রমণ হলে ভাল হয়। চিত্তে এ সংকল্প করে শ্রমণ হওয়ার জন্য তিনি প্রার্থনা করলেন। বন বিহারের নিয়ম অনুযায়ী কমপক্ষে পনের দিনের জন্য শ্রমণ ধর্ম পালন করতে হয়। এদিকে সরকারী ছুটি সাত দিনের অধিক পাওয়া যাচ্ছেনা বিধায় তাঁর উদ্দেশ্য পুরণ হলনা। কিছুদিন পর পুনরায় তিনি প্রার্থনা করলেন–শ্রদ্ধেয় ভন্তে অনুকম্পা পূর্ব আমাকে দশদিনের জন্য হলেও প্রব্রজ্যা দান করুন। তাতে বন ভন্তে বললেন– "বেঁচে থাকলে শ্রমণ হতে পার"। বুদ্ধের সময়েও তোমার মত জনৈক উপাসক বুদ্ধের নিকট শ্রমণ হতে পারেনি। বন ভন্তের অনুমোদন পেয়ে তিনি উৎফুল্ল চিত্তে কাপ্তাই চলে গেলেন।

এদিকে অফিসের জমাকৃত কাজ রাতদিন একটানা করার ধুম পড়ে গেল। একদিন সাড়ে নয়টায় অফিস থেকে বাসায় ফেরার পথে রাস্তায় বেবী টেক্সীর ধাক্কায় ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় রাস্তার পাশে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকেন, তাঁর জনৈক বন্ধু তাঁকে চিনতে পেরে হাসপাতালে নিয়ে যান। রাত সাড়ে তিনটায় জ্ঞান ফিরে আসে। তখন বনভন্তের ভবিষ্যত বাণীর কথা স্মরণ করে চিন্তা করলেন–জীবনে যখন বেঁচে গেলাম নিশ্চয় আমি শ্রমণ হতে পারব। হাসপাতালে কয়েকদিন থাকার পর চিকিৎসকের অনুমতি ছাড়াই বন বিহারে চলে আসেন।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের ভবিষ্যত বাণী,দুর্ঘটনা ও তাঁর শরীরের অবস্থা দেখে আমি সত্যিই আশ্চর্যন্বিত হলাম। এ ব্যাপারে ভন্তেকে অবহিত করার পর তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন–"তাকে শ্রমণ হওয়ার ব্যবস্থা করে দাও।"

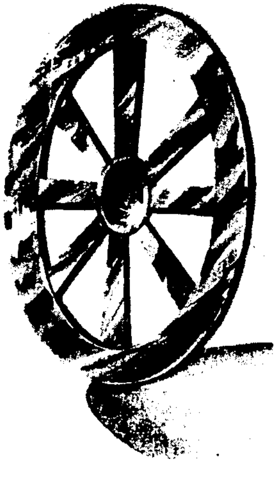

ধর্মবাবা

লৌকিক ভাবে দেখা যায় পিতাপুত্রের সম্পর্ক খুবই গভীর। এমনকি চেহারা ও রক্তের দিক দিয়ে মিল দেখা যায়। একজন শিশু তার বাবাকে বাবা বলে ডাকতে ডাকতে অভ্যস্থ হয়। আবার যৌবন কালে তার শ্বশুরকেও বাবা বলে সম্বোধন করে। ভিক্ষু-শ্রমণ, সাধু-সন্যাসী, ফকির ও দরবেশদেরকেও অনেকে বাবা সম্বোধন করে থাকে।

ত্রিপিটকে দেখা যায় একদা ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ এক ব্রাহ্মণ গ্রামে ভিক্ষাচরণে গিয়েছিলেন। সেখানে এক ব্রাহ্মণ তাঁকে পুত্র সম্বোধন করে জড়িয়ে ধরে বাড়ীতে নিয়ে যান। আপন পুত্রকে যেভাবে আদর করে খাওয়ান হয় সেভাবে ভগবান বুদ্ধকেও খাওয়ালেন। কেহ কেহ মনে করল ব্রাহ্মণের মতিভ্রম হয়েছে। ভগবান বুদ্ধ দেশনায় বলেন- এ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ঠিকই বলেছেন। তিনি পূর্ব জন্মে আমার বাবা ছিলেন। পূর্ব সংস্কার বশতঃ তিনি আমাকে পুত্র সম্বোধন করেছেন। ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় বিভিন্ন ধর্মদেশনা শুনে উক্ত ব্রাহ্মণ মার্গফল লাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই জাতিস্মর জ্ঞান লাভ করে পূর্বজন্মের পিতা পুত্রের প্রমাণ পেলেন।

আর এক ব্যক্তিক্রমধর্মী বাবা ও পুত্রের গভীর সম্পর্ক সম্বন্ধে পাঠক পাঠিকাদের সমীপে ব্যক্ত করছি। গতবার (১৯৯১ইংরেজী) শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে খাগড়াছড়ি জেলায় ছাব্বিশ দিনের জন্য এক ধর্ম অভিযাত্রায় পরিভ্রমণ করেন। বিভিন্ন স্থানে ধর্ম সভা করার জন্য সেই অঞ্চলের মাননীয় ব্রিগেড কমান্ডার মহোদয় একখানা গাড়ীর ব্যবস্থা করে দেন। বন ভন্তেকে সযত্নে গাড়ীতে উঠানামা করার জন্য একজন সৈনিককে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। আনুমানিক ২২/২৩ বৎসরের অবিবাহিত যুবক, দেখতে নাদুস-নুদুস আদুরে চেহারা। সেবাকার্যে বেশ যত্নশীল, ক্যাপ্টেন পদে কর্মরত আছেন।

কয়েকদিন যাবৎ বিভিন্ন স্থানে ধর্মসভায় যোগদান করার পর উক্ত ক্যাপ্টেন একটু হেসে বন ভন্তের প্রতি কিছু বলবার ইচ্ছে প্রকাশ করলেন।

বন ভন্তে ঃ কিছু বলতে চান?

ক্যাপ্টেন ঃ হ্যাঁ।

বন ভন্তে ঃ বলতে পারেন।

ক্যাপ্টেন ঃ আপনার সংস্পর্শে এসে আমি খুবই আনন্দিত এবং নিজকে অতীব ধন্য বলে মনে করি।

বন ভন্তে ঃ কেন?

ক্যাপ্টেন ঃ আপনার কথাগুলি আমার খুবই ভাল লাগে। যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলতে পারি।

বন ভন্তে ঃ (চিত্তের অবস্থা জেনে) বল্‌তে পার।

ক্যাপ্টেন ঃ আপনাকে বাবা ডাকতে ইচ্ছে হয়।

বন ভন্তেঃ কেন? তোমার বাবা নেই?

ক্যাপ্টেন ঃ আছে।

বন ভন্তেঃ তবে কেন ডাকবে?

ক্যাপ্টেন ঃ আমার মন যে চায় আপনাকে বাবা ডাকতে।

বন ভন্তে ঃ আমি বৃদ্ধ হয়েছি, সেজন্য?

ক্যাপ্টেন ঃ না, একান্ত ইচ্ছার কারণে।

বন ভন্তে ঃ বাবা ডাক্‌লে বাবা ও পুত্রের গুরুত্ব দিতে হয় জান?

ক্যাপ্টেন ঃ অনুগ্রহ পূর্বক গুরুত্ব সম্বন্ধে একটু বলুন।

বন ভন্তে ঃ তাহলে মন দিয়ে শুন, ধারণ কর এবং আচরণ করতে চেষ্টা কর। বাবা পুত্রের অমঙ্গল চায়না। সব সময় মঙ্গল কামনাই করে। তাই দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণে প্রকাশ করছি।

১। আমার মত বয়সের লোক দেখলে মনে করবে তোমার বাবার মত।

২। তোমার মত বয়সের লোক দেখলে মনে করবে আপন ভাই এর মত। শত্রু বা অপর মনে করবেনা।

৩। যুবতী নারী আপন বোনের মত মনে করবে। চিত্তে কোন সময় কামভাব উৎপন্ন করবেনা।

৪। যে কোন বয়সের নারী পুরুষ দেখলে আপন ব্যতীত অপর মনে করবেনা।

৫। কারো প্রতি হিংসা, ঘৃণা ও অবজ্ঞা সূচক ভাব মনে স্থান দিও না। সকলের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করবে।

এ পাঁচটি উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা কর। তুমি বাংলাদেশের যেখানে যাওনা কেন সেখানে পাঁচটি উপদেশ মেনে চলিও। তোমার মনের শান্তি ও অনাবিল সুখ বহে আসবে। মানুষের মনের শান্তি ও সুখ খুব বড় সম্পদ "ধর্ম বাবা" যখন ডেকেছ, উপদেশ পালনে যথাযথ মূল্য দিও।

পরিশেষে উভয়ের মধ্যে বিদায় নেয়ার পালা। পুত্র সজল নয়নে ও করুণ স্বরে বললেন-বাবা আমাকে আশীর্বাদ করবেন। বাবাও অনাসক্ত ভাবে বল্‌লেন-তুমি শান্তিতে থাক ও সুখে থাক আশীর্বাদ করি,কিন্তু আমার উপদেশগুলি পালন করবে।

বনভন্তের সংক্ষিপ্ত উপদেশ গুচ্ছ

সাধারণতঃ উচ্চ মার্গের উপদেশ সাধারণ উপাসক-উপাসিকারা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা। অপেক্ষাকৃত সহজভাবে প্রকাশিত হলে সকলে ঐ সকল উপদেশাবলীর মর্মার্থ উপলব্ধি করে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের কথিত উপদেশসমূহ পালনে ব্রতী হতে পারেন।

প্রায় সময় লক্ষ্য করা যায় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ভিক্ষু-শ্রমণ, উপাসক-উপাসিকা অথবা যে কোন ব্যক্তিকে উপলক্ষ্য করে অতি সংক্ষেপে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাঁর উপদেশাবলী গভীর তথ্যমূলক, মুক্তির পথ নির্দেশক ও ব্যাপক ভাবার্থে পরিপূর্ণ। যাঁরা এগুলি বুঝার ক্ষমতা অর্জনের সৌভাগ্য লাভ করেছেন শুধু তাঁরাই বুঝতে পারেন। স্বল্প জ্ঞানীরা বিশদ বিশ্লেষণ ব্যতীত বুঝতে সক্ষম হন না। প্রত্যেকটি উপদেশ পুংখানুপুংখ রূপে ব্যাখ্যা বা ভাবসম্প্রসারণ করলে এক একটির কলেবর পুস্তক আকারে প্রকাশ পাবে।

সুতরাং পাঠক-পাঠিকাদের জানার সুবিধার্থে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের নিকট হতে শ্রুত মহামূল্য উপদেশ সমূহ সযত্নে চয়ন করে "বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত উপদেশ গুচ্ছ" নামে কিছু উপদেশাবলী প্রকাশ করতে চেষ্টা করছি। পাঠক-পাঠিকারা শদ্ধেয় বন ভন্তের সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে মনে করবো। বন ভন্তের দেশনা হতে যে সকল মুল্যবান উপদেশ সংক্ষিপ্ত আকারে চয়ন করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ-

১। ত্যাগই সুখ, ভোগই দুঃখ।
২। জীবন যাপনে বাতাসের মত আশ্রয়হীন ভাব অবলম্বন কর।
৩। সর্ব বিষয়ে অনাসক্ত হও।
৪। শীল রূপ কাপড় পরিধান কর।
৫। অজ্ঞান মিথ্যা ত্যাগ করতে পারলে জ্ঞান সত্য পাওয়া যায়।
৬। তুমি এমন জায়গায় যাও যেখানে যাবে মারে দেখবেনা।
৭। ধর্মের অধীন ও কর্মের অধীন থাকিও না।
৮। বিপদের সময় প্রকাশ পায় কার কতটুকু জ্ঞানের পরিধি আছে।
৯। কায়, রূপ ও অরূপ ত্যাগ কর।
১০। কুশল কর্মে তুমি মুনি হও।
১১। শীল পালনকারীকে সাধু বলে।
১২। দয়া, ক্ষমাশীল, পূণ্য কর্মে নির্ভীক, সহিষ্ণু ও মৈত্রী পারায়ণ লোককে পন্ডিত বলে।
১৩। ত্রিলোক দুঃখ, মিথ্যা ও অগ্নিকুন্ড তূল্য।
১৪। চিত্তের নির্মলতা, উচ্চ ও উচ্চ মনই মুক্তির সোপান।
১৫। দান কর ভোগের উদ্দেশ্যে নয়, মুক্তির উদ্দেশ্যে।

১৬। যে সুখী হতে চায় তার পক্ষে একা থাকা ভাল।
১৭। শুধু কাষায় বস্ত্র পরিধান ও মস্তক মুন্ডন করলে ভিক্ষু হয়না।
১৮। অজ্ঞানতা বশতঃ পৃথিবী ভ্রমণ করলেও কোন শান্তি নেই, সুখ নেই ও শ্রম বৃথা।
১৯। বনের বাঘকে ভয় করনা, নারীকে ভয় কর।
২০। মার্গ ভাবনায় মুক্ত হও।
২১। চিন্তা ভাবনায় আকাশের মত উদার হও।
২২। জীবন ও মনুষ্য সুখ ত্যাগ কর, নিবৃত্তি সুখ গ্রহণ কর ও নির্বাণ সুখ গবেষণা কর।
২৩। শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞায় পারদর্শী হও।
২৪। পূর্বে সঞ্চিত পূণ্য, ইহজন্মের প্রচেষ্টাও বুদ্ধের উপদেশে ভব সাগর পার হওয়া যায়।
২৫। প্রত্যেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা কর।
২৬। তুমি নির্বাণ পুকুরে স্নান কর।
২৭। কর্মযোগে অসাধারণ হও।
২৮। চারি মার্গ সত্য কথন, দেশনা প্রজ্ঞাপন, প্রকাশন ও স্থাপন কর।
২৯। এম, এ, পাশ ও ত্রিপিটক বিশারদ হলে শিক্ষিত বলা যায় না। বুদ্ধ জ্ঞানে শিক্ষিত হও।
৩০। মার্গফল লাভীই প্রকৃত বিশ্বাসী।
৩১। সৎ পুরুষ দর্শন, সদ্ধর্ম শ্রবণ, প্রনালীবদ্ধ চিন্তা ধারা ও সদ্ধর্ম আচরণই ইহ জন্মে প্রশংসিত হয়।
৩২। ইন্দ্রিয় দমন, আত্ম দমন ও চিত্ত দমনই প্রকৃত দমন।
৩৩। দেহে কৃশ হও ও জ্ঞানে প্রদীপ্ত হও।
৩৪। মুক্তির জন্যে সংগ্রাম কর।
৩৫। নিজের জন্য নিজে নিয়ন্ত্রণ কর।
৩৬। সকল বস্তুতে দুঃখ, মিথ্যা ও পাপ দেখে আসক্তি বর্জন কর।
৩৭। নিজে মুক্ত হয়ে অপরকে মুক্ত কর।
৩৮। অবিদ্যার অন্ধকার থেকে নির্বাণ আলোকে আস।
৩৯। নির্বাণই একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।
৪০। তোমার সব কিছু আছে, কিন্তু কোন কিছু নেই হিসাবে জানতে হবে।
৪১। জ্ঞান আর সত্য উদয় হলে অবিদ্যা তৃষ্ণা ধ্বংস হয।
৪২। অনুবীক্ষণ যন্ত্রে যেমন ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র জিনিস দেখা যায় সেরকম তোমাদের অসংখ্য দুঃখরাশি আমি নিরীক্ষণ করি।
৪৩। দেব ব্রহ্মরাও হীন এবং মিথ্যা।
৪৪। কাম সুখ অন্তে দুঃখ।

৪৫। পঞ্চ স্কন্ধের বিলয় ঘটাও।
৪৬। পরধর্ম, (লোভ, দ্বেষ, মোহ,) দুঃখ সদ্ধর্ম (শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা) সুখ।
৪৭। অন্য পথে চলিও না, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে চল।
৪৮। তুমি শূণ্যের দিকে চেয়ে থাক।
৪৯। তৃষ্ণাস্রোত অতিক্রম কর।
৫০। জন্ম-মৃত্যু বন্ধ কর।
৫১। লৌকিক সুখ-দুঃখ অতিক্রম কর।
৫২। নির্বাণ দর্শনই যথার্থ দর্শন।
৫৩। সর্বদা নিজেকে অক্ষুন্ন রাখ।
৫৪। দুর্বলের স্বর্গ কামনা সবলের নির্বাণ কামনা।
৫৫। হীন সংস্কার ও হীন মনুষ্যত্ব ত্যাগ কর।
৫৬। কাম সুখ ও আত্মপীড়ন ত্যাগ কর।
৫৭। নির্বাণের নিকট আত্ম সমর্পণ কর।
৫৮। কোথায় পাব? কে দেবে? কি খাব? আমার বিছানা কোথায়? এচিন্তা করিও না। (শিষ্যদের)
৫৯। জ্ঞানীরা ধন, জন, পদ, রোগ মুক্তি এমন কি আপন সমৃদ্ধির জন্যও কামনা করেননা।
৬০। অন্তর্দৃষ্টি ভাব উৎপন্ন কর।
৬১। অপরের প্রতি পালক হইওনা।
৬২। জাতি বাদ উচ্ছেদ কর।
৬৩। নয় প্রকার মান ধ্বংস কর।
৬৪। অজ্ঞানতা হতে সকল দুঃখের উৎপত্তি।
৬৫। অবিদ্যা নিরোধ করে বিদ্যা বা প্রজ্ঞা উৎপন্ন কর ও চিত্তের গতি নিরোধ কর।
৬৬। অগ্রত্বে শ্রেষ্ঠত্ব হয়। হীনত্বে অগ্রত্ব হয়না।
৬৭। মেঘ চন্দ্র সূর্যের ন্যায় স্থায়ী নয়, মিথ্যা ও সত্যের ন্যায় স্থায়ী নয়।
৬৮। তোমরা নিরানব্বই ভাগ দুঃখের বোঝা বহন করে মাত্র একভাগ সুখ পেয়ে আনন্দ কর।
৬৯। যিনি নির্বাণের স্বাদ পেয়েছেন তাঁকে কোটি কোটি টাকার সম্পদ দিলেও অতি তুচ্ছ মনে করেন।
৭০। জ্ঞান দান, ধর্ম দান ও অভয় দানই উত্তম দান।
৭১। ইহ জীবনকে তুচ্ছ মনে করে শীল পালন করে মরে যাও।
৭২। ধানক্ষেতের মাঝখানে খালি জায়গায় গরু চড়ানো যেমন মহাকষ্টকর তেমনি দুঃশীলের মাঝে শীল পালন করাও মহাকষ্টকর।
৭৩। মার্গসুখ, ফলসুখ ও নির্বাণ সুখই উত্তম সুখ।
৭৪। প্রাণীর মধ্যে যেমন তিমি মাছ সর্ববৃহৎ, তেমনি মানুষের মধ্যে মার্গফল লাভীই শ্রেষ্ঠ।

৭৫। তুমি যা পাও তাতেই সন্তুষ্ট থাক।
৭৬। যারা হীন ও সাধারণ ব্যক্তি তারা সংসারে নানাবিধ অপকর্মে লিপ্ত থাকে।
৭৭। যিনি চারি আর্যসত্যকে দর্শন করেছেন তিনি বুদ্ধকে দর্শন করেছেন।
৭৮। মানবিক চাপ, বিদ্বেষ ও উত্তেজনা হতে পাপ ও দুঃখ উৎপত্তি হয়।
৭৯। জ্ঞান আর সত্য দিয়ে সবকিছু জয় করা যায়।
৮০। নিজের এবং অপরের মঙ্গল ও সুখের জন্য কথা বল ও কাজ কর।
৮১। জ্ঞান পূণ্যে ভেজাল দিওনা।
৮২। সমাজের নানাবিধ কাজ ও রাজনীতি ভিক্ষুর কর্ম নয়।
৮৩। দুঃখেও থাকিওনা, সুখেও থাকিও না।
৮৪। দেহ মূর্তি ধারণ করলে সংসার অতিক্রম করা যায়না।
৮৫। জ্ঞানের দ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, সে সুখই প্রকৃত সুখ।
৮৬। তৃষ্ণা, মিথ্যা দৃষ্টি ও অহংকার মানুষের পরিহানি ঘটায়।
৮৭। তৃষ্ণারূপ সাগরে নির্বাণরূপ দ্বীপে আশ্রয় লও।
৮৮। দেখলে দেখতে পার শুনলে শুনতে পার ও অনুমান করলে অনুমান করতে পার। কিন্তু আসক্ত হবেনা।
৮৯। সংসারে থেকে সংসারের নানাবিধ বিষয়ে লিপ্ত না হয়ে জীবন অতিবাহিত কর।
৯০। নারী বা পুরুষ নয়, চারি মহাভূত হিসাবে দর্শন কর।
৯১। তুমি কোথায় যাবে গন্তব্য স্থল ঠিক কর।
৯২। এ সংসারে যাবতীয় সুখ তুচ্ছ মনে কর ও ভোগ কামনা ত্যাগ কর।
৯৩। পঞ্চমার জয় কর।
৯৪। ত্রিহেতুক লোকই মুক্ত হতে পারে।
৯৫। পৃথিবী হতে চন্দ্র-সূর্য যেমন বহু দুরে অবস্থান করে তেমন সদ্ধর্ম হতে সাধারণ ব্যক্তির অবস্থান বহু দূরে।
৯৬। নবলোকোত্তর ধর্মের অধিকারী হও।
৯৭। অন্যায়, অপরাধ, ভুল ও গলদ করিও না।
৯৮। শ্রদ্ধা হতে মনুষ্য সম্পত্তি, দেবসম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি উৎপত্তি হয়।
৯৯। যার যতটুকু সামর্থ তার ততটুকু ত্যাগ, যার যতটুকু ত্যাগ, তার ততটুকু মুক্তি।
১০০। নহে দূরে নহে কাছে খুঁজলেই পায়।
লোভ-দ্বেষ-মোহ তাকে ঢাকিয়াছে গায়।
আবরণ খুলে ফেল দেখিবে নির্বাণ।

চির শান্ত হবে তুমি রহিবে অম্লান।।

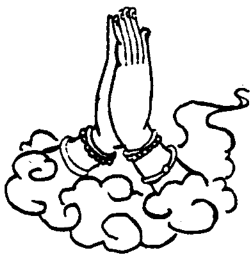

নির্বাণ কোথায়?

নির্বাণ কোথায়? এটা একটা জটিল প্রশ্ন। নির্বাণ যিনি উপলব্ধি বা লাভ করেছেন তিনিই ভালভাবে সমাধান দিতে পারেন। যিনি লন্ডনে গিয়েছেন তিনি লন্ডন সম্বন্ধে পুংখানুপুংখরূপে বিবরণ দিতে সক্ষম হবেন। যিনি লন্ডনে যান নি তিনি অপরের মুখে বা বই পুস্তক থেকে পড়ে লন্ডন সম্বন্ধে বলতে পারেন। এখানে কথা হচ্ছে যে, লন্ডনে যিনি সশরীরে গিয়েছেন আর যিনি অপর লোক থেকে বা বই পুস্তক থেকে পড়ে দেখেছেন তাতে অভিজ্ঞতায় অনেক ব্যবধান থাকবে। যাঁরা ত্রিপিটক অধ্যয়ন করে নির্বাণ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন, তাঁদের মধ্যেও অভিজ্ঞতায় বা বর্ণনায় অনেক ব্যবধান থাকবে।

একদিন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের নিকট জনৈক উপাসক জিজ্ঞাসা করেছিলেল–ভন্তে, নির্বাণ কোথায়? বন ভন্তে বল্‌লেন–নির্বাণ স্বর্গে, ব্রহ্মলোকে বা অন্য কোথাও নহে। তাহা পঞ্চ ইন্দ্রিয়েও জানা যায়না। তাহা মনো ইন্দ্রিয়ে জানা যায়। যাঁর মন বা চিত্ত নির্বাণ সম্বন্ধে জানার ক্ষমতা অর্জন করবে তিনিই নির্বাণ সম্বন্ধে জানতে পারবেন।

বন ভন্তে উপমা দিয়ে বল্‌লেন– ধর, আমি একটা মুরগীর বাচ্চাকে বিভিন্ন স্থানে নিয়ে বলি–এটা চট্টগ্রাম, এটা ঢাকা, এটা কলিকাতা প্রভৃতি। মুরগীর বাচ্চাটি কি বুঝতে পারবে ঐ সমস্ত স্থান সম্বন্ধে? উপাসক বল্‌ল– না ভন্তে, ভন্তে বল্‌লেন–ঠিক তুমিও মুরগীর বাচ্চার মত। উপলব্ধি না হলে নির্বাণ কি বা কোথায় বল্‌লে বুঝতে পারবেনা।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে অন্য উপমায় বললেন–ধর, তুমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কর। যদি কেহ তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ সম্বন্ধে পাঠ দান করেন, তবে তুমি কি তা বুঝতে পারবে? উপাসক বল্‌ল–না ভন্তে, বনভন্তে বল্‌লেন– সেরূপ তুমিও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে বুঝতে পারবেনা, তুমি ক্রমান্বয়ে জ্ঞান লাভ কর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কর। নিশ্চয়ই এম, এ, ক্লাশের পাঠ সম্বন্ধে বুঝতে পারবে। নির্বাণের বেলায়ও একই ব্যাপার।

একদিন বাবু বিদ্যুৎ কুমার তালুকদার সহ আমি বন বিহার হতে আসার সময় নদীর ঘাটে জনৈক উপাসিকার সাথে দেখা হয়। বিদ্যুৎ বাবুর সাথে উক্ত উপাসিকার কুশল বিনিময়ের পর বিদ্যুৎ বাবু বল্‌লেন–লঞ্চ ধর্মঘটের কারণে চাকুরীতে (মারিশ্যায়) যোগদান করতে পাচ্ছিনা। উক্ত উপাসিকা তাঁকে উপদেশ দিয়ে বল্‌লেন–আপনার কোথাও যাওয়ার দারকার নেই। আপনি নির্বাণে চলে যান। এই কথা বলার পর আমি উচ্চস্বরে হেসে উঠলাম। আমার সাথে সাথে আরো কয়েকজন হেসে ফেল্‌লেন। তাতে উপাসিকা হতবাক হয়ে বন বিহারে চলে গেলেন। নদী পারাপার হওয়ার সময় আমরা (নৌকার যাত্রী) উপাসিকার উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্য করে বল্‌লাম–বিদ্যুৎ বাবু ভুল করেছেন, নির্বাণের ঠিকানাটি তার থেকে জেনে নেওয়া উচিৎ ছিল। শেষ মন্তব্যে আরো বল্‌লাম–উপাসিকার মতে নির্বাণ কোন এক নিরাপদ জায়গা হতে পারে। উক্ত

উপাসিকার মত অনেকে এ রকম ধারণা করে থাকেন।

নির্বাণ বৌদ্ধদের চরম ও পরম লক্ষ্য; কিন্তু অনেকে ভুল পথে পরিচলিত হন। এ রকম ভুল তথ্য পোষণকারীর দুটি তথ্য গল্পাকারে নিম্নে ব্যক্ত করছি।

১। কোন এক বিহারের পাশেই এক উপাসিকার ঘর। প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা বিহারে গিয়ে নিয়মিত উপাসনাদি করেন।দিনের বেলায় নাতি-নাতনীর রক্ষণাবেক্ষণই উক্ত উপাসিকার প্রধান কাজ। একদিন সেই উপাসিকা বন্দনাদি করার পর বুদ্ধের সামনে এভাবে প্রার্থনা করলেন-হে করুণার আধার ভগবান বুদ্ধ, তুমি আমাকে নির্বাণে নিয়ে যাও। জরাজীর্ণ দেহ নিয়ে আমি অতিকষ্টে কালযাপন করছি। এ পৃথিবীতে থাকার আমার আর ইচ্ছা নেই। অতি সত্বর আমাকে নির্বাণে নিয়ে যাও।

সে বিহারে বিহারাধ্যক্ষ জনৈক পন্ডিত ভিক্ষু উপাসিকার প্রার্থনা শুনে সংশোধন করার চেষ্টা করেও বিফল হন। আর একদিন তিনি বুদ্ধ মূর্তির আড়ালে থেকে বল্লেন-হে উপাসিকা, তুমি প্রস্তুত হও। তোমাকে নির্বাণে নিয়ে যাব। এদিকে উপাসিকা মনে মনে ধারণা করলেন-ঠিকই স্বয়ং বুদ্ধই আমাকে বলেছেন। আর একদিন প্রার্থনার পর উক্ত পন্ডিত ভিক্ষু বল্লেন-এখন সময় হয়েছে, কখন নির্বাণে যাবে বল? উপাসিকা চোখ বন্ধ অবস্থায় বল্লেন-প্রভু, আমি এখনও প্রস্তুত হতে পারিনি, কারণ আমার ছোট নাতিটি আমাকে ছাড়া থাকেনা। তদুপরি তার প্রতি মায়ামমতায় জড়িয়ে পড়েছি। সে আর একটু বড় হোক। উপযুক্ত হলে নির্বাণে যাব।

বহুদিন হয়ে গেল উপাসিকার উপযুক্ত সময় হলনা। আর একদিন উপযুক্ত সময় পেলেন সেই পন্ডিত ভিক্ষু। সমবেত উপাসক উপাসিকাদেরকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলেন-কে কে নির্বাণে যাওয়ার ইচ্ছা কর। হাত তোল। প্রথমেই হাত তোল্লেন-সেই উপাসিকা। পন্ডিত ভিক্ষু বল্লেন- আর কারো হাত তোলার প্রয়োজন নেই। যার জন্যে আয়োজন করেছি, সে প্রথমেই হাত তুলেছে। তারপর উক্ত ভিক্ষু উপাসিকার প্রার্থনা ও তাঁর বিচক্ষণতার কথা প্রকাশ করে বল্লেন-নির্বাণই পরম সুখ। নির্বাণ কোথাও নয়। নির্বাণ উপযুক্ত চিত্তেই অনুভব করা যায়। যেমন বাতাস যে আছে, তার প্রমাণ শরীর দ্বারা উপলব্ধি করতে পারি সেরূপ নির্বাণও আছে। পরম পূণ্যবান ব্যক্তিই কেবল নির্বাণ উপলব্ধি করতে পারেন।

২। বহুদিন আগের কথা। কোন এক দেশে এক রাজা রাজত্ব করতেন। পৌঢ় বয়সে তিনি ধর্মানুরাগী হন। ধর্মালোচনাতে তিনি আনন্দ পেতেন। সে দেশের এক বিখ্যাত পন্ডিতের সাথে তাঁর সখ্যতা জন্মে। তিনি মনে করতেন সে দেশে শুধু উক্ত পন্ডিতই মুক্ত পুরুষ। একদিন রাজা আলোচনা প্রসঙ্গে পন্ডিতকে বল্লেন-আপনিই আমার একমাত্র মুক্তিদাতা। আপনি ছাড়া আমাকে কেহ মুক্তি দিতে পারবে না অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে মুক্ত করে দিন। পন্ডিত মশাই বল্লেন-আপনি যা ধারণা করছেন তা ভুল ধারণা। আমি মুক্ত পুরুষ নই। শুধু পন্ডিতই বটে আপনাকে মুক্ত করার সাধ্য নেই। তবুও রাজা পন্ডিত মশাইকে বারবার অনুরোধ করে বলেন-ঠিক আছে, আপনি কিছুদিন চিন্তা করে সমাধান দিলে ভাল হয়।

এদিকে রাজার সমাধান দিতে গিয়ে পন্ডিত মশাই এর রীতিমত পেটের ভাত ও চোখের ঘুম চলে গেছে। এমন কি রাজার চিন্তায় চিন্তায় পান্ডিত্যের পরিধি পর্যন্ত খর্ব হয়ে যাচ্ছে। তা' দেখে তাঁর ছেলে উৎকন্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল-ইহার কারণ কি? পন্ডিত মশাই তাঁর ছেলেকে সমস্ত বিষয়টি প্রকাশ করার পর ছেলে বল্ল-চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনি রাজাকে সংবাদ দিন। আমি নিজেই উহার উপযুক্ত সমাধান দিতে সক্ষম।

একদিন পন্ডিত মশাই তাঁর ছেলেকে নিয়ে রাজার নিকট উপস্থিত হলেন। রাজা মহাশয় উৎফুল্ল চিত্তে চিজ্ঞাসা করলেন- এখন আমার কি করতে হবে বলুন। পন্ডিত পুত্র বল্ল-আপনার কিছু করতে হবেনা। একটা মাহুত ছাড়া হাতী এখানে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিন। অতঃপর রাজা পন্ডিত ও পন্ডিত পুত্রকে নিয়ে ঐ হাতীর পিঠে চড়ে তাঁরা গহীন অরণ্যের দিকে চলে গেলেন। সুবিধামত দু'টা গাছ দেখে তাঁরা সেখানে নেমে পড়লেন। রাজা এবং পন্ডিতকে দুই গাছের গোড়ায় সামনা সামনি দাঁড় করানো হলো। পন্ডিত পুত্র তাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটি শর্ত দিয়ে বল্ল-আমি যা করি বা যা বলি তা দ্ব্যর্থহীন ভাবে মেনে নিতে হবে। তাঁরা উভয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করার পর পন্ডিত পুত্র তার পকেট থেকে দুটো রশি বের করলো। প্রথমেই তার বাবাকে ও পরে রাজাকে ভালভাবে গাছের সাথে বেঁধে ফেল্লো। অবশেষে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বল্ল- বাবা, আপনি রাজা মহাশয়কে মুক্ত করুন। আমি চলে যাচ্ছি। পন্ডিত পুত্র হাতীর পিঠে করে অপেক্ষমান জনগণের নিকট খবর দিল-আপনারা সবাই এসে দেখে যান আমার বাবা এবং রাজার অবস্থা খুব খারাপ। জনগণ দুইজনকে বন্ধন অবস্থায় দেখে বল্ল-এ কি ব্যাপার? পন্ডিত পুত্র বল্ল-অনুগ্রহ পূর্বক তাঁদের কে কেউ খুলবেন না শুধু দেখতে পারবেন। পরিশেষে রাজা হেসে হেসে বল্লেন-বুঝতে পেরেছি, পন্ডিত পুত্র মহাপন্ডিত। পন্ডিত পুত্র এ ঘটনা না ঘটালে আমার এ ভুল জীবনে কোনদিন সংশোধন হতোনা।

তা হলে বুঝা যায়, যে মুক্ত নয় সে কখনও অপরকে মুক্ত করতে পারেন। সেরূপ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায়ই ধর্মদেশনায় বলে থাকেন-তোমাদের হাত পা শক্ত ভাবে বাঁধা আছে। কার কাছে জান? যেমন অবিদ্যা, তৃষ্ণা, লোভ, দ্বেষ, মোহ, আসক্তি, মান, সন্দেহ, মিথ্যা দৃষ্টি, শীলব্রত পরমার্শ, তন্দ্রা-আলস্য এবং বিভিন্ন ক্লেশের নিকট। এগুলি হল রশি সদৃশ। কোন কারাগারে আছ জান? যেমন মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধু-বান্ধব, জ্ঞাতি-মিত্র, দেশ-গ্রাম, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিষয়-সম্পত্তি এবং বিভিন্ন প্রভুত্বের কারাগারে আছো। যতদিন পার্যন্ত উপরিল্লিখিত রশি এবং কারাগার থেকে মুক্তি পাবেনা ততদিন পর্যন্ত কখনো নিজেও মুক্ত হতে পারবেনা এবং অপরকেও মুক্ত করতে পারবেনা। যেমন একজন লোকের রোগ হয়েছে। সে রোগের কারণ নিশ্চয়ই থাকবে। আবার দেখা যায় রোগ হলে সে রোগের ঔষধ বা উপায় নিশ্চয়ই থাকবে। উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করলে সে রোগ সেরে যায়। সে রকম দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখ নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের পথও আছে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ নিরোধের একমাত্র পথ। সে পথ দিয়ে অনার্য বা অজ্ঞানীরা চলতে

পারে না আর্য হয়ে চলতে হয়। সে পথ হল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা।

সম্যক শীল বলতে সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যাক আজীব বা জীবিকাকে বুঝায়।সমাধি বলতে সম্যক স্মৃতি,সম্যক্ব্যায়াম বা উদ্যম ও সম্যক সমাধিকে বুঝায়।প্রজ্ঞা বলতে সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্পকে বুঝায়। এ আটটির সমন্বয়ে নির্বাণ লাভ করা যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব দুঃখের অবসান ও মুক্তি লাভ করা যায়। যে মুক্ত ও বন্ধনহীন তিনি অপরকে অনায়াসে মুক্ত বা বন্ধন খুলে দিতে সমর্থ ইহাই অবিনাশী বা পরম সুখ নির্বাণ।

নহে দূরে নহে কাছে খুঁজলেই পায়।
লোভ-দ্বেষ-মোহ্ তাকে ঢাকিয়াছে গায়।।
আবরণ খুলে ফেল দেখিবে নির্বাণ।
চির শান্ত হবে তুমি রহিবে অম্লান।।

বন ভন্তে কি অর্হৎ?

মহান সাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বন ভন্তে) মহোদয় প্রায় ৪২ বৎসর যাবৎ শমথ-বিদর্শন ধ্যান সাধনা অনুশীলন করে আস্‌তেছেন। তিনি সাধনা করে আনন্দ পান বলেই তাঁর নাম সাধনানন্দ নামকরণ করা হয়েছে। প্রথম জীবনে তিনি গভীর ও নির্জন বনে কঠোর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন থাকতেন বলে লোকেরা তাঁকে বনভন্তে নামে আখ্যায়িত করেছেন।

এখন অনেক ভিক্ষু-শ্রমণ ও উপাসক-উপাসিকাদের মনে একটা প্রশ্ন জাগে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে অর্হত্ব লাভ করেছেন কিনা? আমাকেও অনেকে এরূপ প্রশ্ন করেছেন। একবার জনৈক পন্ডিত ভিক্ষু আমাকে প্রশ্ন করলেন-বন ভন্তে কি অর্হৎ? এই প্রশ্নটি করার সাথে সাথেই আমার মনে রাগ উদয় হলো কারণ প্রশ্নটি কেমন একটা হাস্যস্পদ ধরনের। আমি মনে মনে রাগ সংবরণ করে প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত হলে তিনি অন্য প্রশ্ন করেন আমার উত্তর শুনতে চান না। তাতে আমি দৃঢ় ভাবে বল্‌লাম-আপনি কি উত্তর শুনতে চান? নাকি হাসি ঠাট্টা করতে চান? দু'টার থেকে একটা বলুন। পরিশেষে তিনি বল্‌লেন-উত্তর শুনতে চাই।

প্রথমেই আমি বল্‌লাম আমার যৎ সামান্য জ্ঞান নিয়ে আপনাকে সন্তুষ্ট করতে পারবো বলে আমি আশা করিনা, যা হউক, শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সংস্পর্শে এসে যেটুকু বন ভন্তের সম্বন্ধে আমি উপলব্ধি করেছি, তা প্রকাশ করতে পারি। বনভন্তে অর্হৎ এই

কথাটি বল্‌লে ভুল হবে। আবার বন ভন্তে অর্হৎ নয়, তা বললেও ভুল হবে।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ধর্মদেশনায় বলেছেন-নিজের কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা চারি আর্য সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, পটিচ্ছ সমুপ্পাদ এবং সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম আয়ত্ব করা যায় যা আমি প্রকাশ করি তা আমার অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যক্ত করি। আমি আমার জন্ম জন্মান্তরের অনুসরণকারী অবিদ্যা ও তৃষ্ণাকে ক্ষয় করেছি এবং অংগ জীবনও ত্যাগ করে পরম সুখ অনুভব করছি। গভীর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয় সংযম ও চিত্ত সংযমই নির্বাণ গমনের একমাত্র চাবিকাঠি। তিনি আরো বলেন-আমি যেভাবে কঠোর হতে কঠোরতম ভাবনা করেছি আমার নির্দেশ অনুসরণকারীরা তা পালন করে অনায়াসে সর্ব দুঃখের অবসান ঘটাতে পারবে। নির্বাণ লাভেচ্ছু ভিক্ষু-শ্রমণ আমার. নির্দেশিত পথে চল্‌লে অচিরেই অনাগামী ও অর্হত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত এবং উপাসক-উপাসিকারা স্রোতাপত্তি ও সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হতে নিশ্চয়ই পারবে।

ধরুন, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন তাঁর বহু অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার ফলে তাঁর ছাত্র এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম ক্লাশ পেয়ে পরিচিত হন। যদি কেহ প্রশ্ন করে উক্ত শিক্ষক কি পাশ? তখন প্রশ্নটি হবে বাতুলতা মাত্র। ঠিক তেমনি শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেও উপরোল্লিখিত বাণীগুলি দেশনা করে থাকেন। তিনি প্রায়ই নির্বাণ দেশনা বা লোকোত্তর দেশনায় বিভিন্ন উপমায় প্রমাণ করে বলেন-নির্বাণ পরম সুখ। বহুক্ষণ পর্যন্ত বিবিধ যুক্তি উপমা দিয়েও উক্ত পন্ডিত ভিক্ষুকে আমি সন্তুষ্ট করতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত আমি মনে মনে ধারণা করলাম-"যারে দেখতে নারে, তার চলন বাঁকা।" কারণ তিনি বুঝেও না বুঝার ভান ধরে আছেন।

একবার জনৈক উপাসক বন ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-ভন্তে, অর্হৎ কি ভাবে চেনা যায়? বর্তমানে অর্হৎ আছে কি নেই? বন ভন্তে সংক্ষেপে বল্‌লেন-অর্হৎ চেনা মহা কঠিন ব্যাপার। মারা গেলে সহজে জানা যায়। কারণ যে কোন লোক পোড়ার পর ছাই হয়ে যায়, কিন্তু যাঁরা অর্হৎ, তাঁদেরকে পোড়ানোর পর ছাই না হয়ে একপ্রকার ধাতব পদার্থে পরিণত হয়। বুদ্ধের জীবদ্দশায় অগণিত অর্হৎ ছিলেন। বর্তমানে থাকলেও থাকতে পারে। বন ভন্তের উত্তর শুনে উক্ত উপাসক খুব সন্তুষ্ট হয়ে চলে গেলেন।

আর একবার শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে খাগড়াছড়ির জনৈক উপাসক সরাসরি জিজ্ঞাসা করেছিলেন-ভন্তে উপাসকদের মধ্যে কৌতুহলী কেহ কেহ আগ্রহ সহকারে জানতে চান, আপনি কি অর্হৎ? বন ভন্তে একটু হেসে বললেন-ধরুন, এ অনুষ্ঠানে একজন থানা ও,সি, সাধারণ বেশে এসেছেন। তাকে কেউ চিনেনা আপনারা মনে করবেন আপনাদের মত সাধারণ উপাসক। যদি কেউ চিনে থাকলে, তবে অত ঢাক-ঢোল পেটানোর প্রয়োজন কি? অথবা ও,সি'র পরিচয় দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এ ভাবে বিভিন্ন যুক্তি উপমা দ্বারা উপাসককে পরোক্ষাভাবে উত্তর প্রদান করে সন্তুষ্ট করলেন।

অতএব ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ-আপনারা

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে নিঃসন্দেহে ও গভীর ভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করুন। তাঁর নির্দেশিত গৃহীদের লক্ষ্যস্থল স্রোতপত্তি ও সকৃদাগামী ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য সচেষ্ট হউন। অচিরেই আপনাদের নিশ্চয়ই মঙ্গল ও পরম সুখ বহে আসবে আমি আশা রাখি।

স্থির শান্ত নির্বিকার যেই মহা মহাজন।
পূর্ণজ্ঞানে পাপমুক্ত হয়েছে যেজন।।
সেই জ্ঞানী নহে শুধু আপনি প্রশান্ত।
চিন্তা বাক্য কার্যতার হইয়াছে শান্ত।।

উপযুক্ত পরিবেশ

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে মহোদয়কে কোন জায়গা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানালে উপযুক্ত পরিবেশের দরকার। উপযুক্ত পরিবেশ বলতে তিনি বলেন-প্রথমে গভীর শ্রদ্ধার প্রয়োজন। মৃদু শ্রদ্ধায় আমি কোথাও যেতে পারিনা। দু হাত পানিতে ছোট নৌকা চলাফেরা করতে পারে কিন্তু লঞ্চ চলাফেরা করতে পারে না। লঞ্চ চলাফেরা করতে হলে কমপক্ষে আট হাত গভীর পানির দরকার। সেরূপ উপাসক-উপাসিকাদের গভীর শ্রদ্ধা না থাকলে আমি কোথাও যেতে পারিনা।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন-উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে ঐক্যমত বা এই ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত থাকতে হবে। কোন প্রকার দল বা নিকায় অথবা সামাজিক কোন্দলে আমি যেতে পারি না। সর্বসম্মতিক্রমে একতাবদ্ধ হয়ে আমন্ত্রণ জানালে আমি যেতে পারি।

তৃতীয়তঃ যে বিহারে অনুষ্ঠান হবে সে বিহারে রাস্তার অসুবিধা থাকলে মেরামত করে নিতে হবে। সে বিহারের পায়খানা ও প্রস্রাব ঘর ও স্নান ঘর না থাকলে, তাও ব্যবস্থা করে নিতে হবে। কারণ এগুলি ভিক্ষু সংঘের উপযুক্ত পরিবেশ। তদুপরি সে বিহারেরও স্থায়ী ব্যবস্থা হয়ে যায়।

চতুর্থতঃ আমন্ত্রণে বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নিতে হলে এরূপ প্রার্থনা করতে হয়ঃ-

পরম পূজনীয় ভন্তে, দেব মনুষ্যের হিতের জন্য, পরম সুখের জন্য এবং সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্য (অত্র বিহারে বা স্থানের) উপাসক-উপাসিকাদের পক্ষ থেকে

আমরা সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে আপনাকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

অতএব শ্রদ্ধেয় ভন্তে, অনুকম্পা পূর্ব আমাদের আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করুন। এ ভাবে তিনবার ফুল দিয়ে প্রার্থনা করতে হয়।

অনেক সময় দেখা যায় প্রার্থনা করার সাথে সাথেই তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করে থাকেন আবার অনেক সময় দেখা যায় বার বার অনুরোধ করা সত্বেও সম্মতি জ্ঞাপন করেন না। প্রার্থনাকারীর মধ্যে শ্রদ্ধা, একতা ও শৃংখলার অভাব থাকলে তিনি জ্ঞান চোখে নিরীক্ষণ করে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যায়ঃ-একদিন শাকপুরার বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ স্থবির তাঁর দায়ক অবসরপ্রাপ্ত দারোগা বাবু বিভূতি ভূষণ বড়ুয়াসহ্ দু' তিনজন দায়ক বন ভন্তেকে আমন্ত্রণের জন্য প্রার্থনা জানালেন। প্রথমে বন ভন্তে বল্লেন-ছোট শিশুর আমন্ত্রণে বৃদ্ধ সাড়া দেয়না। বিশ্লেষণ করে বলেন-তোমরা শিশু থেকে বড় হলে আমি যাব। ছোট শিশুরা ধূলাবালি নিয়ে খেলা করে। আপনারা শিশু সদৃশ। দ্বিতীয় বার অনুরোধ করার পর বন ভন্তে বল্লেন-আপনারা মন্ত্রী নিয়ে যান। মন্ত্রী নিলে অনেক টাকা লাভ হবে। তৃতীয়বার অনুরোধ করার পর বল্লেন-আর একদল আসতেছে (আর এক দাবি এর)। এই কথাটি শুধু আমি ও বাবু সত্যব্রত বড়ুয়া ছাড়া কেহ বুঝেননি। তাতে আমরা সমস্বরে হেসে উঠি। দেখা গেল কয়েক মিনিট পরে শাকপুরা গ্রামের অপর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ সহ্ কয়েকজন দায়ক আমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বিহারে উপস্থিত হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বনভন্তে কাহারো আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি। জান্তে পারলাম বয়স্করা শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে আমন্ত্রণ জানানোর পক্ষপাতী ছিলেন। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্বেও বনভন্তে তাদের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নি।

পরবর্তীতে দেখা গেল অন্য অনুষ্ঠানে শাকপুরা বিহারের বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র উদ্বোধনের সময় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাস্থিত হন।

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে অনেক সময় অনেক স্থানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও নির্ধারিত দিনে আমন্ত্রণে যাননি। তৎমধ্যে পশ্চিম বিনাজুরী ও আনন্দ বিহার উল্লেখ করা যায়। এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন-দায়কদের শ্রদ্ধার দুর্বলতায় মারের উপদ্রব হয়। যেখানে মারের উপদ্রব সেখানে কোন ফল হবেনা। সুতরাং না যাওয়াই উত্তম।

পরিবেশ গড়ে তোল প্রবল উদ্যমে
মুক্তির উন্মেষ হয় পুণ্যের মাধমে।

পঞ্চ নিমিত্ত ও দিক নির্ণয়

জনাব আবদুল কাদের পুলিশ বিভাগের গোয়েন্দা শাখায় চাকুরী করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি বন বিহারে যান। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের দেশনা শুনে খুবই আনন্দ অনুভব করেন। অবসর সময়ে আমার সঙ্গে বৌদ্ধ দর্শন ও ইসলাম দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতে তার খুব আগ্রহ।

একদিন তাঁর বড়কর্তা মাননীয় এস,পি (এডিশনাল) জনাব মকবুল হোসেন মহোদয়কে নিয়ে বন ভন্তের সান্নিধ্যে যান বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পর এস,পি মহোদয় দুটি প্রশ্নের সমাধানের পথ জানার আগ্রহের কথা প্রকাশ করলেন।

১। এস পি–আপনাদের বৌদ্ধ ধর্মে জন্মান্তরবাদ আছে, সেটা কি রকম? মানুষ মরে যাওয়ার পর কি ভাবে আর একটা প্রাণী হয়ে জন্মগ্রহণ করে? অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে জানার সুযোগ দিলে খুবই সন্তুষ্ট হব।

বন ভন্তে ঃ আপনি বোধহয় জঙ্গলে বা ঘাসের মধ্যে ছোট ছোট জোঁক নিশ্চয় দেখেছেন। জোঁকে কি করে জানেন? জোঁক এক ঘাস থেকে অন্য ঘাস আলাদ করে বা স্থান খোঁজে। অন্য ঘাসের সন্ধান পেলেই সেটাতে চলে যায়। ঠিক তেমনি মানুষও মৃত্যুর পঞ্চ নিমিত্ত দেখে থাকে। প্রাণ যাওয়ার সময় যে যে নিমিত্ত দেখে থাকে তার কর্মানুযায়ী সে ব্যক্তি সে জায়গায় জন্মগ্রহণ করে। যেমন মনুষ্য নিমিত্ত বা ছবি দেখে, তখন বুঝতে হবে সে মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করবে। কেহ সুন্দর সুন্দর ঘর, বাগান ও পরিস্কার আলো নিমিত্ত দেখে থাকে, সে স্বর্গে বা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে থাকে। কেউ আগুন বা অগ্নিকুন্ড দেখে ভীত ও চীৎকার করে, তারা নরকে গমন করে। কেহ নর কংকাল বা জীর্ণ শীর্ণ দেহের নিমিত্ত দেখে থাকে, তারা প্রেতলোকে জন্ম গ্রহণ করে, যারা নিশ্চুপভাবে পশু,পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবজন্তুর নিমিত্ত দর্শন করে থাকে, তারা তীর্ষক্ কুলে জন্মগ্রহণ করে।

জোঁক যেমন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যায়, তেমনি মানুষও তার কর্মানুযায়ী নিমিত্ত দেখে নিমিত্তের ক্ষেত্র অনুযায়ী অন্যত্র জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্যের দেহ পড়ে থাকে, চিত্ত অন্য দেহ ধারণ করে। নিমিত্তই জন্মান্তরের কারণ।

যাঁরা ধ্যান সাধনা করে নির্বাণ প্রাপ্ত হন, তাঁরা কোন প্রকার নিমিত্ত দর্শন করেন না। অবিদ্যা–তৃষ্ণা ধ্বংস হলে জন্মান্তরাদি শেষ হয়ে যায়। অর্থাৎ আর জন্ম হবেনা। যে কোন জন্মধারণ করা দুঃখজনক। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণ লাভ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত জন্মান্তরে দুঃখ ভোগ করতে হবে। বিভিন্ন দুঃখকে অতিক্রম করতে পারলে নির্বাণ লাভ করা যায়।

২। এস পিঃ আমাদের ইসলাম ধর্মের দিক নির্ণয় হল কারা মুখী। নামাজ বা ইবাদত করতে হলে কাবামুখী হতে হয় সুতরাং প্রত্যেক মসজিদই পূর্ব দরজা বিশিষ্ট। কিন্তু আপনাদের বৌদ্ধ মন্দিরের বেলা দেখা যায় অনিয়ম। যেমন আপনাদের বন বিহার পূর্ব দরাজা, মৈত্রী বিহার পশ্চিম উত্তর দরাজা বিশিষ্ট। আপনাদের ধর্মের দিক নির্ণয়ের নিয়ম কি?

বন ভন্তে ঃ শূন্যতায় দিক নির্ণয়।

এস পিঃ বুঝলাম না।

বন ভন্তে ঃ বৌদ্ধ পরিভাষায় নির্বাণ দর্শনই দিক নির্ণয়। সেটা ছয় দিকের মধ্যে কোন দিক নয়। সেই দিক হল আত্ম মুক্তির দিক নির্ণয়। যেমন দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদা বা অষ্টাঙ্গিগ মার্গ বা পথই দিক নির্ণয়। আমাদের বৌদ্ধ মতে যতক্ষণ পর্যন্ত লোভ, হিংসা, অজ্ঞানতা, অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ, আসক্তি প্রভৃতি থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত নির্বাণ দর্শন বা দিক নির্ণয় করা মহা কঠিন ব্যাপার।

উল্লেখ্য যে, চতুর্দিক দরজা বিশিষ্ট বিহার গুলি হল প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শূণ্য বা নির্বাণই সঠিক দিক নির্ণয় বা লৌকিক ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে গণ্য করা যায়। নির্বাণে অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মান বা অহংকার, মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ, আসক্তি প্রভৃতির কোন স্থান নেই বিধায় শূণ্য বলা হয়। যেমন কোন ছাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত পড়তে হয়, ঠিক তেমনি যে কোন দিক দরজা বিশিষ্ট বিহার হতে ক্রমান্বয়ে পূর্ব জন্মের সঞ্চিত পূণ্য, বুদ্ধের নির্দেশ এবং ইহজন্মের প্রচেষ্টার দ্বারা নির্বাণ লাভ করা যায়।

মাননীয় এস পি মহোদয় ও জনাব আবদুল কাদের শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সাথে আলাপ-আলোচনায় খুবই সন্তুষ্টি লাভ করেন এবং মনে শান্তি নিয়ে রাজ বন বিহার ত্যাগ করেন।

পূর্বের সঞ্চিত পূণ্য বুদ্ধের নির্দেশ।
ইহ জন্মের চেষ্টায় নির্বাণে প্রবেশ।।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিয়ম

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ১৯৭০ ইংরেজীতে দীঘিনালা লংগদুর তিনটিলায় আসেন। তথায় আসার কয়েক মাস পর তাঁকে দর্শনের জন্য যাই। সে সময় হতে মধ্যে মধ্যে ১৯৭৪ ইংরেজী পর্যন্ত তাঁর দর্শন লাভের জন্য আমি তিনটিলায় যেতাম।

১৯৭৪ ইংরেজীতে তিনি রাঙ্গামাটিতে রাজ বন বিহারে আগমন করেন। একদিন আমি বন বিহারে গেলে পর হঠাৎ আমাকে ভন্তে বল্লেন-আমি রাঙ্গামাটিতে আসার কারণ কি জান? আমি বল্লাম-ভন্তে, আমার জানা নেই। তারপর তিনি বল্লেন- রাঙ্গামাটি হল চাক্মা ও বড়ুয়াদের সীমান্তবর্তী স্থান। তিনটিলায় যাওয়া সবার পক্ষে সম্ভব নয়। রাঙ্গামাটিকে সবার উপযুক্ত স্থান হিসাবে মনোনীত করলাম।

আর একদিন বন ভন্তে আমাকে বল্লেন-আগামীকাল আমি গহিরা ধনীরাম বড়ুয়ার বাড়ীতে আমন্ত্রিত হয়েছি, তোমাকেও সঙ্গে যেতে হবে। সে হতে গহিরা রাউজান, কোটেরপার, কদলপুর, কুলকুরমাই, ডাবুয়া, পূর্ব বিনাজুরী, করল, জোয়ারা, মহামুনি, শিলক প্রভৃতি বহু স্থানে তাঁর অনুগামী হয়ে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

শিলক নিবাসী বাবু পরিমল বড়ুয়া শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে মহোদয়কে শিলক নেওয়ার আমন্ত্রণে বিফল মনোরথ হয়ে একদিন তবলছড়িস্থ হোমিও নিরাময় নিকেতনে আসেন এবং তার আশাভঙ্গের কথা বলেন। আমি তাকে নিয়ে বন বিহারে যাই এবং সবিনয়ে বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করে ভন্তের নিকট হতে আমন্ত্রণ গ্রহণের স্বীকৃতি লাভ করি।

শিলক আমন্ত্রণের খবর শুনে চট্টগ্রামের প্রকৃতি রঞ্জন চাক্মা (ম্যাজিষ্ট্রেট) মহোদয় তাঁর চট্টগ্রামের বাসায় সুত্র শুনার জন্য স্বশিষ্যে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে মহোদয়কে আমন্ত্রণ জানান। প্রকৃতি বাবু আমাদেরকেও (উপাসকবৃন্দ) বল্লেন-আপনারাও বন ভন্তের সঙ্গে ফেরার পথে আমার বাসায় আসবেন। আমরা অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধ্যায় সময় শিলক পৌঁছি। রাত্রি বেলায় বন ভন্তে আমাকে ডেকে বল্লেন-এই বিহারে আমি রাত্রি যাপন করবো না। কারণ বিহারের পাশেই গৃহীদের বাসস্থান। এই এলাকা আমার থাকার উপযুক্ত স্থান নয়, ভন্তের এই সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিহার কমিটির সাথে আলাপ করে এক মাইল দক্ষিণে বিলের মধ্যে শামিয়ানা টাঙ্গানো হয় এবং ভন্তের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করা হল। ফলে ভন্তে সেখানে অবস্থান করতে সম্মত হল।

সে ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব নুরুল হক, স্থানীয় দায়ক ও শত শত মুসলিম জনগণকে নিয়ে নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে দুই ঘন্টার মধ্যে গাড়ী যাওয়ার মত রাস্তা সংস্কারের ব্যবস্থা করে দেন। পুরানো রাস্তা সংস্কার হওয়াতে চেয়ারম্যান সাহেবকে উল্লাস করতে দেখে আমি বিমোহিত হই। তাঁর বক্তব্য ছিল-বন ভন্তের আগমনে আমার এলাকার উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিয়ম। এখন আসল কথায় আসা যাক্। সকাল বেলা বনভন্তের নিকট যাওয়ার পর ভন্তে আমাকে বল্লেন- তুমি কমিটিকে বলে দাও, আমি দুপুর একটায় চলে যাব। সুতরাং বারোটায় ধর্মসভা আরম্ভ হবে। সভয়ে আমি বললাম-ভন্তে, দুপুর দুইটায় ধর্ম সভা হবে মাইকে এরূপ ঘোষণা দেয়া হয়েছে। তিনি পুনরায় বল্লেন-যাও, আমার কথা মত ব্যবস্থা কর। ভন্তের নিকট কমিটির বিশেষ প্রার্থনা সত্ত্বেও তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টানো সম্ভব হয়নি।

ভোজনের পর ঠিক সরাসরি তিনি ধর্ম সভা মন্ডপে গিয়ে আসন গ্রহণ করেন। সে সময় অন্যান্য ভিক্ষু সংঘ ভোজন শেষে একটু বিশ্রাম করতেছিলেন। ভন্তে আসন গ্রহণ করার পর দেখতে দেখতে অনেক উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত হয়ে গেল। সাড়ে বারোটায় বন ভন্তে জনৈক উপাসককে বল্লেন-পঞ্চশীল প্রার্থনা কর। পঞ্চশীল গ্রহণ অবস্থায় ভিক্ষু সংঘ ও আশে পাশের উপাসক উপাসিকারা ধর্ম সভায় এসে আসন গ্রহণ করেন। ঠিক বিশ মিনিট দেশনা করার পর ভন্তে দেশনা বন্ধ করেন এবং বেলা একটায় আসন ছেড়ে আমাকে বল্লেন-এখন ধর্ম সভা চলুক, চল আমরা চলে যাই। যেই কথা সেই কাজ। আমরা ভন্তেকে নিয়ে ফেরার পথ ধরলাম। কর্ণফুলী নদী পার হয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে বললাম-ভন্তে, এখন আমাদের প্রকৃতি বাবুর বাসায় যাওয়ার কথা। তিনি বল্লেন-না, প্রকৃতির বাসায় যাবনা। সরাসরি রাঙ্গামাটি চলে যাব। তারপর ভন্তে সহ আমরা সকলে রাঙ্গামাটি চলে আসি।

রাঙ্গামাটিতে এসে তিনি বল্লেন-প্রকৃতি বাবুর বাসায় না যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে বিস্তারিত বলেন-যেমন ঃ

১। প্রকৃতি বাবুর বাসাটি তিন তলার নীচের তলায়। তাই তাঁর কোন পূণ্য সঞ্চয় হবে না।

২। আমি সেই বাসায় উপস্থিত হলে সেই বাসার উপরের তলায় অবস্থান রত লোকদের অজান্তে পাপ হবে।

৩। ধর্মের পরিহানি ঘটবে।

উল্লেখ্য যে, পূর্ব রাত্রিতে ভন্তে জ্ঞান চোখে কারণগুলি জেনে বেলা তিনটার পরিবর্তে বেলা একটায় শিলক ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেই ঘটনার পর থেকে কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলে পূর্ব রাত্রিতে জ্ঞান চোখে ঐ এলাকার ভাল মন্দ নিরীক্ষা করে আমন্ত্রণে যাত্রা করেন। পরবর্তীতে ঘটনার বিবরণ জেনে প্রকৃতি বাবু ভন্তেকে তাঁর রাঙ্গামাটির বাসায় আমন্ত্রণ করে এনে সূত্র শ্রবণ করেন। ইহাই হল অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনিয়ম।

শত্রুর জন্য মঙ্গল কামনা

একদিন আমার জনৈক আত্মীয় আগ্রান্বিত হয়ে বল্লেন-আপনি শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের বাণীগুলি লিপিবদ্ধ করেন। একটা চমৎকার বিষয় সম্বন্ধে আপনি জানেন কিনা? উত্তরে

আমি বল্লাম-কোন সময়ে বন বিহারে গেলে বন ভন্তের মুখ নিঃসৃত বাণী গুলি আমার সামর্থ্য অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করে থাকি। প্রত্যেক বিষয় সম্বন্ধে জানা বা লেখা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি বল্লেন-ব্যাঙ্কের জনৈক কেরানী ম্যানেজারকে হত্যা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কিন্তু বন ভন্তের সংস্পর্শে এসে বিরাট ঘটনা থেকে বিরত হয়ে তাদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপন হয়।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ- তাঁরা আগ্রাবাদে একই ব্যাঙ্কে চাকুরী করেন। ম্যানেজারের বাড়ী হাটহাজারী ও কেরানীর বাড়ী গহিরা তাঁদের মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব সুলভ ব্যবহার চল্‌ত। কালক্রমে ফাটল ধরে। অফিসিয়েল কারণে একদিন ম্যানেজার তাঁর উক্ত কেরানীকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। এতে উক্ত কেরানী ম্যানেজারের প্রতি ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকেন। পুঞ্জিভূত ক্রোধ নিয়ে কেরানী শেষ পর্যন্ত ম্যানাজারকে হত্যা করার সংকল্প নেন।

হঠাৎ একদিন অন্য এক বন্ধুকে নানা দুঃখের কথা বল্‌তে গিয়ে কেরানী ম্যানেজারকে হত্যার সংকল্পের কথা প্রকাশ করে ফেলেন। সেই ভদ্রলোক হলেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একনিষ্ঠ উপাসক। তিনি বিভিন্ন ভাবে শান্তনা দিয়ে বলেন-আমি তোমার সমস্যার সমাধান দিতে পারি কিন্তু আমার নির্দেশমত কাজ করতে হবে। কেরানী বললেন-কি করতে হবে বলেন দেখি? যদি আমার উপকার হয় করবনা কেন? তারপর তিনি বল্লেন-রাংগামাটিতে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের নাম কোনদিন শুনছেন? তিনি বল্লেন-হ্যাঁ শুনেছি। তাহলে তাঁর নিকট গিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসেন, যেন আপনার সমস্যার সমাধান হয়।

কেরানী, বন্ধুর নির্দেশ মতে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সমীপে উপস্থিত হয়ে সমস্যার সমাধানের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। কথা প্রসঙ্গে আরো বলেন-সব দোষ ম্যানেজারের, আমার কোন দোষ নেই। তারপর বন ভন্তে উপদেশ দিয়ে বলেন-সংসারে অপরের দোষ দেখা খুব সহজ কিন্তু নিজের দোষ দেখা মহাকঠিন ব্যাপার। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা প্রথমে নিজের দোষ পর্যবেক্ষণ করে নিজকে পরিশুদ্ধ করেন। আপনি ম্যানাজারের প্রতি মৈত্রী ভাব পোষণ করে তাঁর জন্য মঙ্গল কামনা করুন, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে। বন ভন্তের উপদেশ শুনে কেরানী বলে উঠলেন-না, পারবনা। সে আমার বড় শত্রু। শত্রুর জন্য মঙ্গল কামনা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে। বন ভন্তে পুনরায় বলেন-মৈত্রী ভাব এভাবে করতে হয়, আমি শত্রুহীন হই, মানসিক দুঃখহীন হই, কায়িক বাচনিক দুঃখহীন হই, বিবিধ উপদ্রবহীন হই এবং নিজকে সুখে রক্ষা করি। সেরকম আমার মত সকলে সুখে থাকুক, এমনকি শত্রুর প্রতিও এভাবে মঙ্গল কামনা করতে হয় এটাই তোমার রক্ষা কবচ। কেরানী বনভন্তের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে তার বন্ধুকে জানাল। বন্ধুত কেরানীকে পুনঃবার বন ভন্তের নিকট তাগিদা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

পুনঃবার কেরানীকে দেখে বন ভন্তে বল্লেন-ম্যানেজারের জন্যে মঙ্গল কামনা করেছ কি? কেরানী নিরুত্তর থেকে একটু হাসলেন। বন ভন্তে সেদিন বিস্তারিত কোন উপদেশ না দিয়ে শুধু বললেন-যাও তাঁর জন্যে মঙ্গল কামনা কর। তার বন্ধু ভন্তের নির্দেশ জানতে পেরে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

পরিশেষে ম্যানজারের জন্যে মঙ্গল কামনা করে একদিন ব্যাংকের কেন্টিনে চা পান করে বসে আছেন এমন সময় ম্যানাজার সাহেব দুই তিনজন লোক নিয়ে কেন্টিনে উপস্থিত হলেন। কেরানীকেও চা আপ্যায়ন করে বললেন-তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? আমি তোমাকে মনে মনে খোঁজ করেছি অফিসে এস, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন-আমি তোমাকে ভালবাসি বলে তোমার উপর আমার অনেক অধিকার আছে তাই বলে আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা করা তোমার পক্ষে উচিৎ ছিল না। যাক, আগামীকাল তুমি কাজে পুনঃ যোগদান কর। কেরানী হতবাক হয়ে শুধু শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের কথা স্মরণ করতে করতে ম্যানেজারের দিকে চেয়ে আছে।

আত্মবৎ জ্ঞান সবে অন্যথায় নয়।
ইহলোক পরলোক হবে সুখ ময়।।

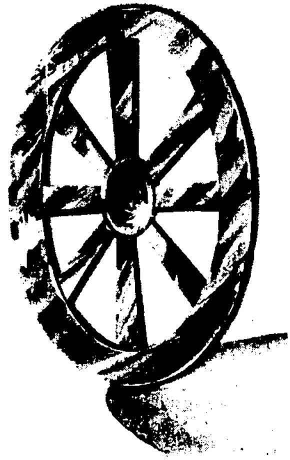

জ্ঞান চক্ষু

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের জনৈক বিশিষ্ট উপাসক এক প্রশ্নের সমাধানের জন্য বন বিহার উপস্থিত হয়েছেন। শ্রদ্ধা জ্ঞাপনান্তে তিনি বল্লেন-ভন্তে, স্বর্গ-নরক আছে কি নেই? অনুগ্রহ্ পূর্বক আমাকে বুঝিয়ে বল্‌লে খুবই সন্তুষ্ট হব। বন ভন্তে বল্‌লেন-তুমি কি জ্ঞান-চক্ষুতে দেখতে চাও, না শুধু চর্ম চক্ষুতে দেখতে চাও? স্বর্গ-নরক আছে। যদি তুমি জ্ঞান চক্ষুতে দেখতে চাও, তবে জ্ঞান চক্ষু উৎপন্ন কর। নিজে নিজেই দেখতে পাবে।

চক্ষু পাঁচ প্রকার। ১। চর্ম চক্ষু ২। দিব্য চক্ষু ৩। জ্ঞান চক্ষু ৪। সামন্ত চক্ষু ৫। বুদ্ধ চক্ষু।

১। চর্ম চক্ষুতে এক যোজন (ছয় মাইল) দেখা যায়।

২। দিব্য চক্ষুতে তিনশত যোজন দেখা যায়।

৩। জ্ঞান চক্ষুতে যেখানে দেখতে হয়, সেখানে দেখা যায়। স্বর্গ নরক এমন কি একত্রিশ লোক ভূমি পর্যন্ত দেখা যায়।

৪। সামন্ত চক্ষুতে সম্যক সম্বুদ্ধের ধ্যান-চিত্ত সম্বন্ধে জানা যায়। যেমন অনুরুদ্ধ স্থবির সামন্ত চক্ষু বিশিষ্ট ছিলেন।

৫। বুদ্ধ চক্ষুতে দশ সহস্র চক্রবাল (একত্রিশ লোক ভূমিতে এক চক্র বাল) সম্বন্ধে পুঙ্খনুপুঙ্খরূপে অবগত হওয়া যায়।

সুতরাং তোমার জ্ঞান চক্ষু উৎপন্ন করার প্রয়োজন। জ্ঞান-চক্ষুতে অবিদ্যা-তৃষ্ণা ধ্বংস হয় এবং যাবতীয় দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে উক্ত বিশিষ্ট উপাসক অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে চলে যান।

উল্লেখ্য যে-শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে একদিন আমাকেও বলেছিলেন-চোখখোলা অবস্থায় তেমন কিছু দেখা যায় না। বরঞ্চ চোখ বন্ধ অবস্থায় সবকিছু দেখা যায়। তাতে বুঝলাম, জ্ঞান চক্ষুর দৃষ্টি শক্তির পরিধি ব্যক্ত করা মহা কঠিন ব্যাপর।

জ্ঞান চক্ষু সৃষ্টি কর যদি চাও মুক্তি।
একাগ্র চিত্তে কর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, ভক্তি।।

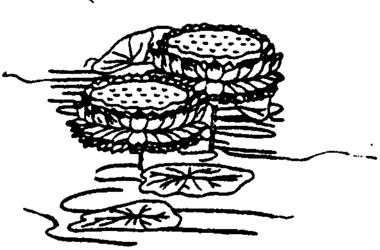

ওলট—পালট

আমার সুপরিচিত জনৈক ভিক্ষু বন বিহারে এসে বন্দনাদি করার পর দেশনালয়ে বসে আছেন। আলাপ আলোচনায় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে বল্‌লেন তুমি, ভিক্ষু হয়েছ কত বৎসর? উত্তরে তিনি বল্‌লেন–চার বৎসর। টেবিলের উপর কালী দেখিয়ে বল্‌লেন–এ'টা কি কালী?

ভিক্ষু ঃ জেম কালী।

বন ভন্তে ঃ কোন দেশীয়?

ভিক্ষু ঃ বাংলাদেশীয়।

বন ভন্তে ঃ এটা কি কালী ?

ভিক্ষু ঃ হিরো কালী।

বন ভন্তে ঃ কোন দেশীয় ?

ভিক্ষু ঃ চীন দেশীয়।

বন ভন্তে ঃ আচ্ছা, বল দেখি এ হিরো কালী অন্য জায়গায় ঢেলে জেম কালী রাখা যায় কিনা?

ভিক্ষু ঃ হ্যা ভন্তে, রাখা যায়।

বন ভন্তে ঃ তা' হলে কেউ বুঝতে পারবে?

ভিক্ষু ঃ বাহির থেকে কেউ বুঝতে পারবেনা লিখলে বুঝতে পারবে।

বন ভন্তে ঃ ঠিক তেমনি, কালীর প্যাকেট হল রংবস্ত্র ও মুণ্ডিতমস্তক এবং চিত্ত হল কালী। হিরো–কালীর প্যাকেট জেম কালী ওলট–পালট করিও না। আচরণেই প্রকৃত ভিক্ষু ও ছন্দবেশী ভিক্ষুর পরিচয় জানা যায়।

অন্য প্রসঙ্গে বন ভন্তে বলেন–আজকাল রংবস্ত্র ও মস্তক মুণ্ডিত করে কেন জান?

১। গরীব লোকের ছেলে ভিক্ষু হয়ে লেখা পড়া করার জন্য।

২। লেখা পড়া শিখে চাকুরী করার জন্য।

৩। বিভিন্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজ করার জন্য।

৪। বড় বড় বক্তৃতা দেয়ার জন্য।

৫। পালি ও ত্রিপিটক বিশারদ হওয়ার জন্য।

৬। টাকা পয়সা জমা করার জন্য।

৭। ছদ্মবেশে বিভিন্ন পাপ কার্য করার জন্য।

৮। ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য।

উল্লেখিত ভিক্ষুরা কোনদিন মুক্তির পথ পায়না তারা হীন ও অধম। আর যাঁরা মুক্তিকামী তাঁরা অবিদ্যা–তৃষ্ণা ধ্বংস করে নির্বাণ সাক্ষাৎ করার জন্য সচেষ্ট থাকেন। তাঁরাই প্রকৃত ভিক্ষু। আকজাল নির্বাণ লাভের উদ্দেশ্যে খুব কম ব্যক্তিই ভিক্ষু হয়ে থাকেন।

শীলহীন ছদ্মবেশে ভিক্ষু হয়ে চলে।
পরকালে জ্বলে মরে নরক অনলে।।
কাম রূপারূপ ত্যাগী হয় বৌদ্ধ ভিক্ষু।
লভিবে নির্বাণ সুখ আর জ্ঞান চক্ষু।।

অপ্রিয় সত্য

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের অনেক সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অথবা দেশনা প্রসঙ্গে বিনয় লংঘনকারী ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে অপ্রিয় সত্য ভাষণ দিয়ে থাকেন। কালক্রমে দেখা যায় সেই ভিক্ষুরা বন ভন্তের বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনায় লিপ্ত হয়ে জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেন।

একদিন আমি বনভন্তের সমালোচনাকারী জনৈক ভিক্ষুর কথা ভন্তের নিকট উথাপন করি। উত্তরে তিনি বলেন–সত্য বলতে দুর্বলতা কিসের? সত্য একদিন না একদিন ভেসে উঠবে। চন্দ্র–সূর্যকে মেঘে কতক্ষণ ঢেকে রাখতে পারে? তিনি গম্ভীর ভাবে ভবিষ্যৎ বাণী করে বলেন–শৃগাল সিংহ কোনদিন দেখেনি। ভুল করে আস্ফালন করতেছে। চিনতে পারলে চলে যাবে। ঠিকই দেখা গেল কয়েকমাস পর সেই ভিক্ষু (চিরতরে) অন্যত্র চলে গেলেন।

একবার এক জনাকীর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিনয় লংঘনকারী ভিক্ষুদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন–কেহ কেহ মনে করেন বন ভন্তে খুব রাগী ও ভিক্ষু বিদ্বেষী। যদি কেহ তা' মনে করেন, সেটা হবে মহাভুল। তিনি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন–কর্মকারেরা কি করে দেখেছেন? তারা জ্বলন্ত লোহাকে সজোরে আঘাত করে দা, কাস্তে প্রভৃতি তৈয়ার করে। কর্মকারের বেলায় দেখা যায় লোহার প্রতি তার কোন রাগ বা বিদ্বেষ নেই। সে রকম আমারও ভিক্ষুদের প্রতি কোন প্রকার রাগ বা বিদ্বেষ নেই। শুধু পাপ থেকে বিরত হওয়ার এবং বিনীত হয়ে নির্বাণের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য আমি উপদেশ দিয়ে থাকি।

আর একবার বন ভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে বলেন–বহুদিন পর্যন্ত জ্বর ভোগ করার পর রোগী রোগ মুক্ত হয়ে আহারে সবকিছু তিতা মনে করে। এমন কি মিষ্টিও তিতা লাগে। খাদ্য দ্রব্য তিতা নয়। জ্বর ভোগের কারণে এরকম হয়ে থাকে। সে রকম আমার সত্য ভাষণেও কিছু সংখ্যক লোক ভীষণ খারাপ অনুভব করে। আর যারা স্বাভাবিক অর্থাৎ শীলবান তাদের কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া হয়না।

আর একদিন জনৈক পাপাচার ভিক্ষু (জয়পাল) সম্বন্ধে মন্তব্য করে ভন্তে বলেন–সেছিল বিরাট কায়া বিশিষ্ট অজগর সাপ। তিনি বিশ্লেষণ করে বলেন–অজগর সাপ হরিণ কিভাবে ধরে জান? প্রথমে তার লেজ দ্বারা আমলকি গুলি জড়ো করে। দ্বিতীয়তঃ জংগল হতে মুখে পাতা সংগ্রহ করে আমলকির স্তুপ পর্যন্ত সারিবদ্ধভাবে পাতা সাজিয়ে রাখে তৃতীয়তঃ জঙ্গল হতে পাতার ভিতর দিয়ে আমলকির স্তুপ পর্যন্ত এসে ওত পেতে থাকে। যখনই হরিণ আমলকি খাওয়া আরম্ভ করে তখনই হঠাৎ হরিণটিকে গিলে ফেলে। সে রকম উক্ত ভিক্ষু হল সেই অজগর, তার রং বস্ত্র হল পাতা, যুবতী নারী হল হরিণ, বিহার হল আমলকি গাছ এবং বিভিন্ন পুণ্যানুষ্ঠান হল সেই আমলকি। বন ভন্তে অজগরের কীর্ত্তি কাণ্ডের কথা বলার সাথে সাথে উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে হাসির শোরগোল পড়ে যায়। তারপর শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে সিংহ চর্মজাতক দেশনা করে বলেন–পাপাচার ভিক্ষুরাই যতসব ধর্মের পরিহানি ঘটায়। তারা অতীব হীন অধম ও মূর্খ হিসাবে গণ্য হয়।

আর একদিন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে বলেন–উপাসক-উপাসিকারা ফান্টা, কোকাকোলা পানিয় হিসাবে দান করে। কিন্তু বোতল কেহ দান করে না। বোতল কোম্পানীর নিকট ফেরৎ দিয়ে দেয়। আমরাও পানীয়রূপে গ্রহণ করে থাকি। কিন্তু অনেক পাপাচার ভিক্ষু বোতলের প্রতি লোভ বা আসক্ত হয়ে আত্মসাৎ করে। তিনি বিশ্লেষণ করে বলেন–ফান্টা-কোকাকোলা হল যাবতীয় দানীয় সামগ্রী এবং বোতল হল সেই যুবতী নারী। পাপাচার ভিক্ষুরা যুবতী নারীর প্রতি আসক্ত হয়ে নানাবিধ দুঃখ এবং সমস্যার সৃষ্টি করে।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে উপলক্ষ্য করে প্রায়শঃ বলে থাকেন–তোমরা বনের বাঘকে ভয় করিও না যুবতী নারীকে ভয় করিবে, কারণ বনের বাঘ তোমাদের রক্ত মাংস খাবে আর যুবতী নারী খাবে তোমাদের জ্ঞান ও পূণ্য।

সুতরাং তোমরা নির্বাণের দিকে লক্ষ্য রেখে ধ্যান-সাধনা করে মুক্তি লাভ কর, ইহাই আমার অনুশাষন। আর একদিন ভিক্ষুদের প্রতি লক্ষ্য করে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে বলেন–ভিক্ষুদের মধ্যে কেউ কেউ আমি কোন নিকায় বা দলে অথবা কোন ভিক্ষু সমিতিতে আছি তা' জানার চেষ্টা করেন। উত্তরে আমি বলবো–আমি কোন নিকায়ে বা সমিতিতে নেই বল্‌লেও ভুল হবে। বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন–কোথাও আছি বল্‌লে ভব তৃষ্ণা হয়। অন্যদিকে কোথাও নেই বল্‌লে দেখা যায় আমি আপনাদের মধ্যে বিদ্যমান আছি। ভিক্ষু সংঘ দুই প্রকার। যথাঃ সম্পত্তি সংঘ ও পরমার্থিক সংঘ। আমি পরমার্থিক সংঘেই আছি।

পরিশেষে ভিক্ষু সংঘের প্রতি উপদেশ দিয়ে বনবন্তে বলেন–যদি কেহ কাম লোক, রূপ লোক, অরূপলোক, নিকায়ে বা সমিতিতে বিদ্যমান আছে বল্‌লে তাঁর মুক্তির পথ সুগম হবেনা। তা' হলে কিভাবে থাকতে হবে জানেন? কাদায় উৎপন্ন পদ্ম নাল কাদয় লিপ্ত না হয়ে যেভাবে থাকে সেভাবে কোন প্রকার নিকায় এর বা সমিতির কাদা না

লাগিয়ে থাকতে হবে।

তিনি আরো উপদেশ দিয়ে বলেন-বাতাসের কোথাও আশ্রয় আছে কি? আপনারা বোধ হয় জানেন-নেই। ঠিক বাতাস যেভাবে থাকে সেভাবে অপ্রমত্ত হয়ে নির্বাণ সাক্ষাৎ করুন। ইহাই আমার মূল উপদেশ।

যেখানে থেকে যাত্রা আবার সেখানে

রাজ বন বিহার প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনেক ভিক্ষু-শ্রমণ বন ভন্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। কেহ কেহ দশ পনের দিন, কেহ কেহ দুই তিন মাস পর্যন্ত প্রবজ্যা ধর্ম পালন করে চলে যান। অনেক সময় দেখা যায় তিন চার বৎসর পর্যন্ত স্থায়ীত্বের পর গৃহী ধর্মে ফিরে যান।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের অনুশাসন হল এই-যে যতটুকু লেখাপড়া করেছে, তা যথেষ্ট। ভবিষ্যতে স্কুল কলেজে পড়বে না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্য ভাল থাকলে চলবে। দিনে একবার মাত্র বা বেলা এগারটায় অল্পাহারে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। আমি কি খাব, কোথায় পাব ও আমার বিছানা কোথায় এ রকম বলতে বা চিন্তা করতে পারবেনা। নতুন শ্রমণের ছোট খাট কাজ ও রাত দশটা থেকে রাত তিনটা পর্যন্ত পালাক্রমে বিহার এলাকা পাহাড়া দিতে হবে। টাকা পয়সা স্পর্শ করতে পারবেনা। বিনা অনুমতিতে বিহার এলাকা থেকে অন্যত্র যেতে পারবেনা। শুধু রাত এগারটা হতে রাত তিনটা পর্যন্ত ঘুমাতে হবে। শীল ভঙ্গ অথবা বন বিহারের নিয়ম লংঘন করলে তাৎক্ষণিক ভাবে চলে যেতে হবে। প্রত্যেক শ্রমণ ভিক্ষুদের শমথ-বিদর্শন ভাবনা অনুশীলন করতে হবে।

উল্লেখিত নিয়মগুলি হল শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের নির্দেশ নামার অর্ন্তভুক্ত। এখন আসল কথায় আসা যাক। বন বিহারে যেহারে স্রোতের মত ভিক্ষু-শ্রমণ প্রব্রজ্যা-উপসম্পাদা লাভ করেন, আবার প্রায় সেহারেই চলে যান। অর্থাৎ যেখানে থেকে যাত্রা আবার সেখানে ফিরে যান। প্রত্যেকের একটা জিজ্ঞাসা? কারণ কি? আমার দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত কারণগুলি পরিলক্ষিত হয় ঃ-

১। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য অথবা ভাল ভাল খাদ্যের অভাবে চলে যায়। এদিকে বন ভন্তের নির্দেশ হল-তোমার সামনে যা আসে, পেট ভর্তির পরিবর্তে অল্পাহারে সন্তুষ্ট থাকতে হবে।

২। স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করার জন্য চলে যায়। এদিকে বন ভন্তের নির্দেশ হল-তোমার লেখাপড়া যা আছে তা নিয়ে উদ্যম সহকারে নির্বাণ সাক্ষাৎ কর।

৩। বদ্ধজীবন সহ্য হয় না। অন্যান্য ভিক্ষু শ্রমণদের মত ঘুরাফেরা করতে পারেনা

বলে চলে যায়। এদিকে বন ভন্তের নিদের্শ হল-ভিক্ষু-শ্রমণদের শমথ-বিদর্শণ ভাবনায় রত থাকতে হবে।

৪। পর্যাপ্ত পরিমাণ ঘুমের অভাবে চলে যায়। এ বিষয়ে ভন্তের নিদের্শ হল-তিন চার ঘন্টার অধিক ঘুমাতে পারবেনা।

৫। গৃহীজীবনের মোহে চলে যায়। এ ব্যাপারে বন ভন্তের নির্দেশ হল-গৃহীজীবন দুঃখজনক। মুক্তির পথ সহজে পায় না।

৬। সদ্ধর্মের আস্বাদ না পেয়ে চলে যায়। ধর্মের আস্বাদ সম্বন্ধে বনভন্তের নির্দেশ হল-তুমি চেষ্টা কর। যদি তোমার পূর্বজন্মের পারমী থাকে, বুদ্ধের নির্দেশ ও ইহজন্মের প্রচেষ্টার দ্বারা একদিন না একদিন আস্বাদ পাবেই।

৭। অন্যান্য ভিক্ষু শ্রমণ অথবা অভিভাবকের প্ররোচনায় চলে যায়। এসম্বন্ধে বন ভন্তের নির্দেশ হল-এক পথ, এক মত। এক পথ হল আর্য অষ্টাঙ্গিক পথ ও একমত হল নির্বাণই গন্তব্য স্থল।

৮। হুজুকে এসে হুজুকে চলে যায়। এ বিষয়টির উপর বন ভন্তের নির্দেশ হল-মন চঞ্চল করবেনা।

৯। নিরাপত্তার জন্য কিছুদিন থেকে চলে যায়। এ বিষয়ে বন ভন্তের নির্দেশ হল-নির্বাণই তোমার সম্পূর্ণ নিরাপত্তা।

১০। ভিক্ষু-শ্রমণদের মধ্যে কোন্দল হলে চলে যায়। এব্যাপারে বন ভন্তের নির্দেশ হল-মৈত্রী পরায়ণ হও।

আপাততঃ দৃষ্টিতে দেখা যায় উপরোল্লিখিত দশটি কারণে রাজ বন বিহার হতে ভিক্ষু শ্রমণেরা রংবস্ত্র ছেড়ে চলে যায়।

একবার জনৈক বড়ুয়া শ্রমণকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম-আপনি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছেন, চলে যাচ্ছেন কেন? তিনি বল্‌লেন-ভিক্ষু শ্রমণদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে বড়ুয়া বলে হিংসা করে আবার অন্যদিকে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আমাকে প্রশংসা করলে তারা হিংসায় জ্বলে যায়। আমি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বল্‌লাম-যে যা বলুক, যে যা' মনে করুক, আপনি ঠিক থাকুন, বন ভন্তের দিকে চেয়ে থাকুন। বন ভন্তে সব সময় জাতীবাদ উচ্ছেদ করার জন্য বারবার জোর দিয়ে থাকেন। ভাবনাকারীদের মধ্যে প্রথমে মৈত্রী ভাবনা নিতান্তই দরকার। আপনি বন ভন্তের নির্দেশেই চলুন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তাঁর পারমী না থাকাতে চলে যেতে বাধ্য হন।

শ্রমণকে উপমা দিয়ে বল্‌লাম-একবার শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন-আপনি কি চাকমা? উত্তরে বল্‌লেন-না, আবার বল্‌লেন-তবে কি? বন ভন্তে বল্‌লেন-আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমি চাক্‌মা হলে চাক্‌মার আচরণ থাকতো, বড়ুয়া হলে বড়ুয়ার আচরণ থাকতো। আমি ভগবান বুদ্ধের শিষ্য। বুদ্ধের শিষ্যের আচরণ করি সুতরাং আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু।

আর একবার জনৈক চাক্‌মা শ্রমণ চলে যাওয়ার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। যাওয়ার সময় বল্‌ল অত গরম জলে মাছ থাকতে পারে না। বন ভন্তে খুব গরম এবং বন ভন্তের শিষ্যরাও গরম। তা শুনে বন ভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ নন্দপাল ভন্তে বল্‌লেন–তুমি যা বল্‌ তা অতিশয় সত্য। গরম জলে মাছ থাকতে পারে না। ঠাণ্ডা জলে থাকতে পারে। তুমি ঠাণ্ডায় চলে যাও। এই সংলাপগুলি শুনে আমি খুব হাসাহাসি করলাম।

আরো কয়েকজন ভিক্ষু শ্রমণ বন বিহার ত্যাগ করার কারণ আমার স্মৃতিপটে আঁকা আছে। কিন্তু লেখনির কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে আপাততঃ স্থগিত রাখলাম। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে তাঁর শিষ্যদেরকে উপমায় উপদেশ দিয়ে বল্‌লেন–আমার উপদেশ হল একটা বড় কোচ গাড়ী সদৃশ। আমি হলাম সুদক্ষ চালক, তোমরা আমার গাড়ীতে বস। আমি তোমাদেরকে চট্টগ্রাম নিয়ে যাব, কিন্তু উপযুক্ত ভাড়া দিতে হবে। ভাড়া হল শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা ও প্রজ্ঞা। যখন আমি আমার গাড়ী নিয়ে চট্টগ্রাম রওনা হই, তখন দেখা যায় গাড়ীতে তিলধারণ করার স্থান থাকে না তার অর্থ হল, যাত্রীর আধিক্য। কালক্রমে দেখা যায় ভেড়্‌ভেড়ী পৌঁছলে অর্ধেক নেমে যায়, মানিকছড়ি গেলে কিছু সংখ্যক নেমে যায়, ঘাঘড়া গেলে আরও কিছু নেমে পড়ে, রাণীর হাট গেলে আরও যাত্রী নেমে প্রায় খালি অবস্থায় থাকে। গুটি কয়েকজন যাত্রী নিয়ে আমার পরিশ্রম সার্থক হয় না এবং উদ্যমও থাকেনা। সত্যের পথ আঁকড়ে থাকার জন্য শিষ্যদেরকে লক্ষ্য করে বন ভন্তে নিজেই গান রচনা করেছেন। এ গান সুর দিয়েছেন বাবু রন্‌জিত দেওয়ান।

ছি ! ছি! ছি!
করিস কি তুই
পাগলা ছেলে, পাগলা ছেলে।
সাত রাজার ধন হাতে পেয়ে
অতল জলে দিসনে ফেলে।
এই ভুলে তোর দুকুল যাবে
আপন বুঝে চল।।
কেঁদে কেঁদে তুই কুল পাবিনে
বইবে চোখের জল।
দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে
সুখের বোঝা দিসনে পায়ে ঠেলে।

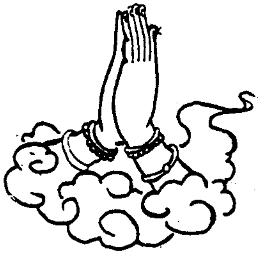

খোঁড়ার গিরি লংঘন

"খোড়ার গিরি লংঘন" কথাটি প্রবাদ বাক্য বলা হয়। কেননা যে খোঁড়া বা আঁতুর সে কোনদিন পাহাড় পর্বত অতিক্রম করতে পারেনা। এমন কি শক্ত-সমর্থ লোকও গিরি বা পাহাড় পর্বত অতিক্রম করতে সাহস পায়না।

এ উক্তিটি শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে জনৈকা উপাসিকার উদ্দেশ্যেই করেছিলেন। উক্ত উপাসিকা বলেছিলেন-আমার যদি লক্ষ লক্ষ টাকা থাকতো আমি বন বিহারের উন্নতি কল্পে ব্যয় করতাম। বন ভন্তে বল্লেন-ঠিক কথা, তোমার মত খোঁড়ারাও বলে-আমার যদি পা স্বাভাবিক থাকতো, আমি পর্বত বা গিরি লংঘন করতাম।

ইহার অর্থ হল, যে ইহ জন্মে খোঁড়া সে পূর্ব জন্মে অকুশল কর্ম বা পাপ কর্মের ফলে খোঁড়া হয়েছে, আর যে, ভাল, ধরতে হবে সে পূর্ব জন্মে পূণ্যকর্ম করে স্বাভাবিক হয়েছে।

অন্যদিকে দেখা যায় কেহ্ কেহ্ ধনাঢ্য বা সম্পদশালী। তারা পূর্ব জন্মে দান, শীলাদি পালন করে সম্পদশালী হয়েছে। ইহাও সুকর্মের ফল। অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায় কেহ কেহ্ পুণ্য কর্ম করে, আর কেহ্ পূণ্য কর্ম করেনা। যারা পূণ্য কর্ম করে তারা ভবিষ্যত জন্মের জন্য সম্পদ গচ্ছিত রাখে, আর যারা পূণ্য কর্ম করেনা তারা পূর্বজন্মের ফল ভোগ করে এবং ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ গচ্ছিত রাখেনা।

মহৎ পূণ্যকর্ম করতে হলে দুটি জিনিষের দরকার। তা হল, পূর্বজন্মের জমাকৃত সম্পদ ও ইহ্ জন্মের স'দিচ্ছা। এখন কথা হচ্ছে যে, কারো সদিচ্ছা আছে, কিন্তু সম্পদ নেই। এখানেই সে ব্যক্তি এক প্রকার খোঁড়া বিশেষ। যদি কারো পূণ্যকর্ম করতে ইচ্ছা থাকে তবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী পূণ্যকর্ম করে যাওয়া উচিৎ। পরবর্ত্তীতে ঐ ব্যক্তি অফুরন্ত পূণ্যের ফল ভোগ করতে পারবে। দান করাও একপ্রকার বাঁধা। কেননা দান করলে দানের ফল ভোগ করতে হবে। ভোগ করাও দুঃখজনক। ত্যাগই পরম সুখ। ত্যাগ করা মহাকঠিন। ত্যাগ বলতে লোভ, হিংসা অজ্ঞানতা, মিথ্যাদৃষ্টি, মান, সন্দেহ, শীলব্রত পরামার্শ প্রভৃতিকে বুঝায়। যতদিন পর্যন্ত অবিধ্যা-তৃষ্ণা বিদ্যমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত আসল সুখ কি তা' বুঝা কঠিন।

আর একদিন শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আর একজন উপাসিকার উদ্দেশ্যেই একই উক্তি করেছিলেন। উপাসিকা বলেছিলেন-ভিক্ষু-শ্রমণ বন বিহার থেকে রংবস্ত্র ছেড়ে চলে গেলে আমার বড়ই দুঃখ লাগে। আমি যদি পুরুষ হতাম সারাজীবন বন ভন্তের নির্দেশ অনুযায়ী চলতাম।

বন ভন্তে উদাহরণ স্বরূপ বল্লেন-কোন লোক ব্যবসা করতে হলে প্রথমে তার সঞ্চিত টাকার প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ তার অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ তার কঠোর

কর্ম প্রচেষ্টার দরকার। এ তিনটার সমন্বয়ে সে তার ব্যবসায় উন্নতি করতে পারবে। ঠিক তেমনি ভিক্ষু-শ্রমণের বেলায়ও তাই। যেমন পূর্বজন্মের অফুরন্ত পূণ্য পারমী, ইহ্ জন্মের অক্লান্ত অধ্যবসায় বা প্রচেষ্টা এবং ভগবান বুদ্ধের আবিস্কৃত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথে চললে ভিক্ষু-শ্রমণ সফলকাম হতে পারে। উক্ত উপাসিকা বন ভন্তের ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে, বন বিহার থেকে ভিক্ষু-শ্রমণ রং রস্ত্র ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণ অনুধাবন করে দ্বিধা মুক্ত হন।

ভূতের কাণ্ড

রাজ বন বিহারের বিভিন্ন মালামাল সংরক্ষণের স্বার্থে নব দীক্ষিত শ্রমণদের পালাক্রমে বিহার পাহাড়া দিতে হয়। কারণ মধ্যে মধ্যে চোরের উপদ্রব দেখা দেয়।

রাত একটায় তিনজন শ্রমণ হাটতে হাটতে গেইটের দিকে যাচ্ছিলেন। এমন সময় সামনের দিক থেকে দুইজন লোক আসতে দেখে তাঁরা উল্টা দিকে প্রস্থান শুরু করেন। লোকদ্বয় হঠাৎ দৌড়ে এসে একজন শ্রমণকে হাত ধরে টানাটানি করতে থাকে। অন্য দুইজন শ্রমণ তাঁকে রক্ষা করতে পারলেন না। প্রায় ত্রিশ হাত টেনে নেয়ার পর হঠাৎ অপহৃত শ্রমণ সহ্ লোকদ্বয় অদৃশ্য হয়ে যায়। তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে ঘটনার কথা জানালেন-বন ভন্তে বল্লেন-যাও তোমরা গিয়ে বিশ্রাম কর। সারারাত তাদের ঘুম হয়নি। প্রতিদিনের নিয়ম অনুসারে ভোর চারটায় মাইকে সূত্রপাঠ করার পর ভূতে নেওয়া শ্রমণ এসে বন ভন্তেকে বন্দনা করতে দেখা গেল।

এ ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পর বন বিহারের সাবেক সহ-সভাপতি পরলোক গত বাবু জ্যোর্তিময় চাক্মা মহোদয় শ্রমণকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। শ্রমণ বিবরণ দিয়ে বলেন-যখন আমাকে ধরে ফেলে তখন আমরা তিনজনে তাদের সঙ্গে শক্তি প্রয়োগ করেও হেরে যাই। তারপর আমি বেহুস অবস্থায় কোথায় ছিলাম তা' জানিনা। হঠাৎ যখন আমার হুস আসে তখন বুঝতে পারলাম আমি একটা ঘরে বসে আছি। সামনে একজন বৃদ্ধলোক দা হাতে নিয়ে বসে আছে। বৃদ্ধ আমাকে অভয় দিয়ে বল্ল-শ্রমণ, তুমি ভয় করো না। ভোর হলে তোমাকে বন বিহারে দিয়ে আসবো। বৃদ্ধের দুই যুবতী মেয়েকে ক্রুদ্ধস্বরে বল্ল-তোরা আর জায়গা পাসনি বন ভন্তের শ্রমণ নিয়ে এসেছিস। তাদেরকে দা দেখিয়ে আমার পাশে বসে রইল। তাদের ভাষাও কথাগুলি অন্য ধরণের কিন্তু আমি বুঝতে পারি। মেয়েরা দূর থেকে তাদের বাবাকে বল্ল-আমরা শ্রমণকে বিয়ে করবো। বৃদ্ধ রাগ করে দা-খানা তাদের প্রতি ছুঁড়ে মারল কিন্তু অল্পের জন্যে পড়েনি। কিছুক্ষণ পর সূত্র পাঠের শব্দ শুনে বৃদ্ধ আমাকে বল্ল সূত্র পাঠ শেষ হওয়ার পর তোমাকে নিয়ে যাব। বৃদ্ধ আমার হাত ধরে কোথায় নিয়ে গেল আর জানি না, শেষে

বুঝতে পারলাম আমি বন বিহারের উত্তর দিকে হেঁটে বন ভন্তের দিকে আসতেছি। তারপর বন ভন্তেকে বন্দনা করে শ্রমণ শালায় চলে গেলাম।

বাবু জ্যোতির্ময় চাক্মা মহোদয় ঘটনার বিবরণ দেওয়ার পর আমি বল্লাম-দাদা, এটাত একটি উপন্যাস। তিনি বললেন-ছোট খাট উপন্যাসও বলা যায়।

ভূতের দুষ্টামি

একদিন তবলছড়ি এলাকার বাবু সাধন চন্দ্র বড়ুয়া সহ আমি রাজ বন বিহারে দেশনালয়ে বসে আছি। সেখানে আরো দশ পনের জন লোক বসে আছেন। সে সময় শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ভোজন করছিলেন। বন বিহারের সাবেক সহ-সম্পাদক বাবু বঙ্কিম দেওয়ানকে দেখে আমি জিজ্ঞাসা করলাম-আপনি শ্রমণ হয়েছিলেন, কবে রং বস্ত্র ছাড়লেন? তিনি বল্লেন পনের দিন প্রব্রজ্যা জীবন যাপন করে গত পরশু রংবস্ত্র ছাড়লাম। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করার পর কথা প্রসঙ্গে ভূতের কথা উথাপন হল। বিবরণে তিনি বলেন-একবার রাতে পায়খানায় যেতে ছিলাম হঠাৎ পশ্চিম দিকের অশ্বথ গাছটি (পাউজ্যা) আমার পথরোধ করে পড়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দেখলাম কোন বাতাস নেই। অমনি গাছটি থর থর করে কেঁপে উঠল। তাতে আমার সর্বশরীর শিহরে উঠে পায়খানার ঘটিটি হাত থেকে পড়ে গেল। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি আমি বন ভন্তের নিকট চলে যাই। তখন বন ভন্তে দেশনালয়ে ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন। হাপিয়ে হাপিয়ে বন ভন্তেকে ভয়ের কথা জানালাম। সঙ্গে সঙ্গে বন ভন্তে বল্লেন-দেখত গাছটি দাঁড়ান আছে। আমি সত্যিই দেখলাম গাছটি দাঁড়ান আছে। ভন্তেকে আবার আমি বল্লাম-তবে আমি কি দেখলাম? বন ভন্তে বল্লেন-সে তোমাকে রহস্য করেছে। তোমার সাহস আছে কি নেই পরীক্ষা করছে। সে পূর্বে দুষ্ট ছিল। প্রতিদিন সূত্র শুনতে শুনতে সে এখন শিষ্ট হয়েছে। অনিষ্ট করবেনা। আমরা কথা বল্তে বল্তে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে দেশনালয়ে চলে আসলেন।

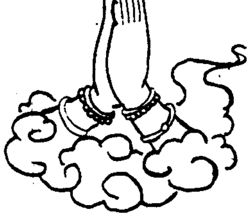

স্বপ্নে কুকুরে কামড়ায়

সময় বিকাল প্রায় পাঁচটা শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে দেশনালয়ে লেখাপড়ায় রত আছেন। আমরা (উপসাক-উপাসিকা) তাঁর সামনে নীরবে বসে আছি। আমার চোখে পড়ল বিহারের দক্ষিণ পাশে কয়েক জন লোক জড়ো হয়ে কি যেন বলাবলি করছে। হাঁটতে হাঁটতে তারা দেশনালয়ের দিকে চলে আসল। দেবাশীষ নগরের জনৈক লোক কতকগুলি থালা ও বাটি বন ভন্তের সামনে রেখে বল্‌ল-ভন্তে, এগুলি আমি চুরি করিনি আমাদের পাড়ার লোক থেকে অল্পদামে কিনে নিয়েছি। সে প্রত্যহ বন বিহারের এসে কাজ করে।

বন বিহারের কুকুরের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলল-ভন্তে, এ' কুকুরগুলি স্বপ্নে আমাকে কামড়াতে চায়। দুই তিন রাত স্বপ্ন দেখে অনন্যোপায় হয়ে আপানার নিকট চলে এসেছি। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করুন। আমরা (স্বামী-স্ত্রী) যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারিমত আশীর্বাদ করুন।

বন ভন্তে তাকে অভয় দিয়ে বল্‌লেন-যাও, যাও, আর কামড়াবে না। এ ঘটনা দেখে আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, এ রকম চুরি অনেক বিহারে হয়ে থাকে কিন্তু এ রকম অলৌকিক প্রমাণ কোনদিন আর দেখিনি। তাহলে তাদের পরকালে কি অবস্থা হবে?

লোকে যাহা বিষ বলে বিষ তাহা নয়।
সংঘের সম্পত্তি বিষ সম উক্ত হয়।।
বারেক পানেতে বিষ বারেক মরণ।
সদা মৃত্যু সংঘদ্রব্য করিলে হরণ।।

দেবতা—যক্ষ—প্রেত

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ নন্দপাল স্থবির মহোদয়কে আমি একদিন কৌতুহল বশতঃ প্রশ্ন করলাম-ভন্তে, আপনি কোনদিন দেবতা-যক্ষ-প্রেত দেখেছেন? তিনি একটু হেসেই বল্‌লেন-এইতো কিছুদিন আগেই দেখলাম। প্রতিদিন ভোর চারটায় বুদ্ধ বন্দনা করে আমার আসনে ধ্যানস্থ হই। তখন দেখা যায় একজন শ্রমণ এসে ঘর পরিস্কার করে চলে যায়। কিছুদিন পর আমার মনে উদয় হল অন্ধকারে ভাল ভাবে ঘর পরিস্কার হচ্ছেনা। তাই বলে বাতি জ্বালানোর জন্য সুইচ টিপার সাথে সাথেই অন্ধকারে দেখা শ্রমণ অদৃশ্য হয়ে যায়। হাত থেকে ঝাড়ুখানা পড়ার দৃশ্যটিই শুধু দেখলাম। তাতে

বুঝলাম দেবতারাই মনুষ্যবেশে পুণ্য করতে আসে।

আর একদিন রাত্রে চংক্রমণ করার সময় আমার সামনেই কি যেন একটা প্রাণী চলে যায়। দেখতে যেন মহিষ বা শুকর মনে হল। মনে মনে যক্ষ বলার সাথেই অদৃশ্য হয়ে গেল।

প্রেত সম্বন্ধে তিনি বলেন-প্রেত দেখেছি আমি যখন শ্রমণ অবস্থায় তখন বার্মার এক বিহারে ছিলাম। সেই বিহারে ভাবনাকারীদের জন্য কতকগুলি নর কংকাল সংরক্ষিত ছিল। প্রায় রাত্রেই কংকাল নাড়াচাড়ার শব্দ শুনা যেত। এমন কি অনেকেই প্রেত দেখতে পেয়েছে। একরাত্রে আমি শব্দ শুনে দেখলাম-একজন বৃদ্ধা কংকালগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে পায়চারী করতেছে। আমি পিছন দিকে দেখতে দেখতে তার মুখ দেখার কৌতহল হলে হঠাৎ বৃদ্ধা অদৃশ্য হয়ে যায়।

অজ্ঞানতার কারণে

সময় তখন প্রায় দশটা। দেশনালয়ে অনেক উপাসক-উপাসিকা মনোযোগের সাথে বন ভন্তের দেশনা শ্রবণ অবস্থায় বসে আছেন। এমন সময় ভন্তের জনৈক শিষ্য একটা বড় এলুমিনিয়ামের গামলা চৌকির উপর রেখে বন ভন্তের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন-দেখুন ভন্তে ! বাচ্ছুরি (বাঁশের কচি চারা) নিয়ে যাচ্ছিল আমাকে দেখে গামলাসহ্ ফেলে পালিয়ে যায়। বন ভন্তে দেখেও না দেখার মত, শুনেও না শুনার মত হয়ে আমাদেরকে ধর্ম দেশনা প্রদানে রত ছিলেন। উক্ত শিষ্য চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর মধ্যবয়সী এক মহিলা এসে বন ভন্তেকে বন্দনা করে বল্‌ল-এ গামলাটি আমার। আমরা সবাই সমস্বরে হেঁসে উঠি এবং সে ঐটি ফেরৎ চাওয়ার অবকাশ আর পেল না। বন ভন্তে আমাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন-অজ্ঞানতার কারণে এগুলি হয়ে থাকে। তার যদি জ্ঞান থাকতো বন বিহার এলাকায় বাচ্ছুরি চুরি করতো না দ্বিতীয়তঃ সে যদি এম, এ পাশ হতো এসব লজ্জাষ্কর কাজ হতে বিরত থাকতো। তৃতীয়তঃ সে যদি বড় লোকের মেয়ে হতো বাজার থেকে চাকরদ্বারা বাচ্ছুরি এনে খেতো।

তিনি বিভিন্ন উপমা দিয়ে লোকত্তর দেশনায় বলেন-মার্গফল না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষিত এবং বড় লোকেরাও অনার্য কাজে (অন্যায় কর্মে) লিপ্ত থাকে। সাড়ে দশটায় বন ভন্তের স্নানের সময় হওয়ায় দাঁড়িয়ে তিনি মহিলাটিকে বল্‌লেন- নিয়ে যাও। তা শুনে আমরা আবারো হেসে উঠে বন ভন্তকে বন্দনা করে দেশনালয় থেকে তাকে বিদায় দিলাম।

যক্ষের ভয়

একদিন বন বিহার দেশনালয়ে অনেক উপাসিকার ভীড়। আমি বুদ্ধ বন্দনা করার পর উপাসিকাদের মুখে শুনতে পেলাম-ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক যক্ষাটিকে তাড়িয়ে দিন। বন ভন্তে বল্‌লেন তাড়িয়ে দিলে যেখানে যাবে সেখানে ক্ষতি করবে। আবার তারা বল্‌ল-ভন্তে, আমাদের সাংঘাতিক ভয় লাগছে। তাড়িয়ে দিলে ভাল হয়। ভন্তে বল্‌লেন-অরবিন্দকে তাড়িয়ে দিলে ভাল হয়। তারা আবার বল্‌ল-অরবিন্দ বাবুকে না, যক্ষটিকে তাাড়িয়ে দিন। তাপর বন ভন্তে বিশদভাবে বল্‌লেন যে ভাল সে সব জায়গায় ভাল। যে খারাপ সে সব জায়গায় খারাপ। অরবিন্দ যদি খারাপ কাজ করে আজ আমি যদি তাকে বুঝিয়ে খারাপ কাজ থেকে বিরত করি তা হবে উত্তম কাজ। সে রকম যক্ষটিকে তাড়িয়ে না দিয়ে কারো অনিষ্ট করতে না পারে মত ব্যবস্থা করলে ভাল হয়। তারপর বন ভন্তে অভয় দিয়ে বল্‌লেন-এখন থেকে ভিক্ষু দিয়ে পরিত্রাণ সূত্র শ্রবণ কর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি উৎকন্টিতে হয়ে উপাসিকা ধনার মাকে জিজ্ঞাসা করলাম-দিদি, কি ব্যাপারে। তিনি প্রকাশ করলেন কালিন্দিপুরের এক নির্জন বাড়ীতে যক্ষের উপদ্রব হয়েছে। ঐ বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে লোক থাকে না, মধ্যে মধ্যে একজন লোক থাকে। রাত্রে ঘরের বাইরে যায় না। গতকাল রাত্রে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যায়। সে লোক ঘুমানোর সময় বিকট শব্দ শুনে তার গুম ভেঙ্গে যায় দ্বিতীয়বার অন্য ধরণের শব্দ করে ঘরের বেড়া ঘেসে কি যেন চলে যায়। মনে হল একটা গরু চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে ভিটার অপর প্রান্তে আর একটি শব্দ শুনতে পায়। সকাল বেলায় দেখা গেল উঠনের মধ্যে এক হাত গোলাকার গর্তের মধ্যে কতগুলি জমাট রক্ত পড়ে আছে। আবার সে গর্ত হতে বেড়া ঘেসে শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বড় বড় ফোটা ফোটা রক্তের দাগ দেখা যায়। জানাজানিতে এলাকাবাসী আতংকিত হয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের নিকট অভয় প্রার্থনা করল। ধনার মার মুখে বিবরণ শুনে পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলাম আর কোন সময় ঐ এলাকায় যক্ষের উপদ্রব হয়নি।

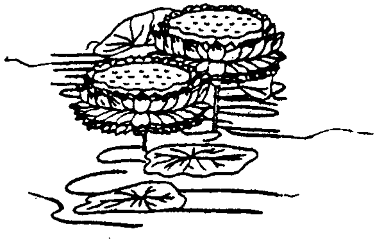

দিব্য চোখে দেখে!

প্রায় সময় লক্ষ্য করা যায় রাজ বন বিহারে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের উদ্দেশ্যে উপাসক-উপাসিকারা বিভিন্ন দানীয় সামগ্রী নিয়ে আসেন। কারো দানীয় সামগ্রী তিনি সাদরে গ্রহণ করেন, কারো দানীয় সামগ্রী স্পর্শ করেন আবার কারো দানীয় সামগ্রী চৌকির উপর রেখে দেয়ার নির্দেশ দেন। আমার ধারণা দানীয় সামগ্রী সাদরে গ্রহণ করা, স্পর্শ করা এবং চৌকির উপর রেখে দেয়ার নির্দেশে বেশ পার্থক্য আছে। গভীর শ্রদ্ধা, মধ্যম শ্রদ্ধা এবং মৃদু শ্রদ্ধার কারণে ত্রিবিধ অবস্থায় পরিণত হয় কিন্তু এক ব্যতিক্রম-ধর্মী দানীয় বস্তুর ব্যাপার সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাদেরকে জ্ঞাত করছি। সেদিন ছিল উপোসথের তারিখ। অন্যান্য দিনের তুলনায় সেদিন উপাসক উপাসিকারা সংখ্যায় বেশী ছিল। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আমাদেরকে ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন, এমন সময় জনৈক আমার অপরিচিত উপাসক কতকগুলি দানীয় সামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হন। প্রত্যেক দানীয় সামগ্রী তিনি সাদরে গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি বল্লেন-ওটা থাক। দ্বিতীয়বার দেয়ার জন্য উদ্যত হলে তিনি বল্লেন-(চৌকি দেখায়ে) ওখানে রাখ। তৃতীয়বার উপাসক বল্লেন-ভন্তে, এটা আমার নূতন গাছের প্রথম ফল, আপনার উদ্দেশ্যেই এনেছি। তৎপর বন ভন্তে আমাকে দেখায়ে বল্লেন-তাকে দাও। বন ভন্তের আদেশ পেয়ে আমি নারিকেলটি গ্রহণ করে আমার কাছেই রেখে দিলাম। রাত্রীতে যখন ভিক্ষু সংঘের ভোর বেলার পায়স অন্নের আয়োজন হচ্ছিল তখন আমি সে নারিকেলটি ভেঙ্গে দেখলাম ওটাতে পানি ও নারিকেল নেই। অতঃপর উক্ত বড় আকৃতির নারিকেলটি উপাসিকা ধনার মাসহ উপাসক-উপাসিকারা দেখে অবাক হলেন। আমাদের ধারণা শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে "দিব্য চোখে দেখে" শূণ্য নারিকেলটি গ্রহণ করেননি।

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে কতটুকু লেখাপড়া করেছেন?

একদিন সকাল ১০টায় বন ভন্তে বন বিহার দেশনালয়ে উপাসক-উপাসিকাদেরকে দেশনা করছিলেন তখন ১০/১২ জন ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা সেখানে উপস্থিত হন। তাঁদের মধ্যে জনৈক ভদ্রলোক বল্লেন-আমরা একটু বন বিহার দেখতে এসেছি। বন ভন্তে বল্লেন-দেখতে পারেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা বন ভন্তের সঙ্গে সামান্য আলাপ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন।

জনৈক ভদ্রলোক ঃ আপনি কি চাক্মা?

বন ভন্তে ঃ না।

জনৈক ভদ্রলোক ঃ তবে কি?

বন ভন্তে ঃ আমি বৌদ্ধ ভিক্ষু। আমি চাক্মা হলেই চাক্মার স্বভাব থাকত, আর যদি বড়ুয়া হতাম, বড়ুয়াদের স্বভাব হত। বৌদ্ধ ভিক্ষুর যা প্রয়োজন তা আমি.......।

জনৈক ভদ্রলোক ঃ এ বিহার আপনি পরিচালনা করেন?

বন ভন্তে ঃ না।
জনৈক উপাসক ঃ বিহার পরিচালনা কমিটি আছে।
বন ভন্তে ঃ আপনারা কোথা হতে এসেছেন।
জনৈক ভদ্রলোক ঃ যশোহর হতে।
বন ভন্তে ঃ আপনারা কি কাজ করেন?
জনৈক ভদ্রলোক ঃ আমরা সবাই ওকালতি করি।
বন ভন্তে ঃ কেউ ব্যারিষ্টারী পাশ করেছেন?
জনৈক ভদ্রলোক ঃ না।
বন ভন্তে ঃ উকিল, ব্যারিষ্টার অজ্ঞানী ও মিথ্যুক। শুধু ভাত খাওয়ার জন্য লেখাপড়া। ওকালতি, পিএইচ, ডি, ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত ভাত খাওয়ার জন্য লেখাপড়া করেন।
বন ভন্তে এ উক্তি করার সাথে সাথেই তাঁদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। তাঁদের মধ্যে অপর ব্যক্তি বল্লেন-আপনি কতটুকু লেখাপড়া করেছেন?
বন ভন্তে ঃ আপনাদের লেখাপড়ায় যা বল্বেন তা' আমি বুঝতে পারব, কিন্তু আমি যা লেখাপড়া করেছি তা' যদি বলি আপনারা বুঝতে পারবেন না।
জনৈক ভদ্রলোক ঃ বুঝতে পারি কিনা দয়া করে একটু বলুন।
বন ভন্তে ঃ দেশে যত সব মারামারি, কাটাকাটি, রাহাজানি এবং নানা অশান্তির সৃষ্টি হয় একমাত্র অজ্ঞানতা ও মিথ্যার কারণে। একজন অপর জনকে ক্ষমা করতে পারেনা। মৈত্রী ভাব পোষণ করতে জানেনা, অপরের সুখ সমৃদ্ধি দেখতে পারেনা, মানুষের মধ্যে দয়াভাব একেবারে নেই বল্লেই চলে। হীনত্বে মহত্ব অর্জন হয়না বরঞ্চ নানা দুঃখের সৃষ্টি হয। দুঃখে থাকলে মানুষ মুক্তি পায়না সুখ ভোগেও মানুষ মুক্তির পথ পায়না সুতরাং যারা পরম সুখ বা মুক্তির পথ অন্বেষণ করবে তাঁরা প্রথমেই জ্ঞান ও সত্যের গবেষণায় নিজকে নিয়োজিত রাখতে হবে।
ত্যাগেই সুখ বয়ে আনে। লোভ হিংসা, অজ্ঞানতা, পরশ্রীকাতরতা, মিথ্যাদৃষ্টি ও অহংকার ত্যাগ করতে পারলে সর্ববিধ দুঃখ থেকে রেহাই পাওয়া যায়।
শ্রদ্ধেয় বন ভন্তের সংক্ষিপ্ত উপদেশাবলী শুনে তাঁরা কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে চলে যান।

ভাল না মন্দ?

কোন এক ছোট খাট ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাজ বন বিহারের দেশনালয়ে উপাসক-উপাসিকাদের ভীড়ে কোথাও ঠাঁই নেই। শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে ধর্মার্থীদেরকে লক্ষ্য করে বলেন-আজ যারা এখানে সমেবত হয়েছ, তারা সবাই ভাল না মন্দ (গম না বজৎ)? উপাসকদের মধ্যে কেহ কেহ ভাল উত্তর দিল; উপাসিকাদেরকে বন ভন্তে বল্লেন-তোমরা কি বল? তাদের মধ্যে প্রায় সকলে বলে উঠল-ভাল ভন্তে। তারপর বন ভন্তে বললেন- তা' হলে সবাই ভাল। কেহ কেহ বল্ল-খারাপ হলে আমরা এখানে

আসতামনা। বন ভন্তে আবার বল্লেন-তা' হলে বুঝা যায় এখানে যারা আসেনি তারা খারাপ? কেহ্ কেহ্ উত্তর দিল-সবাই ভাল, আর সবাই খারাপ ও নয়। বন ভন্তে ভাল মন্দ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেন-এ সংসারে ভাল কে? আর মন্দ কে? যাঁরা শীল সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তি ফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হত মার্গ ও অর্হত ফল লাভী তাঁরাই প্রকৃত রূপে ভাল বলে অভিহিত। বন ভন্তে এ ধর্মদেশনা দেয়ার সাথে সাথেই যারা ভাল বলেছিল তাদের প্রায়জনের মুখ মণ্ডলে অন্ধকার নেমে আসে। কারণ ভাল বলে দাবী করে ফলবতী হয়নি। পরিশেষে বন ভন্তে বল্লেন-খারাপ কে? যে, সব সময় খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে, ভাল কাজ করতে জানেনা তাকে খারাপ বলা যায়। আবার যারা আজকে শীল পালন ও বিভিন্ন পূণ্যানুষ্ঠান করে পরবর্ত্তীতে খারাপ কাজে লিপ্ত থাকবে তাদেরকে মিশ্র কর্মী বলা হয়। তারা পরকালে সুগতিগমন অনিশ্চিয়তায় কালযাপন করবে সুতরাং তোমরা আপাততঃ ভালও নয় মন্দও নয়। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে লোকোত্তর ধর্ম দেশনা করে তাঁর বক্তব্যের ইতি টানেন।

ইহকাল-পরকাল

১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ ইংরেজী সোমবার রাজ বন বিহারের দেশনালয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আমাদেরকে নিম্নোক্ত দেশনাগুলি প্রদান করেন।

ইহ্কাল যেমন আছে পরকালও তেমন আছে তা' বিশ্বাস করতে হবে। অনেকে মনে করে যাবতীয় ধর্মকর্ম পাপ পূণ্য ও সকল কিছু ইহ্কালে সংঘটিত হয়। মরণের পর আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরণের বিশ্বাসকে মিথ্যা দৃষ্টি বলা হয়। মিথ্যাদৃষ্টি মানুষকে অন্ধ করে ফেলে। অন্ধ লোক যেমন কোন কিছু দেখতে পায় না, তেমন মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিও মুক্তির পথ পায়না।

দেশনায় বন ভন্তে বলেন- ঢাকা হতে আগত জনৈক ভদ্রলোক শ্রদ্ধেয় বন ভন্তেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন-আপনি যা কিছু বলেন বা ভাষণ দেন তা' কি শাস্ত্র বা বই পুস্তক হতে বলে থাকেন; না কি আপনার অভিজ্ঞতা হতে বলে থাকেন? উত্তরে বন ভন্তে বল্লেন-আমি আমার অভিজ্ঞতা হতে বলে থাকি। তারপর বন ভন্তে ইহ্কাল-পরকাল সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করে বলেন-এ সংসারে অনেকে অতিদুঃখে কাল যাপন করে। এমন কি জরা, ব্যাধি ও সংসারের নানা দুঃখ কষ্ট সহ্য করে জীবন অতিবাহিত করে। শীল পালন না করায় মরণের পর নরক বা অপায়ে গমন করে। এখানে দেখা যাচ্ছে ইহ্কালে অতিব দুঃখে কাল যাপন করে পরকালেও অতী দুঃখে পতিত হয়।

এ সংসারে কিছু কিছু লোক দেখা যায়, তারা গরীব হোক অথবা সম্পদশালী হোক, শিক্ষিত হোক অথবা অশিক্ষিত হোক তারা অতি দুঃখে কাল যাপন করে থাকে। শীল

পালন হেতু কোন কাজে, কোন কথায় ও কোন জীবিকায় সব সময় বাঁধার সম্মুখীন হয়ে তারা সারাজীবন দুঃখভোগ করলেও মরণের পর স্বর্গ সুখ ভোগ করে।
শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে প্রায় সময় বলে থাকেন-"তোমরা আজ মরে যাও, কাল মরে যাও অথবা যে কোন দিন মরে যাও, তথাপিও শীলচ্যুত হইও না। এমন কি ইহ জীবনকে তুচ্ছ মনে করে জীবন কাটিয়ে স্বর্গে চলে যাও। তোমাদের উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে পরকালে যে কোন জন্মে নির্বাণ লাভ করতে পারবে।"
এ সংসারে ক্বচিৎ দেখা যায়, কিছু কিছু লোক কঠোর অধ্যবসায় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে মার্গফলের অধিকারী হন। তাঁরা সংখ্যায় অতি নগন্য। তাঁরা ইহ জীবনে পরম সুখে জীবন যাপন করেন ও পরকালেও সুখে কাল যাপন করেন। মার্গফল লাভীর ইহ জীবনে যতই বাঁধা বিপত্তি আসুখ না কেন, তাঁরা সুখে দুঃখে অটল থাকেন। তাঁদের চিত্ত কম্পিত হয়না। তাঁদের চিত্তে কোন দুঃখ না থাকাতে পরম সুখ শান্তিতে কাল যাপন করেন এবং পরকালেও সুখে শান্তিতে থাকেন সুতরাং প্রত্যেক মুক্তিকামী উপাসক-উপাসিকাদের মার্গফল লাভ করার জন্য উদ্যোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক।
শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে প্রায় সময় জোর দিয়ে বলেন- "তোমরা বিশ্বাস স্থাপন কর। বিশ্বাসই পরম বন্ধু এপার ও ওপারে।" বিশ্বাস হল-ত্রিরত্নের উপর বিশ্বাস, ইহকাল-পরকাল বিশ্বাস, কর্ম ও কর্মফলের উপর বিশ্বাস, চারি আর্য সত্যের উপর বিশ্বাস, অষ্টাঙ্গিক মার্গের উপর বিশ্বাস ও পটিচ্ছ সমুপ্পাদ এর উপর বিশ্বাস। বিশ্বাসেই মানুষের সুখ ও শান্তি নেমে আসে।

সবাই ভাল চায়

আজ (১৭-২-৯২) রাজ বন বিহার দেশনালয়ে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনায় বলেন-এ সংসারে সবাই ভাল চায়। যেমন কোন এক পরিবারে পিতা হল পরিবারের কর্তা। পিতা সব সময় চায়- আমার ছেলে মেয়েগুলি কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায় ও আচার-আচরণে খুব ভাল হোক। খারাপ হওয়া কারো কাম্য নয়। যেমন গ্রামের মধ্যেও মেম্বার, চেয়ারম্যান আবাল বৃদ্ধ বণিতা সবাই ভাল হোক ভাল ভাবে জীবন যাপন করুক এটি সবারই কাম্য। দেশের মধ্যেও তাই অমঙ্গল দূরীভূত হয়ে মঙ্গল চিরদিন অটুট থাকুক সবারই কাম্য, কিন্তু প্রায় দেখা যায় ভাল-এর পরিবর্তে খারাপ, মঙ্গল-এর পরিবর্তে অমঙ্গল পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ কি? শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে বলেন- এ সংসারে পঞ্চ কামভোগীদের বহুদোষ সুপ্ত ভাবে থাকে। ক্রমান্বয়ে সেগুলি প্রকাশ পায়, তা' অনেক দুঃখ প্রসব করে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা কখনও পঞ্চকামে রমিত হন না। তাঁরা অনাসক্ত ভাবে জীবন যাপন করেন। সংসারে নানা দুঃখের কারণ হল আসক্তি। যেমন দেশের মধ্যে প্রায় দেখা যায় চুরি, ডাকাতি, খুন, লুটতরাজ প্রভৃতি দুঃখজনক কাজ লেগেই আছে। ক্ষমতার মোহে একজন অপর জনকে খুন করতে

কুণ্ঠিত হয়না। হিংসার বশবর্তী হয়ে একজন অপরজনের অনিষ্ট করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয় না। এগুলির কারণ হল আসক্তি।

এ সংসারে কেহ হাসে, আবার কেহ কাঁদে, বিচিত্র ব্যাপার। এসব হাসি- কান্না ও সুখ দুঃখ পর্যবেক্ষণ করে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে বলেন- তোমরা কি ভাবে আছ জান? গভীর ঘুমে অচেতন ভাবে আছ। মধ্যে মধ্যে ঘুমে স্বপ্ন দেখে আজেবাজে বকাবাকি কর (চাক্মা ভাষায় ছন্দবাস মাতা)। যেমন আমার বাড়ী, আমার স্ত্রী, আমার পুত্র-কন্যা, আমার বিষয়-সম্পত্তি, মেম্বার, চেয়ারম্যান, মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট প্রভৃতি।

বন ভন্তে আরো উদাহরণ দিয়ে বলেন- যদি কোন খারাপ লোক মারা যায় তার জন্যে লোকে দুঃখ করে না। ভাল লোক মারা গেলে তার জন্য সবাই দুঃখ করে। তিনি আরো বলেন- ধর, তোমার ছেলের জন্য বৌ এনেছ। সে খুব ভাল-দেখতে খুব সুন্দরী, কাজে-কর্মে, কথা-বার্তায় সবার জন্যে খুব ভাল হঠাৎ মারাত্মক রোগ হয়ে সে মারা গেল, তাতে তোমরা দুঃখ পাবেত? উপাসক-উপাসিকারা বল্লেন-হ্যাঁ ভন্তে! তারপর বন ভন্তে বল্লেন- সংসারে যারা অজ্ঞানী তারা শুধু ভাল চায়। আর যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা খারাপও চান না, ভালও চান না। ভাল এর মধ্যে খারাপও অর্ন্তনিহিত থাকে। উভয় দিক বর্জন করতে না পারলে জ্ঞানী হওয়া যায় না। জ্ঞানীরা এমন কি মনুষ্য সুখ, দেব সুখ ও ব্রহ্ম সুখের জন্য আকাংখিত নন। তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হল পরম সুখ-নির্বাণ।

ট্রেক্টর যোগাড় কর

শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে আজ দেশনালয়ে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি লক্ষ্য করে ধর্ম দেশনায় বলেন- তোমরা ট্রেক্টর যোগাড় কর। অত বড় বড় গাছের মূল (জারুলের ঘুইট্যা) ভাঙ্গা, অকেজো দা দিয়ে সমূলে উৎপাটন করতে কোন দিন পারবে না। তোমাদের যেমনি ভাঙ্গা বা অকেজো দা তেমনি তোমাদের উদ্যমও অতীব ক্ষীণ। এভাবে গাছের মূল ধ্বংস করা অসম্ভব ব্যাপার।

তিনি বিশ্লেষণ করে বলেন- "প্রকাণ্ড গাছের মূল হলো-অবিদ্যা, তৃষ্ণা, মান, মিথ্যাদৃষ্টি, সন্দেহ, শীলব্রত পরামার্শ, সৎকায় দৃষ্টি, তন্দ্রা, আলস্য প্রভৃতি। এগুলিকে সমুলে উৎপাটন করতে হলে ট্রেক্টর রূপ সত্যজ্ঞান বা প্রজ্ঞার প্রয়োজন। সে ট্রেক্টর তোমার কাছে যদি না থাকে ভাড়া করে নিয়ে এস? ভাড়া করতে হলেও অনেক টাকার প্রয়োজন। গাছের মূল থাকলে তোমাদের জমিনে ফসল হবে না সুতরাং তোমরা ট্রেক্টর যোগাড় কর"।

ট্রেক্টরের প্রথম আঘাতে ছোট ছোট মুলগুলি ধ্বংস হবে। সেগুলি হলো মিথ্যা দৃষ্টি, সন্দেহ, শীলব্রত পরামার্শ, সৎকায় দৃষ্টি, তন্দ্রা-আলস্য প্রভৃতি অবিদ্যা-তৃষ্ণাও মানের চার ভাগের একভাগ মূল ধ্বংস হবে। সে সময়কে স্রোতাপত্তি বলে।

ট্রেক্টরের দ্বিতীয় আঘাতে অবিদ্যা-তৃষ্ণা ও মান এর চার ভাগের দুই ভাগ অর্থাৎ মূলের অর্ধেক ধ্বংস হবে। সে সময়কে সকৃদাগামী বলে।

টেষ্টরের তৃতীয় আঘাতে অবিধ্যা তৃষ্ণা ও মানের চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ মূলের মাত্র এক ভাগ বাকী থাকবে। সে সময়কে অনাগামী বলে।
টেষ্টরের চতুর্থ আঘাতে অবিদ্যা-তৃষ্ণার বাকী অংশটুকুও ধ্বংস হবে। সে **সময়কে** অর্হৎ বলে।
স্রোতাপত্তি ফল লাভ করতে পারলে নরক, তীর্যক, অসুর ও প্রেতদ্বার বন্ধ হয়ে সাত জন্মের মধ্যে নির্বাণ লাভ হয়। সকৃদাগমী ফল লাভ করতে পারলে দুই জন্মের পর নির্বাণ লাভ করা যায়। অনাগামী ফল লাভ হলে শুদ্ধাবাস ব্রহ্মলোকে অবস্থানকালীন নির্বাণ লাভ হয় অর্থাৎ এ পৃথিবীতে আর আগমন হয় না। অর্হৎ ফল লাভ হলে ইহ জন্মে নির্বাণ লাভ করা যায়।

ধর্মজ্ঞান

আজ ৩০-৩-৯২ রাজ বন বিহারের দেশনালয়ে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় বন ভন্তে এক অভূতপূর্ব ধর্মদেশনা প্রদান করেন। দেশনার বিশেষত্ব হলো যে তিনি ছোট বেলায় যাত্রাগান দেখেছেন ও কবিতা মুখস্থ করেছেন তা' উপদেশ রূপে বিশেষ ভঙ্গিমায় আবৃত্তি করেন। জনৈক মহিলার স্বামীর অকাল মৃত্যুতেও তার শোক প্রশমিত করার জন্য এক নাতি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন। তাতে উক্ত মহিলার শোক প্রশমিত হয়। কবিতার বিষয়বস্তু হল-রাতের বেলায় সমস্ত বিশ্ব অন্ধকারে আবৃত থাকে কিন্তু সে অন্ধকার স্থায়ী নয়। দিনের আলো অবশ্যম্ভাবী। সেরূপ তোমার দুঃখও চিরদিন থাকবেনা সুখের পরশ নিশ্চয়ই একদিন পাবে। তুমি শোক সংবরণ কর। কবিতা পাঠান্তে উক্ত মহিলার মুখশ্রীতে আনন্দের জোয়ার বহে যায়। গৃহ জীবনে সুখ দুঃখ নিত্য সহচর। উপদেশছলে তিনি অনেক যাত্রাগানের কলি ও কবিতা আবৃত্তি করে উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাদেরকে ধর্মজ্ঞান লাভের জন্য উৎসাহিত করেন।
উপাসক-উপাসিকাদের পক্ষ থেকে আমি সবার জন্য ধর্মজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রতি প্রার্থনা জানাই। তাতে তিনি আশীর্বাদ করে বলেন-ধর্মজ্ঞান লাভ করতে হলে কোন টাকা-পয়সার দরকার হয়না। শুধু তিনটি জিনিষের প্রয়োজন। প্রথম চিত্তের নির্মলতা, দ্বিতীয় উচ্চ আকাংখা ও তৃতীয় উচ্চমনা হতে হবে। যাবতীয় বাচনিক ও কায়িক কর্ম চিত্ত হতে উৎপত্তি হয়ে থাকে সুতরাং স্বীয় চিত্তকে পরিশুদ্ধ করতে না পারলে ধর্মজ্ঞান লাভ হয় না। মানুষের অসংখ্য আকাংখা থাকে। তন্মধ্যে নির্বাণ আকাংখাই সবচেয়ে উত্তম। নির্বাণের উপরে আর কিছু নেই বলে নির্বাণ আকাংখাই উত্তম। অন্য আকাংখায় অধোগতি হয়। যার মান বা চিত্ত সব সময় নির্বাণের দিকে থাকবে তিনি একদিন না একদিন নির্বাণ লাভ করতে পারবেন। চিত্তকে নির্বাণ মুখী রাখাকে উচ্চমনা বলে।

বনভন্তের দেশনা

(২য় খন্ড)

সংকলনে ঃ

ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদ

রাঙ্গামাটি

বনভন্তের দেশনা
(২য় খন্ড)

সংকলনে ঃ

* ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

প্রকাশনায় ঃ

* বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদ

উপদেষ্টা পরিষদে যাঁরা আছেন ঃ

* বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা
* বাবু নির্মলেন্দু চৌধুরী
* বাবু কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা (আহ্বায়ক)
* বাবু সুরেশ বড়ুয়া

সহযোগিতায় যাঁরা আছেন ঃ

* বাবু জগদীশ চাক্‌মা (কৃষি ব্যাংক)
* মিসেস্ পারুল রানী চাক্‌মা
* মিসেস্ জয়া বড়ুয়া
* মিসেস্ সন্ধ্যা দেবী চাক্‌মা
* বাবু সুধীর কান্তি দে
* বাবু সমীরন বড়ুয়া

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ

* বাবু কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা

প্রকাশকাল ঃ লাভী শ্রেষ্ঠ অর্হৎ সীবলী পূজা উপলক্ষ্যে, ২৫৩৯ বুদ্ধাব্দ।

তারিখ ঃ ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬ ইংরেজী, শুক্রবার।

কম্পিউটার কম্পোজঃ

বিন্যাস, ৪২ শৈল বিতান, রাঙ্গামাটি।

মালাকার যেমন পুষ্পউদ্যান হতে নিজের পছন্দমত পুষ্পের দ্বারা মালা তৈরী করে ঠিক তেমন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞাপূর্ণ অমৃতময় দেশনা হতে "বনভন্তের দেশনা" (২য় খন্ড) সংকলন করে

বাবু .... কে

....

....

পুন্য-স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ উক্ত গ্রন্থ খানা অর্পন করলাম। এ পুন্যের প্রভাবে আমাদের নির্বান লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

গভীর শ্রদ্ধান্তে -

সংকলক

ও

বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদ

Reprinted and Donated by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org.tw
Website: http: //www.budaedu.org.tw
This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

উৎসর্গ

অনন্ত গুনের আধার আমার পরমারাধ্য পরলোকগত পিতা বাবু প্রতাপ চন্দ্র বড়ুয়ার পুন্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে অমৃতোপম "বনভন্তের দেশনা" (২য় খন্ড) নামক এ গ্রন্থখানা পরম শ্রদ্ধা সহকারে উৎসর্গ করলাম।

অরবিন্দ বড়ুয়া

পরলোকগত জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে পুন্য-স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ পরম আর্য পুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো মহোদয়ের অভিজ্ঞাপূর্ণ বাণী "বনভন্তের দেশনা" (২য় খন্ড) নামক গ্রন্থখানা উৎসর্গ করলাম।

বনভন্তের দেশনা
(২য় খন্ড)
প্রকাশনা পরিষদ

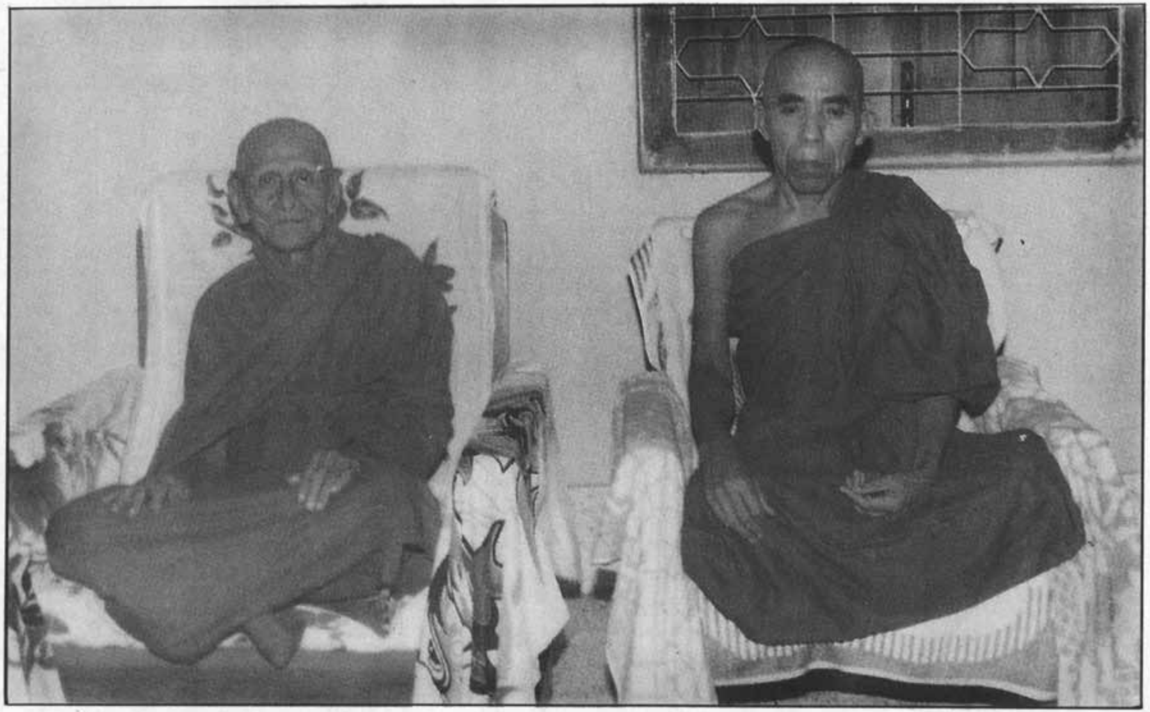

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ধর্মীয় সর্ব্বোচ্চ গুরু মহামান্য সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শীলালংকার মহাথেরো (৯৭ বছর) ও পরম আর্য্য পুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো (বনভন্তে ৭৭ বছর)

ভূমিকা

'সাসনস্‌স চ লোকস্‌স বুড্‌টি ভবতু সব্বদা'

বনভন্তের দেশনা সংকলন প্রসঙ্গ

সূর্যের প্রথম রশ্মি অপসৃত করে বিশ্বের ঘোর অন্ধকার। জ্যোস্নার স্নিগ্ধ আলোয় রমণীয় করে তুলে রজনী আঁধার। মহাপুরুষের জীবনে সূর্যের প্রখরতা এবং চন্দ্রের স্নিগ্ধতা এই দুই গুণ বিদ্যমান। অন্যায়, অসত্য ও অধর্মের প্রতি তারা জীবনান্তেও মাথানত করবে না। অথচ অন্যায়কারীকে ন্যায় পথে আনতে, অসত্যকে পরিহার করে মিথ্যাচারীকে সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত করতে, অধার্মিককে ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁদের অপরিসীম মৈত্রী, করুনা আর ত্যাগ তিতিক্ষার কোন জুড়ি থাকে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জীবনে আমরা উপরোক্ত মহাপৌরুষের গুণাবলীর উপস্থিতি অত্যন্ত উজ্জ্বল ভাবে প্রত্যক্ষ করি। তাঁর দেশনায় অপ্রিয় সত্যগুলো অত্যন্ত সরল এবং সরাসরি উচ্চারিত হয় কিন্তু তা কেবল মাত্র পরনিন্দা বা পরচর্চায় পর্যবাসিত হতো যদি না তিনি বিভ্রান্ত, অন্যায়কারীকে সংশোধিত হওয়ার উপায় নির্দেশ না করতেন। প্রব্রজিত হিসেবে কি করণীয়, কি অকরণীয় তিনি তা যেমন প্রদর্শন করেন অপরদিকে গৃহীদেরকেও ধনী, গরীব মানী নির্মাণী নির্বিশেষে তিনি কর্তব্য, অকর্তব্য সমভাবে নির্দেশ করেন। কে খোশ হবেন, কে বেখোশ হবেন এ তোয়াক্কা তিনি মোটেই করেন না।

বনভন্তের দেশনা সংকলন প্রকাশনার ভূমিকা লিখতে গিয়ে তাঁর দেশনা সমূহ সংকলনকারী ডাঃ অরবিন্দ বাবু সময়ের আনুক্রমিকতা এবং বিভিন্ন শিরোনাম দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠকের অধিগমকে সহজ করার লক্ষ্যে আমার আলোচনাকেও এইভাবে বিন্যস্ত করেছি।

মানুষের দেহ-মন ছন্দায়িত হয় নাচে আর গানে। প্রকৃতির অপরূপ শোভা দর্শনেও ভাবুক হৃদয় হয় ছন্দায়িত। আধ্যাত্মিক ভাব তন্ময়তায় হৃদয় ছন্দায়িত হয় দার্শনিকের। ছন্দায়িত হৃদয়ে ভক্তির অর্ঘ্য নিবেদনে ভক্ত অপার তৃপ্তিতে হন বিভোরিত। আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উদ্দেশ্যে লিখিত এবং গীত বিভিন্ন ভক্তিমূলক গানে ও কবিতায় ভক্তের অপার ভক্তি অর্ঘ যেমন নিবেদিত। সাথে সাথে শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞার সমাবেশ ঘটাতে দেখি তাঁদের হৃদয়ার্তিতে। ফলে তথাগত বুদ্ধের ধর্মাদেশ এখানে হয়েছে সুরক্ষিত। তাতে কেবল ভক্তিজাত মিথ্যাদৃষ্টি এ সকল গানে পরিহার করা সম্ভব হয়েছে সকল ক্ষেত্রে। শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞার সমন্বয় সাধনই তো তথাগত বুদ্ধের শিক্ষা। তাই ধন্যবাদ জানাই সর্বাগ্রে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উদ্দেশ্যে রচিত গানের রচয়িতাদের।

বুদ্ধের ধর্মাদর্শ সম্পর্কে অভিজ্ঞ গীতিকার, নাট্যকার, প্রবন্ধ-নিবন্ধকার ও কবি সাহিত্যিকের দ্বারা সাধারণ মানুষের হৃদয়ে বুদ্ধের দুঃখ মুক্তির আবেদন পৌঁছে দেয়ার প্রয়াস একটি উত্তম পন্থাও বটে। মহাকবি ও নাট্যকার অশ্বঘোষ তারই প্রোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এধরনের সুচিন্তিত নিরবচ্ছিন্ন কোন প্রয়াস এযাবত আমাদের সমাজে পরলক্ষিত না হলেও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মতো একজন সাধকের মাঝে তার প্রতি সচেতনাকে সাধুবাদ জানাতে হয়।

'পূণ্যরূপ প্যারাসুট' নিবন্ধে তিনি জন্মান্তর বিষয়ক যে মত প্রকাশ করেছেন তা একটি প্রবল আত্মপ্রত্যয় দীপ্ত অভিব্যক্তি। আধুনিক বস্তুবিজ্ঞানের ভোগ লালসায় অন্ধ-প্রমত্ত মানসিকতার প্রতি তাঁর এ বক্তব্য একটি সহজ সরল ও নিপুন প্রবল যৌক্তিকতার দাবী রাখতে পারে। বুদ্ধের ভাষায় পুনঃ, পুনঃ জন্ম গ্রহন দুঃখ। তারপরেও সুগতিলোকে জন্ম নিতে পারলে মানুষ কল্যাণমিত্রের সাহচর্যে এই জন্ম দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের প্রয়াস চালাতে পারে। সতত পুণ্য চিন্তা ও কর্মসাধনে নিজেকে ব্যাপৃত রাখাই এ

উত্তম প্রয়াস। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, তোমরা সকলে পূণ্যরূপ প্যারাসূট্ পরিধান কর। তখন মৃত্যু হলে তোমরা ইচ্ছে মতো স্বর্গ সুগতিতে উৎপন্ন হতে পারবে।

'ইন্দ্রিয় দমনে নির্বাণ লাভ সহজ' নামক নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিড়ালের স্বভাবের উপমা দিয়ে অজ্ঞানীর চরিত্রকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, যারা অজ্ঞানী তারা বিড়ালের মতো কোন নিষেধ মানেনা, যেখানে সেখানে মুখ দেয়। অজ্ঞানীকে যে বিষয় অনুশীলনে নিষেধ করা হয় সে বিষয়েই তারা বেশী রমিত হয়। বর্তমানে থেরবাদী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে ভিক্ষুনী প্রথার বিলোপ সম্পর্কে তিনি বলেন, আগে লোভ-দ্বেষ-মোহ ক্ষয় করতে পারলে নারীদের ভিক্ষুনী প্রব্রজ্যা দেয়া যেতে পারে। যেহেতু বৌদ্ধ ধর্ম কঠিন এবং দুঃসাধ্যকেই সাধ্য করতে হয় সেহেতু যে দেশ প্রতিরূপ নয় সে দেশে ভিক্ষুনী সংঘ গঠন করা উচিত নয়।

"খাঁড়া জায়গায় ঘুরাফেরা কর না" - নিবন্ধের শুরুতে তিনি বলেন ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের কথা হল অজ্ঞানতাকে ধ্বংস কর এবং জ্ঞান উৎপন্ন কর। তা'হলে বুদ্ধের কথা অনুযায়ী বনভন্তে তোমাদের কতটুকু জ্ঞান দিতে পারবে? কতটুকু সুখ দিতে পারবে? কতটুকু সত্যধর্ম উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারবে? এ সকল প্রশ্ন তাঁকে বিশেষভাবে ভাবিত করতে দেখা যায়। এর একমাত্র কারণ, তিনি সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েন শ্রোতাদের পক্ষ থেকে আশানুরূপ ধর্মজ্ঞান ও উৎপত্তির লক্ষণ না দেখে।

'মদ্যপানে বিরতি' - নিবন্ধে দেখা যায় মদ্যপায়ীদের অন্যেরা যথেষ্ট চেষ্টা করেও যেখানে বিরত করতে অক্ষম সেখানে বনভন্তের সহজ সরল উপদেশ ও নির্দেশে অনায়াসে তারা মদপান ত্যাগ করছে। এর রহস্য কি? বনভন্তের দীর্ঘ সাধনাময় জীবনে বুদ্ধ সমকালীন সাধকের ন্যায় জীবন চর্যার সুখ্যাতি এবং তাঁর সাধন সাফল্যের উপর লোকের গভীর বিশ্বাস মানুষকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করছে।

"সংসার গতি ও নির্বাণ গতি" নিবন্ধে তিনি বলেন, বিশুদ্ধ জল বা সিদ্ধ জল হল নির্বাণ গতি আর নোংরা জল হলো সংসার গতি। এ জল পান করলে দেহে নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হয়। অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে অতি সহজেই

নোংরা জলে স্থিত সকল রোগ জীবানু যেমন চিহ্নিত করা যায় তেমনি বুদ্ধ জ্ঞান দিয়েও সংসার গতির অসংখ্য দুঃখরাশি প্রত্যক্ষ করা যায়।

"বনভন্তের প্রিয় শিষ্য বুড়া ভন্তে" - প্রসঙ্গে আলোচনায় বুঝা যায় যে, বনভন্তে নির্বাণ লাভের জন্যে কাকেও পীড়াপিড়ী করেন না। বুড়ো ভিক্ষুর ইচ্ছে তিনি আগামী জন্মে যেন শ্রীলংকায় উন্নত মানের গৃহী হয়ে জন্ম নিতে পারেন। তাঁর এমন ইচ্ছেতে বনভন্তে কোন প্রকার আপত্তি বা মত পরিবর্তন প্রয়াস কোন সময় লক্ষ্য করা যায়নি।

১৯৯৩ এর ২৮শে সেপ্টেম্বর "প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশনা" - নিবন্ধের প্রথম পর্বে 'আমি ও আমার' চিন্তায় ব্যস্ত বা আত্মবাদী নেতা এবং ভিক্ষুদের অপায় গতির সমূহ সম্ভাবনা সম্পর্কে বলেছেন। পদ্ম যেমন কর্দম হতে উপরে উঠে শোভা বর্ধন করে ঠিক নেতা দেব হউক বা মনুষ্য হউক চারি আর্যসত্য জ্ঞান লাভ করলেই তাদের সমস্ত অহংকার গর্ব-সংযুক্ত আত্মবাদ উচ্ছেদ হবে এবং নির্বাণ সত্যে উত্তোরণ ঘটবে। ভিক্ষু হউক বা গৃহী হউক পৃথিবীতে এখন যত নেতা আছে তারা সকলেই প্রবল আত্মবাদী বলে পতনের আশংকা সমধিক। এ পতন রোধের ক্ষেত্রে ভিক্ষুরা হতে পারেন সুদক্ষ মাঝি বা চালক যদি প্রব্রজ্যিতের গুণধর্ম আয়ত্ব করতে পারেন। গৃহীগণ সর্ব সময়ে থাকে নৌ-আরোহী তূল্য।

প্রবারণা পূর্ণিমার এ দেশনার দ্বিতীয় পর্বে এক পর্যায়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হয়েছেন কি-না। এর উত্তরে পরোক্ষভাবে তিনি বলেন, মানুষ সারারাত দিন আলাপে ও নানা কাজে ব্যস্ত থাকলে কখন তার জন্যে নির্বাণ? শ্রদ্ধেয় ভন্তে যদি প্রশ্নটির উত্তর ঠিক এমনিভাবেই দিয়ে থাকেন পাঠক সমাজ বুঝতে চেষ্টা করুন এ উত্তরে বনভন্তে কি আত্ম সমালোচনা করলেন না, পরনির্দেশনা ব্যক্ত করলেন? প্রবারণার এ দিনটি সারাক্ষণ মেঘলা ছিল। গুঁড়ি গুড়ি বৃষ্টির মাঝেও অসংখ্য ভক্তরা খোলা আকাশ তলে আকুল আগ্রহে বনভন্তের দেশনা শুনছিলেন। এক পর্যায়ে উপস্থিত শ্রোতাদের পক্ষে সংকলক ডাক্তার মহোদয় প্রার্থনা করে বসলেন- "ভগবান বুদ্ধ এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি প্রার্থনা জানাই প্রত্যেকের চিত্ত যেন নির্বাণ বারি দিয়ে সিক্ত হয়। "এ ধরণের আবেগ

প্রকাশে দৃষ্টির সম্যকতা রক্ষা পায় কিনা প্রার্থনা কারীর প্রতি জিজ্ঞাসা জাগাটা স্বাভাবিক।

'সীবলী পূজা উপলক্ষে দেশনা' - নিবন্ধে বলা হয়েছে রাজবন বিহারের বোধিবৃক্ষ তলে বুদ্ধ পূজা সীবলী পূজা, সংঘদান ও অষ্ট-পরিষ্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। এতে উদ্বোধনী সংগীতে সীবলী স্থবিরকে লাভী শ্রেষ্ঠ হিসেবে হৃদয়ে আসন দিয়ে আকুল শ্রদ্ধা নিবেদন করা হলো উদ্বোধনী সংগীতে। কিন্তু এমন জমজমাট অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিশ মিনিটের দেশনায় একটি বারও সীবলী পূজার মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বলেননি। দেশনার শুরুতেই তিনি বললেন, যার শ্রদ্ধাবল আছে তার দুঃখ সাগর পাড়ি দিতে অসুবিধা হয় না। শ্রদ্ধার বল অর্জন করতে গেলে বুদ্ধকে বিশ্বাস এবং চারি আর্যসত্যকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে। শ্রদ্ধেয় ভন্তের এই বক্তব্য হলো সারা বিশ মিনিটের সার কথা। অতএব, শ্রোতাদের অবগত হওয়া উচিত, খাদ্য ভোজ্যাদি দ্রব্য সামগ্রী দিয়ে পরিনির্বাপিত বুদ্ধ বা সীবলীকে পূজা বৌদ্ধ ধর্মে সত্যি অগৌন। শুধু তা-ই নহে আর্যসত্য জ্ঞান হীনের পক্ষে বিপদজনক ও বটে। অতিভক্তি মিথ্যাদৃষ্টির পোষকতা করে।

এখানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পরামর্শ দিয়েছেন। সুখের সন্ধানে আত্মতত্ত্ব (এই 'আমি' পূর্বে ছিলাম কিনা, ভবিষ্যতে থাকবো কিনা) এবং লোকতত্ত্ব (এ পৃথিবীর এত প্রাণী কোথা হতে আসলো, আবার কোথায় যাবে) ইত্যাদির অন্বেষণ বা চিন্তা বাদ দিয়ে নির্বাণ তত্ত্বের অন্বেষণ করো, গবেষণা করো। এ অন্বেষণে মুর্খ, ভ্রান্ত গুরুর সংসর্গে থাকার চেয়ে একাকী থাকা অনেক ভালো। কোনরকম পরিহানি যাতে না হয় অথবা অন্ধ যাতে না হও - সবসময় সতর্ক থাকিও।

'কুকুর ও ধর্ম কথা শুনে' - নিবন্ধে দেখা যায়, এক কুকুর একটি নতুন চৌকিতে প্রস্রাব করলো। দৃশ্যটি বনভন্তে দেখে মন্তব্য করলেন, কোন কোন ঠাকুরের স্বভাবের চেয়ে কুকুরের স্বাভাব অনেক ভালো। অনেক মায়াবী ভিক্ষু আছে তারা গোপনে নারীর সাথে কামাচারে লিপ্ত হয়। আমেরিকার সমুদ্র তীরে প্রাপ্ত মৎস্যকন্যা সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন- এ নারীরূপী মৎস্যটি পূর্ব জন্মে আমেরিকার এক প্রবল কামাসক্ত মহিলা ছিল।

১৯৯৩ সালের কঠিন চীবর দান সভায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, নির্বান সম্বন্ধে যিনি জানেন বা অধিগত তার জন্যে নির্বাণ অতি সহজ। বিষয়টি জানতে হলে প্রথমেই নির্বাণ শিক্ষা করতে হবে। শিক্ষা করতে করতে তা অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। অভ্যস্থ হলেই তা পূরণ হবে।

'বিরল ঘটনা' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, উগ্র সাধকের উগ্রতার কারনে নির্বোধের অনিষ্ট ঘটে। কথাটির ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিরল নয়। কিন্তু, সত্য সাধক ও ন্যায় পথানুসারির মনোবেদনার কারণ ঘটালে, শান্তি বিনষ্ট করলে, কৃতকর্মী স্বকর্মের দুঃখময় পরিণতির হাত থেকে কখনই যে ত্রাণ পায় না তার কিছু প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ নিবন্ধে বিবৃত আছে। বেহুশের হুস্ উৎপাদনে নিবন্ধটি খুবই সহায়ক হবে।

'মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কর্তৃক তাঁর মায়ের কক্ষে ছোয়াহিং গ্রহণের দৃশ্যটি বুদ্ধ কর্তৃক পিতা শুদ্ধোধন ও মাতা মায়াদেবী দর্শন এবং ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্র স্থবির কর্তৃক আপন ভূমিষ্ট কক্ষে অন্তিম শর্য্যা গ্রহনের দৃশ্যগুলো মনে করিয়ে দেয়। বনভন্তের ঋদ্ধিময় চলাফেরার যে প্রমাণ আমরা এখানে লাভ করি অতীতের বহু ঋদ্ধিমান সাধু সৎপুরুষ বা মুনি ঋষিদের জীবনেও এ ঘটনা বিরল নহে। শক্তিমান সাধকদের এ সকল ঋদ্ধি শক্তি কিন্তু কখনো কোন আর্য মার্গ লাভের ইঙ্গীত বহন করেনা। তৃতীয় ও চতুর্থ সমথ ধ্যান লাভীর সমাধিস্থ চিত্তের ফসল হলো এসব ঋদ্ধি শক্তি। ধ্যানীর আর্য-মার্গ দর্শন যতদিন লাভ না ঘটে ততদিন এই ঋদ্ধি শক্তি কখনো স্থায়ীত্ব লাভ করে না। চিত্ত যতক্ষণ ধ্যানজ নিমিত্তে ভাবিত থাকে কেবল ততক্ষণই সে শক্তি অক্ষুন্ন থাকে পরমুহূর্তে তার কিছুই অবশেষ থাকেনা। সাধক একজন অতি সাধারণ মানুষে পরিণত হন।

'লাল শাকের ভয়ে আতঙ্ক' - নিবন্ধে নিরেট হাস্যরস পরিবেশিত হয়েছে। বস্তুতঃ দেহ ধারণের তাগিদেই আমাদের খাদ্য গ্রহণ চেতনাটি বলবৎ থাকলে আহারের সময়ে মাছ, মাংস, শাক্ সব্জী, আমিষ, নিরামিষ, প্রাণ-অপ্রাণ, সুস্বাদ, বিশ্বাদ ইত্যাদি কোন প্রশ্নে বালাই থাকে না। অনাসক্ত চিত্তে যে কোন ভোজন হয় বিশুদ্ধ ও নিষ্পাপ। জিহ্বা লোলুপ ভিক্ষুর লাল শাকের তরকারীর প্রতি আতঙ্কের যে সরস চিত্রটি এ নিবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে তা সত্যই উপভোগ্য।

'অপ্রিয় সত্যের যথার্থ উত্তর' - নিবন্ধে কতিপয় দুঃশীল ভিক্ষুর আচার-আচরণে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মাঝে মধ্যে যে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তাকে নিবন্ধকারের মতে 'ব্যক্তি বিশেষ ভিক্ষু বা ভিক্ষুদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন মাত্র' এখানে নিন্দা না বলে বলা উচিত প্রত্যক্ষ- সমালোচনা। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শাসন দরদী জাগ্রত হৃদয় নিসৃতঃ এই অকুতোভয় সত্যবাক্য উচ্চারণ বর্তমান সংঘ সমাজে বড়ই দুর্লভ। তাঁর এ সকল সমালোচনা একান্তই মৈত্রী, করুনাজাত। তিনি অত্যন্ত দূরদৃষ্টিতে এবং একান্ত মঙ্গলকামী হয়েই দূঃশীল ভিক্ষু গৃহীদের এমন সমালোচনা করেন।

'হিতে বিপরীত' - নিবন্ধে জনৈক উপাসকের ছেলে মারা যাওয়ার পর তিনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট তার ছেলে কোথায় উৎপন্ন হয়েছে জানতে চাইলেন। শ্রদ্ধেয় ভন্তে সরাসরি বলে দিলেন যে, সে নরকে উৎপন্ন হয়েছে। এতে উপাসকটি খুবই মর্মাহত হলেন। এ প্রসঙ্গে তথাগত বুদ্ধের সমকালীন মহারাজ প্রসেনজিৎ কোশলের স্ত্রী মল্লিকা দেবী কালগত হওয়ার ঘটনাটি প্রণিধানযোগ্য। নিয়ত বুদ্ধ ও সংঘ সেবাপরায়ণা মল্লিকা রাজা প্রসেনজিৎ এর অতীব প্রিয়তমা পত্নী মৃত্যুর পর শোকাহত অবস্থায় বুদ্ধের নিকট জানতে চাইলেন, মল্লিকা এখন কোথায় জন্ম নিয়েছেন। দিব্য জ্ঞান নেত্রে বুদ্ধ জানতে পারলেন দুর্ভাগ্য ক্রমে মল্লিকা তির্য্যগগতি লাভ করেছেন। এ সত্য প্রকাশ করলে রাজা প্রসেনজিত খুবই মর্মাহত হবেন এবং দান-ধর্ম কুশল কর্মের প্রতি অবিশ্বাস পোষন করবেন। তাই বুদ্ধ প্রথম দিনের প্রশ্নে নীরব রইলেন। দ্বিতীয় দিনের জিজ্ঞাসায় ও নীরব রইলেন। অবশেষে বুদ্ধ কর্ম ও কর্মফলের রহস্য বিবৃত করে সত্য প্রকাশ করলেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও এ ক্ষেত্রে একই রীতি গ্রহণ করলে হিতে বিপরীত হতো না।

'মানস করে প্রত্যক্ষ ফল লাভ' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নিরেট সত্য প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, মানতের ফল হলো মানতকারীর চিত্তের একাগ্রতা ও লৌকিক সত্যের প্রভাব মাত্র। তিনি বলেন, নির্বাণ ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। কারন হীন ও নীচতর সংস্কারের মানুষ মুক্ত হয় না। উচ্চতর প্রার্থনায় মানুষ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। নির্বাণ সাক্ষাত করতে পারলে আর কোন ভয় থাকে না।

'কর্মেই মানুষ পন্ডিত-মুর্খ, সাধু ও অসাধু হয়' এ - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, তোমরা মুর্খ হইও না। পন্ডিত হও। শুধু এম. এ. পাশ বা লেখাপড়া শিখলে পন্ডিত হয় না। যারা পন্ডিত তারা ত্যাগী হয়। সর্বজীবে দয়া, ক্ষমাশীল, মৈত্রী ও পুণ্য কর্মে নির্ভিক ব্যক্তিই পন্ডিত। শুধু নিরামিষ বা শুধু লবন দিয়ে আহার করলে সাধু হয় না। পঞ্চশীল পালন করলেই সাধু হয়। তিনি বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসার ধর্ম, শান্তির ধর্ম, পূণ্যের ধর্ম, সুখের ধর্ম, উন্নতির ধর্ম। আন্দাজ বা অনুমান করে বৌদ্ধ ধর্ম পালনের চেষ্টা করা উচিত নয়।

'অবিদ্যাই সর্ব দুঃখের আকর' - নিবন্ধে তিনি বলেন, বৌদ্ধ ধর্ম মতে জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মান(-)বাদ এবং আবহ-বিবাহবাদ সবই অবিদ্যা জাত। অবিদ্যা সর্বদুঃখের আকর। ইহা ত্যাগ না করলে দুঃখের অবসান নেই। জাতিবাদ, গোত্রবাদের কারণেই দেশে দেশে যত যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা, প্রাণহানি ঘটে। মানবাদের কারণেই তুমি আমার চেয়ে ছোট, হীন, সমান, শ্রেষ্ঠ, যোগ্য, অযোগ্য ইত্যাদি পার্থক্য ভাবের জন্ম হয়। এবং বহু দুঃখের শিকার হতে হয় লোকে বলে, ভারত, বাংলাদেশ, আমেরিকাদি দেশ সমূহ স্বাধীন। তোমরা কি জান স্বর্গ-মর্ত্যে সকলেই পরাধীন? অবিদ্যা তৃষ্ণা, ধর্ম এবং কর্মের থেকে যারা মুক্ত হতে পেরেছে তারাই কেবল স্বাধীন। তাঁরাই নিরাপদ। অবিদ্যা হতে মুক্ত হতে হলে চিত্তদমন, আত্মদমন, এবং ইন্দ্রিয় দমন করতে হবে। স্ত্রী-পুরুষ হীন স্থানে চিত্ত দমন হয়। গভীর নির্জন জঙ্গলে আত্মদমন হয়। চক্ষু, শ্রোত, জিহ্বাদিতে সচেতনতায় ইন্দ্রিয় দমন হয়।

১৪ই ফেব্রুয়ারী '৯২ ইং তারিখ রাঙ্গামাটি মাষ্টার কলোনীতে প্রদত্ত সকাল বেলার ভাষনে বর্তমান যুগে বুদ্ধের সাংঘিক সভ্যদের (ভিক্ষুদের) নিম্নতর জীবনাচারের কারণ সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উক্তি সত্যিই প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন, সে যুগে ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘ রাজা ও ধনাঢ্য কুল থেকেই অধিকাংশ প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন। ধনী-গরীব নির্বিশেষে প্রব্রজ্যার্থীরা ছিলেন প্রবল বৈরাগ্য চেতনায় উদ্বুদ্ধ। উপাসক-উপাসিকারাও সেরকম ছিলেন। বর্তমানে প্রায় ভিক্ষুরা অতীব গরীব ও হীনকুল থেকে প্রব্রজ্যা নেওয়ার দরুন উত্তম ধর্মাচারের অভাব দেখা দিয়েছে। উত্তম ধর্ম না থাকাতে বর্তমানে নানাবিধ দুঃখের প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে।

তবে, এও সত্য যে, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, ত্যাগ ও দুঃখ মুক্তির প্রবল বৈরাগ্য নিয়ে যাদের প্রব্রজ্যা এবং যে ব্যক্তি আজীবন সেভাব ধারণ করে রাখতে পারে তার অবস্থানে সংঘ সমৃদ্ধ হবে, সদ্ধর্মের উত্তান হবে, এও নিশ্চিত।

'স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু' - নিবন্ধে যা আলোচিত হয়েছে তা বৌদ্ধ দর্শনের সার কথা। এগুলো বৌদ্ধ পারিভাষিক শব্দ। এখানে আলোচ্য শব্দের বিষয়গুলো বহু প্রকারে বিশ্লেষন বিভাজন এবং উপমা সহকারে পিটকের বিভিন্ন নিকায় গ্রন্থ সমূহে আলোচিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে তা হওয়ার সুযোগ নেই। অতিসংক্ষেপে যা ভাষিত হয়েছে তা বৌদ্ধ দর্শন ও তার পারিভাষিক শব্দসমূহের সাথে একান্ত পরিচিত পন্ডিতজন ছাড়া সাধারণ্যের বোধগম্য হওয়া কঠিন।

'লফন-কুহন-নিমিত্ত ও নিস্পেষণ' নামক নিবন্ধে ভিক্ষুদের গৃহীস্বভাব ও দায়ক তোষন নীতি, সম্যক পন্ডিত বা মার্গ জ্ঞানী না হয়েও তার ভান করা, ব্রহ্মচর্যার বেশ ধারণ করেও নারী–পুরুষের প্রতি কাম চেতনায় নিমিত্ত গ্রাহী হওয়া, অপরের মিথ্যা নিন্দাবাদ করা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। লফন, কুহন, নিমিত্ত ও নিস্পেষণ নামক এ সকল নির্বাণ মার্গ বিরুদ্ধ জীবনাচার দ্বারা বুদ্ধ শাসনের সমূহ পরিহানি ঘটে।

এ নিবন্ধে তিনি গৃহীদেরকে মাছ, মাংস, ব্যবসা, প্রাণী ব্যবসা, নেশাদ্রব্য ব্যবসা অস্ত্র ব্যবসা ও বিষ ব্যবসা পরিত্যাগ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

'দেবতারাও সাহায্য করে' নিবন্ধে বনভন্তের আবাসিক সমস্যার সমাধানে দেবতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তার কথা উল্লেখিত হয়েছে। বস্তুতঃ যারা শীলবান, মৈত্রী চিত্ত সম্পন্ন দেবগণের সাহায্য সহযোগীতা অবশ্যই তারা বিভিন্ন ভাবে লাভ করে থাকেন। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এ নিবন্ধে বিধৃত।

'জ্ঞানীরা বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন' - এ নিবন্ধে ভক্তরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ঋদ্ধি প্রদর্শন কামনা করেছিলেন, কিন্তু তিনি কোনদিন কোনক্রমেই তাদের ইচ্ছায় সাড়া দেননি। উপরন্তু তথাগত বুদ্ধের ন্যায় উপদেশ দেন যে, ঋদ্ধি হলো প্রায় যাদু বিদ্যার মতো। এ শক্তি সাধারণ

সাধক সাধিকা এমন কি ভূত প্রেতদের পর্যন্ত থাকে। অতি সামান্য তুচ্ছ সম্পদ এটি। নির্বাণই পরম ধন।

'বনভন্তের দিকে তাকাতে পারিনা' - নিবন্ধে মুসলিম ফকিরদের জিকির 'আল্লাহ্ আল্লাহ্-র পদ্ধতিকে আনাপন স্মৃতির সাথে তুলনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে এটা উদয় ব্যয় ধ্যান। যদি তাই হয়, এ জিকির করে কি লোকোত্তর মার্গজ্ঞান লাভ করা যাবে? আনাপন স্মৃতির মাধ্যমে বোধিসত্ত্ব সিদ্ধার্থ সম্যক সম্বুদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হয়েছেন ঠিক। কিন্তু উদয় ব্যয় স্বরূপের দিকে মনোনিবেশ না করলে কখনো জীব্ন ও জগতের অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম জ্ঞান লাভ সম্ভব নহে। অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম জ্ঞানই লোকোত্তর সত্যজ্ঞান। জিকির করে ফকির দরবেশগণ 'অনাত্মজ্ঞান' অধিগম করেন কি? না, আল্লাহ্ নিমিত্তে 'ব্রহ্মসত্বে' একাকার হয়ে যান? বিষয়টি অনুসন্ধান যোগ্য।

"বৈদুতিক খুঁটি" নিবন্ধে রাজবন বিহার এলাকায় বিদ্যুতায়নের প্রেক্ষাপট উল্লেখিত হয়েছে। এখানে একজন ধ্যানী পুরুষ কত সহজ ও সরল হতে পারেন তার প্রমান আছে। নিজেরা সহজ সরল বলে অন্যের সাধারণ মানুষের কুটিল মিথ্যা কথনকেও সত্য সরলভাবে সহজে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে যখনই তার ব্যতিক্রম দেখেন তখন প্রবল প্রতিবাদী হয়ে উঠেন খুব সহজে। এ নিবন্ধে তার উজ্জ্বল প্রমাণ বিদ্যমান।

'শীলরূপ কাপড় পরিধান কর' নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, উলঙ্গ কুকীদের মাঝে খ্রীষ্টান পাদ্রী প্যান্ট-শার্ট বিতরণ করেন লজ্জা নিবারণের জন্যে। আর আমি শীল চরিত্রহীন উলঙ্গ ভদ্র সমাজে বিতরণ করি পঞ্চশীল রূপ বস্ত্র। পাদ্রী প্রচার করেন খৃষ্টান ধর্ম, আর আমি প্রচার করি সর্ব দুঃখ হর নির্বাণ ধর্ম।

'দশবিধ বন্ধন ছিন্ন করে কাম, মার ও আত্মজয় কর' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, নির্বাণ লাভ করার আগে কি কাজ করতে হবে জান? প্রথমেই দশবিধ বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। এগুলো কি? মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা আধিপত্য, লাভ-সৎকার ও দেশ। এগুলোর আকর্ষন, মায়ামমতা ত্যাগ করতে না পারলে নির্বাণ লাভ অসম্ভব। এসবকে অতিক্রম

করা মানে আত্মজয় করা। যে আত্মজয় করতে পেরেছে সেই প্রকৃত জয়ী, প্রকৃত বীর।

'মৃত্যুর পর সব বিলীন হয়ে যায়' নিবন্ধে বলেন, তোমরা আমি বড়ুয়া, তুমি মুসলমান, সে হিন্দু এসব বলো কেন? তুমি মরে গেলে হিন্দু বা মুসলমান থাকবে? মৃত্যুর পর কর্মের স্রোতে সবই একাকার হয়ে যাবে সাগরে নদীর মতো। মারমা, চাক্‌মা, বড়ুয়া, হিন্দু, মুসলমান, খ্রষ্টান - এগুলি হলো নাম মাত্র ব্যবহারিক সত্য। এসব প্রাপ্ত ধারনায় উৎপন্ন হয়ে শুধু হিংসা, ঘৃণা ও স্বার্থপরতা। সারা বিশ্ব জুড়ে আজ যে হানা-হানি, যুদ্ধ ধ্বংস সব কিছু এজন্যেই।

'নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণ কর' - নিবন্ধে তিনি বলেন, লোকে বলে যে, বৌদ্ধ ধর্ম অত্যন্ত কঠিন ও দুঃখ। তা বুঝতে পারা যায় না। এ জন্যে দরকার অত্যন্ত সোজা, সুখ হয় এবং সহজে বুঝতে পারার মতো উপায় করা। তার একমাত্র উপায় হলো নির্বাণ সম্পর্কিত শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণ করা। শুধু বনভন্তে বল্‌লেই হবে না। তোমাদের নিজে নিজেই দৃঢ়তার সাথে উদ্যোগ নিতে হবে।

তিনি নিজের উদাহরণ দিয়ে বলেন, আমি প্রথম জীবনে অক্লান্ত ও গভীর পরাক্রম দিয়ে নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণে গবেষণা করেছি। বর্তমানে ভিক্ষুরা পারতেছে না কেন?

"বনভন্তে চারি আর্য সত্যের ইঞ্জিনিয়ার' - নিবন্ধে তিনি বলেন, ডাঃ সুপ্রিয় বড়ুয়া (সিভিল সার্জন) হলেন রোগ ও দেহের ইঞ্জিনিয়ার। বাবু অশোক কুমার বড়ুয়া হলেন পাকা ঘরের ইঞ্জিনিয়ার এবং আমি হলাম চিত্ত ও আর্যসত্যের ইঞ্জিনিয়ার। বনভন্তে কি বলতে চায়? বনভন্তে বলতে চায় চারি আর্যসত্য সম্পর্কে। চারি আর্যসত্য কি, তা তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়, বুঝিয়ে দিতে চায়, জানিয়ে দিতে চায়, প্রকাশ করিয়ে দিতে চায়, শিখিয়ে দিতে চায়।

'চিত্তকে সোজা কর' - নিবন্ধে তিনি বলেন, লোহার রড সোজা করা বেশ কষ্টসাধ্য। সেগুলো সোজা না করলে বিভিন্ন কাজে লাগানো যায় না। কিন্তু মানুষের চিত্ত লোহার রডের চেয়েও বহুগুন বেশী আঁকা-বাঁকা। তাই একে সোজা করতে হলে কষ্টও করতে হবে বহুগুণ বেশী। আবার দেখা যায়

লোহার রড সোজা করলে সোজাই থেকে যায়। কিন্তু মানুষের চিত্ত বহু পরিশ্রম করে একটু সোজা করলে আবার আঁকা-বাঁকা হয়ে যায়। এটা এক মহা বিস্ময়কর ব্যাপার। যে স্বীয় চিত্তকে যতক্ষণ সোজা করতে পারবে না ততক্ষণ সে নির্বাণ লাভ করতে পারবে না। এখানে তিনি চিত্তকে সোজা মানে নিজের নিয়ন্ত্রনাধীনে আনয়ন করা, শান্ত সংযত করা, নির্বাচিত বিষয়ে একনিবিষ্ট করা বা সমাহিত করা- বুঝিয়েছেন। চঞ্চল, বিক্ষিপ্তভাবে বিচরণশীল স্বভাব বিশিষ্ট চিত্তকে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে একাগ্রতা সাধনে পুনঃ পুনঃ প্রয়াস চালাতে হয়। এ প্রচেষ্টায় এক সময় দেখা যায়, নির্বাচিত বিষয় হতে চিত্ত আর কোথাও সরে যাচ্ছে না। তখন বুঝতে হবে, স্থির হয়ে থাকাটা তার অভ্যস্ত হয়েছে। চিত্ত সমাধিস্থ হয়েছে।

'কুশলের বল থাকলে নির্বাণ লাভ করতে সোজা' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, নিজের প্রতি নিজে মৈত্রী স্থাপন কর। যে নিজের প্রতি সত্যিকার মৈত্রী স্থাপন করতে সক্ষম হয়, অন্যের প্রতিও সত্যিকার মৈত্রী পোষণ তার দ্বারাই কেবল সম্ভব। বেজি ও সাপের যুদ্ধ দেখেছ? এর নাম জাত অমৈত্রী। মানুষের মধ্যেও তা আছে। মৈত্রী ভাবই হলো তার একমাত্র ঔষধ।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে, এ নিবন্ধে এমন কয়েকটি বিষয় ব্যক্ত করেন যা, আমাদের নিকট স্পষ্ট নহে। যেমন, 'যার অক্ষর জ্ঞান বা সামান্য জ্ঞান ও নেই সে ভাবনা করতে পারবে না' এখানে অক্ষর জ্ঞানের সাথে সামান্য জআনের তুলনা কিভাবে হলো তা বুঝা কষ্টকর। আর এই অক্ষর জ্ঞান ব্যতিরেকে ভাবনা করা অসম্ভব কেন হবে? ভাবনাতো নিজস্ব অনুধাবন ক্ষমতা ও বোধশক্তি জাত। অন্যত্র বলাই হয়েছে, "জনৈক ভিক্ষু নদীর কুলে উদয় ব্যয় ভাবনা অনুশীলন করে'। আমরা জানি বৌদ্ধ সাধনা জগতে 'উদয়-ব্যয়' হলো বিদর্শন সাধনা মার্গের আনুক্রমিক উৎকর্ষের একটি পর্যায় মাত্র। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বর্ণিত 'উদয়-ব্যয় ভাবনা' নামে এমন কোন ভাবনা নেই যাকে বৌদ্ধ সাধনার পরিভাষায়, কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা, মৈত্রী ভাবনা, অশুভ ভাবনা- ইত্যাদি নামে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়।

'পূর্ব জন্মের পূণ্য পারমী, বর্তমানে সদ্‌গুরুর উপদেশ ও নিজের প্রবল চেষ্টা থাকলেই লোকোত্তর জ্ঞান বা ধর্ম চক্ষু উৎপন্ন হয়। কথাটি পিটক

অনুমোদিত এবং প্রণিধানযোগ্য। বর্তমান নিবন্ধে কিন্তু 'অজাত শত্রু' সম্পর্কে কিছু তথ্যগত ভুল আছে। দীর্ঘ নিকায়ের শ্রামণ্যফল সুত্তে উল্লেখিত আছে যে, তিনি পূর্ব জন্মের পূরিত পারমি শক্তি সম্পন্ন ছিলেন।

২৫৩৮ বুদ্ধ বর্ষের শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমার ধর্মদেশনায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, ভিক্ষুর কর্তব্য কি? ভিক্ষুর কর্তব্য হলো- ভিক্ষু, শ্রমণ, উপাসক, উপাসিকাদের জ্ঞান দান, ধর্মদান, এবং অভয় দান দেয়া। বর্তমানে যে সকল ভিক্ষুরা ধর্মের নামে সমাজের এবং দেশের বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত আছেন, সেই ব্যাপারে ভগবান বুদ্ধ কখনো নির্দেশ দেননি। ভগবান বুদ্ধ রাজপুত্র হয়ে তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য পূর্ণ রাজ্য ত্যাগ, স্ত্রী ত্যাগ, পুত্র ত্যাগ এবং যাবতীয় সুখ ভোগ ত্যাগ করে কি জন্যে গৃহ ত্যাগ করে ছিলেন? তিনি শুধু দু'টি বিষয় অন্বেষণ করেছিলেন। সে দু'টি হ'ল কুশল ও সর্বজ্ঞতা জ্ঞান। এ দু'টি লাভের জন্যেই তিনি কঠোর সাধনা করেছিলেন। এ আসনে আমার রক্ত-মাংস শুকিয়ে এ দেহের অবসান ঘটে ঘটুক। কিন্তু, উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত এ ধ্যান আসন হতে উঠবো না।

পাপাত্মা মার সর্বত্র আছে। বুদ্ধকে পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। বুদ্ধত্ব লাভের আগে, যে দিন বুদ্ধত্ব লাভ করলেন সেদিন, ধর্ম প্রচার কালে, এমন কি কুশীনগরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত এ মারের চেষ্টার বিরাম ছিল না। গৃহীকালে অনেক ধর্ম বই পড়ে জেনেছি যে, অনেক ভিক্ষুদের সাথেও মার থাকে। সে সব ভিক্ষুরা জ্ঞান দান ও অভয় দানের পরিবর্তে কু-পথে নিয়ে যায়।

বৃটিশ আমলে জনৈক অল্প শিক্ষিত ডাক্তার যে কোন রোগীকে কেবল ফুস্-ফুস্ পরীক্ষার যন্ত্র দিয়েই চিকিৎসা আরম্ভ করতো। যারা অশিক্ষিত লোক তারা ডাক্তারের এ যন্ত্রের প্রতি অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতো। আর যারা শিক্ষিত তারা এ কান্ড দেখে হাসাহাসি করতো। ঠিক তেমনি বর্তমানেও কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত অদক্ষ ভিক্ষু বৌদ্ধ ধর্মের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

উপসংহারে তিনি বলেন, তোমরা অন্ধ হইও না। চক্ষুষ্মান হও। শ্রীবৃদ্ধি লাভ করো। সবসময়ে লক্ষ্য রাখ যাতে ধর্মের পরিহানি না ঘটে। বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করলে অনবদ্য সুখ (নির্দোষ) অনুভব করতে পারবে।

"নির্বাণের নিকট আত্ম-সমর্পন কর' নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, মানুষ প্রাণের ভয়ে অস্ত্রধারীর নিকট আত্ম সমর্পন করে, প্রভাবশালী লোকের নিকট আত্মসমর্পন করে। আবার কেহ কেহ বিশেষতঃ কোন কোন ভিক্ষুরা নারীর নিকট আত্ম-সমর্পন করে। লোভ-দ্বেষ-মোহের নিকট আত্ম-সমর্পনের শেষ নেই। ভিক্ষুরা নারীর নিকট আত্ম-সমর্পনের চেয়ে বনের বাঘের নিকট আত্ম-সমর্পন করা অনেক ভালো। কারণ, বনের বাঘ খায় রক্ত মাংস। আর নারীরা খায় জ্ঞান, পূণ্য। তোমরা কাহারো নিকট আত্ম-সমর্পন করো না। একমাত্র আত্ম-সমর্পন করো নির্বানের নিকট। আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ হলো ভিক্ষু, শ্রমণ ও উপাসক উপাসিকাদের (হাতির) খেদা। এ খেদায় পড়লে দেব-মনুষ্যগণ নির্বাণের নিকট আত্ম-সমর্পন করতে বাধ্য হয়।

'লংগদুঁ বন বিহারে কঠিন চীবর দান ও বন ভন্তের দেশনা' - নিবন্ধে তিনি বলেন, প্রায় উপাসক-উপাসিকারা ধর্মদান, জ্ঞানদান ও অভয়দান প্রার্থনা করে থাকে। তারা কি ভালো ভাবে জেনে ও বুঝে এ প্রার্থনা করে? তাই, তাদের জানা উচিত ধর্মদান হলো- কোন্‌টা পাপ, কোন্‌টা পূণ্য, কোন্‌টা কুশল, কোন্‌টা অকুশল, কোন্‌টা সুখ, কোন্‌টা সুখ, কোন্‌টা দুঃখ, কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ- তা ভালোভাবে বুঝিয়ে বুঝিয়ে দেয়া, চিনিয়ে দেয়া, দেখায়ে দেয়া। এই ধর্মদান তখনই সার্থক হবে, যদি উপদেশ গ্রহণকারী পাপ ত্যাগ করে, অকুশল ত্যাগ করে, মন্দ ত্যাগ করে।

দুঃখ সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান, দুঃখের কারণ সম্পর্কে জ্ঞান, দুঃখের নিরোধ জ্ঞান ও দুঃখের নিরোধ প্রতিপদায় বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা যথাযথভাবে জানিয়ে, বুঝিয়ে, চিনিয়ে এবং পরিচয়ে যে জ্ঞান দান করা হয় তাকে জ্ঞানদান বলে।

দেহ ধারণ করলেই নানাবিধ ভয়ের কারণ হয়। যেমন, মৃত্যু ভয়, রোগ ভয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভয়, জীবজন্তুর ভয়, শত্রুর ভয়, দন্ড-অস্ত্রের ভয়, রাজ ভয় এবং নানাবিধ উপদ্রব ভয় - এসকল বিবিধ ভয় হতে যে ব্যক্তি নিজে মুক্ত হয়েছেন, ভয় শুন্য হয়েছেন, তিনিই কেবল অন্যকে অভয় দান করতে পারেন।

তিনি বলেন, বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে কি? বুদ্ধের উপদেশ- বেঁচে থাকাটাই দুঃখজনক। তাহ'লে মরে গেলে কি সুখ? না, তা নয়। জীবিত ও নয়, মৃত ও নয়। কেউ কেউ বলে মরে গেলেই সুখ। মরে যাওয়ার পর চার অপায়ে গেলে কি সুখ? তিনি বলেন, দুঃখের চরমে গিয়ে কেহ কেহ আত্ম হত্যা করে। সুখ ও পূণ্যে কখনো আত্মহত্যা করায় না। পাপের কারনেই তা হয়। শীলবান জীবনে পাপ নেই। তাই ক্ষুদ্র পাপ হতে মুক্তির জন্যে ক্ষুদ্রশীল রক্ষা কর। মধ্যম পাপ হতে মুক্তির জন্যে মধ্যম শীল রক্ষা কর এবং মহা পাপ হতে মুক্তির জন্যে মহা শীল রক্ষা কর। চিত্তকে যেন কোন পাপ স্পর্শ করতে না পারে সে দিকে সর্বদা জাগ্রত দৃষ্টি রাখতে হবে। কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস কর। বুদ্ধের ধর্মকে মনে প্রাণে বিশ্বাস এবং মেনে চল। যদি আমার নির্দেশিত পথে চল নিশ্চয় তোমাদের মঙ্গল হবে এবং মুক্তির পথ সুগম হবে। অন্যথায় মহা বিপদ হবে। তবে হ্যাঁ, বনভন্তের উপদেশ গ্রহণ না করতে পার, তাকে শ্রদ্ধা না করতে পার। কিন্তু সমালোচনা কর না। সমালোচনা করলে মহাবিপদ হতে পারে।

“ পঞ্চ স্কন্ধের উত্থান-পতন বা জন্ম প্রবাহ বন্ধ কর”- নিবন্ধে তিনি বলেন, পঞ্চ স্কন্ধের উত্থান পতনেই প্রাণীরা একবার জন্ম, আর একবার মৃত্যু, এভাবে চক্রাকারে ঘুরছে। এ আবর্তন মহা দুঃখজনক। জন্ম-মুত্যুর এ প্রবাহকে বন্ধ করতে না পারলে দুঃখ থেকে ত্রাণ কোথায়? জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। জন্মের কারণ অবিদ্যা ও তৃষ্ণা। অবিদ্যা তৃষ্ণার হাত থেকে রেহাই পেতে হলে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা ভাবনা করতে হবে। শীল মানে

সংযম। চঞ্চল স্বভাব বিশিষ্ট চিত্তকে সংযত করতে হলে প্রথমে পরিপূর্ণ শীল পালন করতে হবে। এভাবে আত্মদমনের শক্তি বৃদ্ধিতে চিত্ত সহজেই সমাধিস্থ হওয়ার ক্ষমতা লাভ করে। চঞ্চল চিত্তকে স্থির করার একমাত্র উপায় শপথ-বিদর্শন ভাবনা। একটা ব্যবসা করতে হলে পুঁজির দরকার। ঠিক বিদর্শন ভাবনা করতে হলেও শীল ও শমথ ভাবনার দরকার। তিনি বলেন, বিদর্শন-এ প্রথমে পঞ্চস্কন্ধকে চিনতে হবে, জানতে হবে এবং দুঃখানু দুঃখরূপে বুঝতে হবে। পঞ্চস্কন্ধ সম্পর্কে ভালোভাবে পরিচয় হলে উদয়-ব্যয় ভাবনা করতে হবে। বিশুদ্ধভাবে উদয় ব্যয় ভাবনায় ক্রমান্বয়ে বুদ্ধজ্ঞান উৎপত্তি হয়। এ বুদ্ধ জ্ঞানে সর্ববিধ দুঃখ নিরোধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম-মৃত্যু ও নিরোধ হয়। নির্বাণে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নেই। 'অর্ন্তদৃষ্টি ভাব উৎপন্ন কর' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, মানুষের মনের মধ্যে কাম-প্রবৃত্তি,হিংসা প্রবৃত্তি এবং রাগ প্রবৃত্তি নামে কতগুলি শত্রু লুকায়িত আছে। এগুলো মানুষের মনের ভিতরে থেকে সব সময় মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে। এসব শত্রুকে জ্ঞানের বলে, সত্যের বলে এবং পুণ্যের বলে যারা বের করে দিতে পারেন তাদের চিত্ত হয় আরোগ্য ও স্বাধীন। এইসব প্রবৃত্তি চিত্তে উৎপত্তির সাথে সাথেই বের করে দিতে হবে।

'ত্যাগ, অনাসক্ত ও বিবেকই উত্তম সুখ' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, কামাসক্তি, ইন্দ্রিয়াসক্তি, আহারাসক্তি, মিত্রাসক্তি ও কামাসক্তি সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। হীন মনুষ্যত্ব ত্যাগ করতে হবে। যাবতীয় তৃষ্ণা ত্যাগ করতে হবে। হীন সংস্কার ত্যাগ করতে হবে এবং ত্রিবিধ বিবেক অবলম্বন করতে হবে। যথা- লোকালয় বর্জন করে নির্জনে ধ্যানস্থ হয়ে কায় বিবেক অবলম্বন করা, চঞ্চল ও অস্থির চিত্তকে স্থির করে চিত্ত বিবেক অবলম্বন করা এবং চিত্তে স্থিত বিভিন্ন সংস্কার পুঞ্জ ক্লেশ গুলো উচ্ছেদ করে চিত্তে নির্বাণ উপলব্ধি করা। এগুলোকে বর্জন সহজ নয়। তাই বিষয়গুলোর স্বভাব প্রকৃতি অবগত হওয়া এবং সেগুলো ত্যাগ করার জন্যে প্রত্যেককে দৃঢ় কণ্ঠে বলতে হবে হে মন, চিত্ত তুমি অনাসক্ত ও বিবেক পূর্ণ হও।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, ব্যাঙ পাল্লাতে মাপতে মহা কষ্টকর। তাই পলিথিনের ঠোঙায় ঢুকায়ে মাপার কৌশল অবলম্বন করতে হয়। ভিক্ষু, শ্রমণ, উপাসক, উপাসিকাদেরকেও অনুরূপ পলিথিনের সন্ধান করতে হবে। এই পলিথিন হলো- শক্তি থাকতে দুর্বলের ন্যায়, মুখ থাকতে বোবার ন্যায়, কান থাকতে বধিরের ন্যায় এবং চোখ থাকতে অন্ধের ন্যায় থাকতে হবে। এই কৌশলগুলি হল পলিথিনের থলের মতো।

'মশারী রূপ অভয় দান' নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন, মশারী থাকলে মশা ও নানাবিধ পোকার উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যায়। দায়কেরা ভিক্ষুদের চতুঃপ্রত্যয় দান করেন। তার বিনিময়ে ভিক্ষুরা দায়ক ও উপাসকদেরকে ধর্মতঃ ত্রিবিধ অভয় দান করতে পারেন। এ ত্রিবিধ দান কি? ধর্ম দান, জ্ঞান দান আর অভয় দান। এ নিবন্ধে তিনি ধর্ম দান বলতে এবং জ্ঞান দান বলতে পুনঃ যা ব্যাখ্যা দিলেন তা পূর্বে লংগদু বনবিহারে কঠিন চীবর দান ও বনভন্তের দেশনা' - নিবন্ধে বর্ণিত ব্যাখ্যার সাথে সৌসাদৃশ্য রক্ষা করে না। পাঠকের অনুধাবন সুবিধের জন্যে তাই বর্তমান নিবন্ধের বর্ণনা ও তুলে ধরা হলো। - চারি আর্যসত্য ও পটিচ্চ সমুপ্পাদ সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ রূপে বুঝিয়ে দেয়া হলো ধর্ম দান। লোকোত্তর জ্ঞান ও নির্বাণ সম্বন্ধে পুংখানুপুংখ বুঝিয়ে দেয়া হলো জ্ঞান দান। বিভিন্ন আপদ-বিপদ ও উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি বা আশীর্বাদ প্রদান হলো অভয় দান। এ দান ছাড়া অন্য কোন দান ভিক্ষুরা দিতে পারেন না।

'অন্যায়, অপরাধ, ভুল ক্রুটি, দোষ ও গলদ করোনা' - কোন নিবন্ধের এমন ধরণের বাক্য জোড়া নামারণ বিসদৃশঃ। নিবন্ধকার আরো কিছু নিবন্ধের নামাকরণে অনুরূপ অচেতনের পরিচয় দিয়েছেন। অথচ, কতগুলো নিবন্ধের নামাকরণে এমন শৈল্পিক মনের পরিচয় দিয়েছেন যা সত্যি প্রশংসার যোগ্য। যাই হউক, বর্তমান নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পরম আশ্বাস বাণীটি লেখক তুলে ধরেছেন। এখানে পূজ্য ভন্তে বলেন, তোমরা মিথ্যার আশ্রয়ে যেয়োনা, সত্যের আশ্রয়ে যাও। সত্য তোমাদের রক্ষা করবে এবং পরম সুখ প্রদান করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মুহূর্তে, কথায়, কাজে ও চিন্তায়, অন্যায়, অপরাধ, ভুলক্রুটি গলদ ও দোষ করো না। অচিরেই তোমাদের পরম সুখ বয়ে আসবে।

তিনি বলেন, বর্তমানে কিছু লোকের ধারণা বুদ্ধ অজ্ঞানী ও গরীব। তাদের অবিশ্বাসের ফলে তারা বুদ্ধের নির্বাণ পথ হতে সরে দাঁড়াচ্ছে। যেমন, কোন কোন ভিক্ষু অনাথাশ্রম গড়ে তোলছে, কেউ কেউ সামাজিক কর্মে নিজেকে সারাক্ষণ নিয়োজিত রাখছে। আর কেউ কেউ অন্যান্য নানাবিধ কর্মের অধীনে থাকে। অর্থের ও প্রতিপত্তির মোহে নিজে ও মুক্ত হতে পারছেন না এবং অপরকেও মুক্ত করতে পারছেন না। তিনি বলেন, এম. এ. পাশ করে নরকে পড়লে সে লেখা পড়ার কোন মূল্য নেই। যে যতটুকু লেখা পড়া করুক না কেন তার পাপে লজ্জা থাকতে হবে। ভয় থাকতে হবে। পাপের প্রতি ঘৃণা থাকতে হবে। তবেই, তার এম. এ. পাশের মূল্য পাবেন।

তিনি বলেন, অন্ধকে যেমন কোন জিনিস দেখানো বৃথা, মূর্খকে চারি আর্যসত্য ও উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে বুঝানোও বৃথা। মুর্খেরা নানাবিধ দোষ করেও অবাধ্য থাকে। সব সময় অজ্ঞানে সংঘর্ষ বাঁধে। দুঃশীল অধর্ম পরায়ণ ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্ম নষ্টের কারণ।

'যক্ষিণীর সাথে তিন বৎসর বসবাস' নিবন্ধে বনভন্তের দেশনা বলতে তেমন কিছুই নেই। এখানে বনভন্তের বিহার পরিচালনা কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি বাবু নির্মল কান্তি চাক্মার ভাই প্রমোদ রঞ্জন চাকমার সাথে সম্পর্কিত যক্ষিণীর ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এ ইতিহাস অলৌকিক হলেও চমকপ্রদ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মতে, পাঁচশত বছর পূর্বে হাজারীবাক্ মৌজার কান্দাব ছড়ার কাগত্যায় গ্রামে নির্মল বাবুর ভাই প্রমোদ রঞ্জন চাক্মা যক্ষিণীটি স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কিত হয়ে মানব জীবনের ইহলীলা সংরক্ষণ করেছিলেন। বৈজ্ঞানিক নিরেট বস্তুবাদী চিন্তা চেতনার যুগে ও বিশ্বব্যাপী প্রচলিত লোক বিশ্বাস এবং আড়াই হাজার বছরের পুরনো বৌদ্ধ সাহিত্যে অশরিরী সত্ত্বদের যে সব জীবনাচারের উল্লেখ পাওয়া যায় এ নিবন্ধে তার প্রত্যক্ষ এবং বাস্তব প্রমাণ মিলে।

ঘাগড়ায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনা করতে গিয়ে বলেন, আজ তোমরা আমার দেশনা শ্রবণ করতেছ। যদি তোমরা ধনে, জনে, স্ত্রী-পুত্রে নানা প্রকার অহংকারে অন্ধ হও তবে এ ধর্ম দেশনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। যদি অজ্ঞানতা থাকে ব্যাধের মতোই ধর্ম দর্শন হবে না। তিনি বলেন, চন্দ্র সূর্য চোখে দেখা যায়। কিন্তু তাদের অবস্থান তোমাদের থেকে অনেক দূরে। সেরূপ বৌদ্ধ ধর্ম ও না জানলে না বুঝলে, না শুনলে, না চিন্‌লে স্বাদ না পেলে এবং রুচি না হলে, তোমরাও ধর্ম হতে অনেক দূরে অবস্থান করবে।

লোভ, হিংসা ও অজ্ঞানতা সহ কথা বললে, কাজ করলে, নিজেও দুঃখের ভাগী হয় এবং অপরকেও দুঃখের ভাগী করে। আর যারা লোভহীন, দ্বেষহীন, মোহহীন ভাবে কথা বলেও কাজ করে, তারা নিজেও সুখী হয় এবং অপরকেও সুখী করতে পারে। পূর্বে মানুষ বাঘ, ভালুককে ভয় করতো। এখন মানুষ মানুষকে ভয় করে। যদি মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে এবং মৈত্রী ভাবাপন্ন হয় দন্ড-অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। যারা অজ্ঞানী তারা আমার কথাগুলি বুঝবে না। যারা জ্ঞানী তারা আমার কথাগুলি বুঝতে সক্ষম হবে। যারা জ্ঞানী তারা প্রকাশ্যে বা গোপনে কোন অবস্থাতেই পাপ করবে না। সব সময় সাবধান থাক। সাবধানে থাকলে পাপ হবে না। সাবধানের মার নেই, বিপদও নেই। যারা কাপুরুষ তারা সাবধানতা অবলম্বন করেনা এবং পালিয়ে থাকে। অসাবধান ব্যক্তি কুকর্মে লিপ্ত থাকে। তারা ঘরে ঘরে দলাদলি, হিংসা, রেষারেষি প্রভৃতি বহূ দুঃখের সৃষ্টি করে।

১৯৯৪ সালের ৭ই নভেম্বর কাঁটাছড়ি বন বিহারে বৈকালিক ধর্ম সভায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এক ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলেন, তোমরা শীলবান ও প্রজ্ঞাবান হও। যদি তোমরা আমার উপদেশে অগ্রসর হতে পার আগামী ৩০ বছর পর তোমাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এমনকি স্বর্ণের খনি, লৌহের খনি, সীসার খনি, তৈলের খনি, গ্যাসের খনির অধিকারী হতে পারবে। যারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশলের অধিকারী হয় তারা এ পূণ্যের ফলে অনেক সময় বিপুল ধনের অধিকারীও হয়।

তিনি বলেন, কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করলে স্বর্গে যেতে পারে। তা লৌকিক ধর্ম। ক্ষণস্থায়ী, জন্ম-মৃত্যুর অধীন, হা-হুতাশ পূর্ণ ও দুঃখময়। যারা চারি আর্যসত্যকে বিশ্বাস করে তারা নির্বাণ লাভ করতে পারে। তা লোকোত্তর ধর্ম। দান দিয়ে, শীল পালন ও ভাবনা করে দুঃখ মুক্তি তথা নির্বান প্রার্থনা করা উচিত। যারা মুক্তিকামী তারা ধনকামনা, পুত্র কামনা, রাষ্ট্র-কামনা, এমনকি আপন সমৃদ্ধির জন্যে কোন কামনাই করেন না। এসব কামনা অজ্ঞান ও তৃষ্ণা জাত। বহু উপদ্রব ও দুঃখের কারণ। নির্বাণ অবিদ্যা বা অজ্ঞান ও তৃষ্ণা বিমুক্ত। নির্বাণ জীবিত ও নয় মৃত ও নয়। জন্ম মৃত্যুর নিরোধই নির্বাণ। নির্বাণে ইহকাল, পরকাল নেই। কোন ভৌগোলিক অবস্থানও নেই। কর্মবন্ধনযুক্ত মানুষ মৃত্যুকালে নানা কর্মনিমিত্ত ও গতি নির্মিত্ত দর্শন করে দেব, মানব, তির্যগ, প্রেত, নিরয় ইত্যাদি লোকে উৎপন্ন হয়। কিন্তু নির্বাণের কোন নিমিত্ত নেই। তারা বিমুক্ত চিত্ত সম্পন্ন। তারা পূনঃ জন্মের কারন অবিদ্যা, তৃষ্ণাজাত আসক্তি সম্পূর্ণ রূপে ক্ষয় করে পরি নির্বাপিত হন। নির্বানে পাপ ধর্ম ত্যাগ, পূণ্য ধর্ম ও ত্যাগ হয়। কারণ উভয় ধর্মই কর্ম সংযুক্ত জন্মমৃত্যুর অধীন। তাই দেখা যায়, যারা অরহত তারা কোন ধর্ম করেন না। পূণ্য ধর্মও করেনা, পাপ ধর্মও করেনা। বনভন্তেও কোন ধর্ম করে না। পাপ ধর্মও করেনা, পূণ্য ধর্মও করেনা।

শ্রদ্ধেয় ভন্তের এ উক্তিতে তাঁর অরহত্ব প্রাপ্তি সরাসরি প্রকাশিত হলো। কিন্তু ইতিপূর্বে ১৯৯৩ ইং ইংরেজীর ২৮শে সেপ্টেম্বর দেশনায় তিনি পরোক্ষভাবে তার বিপরীত মত-ই প্রকাশ করেছেন। বনভন্তের এই হ্যাঁ-না বোধক অভিব্যক্তিকে আমাদের সাধারণ জনের একটি কৌতুহলী প্রশ্ন বরাবরই অমিমাংসিত থেকে গেল।

'কুশল কর্মে জীবনে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন, কঠিন চীবর দান সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নাগিত স্থবির যা বলেছেন তা অনেকের বিশ্বাস হয় না। কারণ শাস্ত্রের কথা, পুথিগত বিদ্যা এবং পর কথায় সহজে মনে বিশ্বাস জন্মে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেই নিজের মনে ফুটিয়ে তুলতে না পারে

ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস জন্মানো সহজ নয়। ছাইএ আগুন না থাকলে সারাদিন ফুঁদিলেও আগুন জ্বলবে না। তেমনি যার মধ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞান নেই তার মধ্যে বিশ্বাস জন্মানো কঠিন ব্যাপার।

১৯৯৪ এর ১৫ই নভেম্বর জুরাইছড়ি বন বিহারের চীবর দানে ধর্মদেশনা কালে শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন, বনভন্তে চাক্‌মার ঘরে জন্ম গ্রহণ করে চাক্‌মা জাতিকে জ্ঞানদান করতে না পারলে তা হবে মহা লজ্জাজনক ব্যাপার। যদি চাক্‌মা জাতি হতে কমপক্ষে দুই হাজার ব্যক্তি বুদ্ধজ্ঞান লাভ করতে পারে তবেই বড়ুয়া সম্প্রদায় বলতে পারবে, “হ্যাঁ, বনভন্তে আমাদেরকেও বুদ্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এ উক্তি গভীর স্ব-জাতী প্রেম জাত। যা জ্ঞাতী ধর্ম রক্ষার অংগও বটে। বুদ্ধাদি মহামানবদের জীবনেও আমরা এহেন মনোবৃত্তির বহিঃ প্রকাশ দেখতে পাই। যা কখনো স্বজন প্রীতির দোষ দুষ্ট নহে। জন্ম জন্মান্তরের কর্ম বন্ধন জাত জ্ঞাতী বক্তব্যেরই অন্তর্গত।

‘ভাই-এর বেশে দেবতার আগমন’ নিবন্ধে ১৩৯৯ বাংলার ২৬শে চৈত্রে খাগড়াছড়ির পানছড়িতে সংঘটিত বিষয়টি অতিপ্রাকৃত হলেও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মতো সৎ পুরুষ কল্যান মিত্রদের সাহচর্য লাভীদের জীবনে দেবগণের সহায়তা লাভ মোটেই অসম্ভব কিছুই নহে। বিশেষতঃ যাদের হৃদয়ে সর্বদা মৈত্রী, করুনা ও মুদিতা গুণে পরিপূর্ণ থাকে তারা সকল কাজে ও আপদে-বিপদে দেবতাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহায়তা অবশ্যই পেয়ে থাকেন।

‘আগুন লেগেছে বেরিয়ে এস’ - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের হৃদয়ের এক গভীর নৈরাশ্য ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি বলেন, আমার কথা প্রায় লোকে শোনে ও শোনে না। বিশ্বাস করেও করেনা। যদি আমার কথা শোনতো বা বিশ্বাস করতো তারা নিশ্চয় ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো। কেউতো আমার ডাকে তেমন সাড়া দিচ্ছে না। সবাই জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বনভন্তেকে গভীর আত্ম-বিশ্বাসের সাথে

বলতে শুনি বনভন্তের মাধ্যমে ধর্মের জোয়ার শুরু হয়েছে। এ জোয়ার কোন বিরুদ্ধ শক্তি থামাতে পারবে না।

স্বয়ং তথাগত বুদ্ধের জীবনেও আমরা একই আশা-নিরাশার দোলাচল লক্ষ্য করি। স্থির, সমাধিস্থ, বিমুক্ত সমস্ত লোক ধর্মে অকম্পিত ইন্দ্রখিল পাষান স্তম্ভ সম চিত্তের এমন ভার্ব কেন হবে? এ প্রশ্নের উত্তর দান আমার মতো দরিদ্রের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

'দূর্গার খাড়ু' - নিবন্ধে খাড়ু খোদাইকৃত পাথরটির মধ্যে কিছু অলৌকিক শক্তির আশ্রয় কিভাবে হলো- এ প্রশ্নের উত্তর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হতে জানা দরকার। আমার ধারণা লোকের অন্ধ শ্রদ্ধা ভক্তি জাত চিত্ত শক্তি একটি সাধারণ কিছুর উপরও অলৌকিক ঋদ্ধি শক্তির জন্ম দিতে পারে। এটা সমথ ভাবনার প্রতিপাদ্য বিষয়।

১৯৯৪ ইংরেজীর ১৭ই অক্টোবরের প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনায় তিনি বলেন, অন্যান্য প্রাণীর কথাই বা কি মানুষের জীবনেও কি দুঃখের সীমা আছে? মানুষ নানা প্রকার চিন্তা করে। চিন্তারও কোন শেষ নেই। তবে এমন চিন্তা করা দরকার যে, চিন্তায় সর্ব দুঃখ মুক্ত হওয়া যায়। তিনি বলেন, ভগবান বুদ্ধ চারি আর্যসত্য সম্পর্কে চিন্তা করতে বলেছেন। মানুষ কিসে দুঃখ পায়? অবিদ্যা ও তৃষ্ণায়। চারি আর্য সত্য চিন্তায় সেই - অবিদ্যা ও তৃষ্ণা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা ও তৃষ্ণা ক্ষয়ে চির মুক্তি লাভ হয়। মুক্ত জনই অপরকে মুক্ত করতে পারে। অমুক্তের মুখে বিমুক্তি দেশনা একান্ত অবাস্তব।

'কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়' - নিবন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, তোমরা কি অবস্থায় আছ? অমাবস্যার রাতের ন্যায় অবিদ্যার ঘোর অন্ধকারেই তোমরা আছ। এ ঘোর তমসা মুক্তির জন্যে প্রবল উৎসাহ পরাক্রমে চারটি পাহাড় তোমাদের অতিক্রম করতে হবে। সে চারটি কি কি? কাম পাহাড়, সংসার পাহাড়, সুখ পাহাড় এবং দুঃখ পাহাড়।

বনভন্তের দেশনা সংকলন ২য় খন্ড এ পর্যন্ত এসে স্থির হলো। প্রতিদিন দূর দূরান্ত হতে সমাগত পূণ্য পিপাসু মুক্তি পিপাসু ভিক্ষু গৃহীরা ছুটে আসেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দর্শন, ধর্ম শ্রবণ প্রত্যাশায়। পার্বত্য ও সমতলে বনভন্তের আমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে সমবেত হয় হাজার হাজার মুক্তি পিপাসু নরনারী। রাঙ্গামাটি রাজ বন বিহারের শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য সংঘের জন্যে কেন্দ্রীয় বিহার। এখানে প্রতি নিয়ত অর্ধ থেকে শতাধিক ভিক্ষু শ্রমণের অবস্থান আছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ভোর ৪.০০ টা থেকে রাত ১০.০০ টা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে মহামূল্যবান এবং শিক্ষামূলক ধর্ম দেশনা করে চলেছেন অবিরাম অবিশ্রান্ত।

বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি সচেতন পরিবেশে তাঁর ধর্মগঙ্গার এ অবিরাম প্রবাহকে অনাগত কালের জন্যে অবশ্যই ধরে রাখা সম্ভব হতো। দারিদ্রের কষাঘাত জর্জরিত এ হতভাগ্য সমাজে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ন্যায় আরো কত সুরভিত কুসুমের বিচ্ছুরিত সুবাস এ প্রয়াসের অভাবে অজান্তেই নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে জনারন্যের মাঝে তার ইয়ত্তা নেই। কল্যাণ মিত্র সংসর্গ ধন্য ডাঃ অরবিন্দ বাবুকে প্রাণ ভরা প্রীতি ও মৈত্রীময় শুভাশীষ জানাই অবিরাম বাহিত বনভন্তের ধর্মগঙ্গা হতে সামান্য কয়েক ফোঁটা বিমুক্তির অমৃত বারি আমাদের উপহার দেয়ার জন্যে।

অনর্গল বলে যাওয়া দেশনাকে লেখনিতে যথাযথ ভাবে ধরে রাখা কষ্ঠ-সাধ্য, শ্রমসাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। 'বিশেষতঃ শর্টহ্যান্ড লিখন' জ্ঞান না থাকলে প্রয়াসটি দুঃসাধ্য ও বটে। জানিনা ডাঃ অরবিন্দ বাবু সাংকেতিক লিখ পদ্ধতিতে অভিজ্ঞ কিনা। কিন্তু, সংকলিত দেশনাগুলো পড়তে গিয়ে কিছুতেই মনে হয়না যে, বনভন্তের দেশনার বিষয়বস্তু গুলো অন্যের মুখে ব্যক্ত হচ্ছে বা অন্যের লেখনিতে ধারণ করা হয়েছে। সংকলিত নিবন্ধগুলোর প্রতিটি বাচন ভঙ্গি একান্তই এবং হুবহু বনভন্তের। ভাবলেও অবাক লাগে কেমন করে ডাক্তার বাবু এ দক্ষতা অর্জন করলেন।

নিবন্ধগুলোর মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে ডাঃ নিজস্ব উপলব্ধি জাত মন্তব্যগুলো অত্যন্ত সম্যকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কিছু কিছু নিবন্ধে বক্তব্য উপস্থাপন এবং আনুসাঙ্গিক বর্ণনা শৈলী দারুণ চমৎকার। দক্ষ কথা শিল্পীর বর্ণনা চাতুর্য এবং চুম্বক শক্তি দৃষ্টিতে তিনি উত্তীর্ণ। তাই নিবন্ধগুলো পাঠ করতে মোটেই একঘেঁয়েমির অবসাদ আক্রান্ত হতে হয়না।

দু'একটি ব্যতিরেকে নিবন্ধের শিরোনাম নির্ধারণে ডাঃ বাবুর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না। নিবন্ধের শিরোনাম গুলো ইংগীত দিয়ে দেয় নিবন্ধের সামগ্রিক বক্তব্যের। শুধু তা-ই নহে এখানে তাঁর (ডাঃ বাবুর) সাহিত্যিক রসবোধের পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিমুক্তি রস সমৃদ্ধ এ মূল্যবান ধর্মদেশনাগুলো পাঠকদের নিকট পৌঁছে দেয়া যে, মৈত্রী করুণাজাত প্রবল তাগিদ ডাঃ অরবিন্দু বাবু অনুভব করেছেন তারই ফসল "বনভন্তের দেশনা- ২য় খন্ড" গ্রন্থখানি। মুক্তি পিয়াসী পাঠকের পক্ষ থেকে তাই আবারো সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই ডাঃ বাবুকে তাঁর নিরোগ দীর্ঘায়ু কামনা করে। আমরা প্রত্যাশা করবো তিনি এবং বন বিহার পরিচালনা কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতিদিনের মহা মূল্যবান দেশনা গুলোর প্রত্যেকটি নিখুঁতভাবে উপহার দানের এ মহা প্রয়াস অক্ষুন্ন রাখবেন।

পরিশেষে আমার সকল অক্ষমতার জন্যে সকলের নিকট দুঃখ প্রকাশ করছি। 'বনভন্তের দেশনা' -১ম খন্ডের জন্যে একটি অভিমত লিখে দিতে ডাঃ অরবিন্দ বাবু আমাকে বহুবার বিভিন্নভাবে অনুরোধ জানিয়ে ছিলেন। আমি তাঁর সে আশা পূরণ করতে পারিনি। কেন যে পারিনি তা এবারে তিনি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন নিশ্চয়। কারণ, ২য় খন্ডটির পান্ডুলিপি আমার হাতে পৌঁছে তিনমাস আগে। এ দীর্ঘ সময় লেগে গেল শুধু পান্ডুলিপিটি পাঠ করে একটি ভূমিকা লিখে দিতে। এ বিলম্ব একান্তই আমার অনিচ্ছাকৃত। একনাগাড়ে পড়ে দু'চারদিনের মধ্যে দায়িত্বটা শেষ করার মোটেই অসম্ভব ছিলনা। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার কোনদিন হয়নি।

কোন সময় রাত ৩.০০ টা অথবা ভোর ৪.০০ টায় উঠে দু'এক পৃষ্ঠা পড়ি আর কিছু নোট টুকে নিই, কোন সময় দায়কের বাড়ীতে দু'চার মিনিট সময়, বাড়ীতে বসার সুযোগ পেলে অনবরত ঝাঁকুনির মাঝে কিছুক্ষণ এভাবে সমগ্র পাণ্ডুলিপি পড়া এবং ভূমিকা লেখা শেষ করলাম। শুনে নিশ্চয় হাসি পাবে - এ গ্রন্থের ভূমিকা লিখা ১২ই সেপ্টেম্বর '৯৫ এ চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে শুরু হয়ে ঢাকা রেঙ্গুন, পাগান, মান্ডালে মেমিও সব জায়গা ঘুরে অদ্য ২০শে নভেম্বর ১৯৯৫ ইংরেজীর সোমবারে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে বিকাল ৪.৩০ মিনিটে সমাপ্ত হলো। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা গ্রন্থটির পটভূমি লিখতে যতটুকু শারীরিক সুস্থতা এবং মানসিক একাগ্রতা থাকার দরকার ছিল সে সৌভাগ্য আমার কোন দিন হয়নি। এতে করে ভূমিকাটি সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণতা লাভে মোটেই সম্ভব হয়নি। আমার এ অক্ষমতার জন্যে আবারো দুঃখ প্রকাশ করে ইতি টানছি।

ভবতু সব্ব মঙ্গলম

২৫৩৯ বুদ্ধাব্দ
৬ই অগ্রহায়ন ১৪০২ বাংলা
১৯৯৫ ইংরেজী
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার

শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
বি. এ. (অনার্স), এম. এ. (ডবল), ১ম শ্রেণী
সভাপতি, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ প্রগতি সংঘ, বাংলাদেশ
মহাসচিব, বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা।

শুভেচ্ছা বাণী

ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া ও বাবু সজল কান্তি বড়ুয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলশ্রুতি "বনভন্তের দেশনা" (১ম খন্ড) নামক প্রকাশনাটির প্রথম সংস্করন পাঠক মহলে সাদরে গৃহীত হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনাকে কেন্দ্র করে আরও একটি বই (২য় খন্ড) প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। উক্ত প্রকাশনার মাধ্যমে স্ব-ধর্ম প্রচার ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা ও উপদেশ বাণী দেশের বৌদ্ধ জন-সাধারণের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার উদ্যোগটি প্রশংসনীয়।

আমি এই প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি ও শ্রদ্ধাবান পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি।

রাজবাড়ী, রাঙ্গামাটি
৩১শে অক্টোবর '৯৫ ইং।

রাজা দেবাশীষ রায়
চাক্‌মা রাজা।

শুভেচ্ছা বাণী

রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারাধ্যক্ষ পরম আর্য্যপুরুষ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ধর্মোপদেশ সন্নিবেশ করিয়া এই পুস্তক সংকলিত হইয়াছে। পুস্তক প্রণয়নে গ্রন্থকার মহাশয় কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন। শ্রুত বিষয়কে পুস্তাকারে প্রকাশ করার মাধ্যমে তিনি সদ্ধর্ম হিতৈষনার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ভাষার সাবলীলতা ও প্রকাশ ভঙ্গীর গুণে পুস্তকের বিষয়বস্তু সুবোধ্য হইয়াছে। এই পুস্তক পাঠে ধর্ম পিপাসুরা সবিশেষ উপকৃত হইবেন বলিয়া আমার আন্তরিক বিশ্বাস। আমি এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থকার ও পুস্তক প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হউক।

ইন্দ্রনাথ চাকমা
সাধারণ সম্পাদক
রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটি

চম্পক নগর, রাঙ্গামাটি
তারিখ- ১৫/১০/৯৫ ইং।

সবিনয় নিবেদন

সহৃদয় পাঠকবৃন্দ সমীপে আমার সবিনয় নিবেদন এই, এই পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় সমূহ অরণ্যচারী মহাসাধক শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের মুখ নিঃসৃত ধর্মোপদেশের উপর ভিত্তি করিয়া সংকলিত হইয়াছে। গ্রন্থকার মহাশয় একজন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। তিনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একজন শ্রদ্ধাবান উপাসক হিসাবে বহু বৎসর ধরিয়া নানা ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড উপলক্ষে এবং ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন সময়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হইতে ধর্মোপদেশ শ্রবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আলোকে এই পুস্তক প্রনয়নে প্রবৃত্ত হন। তিনি এই বারে প্রথম এধরনের পুস্তক প্রনয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এমন নহে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের ধর্মোপদেশ অবলম্বনে তাঁহার সংকলিত "বনভন্তের দেশনা ১ম খন্ড" পুস্তকখানি ১৯৯৩ সনে বাবু সজল কান্তি বড়ুয়ার অর্থানুকূল্যে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং মুদ্রিত পুস্তক সমুহ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইয়াছিল।

শ্রুত বিষয়কে ছাপার অক্ষরে রূপ দেওয়া সহজ কাজ নহে। বিশেষতঃ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মুখ নিঃসৃত সদ্ধর্ম ব্যাখ্যা বিষয়ক উপদেশ সমূহ শ্রবন করিয়া পুস্তকারে প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন কাজ। গ্রন্থকার মহাশয়ের প্রবল ধর্মানুরাগ, গভীর মননশীলতা ও বহু আয়াসের ফলে এই পুস্তক প্রকাশের মত এমন মহৎ কাজ সুসম্পাদিত হইয়াছে। ভাষার সরলতা, ভাবের উপর প্রকাশ ভঙ্গীর মাধুর্য্যে পুস্তকের প্রতিপাদ্য বিষয় বস্তু সুবোধ্য হইয়াছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের উপদেশাবলী সংকলনে তাঁহার এহেন উদ্যোগ "সিন্ধুর মধ্যে বিন্দুতুল্য" হইলেও ইহা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর ভবিষ্যতে আরও পুস্তক সংকলন ও প্রকাশ করিয়া সদ্ধর্মানুরাগী পাঠক মহলকে উপহার দিতে সক্ষম হইবেন, এই কামনা করি।

প্রাসঙ্গিক কারনে বলিতে হয়, বৌদ্ধ ধর্ম অতি সূক্ষ্ম, গম্ভীর, দুদ্দর্শ ও সাধারণের দুর্বোধ্য এক উচ্চ জ্ঞান ধর্ম। এই ধর্ম কামরাগাদি বিহীন অবস্থায় আর্য্যমার্গ অবলম্বনে স্বয়ং দর্শনীয় এবং সত্যান্বেষী বিজ্ঞগণ কর্তৃক নিজে নিজেই জ্ঞাতব্য। ইহা শুধু অপরকে উপদেশ সাপেক্ষ নহে, উদাহরণ সাপেক্ষ ও বটে। এই ধর্ম স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া অপরকে উপদেশ দান করিলে অধিক ফলপ্রসু হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয় বহু বৎসরাবধি সাধনা শেষে এই ধর্ম স্বয়ং জ্ঞাত হইয়া নিজ সাধনালব্ধ অভিজ্ঞাবলে নিজকে উদাহরণ রূপে স্থাপন করিয়া অপরকে উপদেশ প্রদানের মত মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার উপদিষ্ট ধর্মোপদেশ সমূহ সম্যক্ সম্বুদ্ধের প্রচারিত সদ্ধর্মের সারাংশ প্রসুত। নানা যুক্তি উপমাযোগে তাঁহার দেশিত উপদেশাবলী এতই হৃদয়গ্রাহী যে, ইহা সহজে শ্রোতৃমন্ডলীর মর্মে স্পর্শ করে। তাঁহার সন্দর্শন ও উপদেশ শ্রবনে তৃপ্ত হইয়া অনেকের গতানুগতিক জীবন ধারায় পরিবর্তন ঘটিয়াছে এবং অগনিত নরনারীর ধর্মান্ধতা ধীরে ধীরে অপসৃত হইতে চলিয়াছে। তিনি বর্তমান বৌদ্ধ জগতে সদ্ধর্মের আলোক স্তম্ভরূপে অত্যুজ্জ্বল শিখায় দীপ্তিমান সদ্ধর্মের ধারক ও বাহক একজন প্রকৃত সংসার ত্যাগী বুদ্ধপুত্র।

তিনি নিঃসন্দেহে জাতিবাদ, গোত্রবাদ, যাবতীয় মতবাদ ও দলবাদের উর্দ্ধে সর্বজন বন্দিত ও বহুজন নন্দিত, লোকোত্তর ধর্মের অধিকারী একজন সদগুরু ও কল্যাণ মিত্র। কাজেই তাঁহাকে জাতিবাদ বা দলবাদের সীমাবদ্ধ চিন্তাধারার আলোকে বিচার করার কোন অবকাশ নাই। তিনি চাকমা সম্প্রদায়ে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন বলিয়া যেমন ঐ পরিচয়ে চিহ্নিত নহেন কিংবা সংঘরাজ নিকায় দ্বারা উপসম্পদা লাভ করিয়াছেন বলিয়া ও ঐ ভিক্ষু দলভুক্ত নহেন। বর্তমানে তিনি একজন সংসার ত্যাগী লোকোত্তর ধর্মের অধিকারী মহিমান্বিত সৎপুরুষের পরিচয়ে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

এই পুস্তক প্রকাশ কল্পে গঠিত উপদেষ্টা কমিটির সদস্যবর্গ বিশেষ করে বাবু কুমুদ বিকাশ চাকমার পান্ডুলিপি প্রস্তুত করনে ও প্রুফ সংশোধনে সক্রিয় সহযোগীতা ও প্রকাশনা কমিটির সদস্যগণের অকুন্ঠ চিত্তে

আর্থিকদানের দ্বারা এই পুস্তক প্রকাশ করা সম্ভব হইয়াছে। তাঁহারা সদ্ধর্ম হিতৈষনার মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়া অশেষ পূণ্যের ভাগী হইয়াছেন।

স্বীয় জীবনে উন্নতিকামী ও সদ্ধর্মানুরাগীদের যদি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশ সম্বন্ধে মনন, ধারন ও অনুধাবনে এই পুস্তকের দ্বারা কিঞ্চিৎ পরিমানে ও উপকার সাধিত হয় তাহা হইলে গ্রন্থকার এবং প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়াস সার্থক হইবে।

"সকল প্রাণী সুখী হউক"

বিনীত

সুনীতি বিকাশ চাকমা (সঙ্ক)

পক্ষে

বনভন্তের দেশনা উপদেষ্টা পরিষদ।

ত্রিদিব নগর, বনরূপা, রাঙ্গামাটি
৫ই অক্টোবর, ১৯৯৫ ইংরেজী।

নিবেদন

পরম পূজনীয় ভদন্তগণ, সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাবৃন্দ, সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আদর্শের অনুরাগীগণ। আপনারা আমার সদ্ধর্ম বন্দনা, নমস্কার, শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। যাঁরা বনভন্তের দেশনা (১ম খন্ড) পাঠ করে মতামত, অভিমত ও শুভেচ্ছা বাণী পাঠিয়েছেন সেগুলি সাদরে গ্রহন করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। যাঁরা মৌখিকভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রথমেই "বনভন্তের দেশনা" (২য় খন্ড) সংকলনে আমার অজ্ঞানতা বশতঃ যাবতীয় ভুল-ক্রুটির জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

"বনভন্তের দেশনা" শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মুখ নিঃসৃত বাণী। তিনি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষ্যে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে এ উপদেশাবলী ভাষনদান করেছেন। মানুষের অধ্যাত্ম জীবনের এমন কোন সমস্যা নেই যার সমাধান এর মধ্যে পাওয়া যাবে না। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদের প্রাত্যাহিক জীবনের প্রধান অন্তরায়গুলি, আমাদের বাঁধা বিপত্তি আবিস্কার করে সেগুলি মোচন করার উপায় প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মনের চিরন্তন রহস্যগুলি উদ্‌ঘাটন ও উহাদের সুচিন্তিত সমাধান তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁর দেশনার যুক্তিগুলি যথাযথ ও উপযুক্ত প্রমাণ এবং সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবন হতে আহরিত।

মানুষ সবসময় কি কি চিন্তা করে। কি কি বাক্য দ্বারা নিজের ভাব প্রকাশ করে। কি কি ধর্ম সম্পাদন করে। তাতে ভালও থাকে, মন্দও থাকে এবং মিশ্রও থাকে। সেগুলি শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ করে সকলের সুখের জন্য, হিতের জন্যে ও মঙ্গলের জন্যে করুনার্দ্র হয়ে তিনি ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।

আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের প্রথমার্ধে সাধনার মধ্য দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছেন। দেশনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন- "মহা অরণ্যে পথ হারা কোন পথিক উঁচু-নীচু, কাঁটা বন ও বিপদসংকুল স্থান অতিক্রম করে হঠাৎ পথের সন্ধান পেয়ে তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌছতে সক্ষম হন। "ঠিক সেরূপ তিনিও আচার্য্য বা গুরু ছাড়া নির্বাণ যাত্রায় প্রায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাঁর দুঃসাহসিক অধ্যবসায়, পূর্বজন্মের পারমী এবং ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত পথ অনুসন্ধান করতে করতে হঠাৎ মুক্তির সন্ধান পেয়েছেন। তাতেই তিনি সফলতা অর্জন করে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করেছেন। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে দেশনা করতে আমি এরূপ শুনেছি- "আমি সাধনা করতে গিয়ে যেভাবে অনাহারে, অনিদ্রায়, বৃষ্টিতে ভিজে, রোদে পুড়ে, শীতে কষ্ট পেয়ে এবং নানাবিধ পোকার উপদ্রব সহ্য করে সফলতা অর্জন করেছি, তা ভবিষ্যতে আমার শিষ্য বা যে কোন কেউ আমার নির্দেশ অনুযায়ী চললে অতি সহজভাবে সফলতা অর্জন করতে পারবে।"

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনাগুলি এমন যে গভীর, অতি উচ্চ স্তরের এবং অতীব দার্শনিক তথ্যে সমৃদ্ধ। এগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করতে লোকোত্তর জ্ঞানের প্রয়োজন, তীক্ষ্ণ স্মৃতি শক্তির প্রয়োজন এবং গভীর বাংলা ভাষা জ্ঞানের প্রয়োজন। অতীব সামান্যতম জ্ঞান, স্মৃতি ও ভাষাজ্ঞান দিয়ে আমার সামর্থ অনুযায়ী শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনাগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করে লিখতে চেষ্টা করেছি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রায় দেশনাগুলি সংক্ষিপ্ত ও কঠিন বিধায় বিস্তৃত, সরল ও সহজ ভাষায় ব্যক্ত করতে চেষ্টা করেছি। দেশনাগুলি সংগ্রহ ও সংকলন করতে আমার অজ্ঞানতা বশতঃ যদি ভুল-ক্রুটি হয়ে থাকে তজ্জন্য পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এবং ভবিষ্যতে বনভন্তের দেশনা ৩য় খন্ড সংকলন করার লক্ষ্য হাসিলের জন্য আশীর্বাদ কামনা করছি।

বনভন্তের দেশনা গ্রন্থে যাদের সুচিন্তিত উপদেশ দিয়ে ভুল-ক্রুটি সংশোধন এবং আমাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করেছেন তাঁরা হচ্ছেন বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্মা (সক্ক), বাবু নির্মলেন্দু চৌধুরী, বাবু কুমুদ বিকাশ

চাক্‌মা ও বাবু সুরেশ বড়ুয়া। এ ব্যাপারে তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

বনভন্তের দেশনা পান্ডুলিপি তৈরীর ব্যাপারে যাঁরা সহযোগিতা করে পূণ্য সঞ্চয় করেছেন তাঁরা হচ্ছেন বাবু জগদীশ চাক্‌মা, মিসেস্ পারুল দেবী চাক্‌মা, বাবু সুধীর কান্তি দে, মিসেস্ জয়া বড়ুয়া, মিসেস্ সন্ধ্যাদেবী চাক্‌মা ও বাবু সমীরণ বড়ুয়া। এ পুণ্যের ফলে তাঁদের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক, ভগবান বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা জানাই।

বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদের অর্থ সাহায্যে বনভন্তের দেশনা (২য় খন্ড) প্রকাশ করে বিনামূল্যে প্রচার করতে সমর্থ হয়েছি। যাঁদের উদ্যোগে প্রকাশ করা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন-

মাননীয় চাকমা রাজা ব্যরিষ্টার দেবাশীষ রায়; বাবু সুরেশ চন্দ্র চাকমা, রাজবাড়ী এলাকা; বাবু মনোহরি বুড়ুয়া, গর্জনতলী; বাবু মুরতিসেন চাকমা, পাথরঘাটা; বাবু দেবব্রুত বড়ুয়া, তবলছড়ি বাজার; বাবু সুবি কুমার তংচঙ্গা, মানিকছড়ি; বাবু অমৃত রন্‌জন বড়ুয়া, হাজারী লেইন, চট্টগ্রাম; বাবু কিনাচান তংচঙ্গ্যা, মরিচ্যাবিল; ডাঃ নীহারেন্দু তালুকদার, অবসর প্রাপ্ত সিভিল সার্জন; বাবু সুশোভন দেওয়ান (ববি) কালিন্দিপুর; ডাঃ সুদর্শন বড়ুয়া, হাজারী লেইন চট্টগ্রাম; বাবু লুইথা মার্মা, গর্জনতলী; বাবু কল্পরঞ্জন চাকমা, প্রাক্তন এম. পি; বাবু রামেন্দু বিকাশ চাকমা, পানছড়ি; বাবু চিরঞ্জীব চাকমা, ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী; বাবু যোগেন্দ্র লাল চাকমা, কালিন্দিপুর; বাবু হরিলাল চাকমা, মাঝেরবস্তি; ডাঃ সুব্রত চাকমা, মাঝেরবস্তী; মিসেস দীপ্তি চাকমা, কালিন্দিপুর; মিসেস রীতা বড়ুয়া, (কনিকা) দেবাশীষ নগর; মিসেস লক্ষী তনচংগ্যা, কালিন্দীপুর; মিসেস ঝর্ণা বড়ুয়া, পুরাতন হাসপাতাল; মিসেস বিজয় লক্ষী চাকমা, ত্রিদিব নগর; মিসেস সূর্যপ্রভা চাকমা, মাঝেরবস্তী; বাবু সুভাষ সদয় চাকমা, মাঝেরবস্তী; মিসেস অনুপমা চাকমা, ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী; বাবু পইরাচান তংচঙ্গ্যা, মরিচ্যাবিল; বাবু করুনা কান্তি বড়ুয়া, ২১০, আছদগঞ্জ, চট্টগ্রাম; বাবু মানস কুমার ও অতীশ কুমার বড়ুয়া, ১০১, নজুমিঞা, লেইন,

চট্টগ্রাম; বাবু সমীরণ বিকাশ বড়ুয়া, ১৪০, আছদগঞ্জ, চট্টগ্রাম; ঘাগড়া টেক্‌টাইল মিলের বৌদ্ধ কর্মচারীবৃন্দ; বাবু দিলীপ কুমার দেওয়ান্‌জী, মাঝেরবস্তী; বাবু সুকুমার বড়ুয়া (শিক্ষক) রাউজান; অধ্যাপক অশোক কুমার বড়ুয়া, ছোটরা, কুমিল্লা; বাবু যামিনী কুমার চাকমা, ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী; বাবু জয় নারায়ন চাকমা, পূর্ব ট্রাইবেল আদাম; বাবু আস্তিক মনি চাকমা পূর্ব ট্রাইবেল আদাম; বাবু অশ্বথামা কার্বারী, জীবতলী, মারিস্যা; মিসেস রাজুলতা চাকমা, জুরাছড়ি; মিসেস শংকরী চাকমা, কালিন্দিপুর; বাবু সনৎ কুমার বড়ুয়া, টি এন্ড টি এলাকা; মিসেস আইনো শোভা চাকমা, আনন্দ বিহার এলাকা; বাবু পবনবীর চাকমা, কমলছড়ি, খাগড়াছড়ি; মিসেস সুদীপ্তা দেওয়ান, প্রাক্তন এম. পি; বাবু কৃষ্ণ চন্দ্র চাকমা, কালিন্দিপুর; বাবু রতন কুমার বড়ুয়া, ওমান; মিসেস দীপ্তি চাকমা, সুনামগঞ্জ, সিলেট; মিসেস গোপাদেবী চাকমা, মাঝেরবস্তী; বাবু ইন্দ্রনাথ চাকমা, চম্পক নগর; বাবু পিযূষ কান্তি বড়ুয়া, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম; ডাঃ রূপম দেওয়ান, বনরূপা; বাবু রতি রঞ্জন চাকমা (পদ) বড় আদাম; বাবু শরৎ কুমার চাকমা, বড় আদাম; বাবু চিত্ত কুমার তংচঙ্গ্যা, মরিচ্যাবিল; বাবু মিলন কান্তি বড়ুয়া, কর্তালা, পটিয়া; বাবু যতীন্দ্র লাল চাকমা, এফ্রাইজার, চট্টগ্রাম; বাবু কালী ধর চাকমা, কালিন্দিপুর; বাবু সমীরণ চাকমা, চম্পক নগর; বাবু মায়াধন চাকমা, দিঘীনালা; মিসেস ইতি চাকমা, অধ্যাপিকা মহালছড়ি কলেজ; বাবু মৃণাল কান্তি তালুকদার, কলেজ গেইট, রাঙ্গামাটি; বীর জ্যোতি চাকমা, সাব্ রেজিষ্টার, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম; পরেশ নাথ চাকমা, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম; পুষ্পিতা খীসা, রেডিও বাংলাদেশ, চট্টগ্রাম।

"সব্ব দানং ধম্মদানং জিনাতি" এ সত্যের প্রভাবে বনভন্তের দেশনা প্রকাশনা পরিষদের সদষ্যগণ ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়ে নির্বাণ প্রত্যক্ষ করুক, ত্রিরত্নের নিকট প্রার্থনা জানাই।

বাংলাদেশ সংঘরাজ নিকায় এর সাধারণ সম্পাদক, ত্রিপিটক বিশারদ এবং ভারতে ডক্টরেট ডিগ্রী অধ্যয়নরত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ প্রজ্ঞাবংশ থেরো তাঁরা নানাবিধ ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে এ গ্রন্থে ভূমিকা লিখেছেন। তজ্জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আপনারা জেনে নিশ্চয়ই প্রীতি অনুভব করবেন যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বৌদ্ধ ধর্মীয় গুরু মহামান্য সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ শীলালংকার মহাথেরো এ বর্ষার (২৫৩৯ বুদ্ধাব্দ) রাজবন বিহারে বর্ষাবাস যাপন করছেন। তাঁর বর্তমান বয়স ৯৭ বৎসর চলছে। বনভন্তের দেশনা ২য় খন্ড গ্রন্থে তাঁর মহা মূল্যবান বাণী লিখে মহা অলংকারে ভূষিত করেছেন। তজ্জন্য তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁর পদতলে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাচ্ছি।

বিগত ২/১২/৮৮ ইং তারিখ মাননীয় চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা লিপিবদ্ধ করার জন্যে উৎসাহিত করেন। এ খণ্ডে তাঁর মূল্যবান শুভেচ্ছাবাণী লিখে গ্রন্থখানা সমৃদ্ধ করেছেন। তজ্জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু ইন্দ্রনাথ চাক্‌মা এ গ্রন্থে তাঁর মূল্যবান শুভেচ্ছা বাণী লিখে কৃতার্থ করেছেন। তজ্জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অত্র পরিচালনা কমিটির সম্মানিত কর্মকর্তাগণ ও সকল সদস্যবৃন্দ এ মহতী পূণ্যকাজে সহায়তা করেছেন। এ পূণ্যের ফলে তাঁদের নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

পরিশেষে পাঠক-পাঠিকাদের প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ শ্রদ্ধেয় "বনভন্তের দেশনা" ২য় খন্ড নামক গ্রন্থ খানা পাঠ করে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করলে আমি উৎসাহ বোধ করব এবং ভবিষ্যতে ৩য় খন্ড সংকলন করার উদ্যোগ গ্রহণ করব। সকলের প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতি জ্ঞাপন করে আমার নিবেদন আপাততঃ শেষ করলাম।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

বিনীত নিবেদক
অরবিন্দ বড়ুয়া

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত (বনভন্তের)	৪৫
২.	বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত (বাংলা ভাষায়)	৫০
৩.	বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত (চাক্‌মা ভাষায়)	৫৮
৪.	চিত্রে বন বিহার পরিচয়	৬৫
৫.	বর প্রার্থনা	৮১
৬.	মার বিজয়ী অর্হত উপগুপ্ত মহাথের	৮২
৭.	পূণ্যরূপ প্যারাস্যুট জোগাড় কর	৮৭
৮.	ইন্দ্রিয় দমন করলে নির্বাণ লাভ করতে সহজ	৯৪
৯.	খাঁড়া জায়গায় ঘুরাফেরা করো না।	৯৬
১০.	মদ পানে বিরত	৯৮
১১.	সংসার গতি ও নির্বাণ গতি	১০২
১২.	সর্পরূপে দেবরাজ ইন্দ্র	১০৩
১৩.	বনভন্তের প্রিয় শিষ্য বুড়াভন্তে	১০৪
১৪.	প্রবারণা পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশনা (১)	১০৭
১৫	সীবলী পূজা উপলক্ষে দেশনা	১১২
১৬.	কুকুরেও ধর্ম কথা শুনে?	১১৪
১৭.	বনভন্তের দৃষ্টিতে মৎস্য কন্যা	১১৬
১৮.	কঠিন চীবর দান উপলক্ষে দেশনা	১১৮
১৯.	বিরল ঘটনা	১২২
২০.	মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ	১২৭
২১.	লাল শাকের ভয়ে আতংক	১২৯
২২.	অপ্রিয় সত্যের যথার্থ উত্তর	১৩১
২৩.	হিতে বিপরীত	১৩৪
২৪.	মানস করে প্রত্যক্ষ ফল লাভ	১৩৬
২৬.	কর্মেই মানুষ মুর্খ, পন্ডিত, অসাধু ও সাধু হয়	১৩৮
২৭.	অবিদ্যাই সর্ব দুঃখের আকর	১৪০
২৮.	বুদ্ধমূর্তি দান, সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান উপলক্ষে দেশনা	১৪৩
২৯.	স্কন্ধ, আয়তন ও ধাতু	১৪৮
৩০.	লফন, কুহন, নিমিত্ত, নিস্পেষন	১৫০
৩১.	দেবতারাও সাহার্য্য করে	১৫১
৩২.	জ্ঞানীরাও বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন	১৫৩

৩৩.	বনভন্তের দিকে তাকাতে পারিনা	১৫৬
৩৪.	রাজবন বিহার এলাকার বৈদ্যুতিক খুটি প্রসঙ্গে	১৫৯
৩৫.	শীলরূপ কাপড় পরিধান কর	১৬০
৩৬.	দশবিধ বন্ধন ছিন্ন করে কাম মার ও আত্ম জয় কর	১৬২
৩৭.	মৃত্যুর পর সব বিলীন হয়ে যায়	১৬৪
৩৮.	নির্বাণের শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণ কর	১৬৫
৩৯.	বনভন্তে চারি আর্যসত্যের ইঞ্জিনিয়ার	১৬৭
৪০.	চিত্তকে সোজা কর	১৬৮
৪১.	দিব্য চোখে দেখে ও দিব্য কর্ণে শুনে প্রকাশ	১৬৯
৪২.	জ্ঞান বল, জ্ঞান শক্তি ও জ্ঞান চক্ষু	১৭০
৪৩.	উত্তম সুখ	১৭১
৪৪.	কুশলের বল থাকলে নির্বাণ লাভ করতে সোজা	১৭৩
৪৫.	শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা (২৫৩৮ বুদ্ধাব্দ)	১৭৫
৪৬.	নির্বাণের নিকট আত্ম সমর্পন কর	১৭৮
৪৭.	লংগদু বনবিহারে কঠিন চীবর দান ও বনভন্তের দেশনা	১৭৯
৪৮.	ফোরমোন কঠিন চবির দানে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার থেরোর দেশনা	১৮৪
৪৯.	অপ্রমাদের সহিত পঞ্চশীল পালন কর	১৮৯
৫০.	জন্ম হতে সব ধরনের দুঃখ ও ভয় উৎপত্তি হয়	১৯১
৫১.	পঞ্চ স্কন্ধের উত্থান পতন বা জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ বন্ধ কর	১৯৩
৫২.	অন্তর দৃষ্টি ভাব উৎপন্ন কর	১৯৫
৫৩.	১লা বৈশাখ (১৪০১ বাং) উপলক্ষে নন্দপাল মহাথেরোর দেশনা	১৯৭
৫৪.	ত্যাগ, অনাসক্ত ও বিবেকই উত্তম সুখ	১৯৯
৫৫.	মশারীরূপ অভয় দান	২০২
৫৬.	অন্যায়, অপরাধ, ভুল, ক্রুটি, দোষ ও গলদ করোনা	২০৩
৫৭.	যক্ষিনীর সাথে তিন বৎসর বসবাস	২০৫
৫৮.	ঘাগড়ায় বনভন্তের দেশনা	২১৩
৫৯.	কাটাছড়ি বনবিহারে বনভন্তের দেশনা	২১৮
৬০.	কুশল কর্মের প্রভাবে জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে	২২৪
৬১.	জুরাছড়ি বনবিহারে বনভন্তের দেশনা	২২৮
৬২.	ভাই এর বেশে দেবতার আগমণ	২৩২
৬৩.	আগুন লেগেছে! বেরিয়ে এস!	২৩৪
৬৪.	দূর্গার খাড়ু?	২৩৬
৬৫.	প্রবারনা উপলক্ষে দেশনা (২)	২৩৮
৬৬.	কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়?	২৪২
৬৭.	অভিমত	২৪৫

বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত (বনভন্তে)

শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় অনেক বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করেছেন। তৎমধ্যে মাত্র ১০টি প্রীতিময় সঙ্গীত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করা হল।

১. বৌদ্ধ পতাকা সঙ্গীত

কণ্ঠ শিল্পীঃ বাবু রনজিত দেওয়ান ও অন্যান্য শিল্পীবৃন্দ।

জয় জয় বৌদ্ধ পতাকা
অহিংসার বিজয় নিশান,
গাওরে সকলে ঐক্য বিতানে;
অহিংসার মহান মিলন গান।
আজি বিশ্ব ব্যাপিয়া অহিংসা হিল্লোলে
জাগে মহাবিশ্ব সাম্য মৈত্রী সলিলে (২ বার)
আকাশে বাতাসে বন উপবনে
নদী কল্লোল ধরেছে তান (২ বার)
জাতি ভেদাভেদ বৈষম্য হিমাদ্রী
লংঘিয়াছিল মহান জলধি
সকল বন্ধন করি অবসান
গাওরে সকলে ঐক্য বিতান (২ বার)
ছয় রং পতাকার শান্তি নিশান।
জয় জয় বৌদ্ধ পতাকা –ঐ– (তিন বার)

২.

বিশ্ব বৌদ্ধ পতাকা উদ্বোধনী সঙ্গীত
এসো সবে মিলি নমো নমো বলি,
নমো নমো ভগবান।
অহিংসা পতাকা বুদ্ধের নিশান,

শত শত শাশ্বত বার মৈত্রীর আধার,
বিশ্ব শান্তি প্রেমের বিধান।
ধর্ম পতাকা এ যে মোদের,
সদায় শান্তি একতা নিশান।
আদি অন্ত মাঝে আনিতে কল্যান,
নমো নমো হে বিজয় নিশান,
পঞ্চ অষ্ট দশশীল নিবন্ধন।

৩.
নৈরঞ্জনা কে তুমি কুন্ডলিনী
জীবন দিয়ে জীবন গেল
যাহার কুলে শাক্যমুনি।
জীবের উদ্ধার তরে অনিদ্রা অনাহারে
বোধিমুলে ধ্যান করেছে,
ভূমন্ডলের শ্রেষ্ঠ মুনি।
ত্রিবিদ্যা সাধন করি, সর্ব দুঃখ পরিহরি
সত্যধর্ম করেন প্রচার,
শুনালেন তিনি অমৃত বাণী।
কোটি কোটি নরনারীর সর্ব পাপ উদ্ধারকারী
সুপথে চালায় সবে,
ত্রিলোকের হবে মহাজ্ঞানী। –ঐ–

৪.
হে মন চঞ্চল
বিচার ধরে চল
একুল ঔকুল দুকুল হারাইওনা।
.... ঐ।
পদ্ম পত্রে জল

জীবন করে টলমল
এই দেহ চিরকাল থাকিবে না।
.... ঐ।

৫.
আশার তরণী ডুবিল সাগরে
শূন্য দেউলে শূন্য পদ
জানিনা কাহার রুদ্র প্রতাপে
পথের ভিখারী বুঝি
হইল অমর।
আশার ....
ফুল্ল বয়ানে কালিমা রেখা
আকাশ বাতাস বিষাদে ঢাকা
পঞ্চম তানে গাহিল বিহগি।
বহেনা তটিনী তরতর।
আশার ....।

৬.
একবার পরান ভরিয়ে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ বল (২)
উত্তরিতে ভবনদী অভিলাষ থাকে যদি
কর ঐ নাম সম্বল .... ঐ।
দারাসূত ত্যাজিয়ে সংসার ছাড়িয়ে
চলিয়া যাইবে একদিন (২ বার)
অন্তিম নিশ্বাসে ঐ নাম গেলে মিশে
পাইবে নিশ্চয় সুগতি সুফল ...... ঐ।
তন্ময় হয়ে ত্রিরত্ন জপিয়ে
চিত্ত হইলে বিমল (২ বার)
ব্রহ্ম বিহার ভেবো অনিবার (২ বার)
হাতে হাতে পাইবে ফল। ঐ।

৭.

নমি তোমাকে সুগত
গাহি তোমার জয়গান
তোমার জ্ঞানের ছায়ায়
ঢেলে দিতে চায় মনপ্রাণ (২ বার)
নমি তোমাকে সুগত।
তোমার স্মরণে পরশখানি
ছড়িয়ে আছে ভূবনে (২ বার)
চিরসত্য তুমি যে সুগত
জীবনে আর মরণে (২ বার)
আর্য্যপথে থাকি আমি
তোমাতে মুগ্ধ হইয়া। ঐ
স্মৃতি পথে তোমার মহিমায়
আমার এই জ্ঞানের আঁখিতে (২ বার)
পারি যেন তোমার সেবায়
সাধনার ফলে জীবন রাখিতে (২ বার)
পেয়েছি এই মানব জীবন
সেতো শুধু তোমারি দান। ঐ

৮.

মানব জনম সার যে সুযোগ তার
ভোগে মোহে ভুলনারে মন,
কর্মের সাধন জয় যত কভু বৃথা নয়,
কর ভবে মুক্তি অন্বেষণ। (২ বার)
করনা সুখের আশ পরনা দুঃখের ফাঁস (২ বার)
জীবনে উদ্দেশ্য তা নয়।
ভবে অরণ্য মাঝে ভ্রমিওনা বৃথা কাজে
যথা মোহ হিংস্র জন্তুর ভয়।
ধনজনসুখ যত কালের করালগত (২ বার)

সাধ দুঃখ অনাথ অস্থির।
সকল ফুরাইয়া যায় এ মানব দেখেনা তায়।
প্রাণ যেন পদ্ম পত্রে নির।
স্বীয় কর্মে হও রত সাধিতে আপন ব্রত। (২ বার)
কর মন সত্যের সন্ধান সার্থক কর এ জীবন।
দুঃখমুক্তি হবে যবে সাধনার এই কর্মস্থান।
মহাজ্ঞানী আর্যগন যে পথে করেছেন গমন
লভিয়া সম্যক দর্শন সে পথ লক্ষ্য করে
আচরিব ধরে সার্থক কর এজীবন। ঐ

৯. (চাকমা ভাষায়)
তুইদ ভারী দোল, তুইদ ভারী দয়েলু,
তুইদ পুরেয়স্ পারমী।
তুইদ ধ্যানী তুইদ মহাজ্ঞানী,
তুইদ নির্বানগামী। (২ বার)
হিংসেই সংসারত আগুনান জ্বলেত্তে,
যাগে যাগে মানুষচুন পুড়ি পুড়ি যাদন্দে (২ বার)
বুড়, পীড়া, মরনর বানানি
কান্দন সংসারত কোটি কোটি প্রাণী। ঐ
তরে ইচ্যে সংসারত তোগাদন,
তুইদ বিলেই যর নির্বান জ্ঞানান। (২ বার)
দি আদত কিচ্ছু নেই মর,
তত্তুন ভিক্ষে মাগঙর,
সংসারত্তুন মুক্ত গর
মুক্তি পেই যেই বেক্কুন আমি। ঐ

১০.
আয়নারে ভাই স্মৃতি ধ্যানে বাড়বে যাতে জ্ঞানের বল (২)
অলস ঘরে থাকবো না আর জয় করিব মারের সৈন্যদল,

বাড়বে যাতে জ্ঞানের বল। ঐ
মৈত্রী ক্ষান্তি শীল যত বাড়াবো আমি অবিরত। (২)
প্রজ্ঞা অস্ত্রে ছিন্ন হবে পাইব নিশ্চয় সুগতি সুফল,
অলস ঘরে থাকবো না আর জয় করিব মারের সৈন্যদল
বাড়বে যাতে জ্ঞানের বল। ঐ
জন্ম মৃত্যু নিরোধ করি সর্ব দুঃখ পরিহরি। (২)
চারি আর্য্য সত্য দর্শন করি (২)
তোমাদের হবে আমার সিদ্ধিবর
সত্য লাভী জ্ঞানীগণ, কামনা বাসনা বিজয় ক্ষয় (২)
বুদ্ধের বাণী কর্ণপাত করিয়া
শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে মনযোগ দিয়া
জ্ঞানের আলো পরম মঙ্গল
অলস ঘরে থাকবো না আর জয় করিব মারের সৈন্যদল
বাড়বে যাতে জ্ঞানের বল। ঐ।

বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত (বাংলা ভাষায়)

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসকরা বহু ভাবার্থমূলক বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত বাংলা ভাষায় রচনা করে সুর দিয়েছেন। তৎমধ্যে মাত্র ১০টি সঙ্গীত প্রচার করা হল।

১. শ্রদ্ধাঞ্জলি
রচনা– গয়াসুর চাক্‌মা
সুর– উৎপলা চাক্‌মা

ওগো ত্যাগী, ওগো জ্ঞানী
ওগো প্রভু দয়ার সাগর। (২ বার)
জীবন অংগ ত্যাগের মাঝে

মুক্তি পথ পেয়েছ খুঁজে (২ বার)
পাই যেন মোরা ....
সেই ত্যাগ-বল মাগি এই বর। ঐ
শীল, সমাধি প্রজ্ঞার মাঝে
বুদ্ধজ্ঞান পেয়েছ খুঁজে (২ বার)
পাই যেন মোরা ....
সেই বুদ্ধজ্ঞান মাগি এই বর। ঐ
সাম্য, মৈত্রী আর করুণা।
সদায় আমার এই প্রার্থনা (২ বার)
ঢেলে দাও প্রভু ....
সেই করুনা মাগি এই বর। ঐ
জন্ম, মৃত্যু নিরোধ মাঝে
নির্বান সুধা পেয়েছ খুঁজে (২ বার)
পাই যেন মোরা ....
নির্বান সুধা মাগি এই বর। ঐ

২. শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনা ও সুর- সম্রাট সুর চাকমা

তুমি যে মহান মানব সাধনানন্দ
তুমি যে মুক্তি সাধনে রত। (২ বার)
তুমি যে ধ্যানী, তুমি যে জ্ঞানী
তুমি যে সর্বত্যাগী।
নির্বোধ আমরা কিছুনা জানিনি
তুমি যে নির্বান গামী
থাকিবে মোদের চির ব্রত। ঐ
অষ্ট মার্গ ধর্মে লভি
মুক্তি লাভ হবে সত্যি

তোমার সাধনা অহিংসা মন্ত্র
বিশ্বে ছড়িবে আজি।
মুক্তি মার্গ আর্যপথে সত্য হয়েছে জয়
আজিকে তোমায় পেয়েছি জয়
আজিকে তোমায় পেয়েছি বলে
দুঃখ ঘুচিবে নিশ্চয়
থাকিব তোমার স্মরণে রত। ঐ

৩. শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনা– নির্মলেন্দু চৌধুরী
কণ্ঠে– রন্‌জিত দেওয়ান

নির্জন বিহারী বনচারী
ওগো কে তুমি মহান দেবতা। (২ বার)
পূর্ণ করো মম শূণ্যতা। ঐ
বনভূমে তুমি কঠোর ধ্যানে
কি দিয়ে পূজিব তোমায় এখানে। (২ বার)
অন্ধ নয়নে পাইনিকো খুঁজে
আলো দিয়ে করো পূর্ণতা
এস হে মম চিত্ত গভীরে
পূর্ণ করো মম শূন্যতা। ঐ
সন্যাসী তুমি চির জ্যোতিরময়
মানুষের তরে জ্বালিয়ে প্রদীপ
জ্ঞানের পরশে ধন্য কর ওগো
পরাও চন্দন বিজয় টিপ (২ বার)
ত্রিবিধ বিধারি এস হে বিহারী। (২ বার)
লও হে প্রভু দিনয়ন অঞ্জলি বনদনা গানে
গাথিব মালিকা বুকে আছে তব আসনপাতা
এস হে মম চিত্ত গভীরে পূর্ণ করো মম শূন্যতা। ঐ

৪. শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনা ও সুর– ভূবন বিজয় চাক্‌মা

তুমি সুন্দর তাই এসেছি সবাই
এসেছি তোমায় আজি দেখিতে (২)
কত সুন্দর তুমি, কত যে মহান
শ্রদ্ধা চিত্তে তোমায় করি হে প্রণাম (২)
তোমার অমোঘ বাণী অমৃত জানি
এসেছি সবাই আজি শুনিতে (২)
এসেছি সবাই আজি দেখিতে। ঐ
চারি সত্য আর্যমার্গ বুদ্ধের মহা বাণী
পঞ্চশীল পালন করিব শান্ত হোক ধরণী (২)
কর আশীর্বাদ হে চির কল্যান
পায় যেন সবে মুক্তির সন্ধান (২)
তোমার আশীষ বাণী অমূল্য জানি
এসেছি সবাই আজি নিতে (২)
এসেছি সবাই আজি দেখিতে। ঐ

৫. শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনায়– রণজিত দেওয়ান

সুর– বাবলী

সাধক প্রবর সন্যাসী
জ্ঞান প্রদীপ জ্বলুক ধারায়
তোমার জীবন উদভাসী। (২ বার)
তোমার ভাবনা তোমার দেশনা
নব জীবনের গড়িল খোজনা (২ বার)

তুমি হে ত্যাগী তুমি বৈরাগী (২ বার)
স্মরিলে জ্ঞানে ধ্যানে বসি। ঐ
সাম্য, মৈত্রী তোমার বাণী
শুনাও জগতে মুক্তি লভি।
স্মরিলে জ্ঞানে ধ্যানে বসি। ঐ
তোমার মহিমা প্রবাসি সুদুরে
আর্ত মানবে জানাবো অধীরে
ও চাঁদ সূর্য লাগিলে আজি
ডষার আকাশে ভাসি।
সাধক ....
সর্ব প্রাণীর বাতি হে তুমি। ঐ

৬. শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনায়– সুনীল কুমার কারবারী
সুর– দিলীপ বাহাদুর রায়

চলো যাই, সবাই রাঙ্গামাটি বন বিহার
সেথায় আছেন বনভান্তে ত্রিরত্নের সমাহার
চারি আর্য্যসত্য প্রতীত্য সমুৎপাদনীতি
বুদ্ধ ধর্মের মূলমন্ত্র পেয়েছেন তিনি
তাই তিনি আজি বুদ্ধ ধর্মের ইঞ্জিনিয়ার
পূজ্য সবাকার।
বনভান্তে প্রভু দয়াময় করুনা সাগর
সত্যের আধার তিনি অমৃত নির্ঝর
হায়, নির্বোধ মোরা মিথ্যা দৃষ্টি হয়ে করছি
অবিদ্যা আহার।
সকল জীবের কল্যাণে প্রভু বনভান্তে

কুশলে অকুশলে কিবা জিজ্ঞাসিয়ে
লভি মোরা সত্য জ্ঞান সত্য ধর্ম শ্রদ্ধা চিত্তে
করি নমস্কার।

৭. শ্রদ্ধাঞ্জলি
রচনায়- অমলেন্দু বিকাশ চাক্‌মা
সুর- রনজিত দেওয়ান

হে সীবলী
লাভী শ্রেষ্ঠ ওগো সীবলী,
পূজিতে তোমারে
রেখেছি মনের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালী
ধুপ-দীপ আর পূজার সম্ভার
সাজিয়ে রেখেছি পূজার ডালা
লহ প্রভু মোর ভক্তির প্রণাম মালা।
অন্তরে মম গাহে মঙ্গল আরতি
লহ প্রভু মোর পূজার অঞ্জলি
হে প্রভু সীবলী।

৮. শ্রদ্ধাঞ্জলি
রচনায়- সুনীল কুমার কারবারী
সুর- সুচন্দা তঞ্চঙ্গ্যা

পেয়েছি মোরা মানব জীবন কত সাধনের ফলে
যেতে হবে প্রিয় একদিন বিচ্ছেদ হয়ে।
কর্মফলে পরকালে কোথায় কে জন্মিবে
জানিতে পারেনা কেহ আপন গতি নিয়ে

এসেছি একা যেতে হবে একা
আপন কর্ম নিয়ে।
অনিত্য এই সংসার নেই কোন সার
আছে শুধু দুঃখের হাহাকার
অবুঝ মোরা ক্ষনিকের সুখের তরে
কত পাপ করি লোভ-দ্বেষ-মোহ নিয়ে।
সহায় সম্পদ-বল-পরিজন নহে কিছু আপনার
"এই আমি এই আমার" অজ্ঞানেতে অহংকার
আছি মিথ্যাদৃষ্টি হয়ে।

৯. শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনায়- সুনীল কুমার কারবারী

সুর- সুরেন্দ্র নাথ রোয়াজা

কে শুনাবে মুক্তির বাণী
কে শুনাবে অহিংসার বাণী
কে শুনাবে মৈত্রীর বাণী
আজি বিশ্ব ব্যাপিয়া হিংসা ক্রোধে জর্জরিত
জাতি ভেদাভেদ হানাহানিতে রক্তপাতে কম্পিত
কে করিবে শান্ত
অশান্ত এই পৃথিবী
আজি মানব মাঝে অধর্মের জয়গান
নেই কোন ভক্তি মৈত্রী প্রীতি মানবতার বলিদান
মিথ্যাদৃষ্টি হয়ে স্বার্থের টানাটানি।
হে প্রভু বনভন্তে
নমি নমি তোমাকে
তুমি চিরঞ্জয়ী বিশ্বজয়ী তুমি চির অম্লান

তুমি দয়ার করুনা সাগর তুমি চির মহান
তুমি বিনা হবেনা শান্তির নিকেতন
বিশ্বমাঝে ছড়িয়ে পড়ুক তোমারি অমৃত বাণী
তোমারি পরশে শান্ত হোক অশান্ত এই পৃথিবী
তোমারি আশীর্বাদ হোক মোদের চির সাথী।

১০. শ্রদ্ধাঞ্জলি

রচনায়- সুনীল কুমার কারবারী

সুর- সম্রাট সুর চাক্‌মা

নমো বনভন্তে সাধনানন্দ (৩)
তোমারি পরশে মুছে যাক যত কালিমা
আশীর্বাদ কর সত্য পথে আর্যপথে থাকি যেন সদা
তোমায় পেয়ে ধন্য হলাম আজি
তুমি যে মহাজ্ঞানী মহালাভী
স্মৃতির সাধনায় থাকি যেন মোরা
প্রনতি জানাই তোমারে।
তুমি যে চিরসত্য চির সুন্দর চিরমহান
লভিতে পারি যেন চারি আর্যসত্য জ্ঞান,
সমর্পিনু মম জীবন তোমারি স্মরণে।
নির্বান হেতু হোক অবিদ্যা-তৃষ্ঞা ক্ষয়ে
দাও মোরে জ্ঞানবল শক্তি অমরতা
ত্যাগের বিমল বৃদ্ধি দৃষ্টি অসারতা,
অন্ধজনে দাওগো আলো তুমি যে ভগবান
তোমারি অমৃত বাণী হিংসা হোক অবসান,
বিশ্ব প্রাণী সুখী হোক তোমারি জয়গানে
প্রনতি জানাই তোমারে।

বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত (চাক্‌মা ভাষায়)

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকারা বহু সংখ্যক মনোমুগ্ধকর চাক্‌মা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত রচনা করে সুর দিয়েছেন। তৎমধ্যে মাত্র ১০টি সঙ্গীত পাঠকদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করা হল।

১.

রচনায়- শ্রীমৎ ভদ্দজী ভিক্ষু

সুর- রনজিত দেওয়ান ও উৎপলা চাক্‌মা

ভারী দোল এই কিয়ঙান

মুই ভারী হোস্ পাং

এই কিয়ঙত এলে মুই

জুরে যায় পরান। (২)

ভারী দোল এই কিয়ঙান।

এই কিয়াঙান হোস পেয়ংগে

পরানান ইদু বাজি আগে। (২)

ডাঙর এই কিয়ঙান

যেন্ স্বর্গ চান। ঐ

এই কিয়ঙর বনভান্তে ভারী গম

নেই কন জোল দোল তার মনান (২)

এই কিয়ঙত পূণ্য গল্লে সুগ অব

বেক প্রাণরি সুগ অব

যেক্কে ভাজি উদিব

পুন্যর ফল আর মার্গ জ্ঞান। ঐ

২.

কথা– সলিল রায়

সুর– সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা

নমো বুদ্ধ চরনত্
নমো ধর্ম চরনত্
নমো সংঘ চরনত্
এই তিন নাঙে সমানে এই মানেই জনমত্ (২)
কদক পাপ গুরিলুং তরে নমানি (২)
যুগে যুগে রভ জমা, যদি নপেলুং হমা। (২)
সেই পাপ জীবনত্। ঐ
লোভে পাপ পাপে ক্ষয়
এই কদা মিজা নয় (২)
অবুঝ মানেই লোক আমি নবুঝি
সেই কর্মফলে মর যুগে যুগে জনম অব (২)
জ্বরা–মৃত্যু–দুঃখ পাঙর তরে নপুজি,
মুক্তি পেভাত্ত্যেয় মুই কদক বারে বার (২)
ধর্মপদ ধুরিনেই কর্মশেষ গুরিনেই। (২)
যিদুং মুই নির্বানত্। ঐ

৩.

কথা ও সুর– অমর শান্তি চাক্মা

বেলা যিয়্যে সাজন্যে পহ্‌রান
ম মনানে তরে দাগে ও ভগবান (২)
বেলান যিয়্যে সাজন্যে পহ্‌রান।
কদক আন্দারত ঘুরি ঘুরি রেইত কাদেম
আগাজর চানানত্ আংঙোচ্যে আন্দারত নথেম (২)
নোনেয়া গুরি বন্দনা গরং (২)
মরে সিগেই দেনা দোল চিত্তান
ম মনানে তরে দাগে ও ভগবান (২)

এদক আবিলেজ গরি গরি ঝুউ জানেই
মুইও নানু হোলেদুং বুদ্ধ মানেই (২)
বেলান যিয়্যে সাজন্যে পহ্‌রান। ঐ

৪.
কথা– সাধন তালুকদার
সুর– উত্তমা খীসা

ওমা বোনলক বেইন বুনিজ
বিশাখারে স্মরণ গড়ি
মহা উপাসিকা অ– (২)
জনে জনে ইচ্যে তুমি
ওইয় বিশাখা।
এগেম গুরি বেইন বুনিজর
কঠিন চীবর। ঐ
বনভন্তে সংঘ তার
মহা শীলবান
তারা লবাক তোমার এই
কঠিন চীবর দান (২)
তোমার দানর ফল
অব বিশাখা ধক্যান। ঐ

৫.
কথা– গয়সুর চাক্‌মা
সুর– উত্তমা খীসা
কণ্ঠে– উৎপলা চাক্‌মা

এঝ এঝ বেগে মিলি বন বিহার যেই
সিদু আগে বনভান্তে, আগে ত্রিরত্ন
আরহ্‌ আগে আর্য্য সত্য আঘে প্রজ্ঞারত্ন।
ত্রিরত্নরে মানিবং আর্য্যসত্য বুজিবং

প্রজ্ঞাধন লাভ গরিবং আর্য্যপদ ধরি।
এঝ এঝ বেগে মিলি বনবিহার যেই।
দান দিবং আহ্উজ গরি পুন জন্ম বিচ্ছেজ গরি
শীল পালেবং ভক্তি গরি আর্য্যসত্য বিচ্ছেজ গরি।
কর্মফল মানবিং পিজে ফিরি নহ্ চেবং
দুগহ্ সাগর পারি দিবং ভান্তের কদা ধরি।
এঝ এঝ বেগে মিলি বনবিহার যেই।
এই কেয়েঘান অনিত্য বানাহ্ দুগ ভরা
নিন পারে লগেগরি যেক্কে যেবং মারা
এই কথানি ভাবিবং জ্ঞান বলে বুজিবং
নহ্ থেবং আর ইদু আমি যেবং নিবানত। ঐ

৬.
কথা– সুকৃতি দেওয়ান
সুর– রূপায়ন চাক্মা

এঝ এঝ বাব ভেইলক এঝ মা বোন লক
পূন্য জাগাত্ যেই
যে জাগানত মৈত্রী ছাড়া হিংসে নিন্দে নেই (২)
কদক পাপ গজ্জেই আমি কন ইজেব নেই।
পূণ্য বাদে ইক্কেনে আমার কন উভয় নেই (২)
যেই ঝাদি যেই আমি সেই জাগানত
যেই জাগানত মৈত্রী ছাড়া হিংসে নিন্দে নেই (২) ঐ
বুদ্ধ যিয়ে নির্বানত তারে পেবং কুধু
তা ধক্যান বনভন্তে ইক্কে আমা ইদু (২)
ভন্তের কদা শুনি নেই ত্রিরত্নরে পূজিবং
বুদ্ধ ধর্ম সংঘত্তুন আমি হেমা মাগিবং (২)
অষ্ট মার্গ ধরি আমি নির্বানান তোগেই
যে জাগানত্ মৈত্রী ছাড়া হিংসে নিন্দে নেই (২) ঐ

৭.

কথা– জ্যোর্তিময় চাক্‌মা

সুর– সুরেশ ত্রিপুরা

সুগে দুগে থেবং আমি মিলি মিজি সমারে (২)
লোভ হিংসা ত্যাগ গরিনেই মৈত্রী দিবং বেগরে। ঐ
ধর্ম পূণ্য ছাড়িনেই গুজ্জেই যেক্কে পাপ্‌পানি।
যেদগ সুগকান তোগেইয়েই সেদগ পেয়েই দুগ্‌কানি (২)
ভন্তে ইচ্যে আমা ইদু ত্যাগ গরিনেই বেক্কানি।
তা কদানি শুনিনেই পেবং আমি সুগ্‌গকানি। ঐ
ইক্কে আমি নছাড়িবং বনভন্তে ছাবাগান,
ধুরী থেবং অষ্ট মার্গ চারি আর্য্য সত্য জ্ঞান।
এঝ এঝ বেক্কুনে ভন্তে ছাবাত তলে,
নির্বান সুখ পেবং আমি সত্য ধর্ম রাগেলে (২)
বুদ্ধ দুক্ক্যা বনভন্তে পেইয়েই ইদু যেক্কেনে,
তা ছাবানত তলে এবার থেবং আমি বেক্কুনে। ঐ

৮.

রচনা– সুনীল কুমার কারবারী

সুর– সুরেন্দ্র নাথ রোয়াজা

আমা মনান দোল বনভন্তে দোল,
এক সমারে আগি আমি নেই কন জোল।
বনভন্তেরে পূজিনেই পূণ্য গড়ি লোই,
সেই পূন্যের ফলানিলেই দুঃখ মুক্তি ওই।
চারি আর্য সত্যরে ধরি থেবং মনানত,
আমা মনান পড়গোই নির্বান সাগরত। ঐ
জন্মে জন্মে থেবং আমি বুদ্ধো ছাবাত তলে,
ত্রিরত্নরে পূজিবোং আমি এগামনে।
জ্ঞান বলে ধোই যোক্কোই আমা মন ফেজানি,

জ্ঞানে মানে ধনে জনে পেধং আমি ভাত পানি।
এঝ এঝ বেক্কুনে ভন্তের কদা ধরিনেই,
ভব সাগর পাড় ওই আর্য্য পধত থেইনেই। ঐ

৯.

কথা– জ্যোতির্ময় চাক্‌মা
সুর– দিলীপ বাহাদুর রায়
কণ্ঠে– প্রিয়াংকা চাক্‌মা

এজ এজ সমারে যেই, বনভন্তে সিদু,
বর মাগিবং আমা মনান,
নযোগ ইদু ইদু।। ঐ
সত্য কদা শুনিয়্যই
নির্বান পথ ধরিয়্যই
যাদি মাদি বেক্কুন এজ নথেই ইদু উদু।। ঐ
কর্মফলান ভাবিনাই সত্য ধর্ম গরি
দুঘ মুক্তি তোগেলে বনভান্তে কদা ধরি
ভন্তে কদা শুনিবোং
মিথ্যাদৃষ্টি ঝাড়িবোং
বেগে আমি তোগে লবং নির্বান পথ হুধু।।
জয় গড়িবোং নিজরে দমন গড়ি চিত্তরে
ঘাদাঘাদি ন গড়িবোং আপন জনে কি পরে।
উদ্ধার গরি নিজরে
লক্ষ্য রাখি সত্যরে
ভব সাগর দিলে পাড়ি এজ ঝাদি ইধু
বনভন্তে ধক্ক্যা আমি পেবং আর কুদু।। ঐ

১০.

কথা– সুনীল কুমার কারর্বারী
সুর– সম্রাট সুর চাক্‌মা

ওগো বুদ্ধো, ওগো বুদ্ধো, ওগো বুদ্ধো।।
তুই যেইওছ চিরো সুঘো নির্বানত,

আমি আঘি চিরো দুঘো সংসারত।
কোইন পারি অজ্ঞানে বুদ্ধ বাত্তিবো,
নমো বুদ্ধো, নমো ধম্মো, নমো সংঘো।
জ্ঞানী যারা আগন বুঝি তারা পাড়ন,
পর জাগা সংসারান নিজ জাগা নির্বানান।
সুঘোত হ্‌াঝির দুঘোত কানির
এ কালান বেক মিঝে সংসার
বেন্যা বিল্ল্যা খেরদের
কনে হক্কে মরি যেই
সেই খবর আমি নপের
মরণ জাগা সংসারান অমর জাগা নির্বানন
যেই যেই বেগে নির্বানত
লুগি মারি দুঘো ভুদিবো।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মুখ নিঃসৃত লোকোত্তর ধর্ম দেশনার ক্যাসেট, বাংলা ও চাক্‌মা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীতের ক্যাসেট এবং উপাসকদের রচিত বাংলা ও চাক্‌মা ভাষায় বিভিন্ন বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীতের ক্যাসেট নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিকট হতে সংগ্রহ করিবার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১. **অরুনদ্যুতি চাক্‌মা**
   প্রযত্নে- সন্ধ্যারাণী চাক্‌মা
   গ্রাম- পূর্ব ট্রাইবেল আদাম
   ডাকঘর- রাঙ্গামাটি
   জেলা- রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।

২. **বাবু রনজিৎ দেওয়ান**

৩. **বাবু কাজল চাক্‌মা**
   রাজবাড়ী ঘাট।

চিত্রে বনবিহার পরিচয়

রাজ বনবিহার (মন্দির)

রাজ বনবিহার সার্বজনীন উপসনালয়

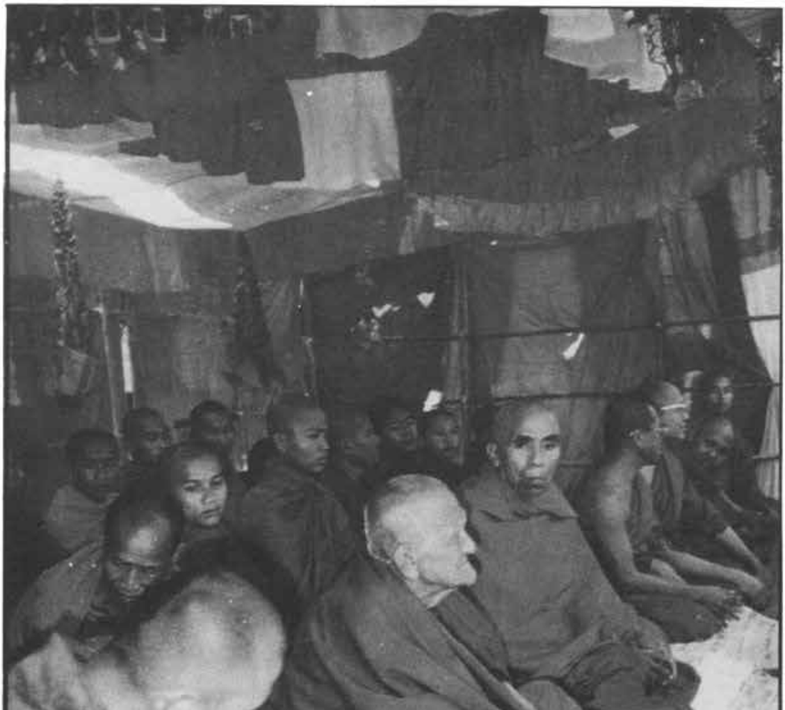

বুদ্ধমূর্তি দান অনুষ্ঠান ঃ
মহামান্য সংঘরাজ, থাইল্যান্ড হতে আগত ভিক্ষু সংঘ ও রাজ বনবিহারে ভিক্ষু সংঘ

শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ শ্রীমৎ শীলালংকার মহাথেরো

ও

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথেরো (সশিষ্যে)

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ভাবনা কুঠির

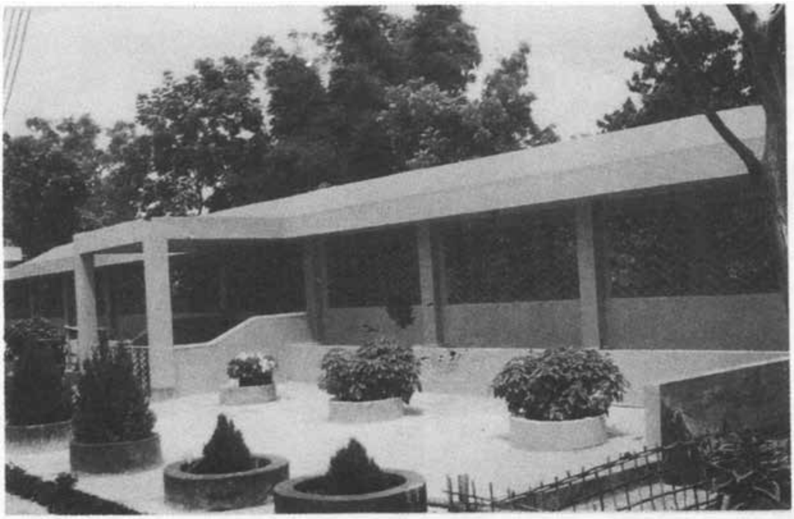

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের চংক্রমণ ঘর

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ভোজনশালা

উপরে ঃ শ্রমনদের ভাবনা কুঠির
মধ্যে ঃ প্রবেশ তোরণ (গেইট)
নীচে ঃ রাজ বনবিহার পরিচালনা কমিটির কার্যালয়

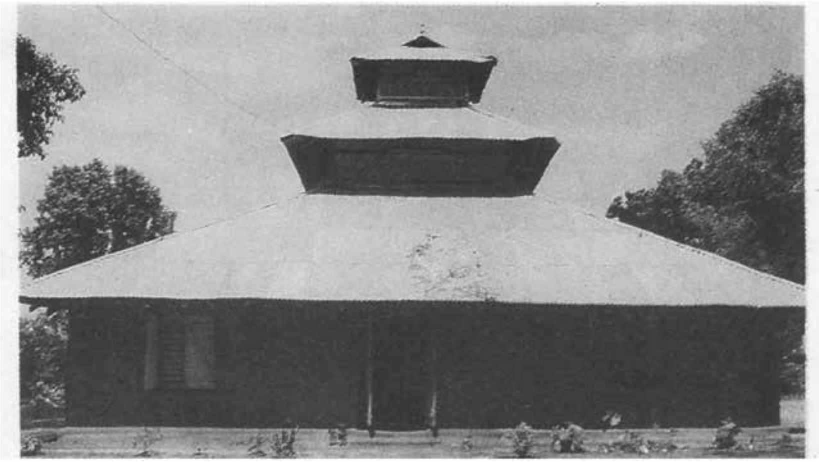

রাজ বনবিহার ভাবনা কুঠির (ভিক্ষুদের)

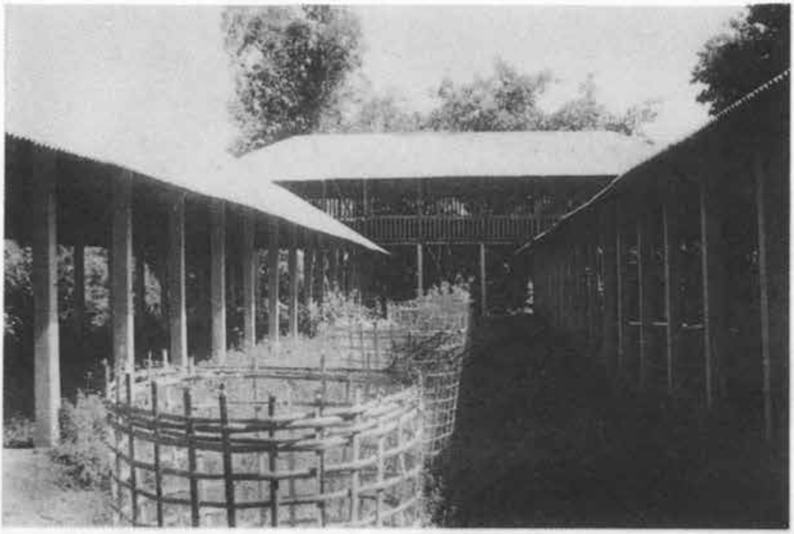

বেইন ঘর (২৪ ঘন্টার মধ্যে কঠিনচীবর তৈরী করা হয়)

রাজ বনবিহারের বোধিবৃক্ষদ্বয়

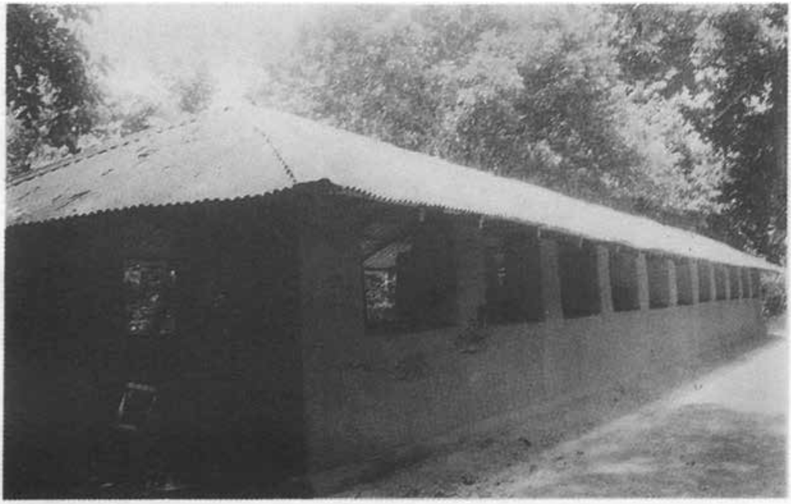

রাজ বনবিহার চংক্রমণ ঘর (ভিক্ষুদের)

রাজ বনবিহারের ভিক্ষু সীমা (ঘেংঘর)

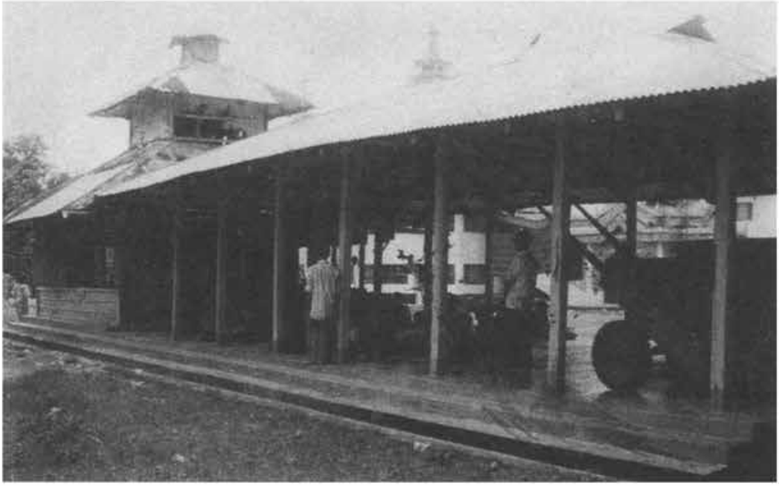

রাজ বনবিহার দেশনালয়

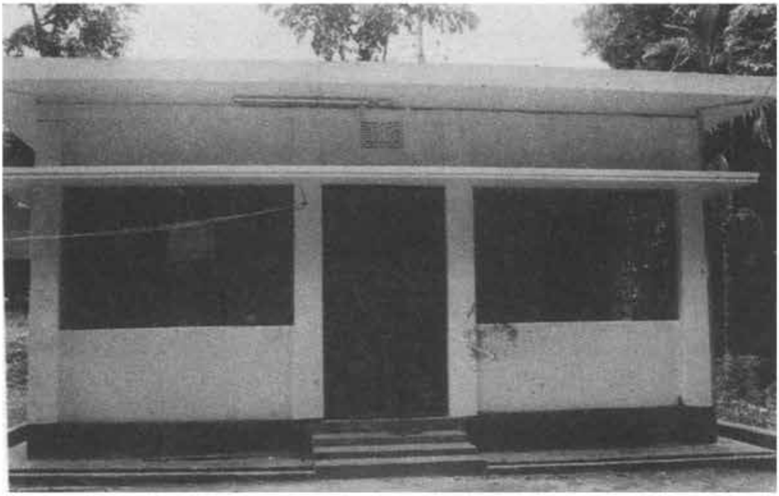

ঘাগড়া টেক্সটাইল মিলের বৌদ্ধ কর্মচারীদের প্রদত্ত দানে নির্মিত ভাবনা কুঠির

যমচুগ বনবিহারের ভিক্ষু সংঘ
পিন্ডাচরণে অগ্রে আছেন শ্রীমৎ নন্দপাল মহাথেরো

তিনটিলা বনবিহারের ভিক্ষু সংঘ

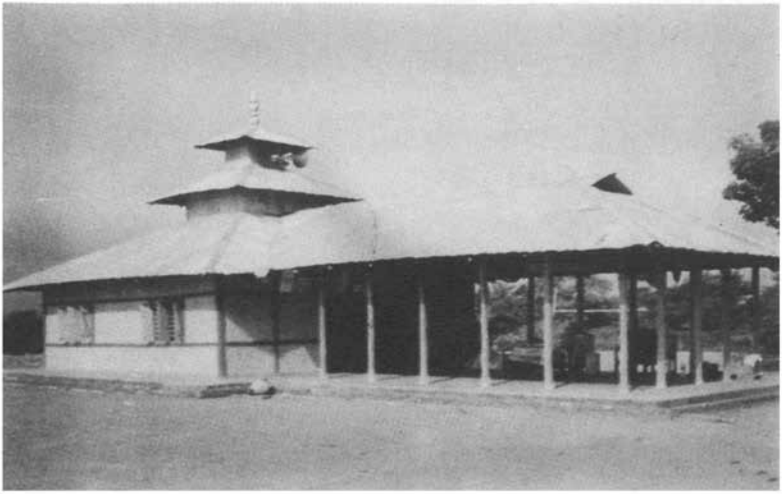

মেদিনীপুর বনবিহার, কাচলং, বাঘাইছড়ি

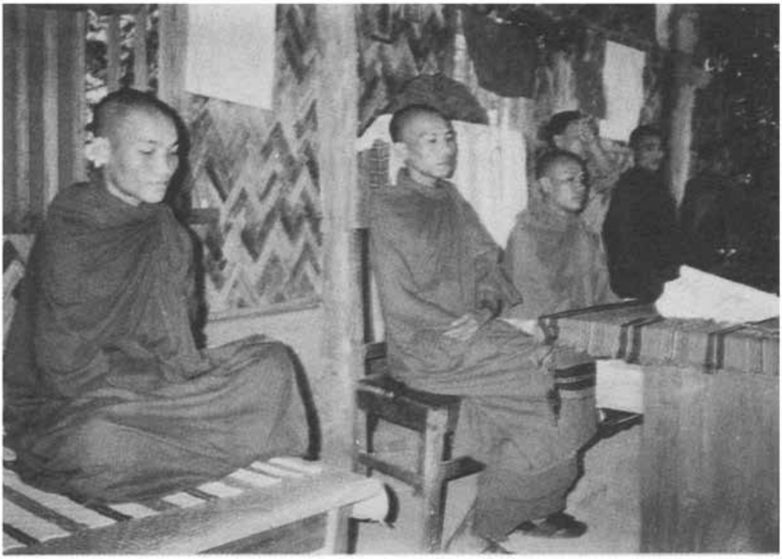

সুবলং শাখা বনবিহারের ভিক্ষু সংঘ

ধর্মপুর আর্য বনবিহার, খাগড়াছড়ি
বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ বৃক্ষজিৎ ভিক্ষু (সর্বডানে) সহ ভিক্ষু শ্রমণ

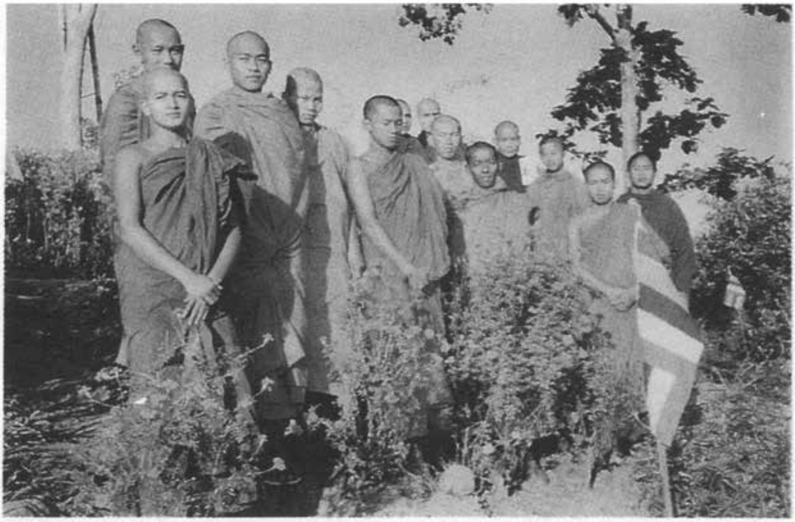

ফোরমোন বনবিহার
শ্রীমৎ অনোমদর্শী ভিক্ষুসহ অন্যান্য ভিক্ষু শ্রমণ

আমতলী ধর্মোদয় বনবিহার
বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ সুনন্দ থেরোসহ ভিক্ষু সংঘ

কাঁটাছড়ি বনবিহার
শ্রীমৎ জ্ঞানবংশ ভিক্ষু (বৃদ্ধ), শ্রীমৎ মহাতিসস শ্রমণ (বৃদ্ধ)

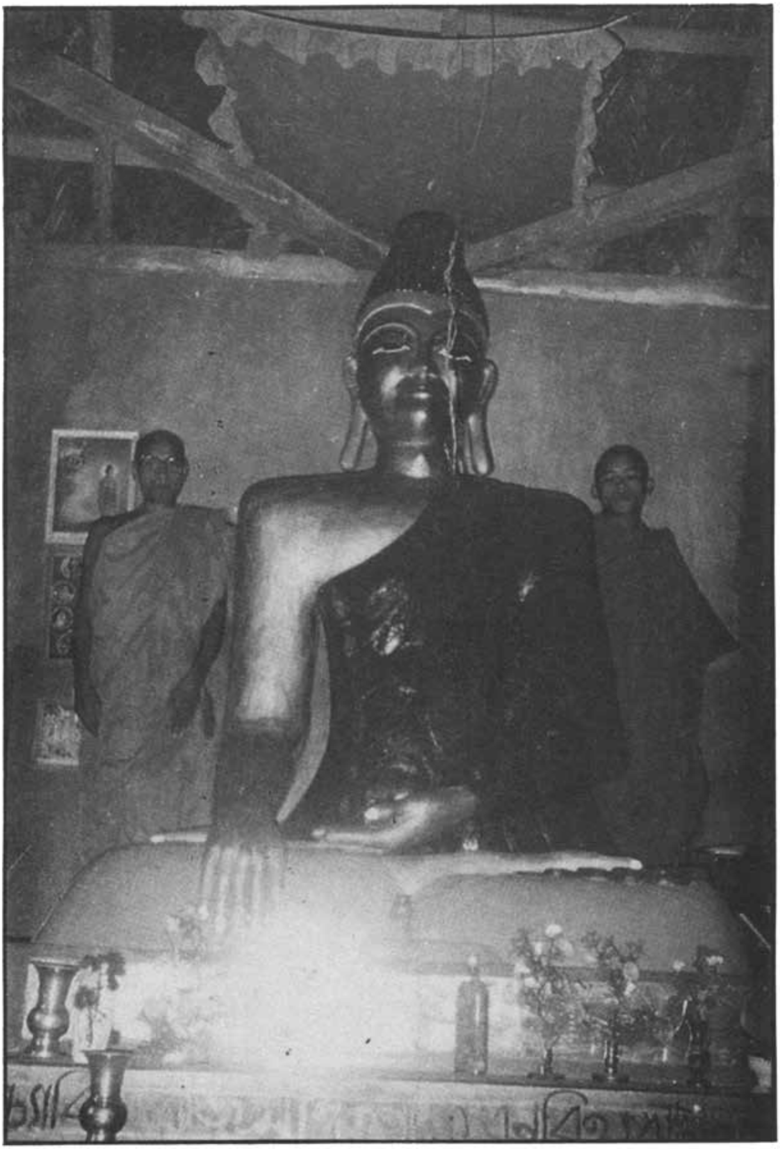

রাজমনি পাড়া বনবিহার, বালুখালি

বর প্রার্থনা

প্রথমে বন্দনা করি বুদ্ধ ভগবান।
ছয়গুনে নমি আমি আর সংঘগন।।
নতশিরে বন্দি আমি যত আর্যগনে।
আর্যজ্ঞান হোক মোর তম নিরশনে।।
শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দি আমি বনভন্তে পদে।
ভন্তের প্রভাবে যেন নাপড়ি বিপদে।।
ভন্তের আদর্শ রশি না যাক কর্তন।
আশীর্বাদ পাই যেন সারাটা জীবন।।
জ্ঞান প্রদীপ জ্বলুক মোর চিত্ত মাঝে।
আর্যপথে চলি যেন কথা আর কাজে।।
কুশলে উপরে উঠি লোকোত্তর ধর্মে।
অপায়ে না যাই আমি অকুশল কর্মে।।
ধর্মচক্ষু ধর্মজ্ঞান হোক মোর চিত্তে।
ভালমন্দ নিরীখিব প্রজ্ঞার জ্যোতিতে।।
নবধর্মে ধনী তুমি দান কর মোরে।
ধনশালী হব আমি সে ধনের জোরে।।
মানতৃষ্ণা পঞ্চমার হোক অন্তর্ধান।
বর প্রার্থনা করি পরম নির্বান।।

- ০ -

মার বিজয়ী অর্হৎ উপগুপ্ত মহাথের

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায় সময় দেশনায় বলে থাকেন পঞ্চমারের কথা। সংক্ষেপে পঞ্চমার হলো স্কন্ধমার, মৃত্যুমার, ক্লেশমার, অভিসংস্কার মার ও দেবপুত্রমার।

রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান স্কন্ধ বিরামহীনভাবে সত্ত্বগন উৎপন্ন হচ্ছে এবং বিভিন্ন দুঃখে পতিত হচ্ছে। এ দুঃখ থেকে কেউ মুক্তি পাচ্ছে না। পঞ্চস্কন্ধ উৎপন্ন হলেই একদিন না একদিন বিলয় বা মৃত্যু অনিবার্য্য। বিরামহীনভাবে উদয় বিলয় মহাদুঃখজনক। ক্লেশমার মানুষ বা সত্বগণের চিত্তকে নানাবিধ অপকর্মে নিয়োজিত করে। তাতে চারি অপায়ে নিক্ষিপ্ত করে এবং মহাদুঃখে পতিত হয়। কেউ কেউ ভ্রান্ত ধারণা বশতঃ মুক্তির আশায় কামলোক, রূপলোক ও অরূপ লোকে উৎপন্ন হয়। তারা সহজে মুক্তির পথ পায় না। এ অভিসংস্কার মারের অধীনে থাকা ও দুঃখজনক। এগুলি থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এতক্ষন যার উদ্দেশ্য নিয়ে বলা হচ্ছে স্মৃতিচারণ করছি তিনিই হলেন দেবপুত্র মার। দেবপুত্র মারের আবাসস্থল হলো সপ্তম সুগতি বা পর নির্মিত বশবর্ত্তী স্বর্গে। তাকে মার রাজা বলা হয়। দেবগণের মধ্যে সে খুবই শক্তিশালী ও মহাঋদ্ধিসম্পন্ন। তাঁর কাজ হলো সত্বদেরকে কামলোক থেকে উপরে বা নির্বাণ লাভ করতে না দেয়া।

আপনারা বোধ হয় জানেন বৌদ্ধ সাহিত্যে মারের পরিচয়। হিন্দু শাস্ত্রে তাকে শনি নামে আখ্যায়িত করেছেন। ইসলাম ধর্মে তাকে শয়তান নামে

অভিহিত করেছেন। মার সবসময় মানুষকে মুক্তির পথে বাধা দেয়। এমনকি পুন্য কাজেও বিভিন্ন বাধার সৃষ্টির করে। সবসময় উৎপীড়ন বা মারে বলে মার নামে অভিহিত।

সম্রাট অশোকের সময় সমগ্র ভারতে ৮৪ হাজার বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ ও বুদ্ধের ধাতু অস্থি চৈত্যে স্থাপন করা হয়। তৎসংগে কয়েকমাস যাবত বৌদ্ধ সঙ্গায়ন বা সম্মেলন হতে যাচ্ছে। এমন সময় দেবপুত্র মার সঙ্গায়ন বন্ধ করার জন্যে শিলা বৃষ্টি ও প্রবল বেগে তুফানের সৃষ্টি করে। তাতে মহা পূণ্য কাজের ব্যাঘাত ঘটে। সে সময় যাঁরা অর্হৎ ভিক্ষু ছিলেন তাঁরা বুঝতে পারছেন দেবপুত্র মার তার ঋদ্ধির প্রভাবে সঙ্গায়ন বন্ধ করার জন্যে বাধার সৃষ্টি করেছে। সমবেত অর্হৎ ভিক্ষু সংঘ উক্ত মারকে দমন করার জন্যে মহা ঋদ্ধিমান উপগুপ্ত মহাথেরকে মনোনীত করলেন। উপগুপ্ত মহাথের তাঁর বিভিন্ন ঋদ্ধির সাহায্যে মারের উপদ্রব বন্ধ করে দেন। কিন্তু তিনি চিন্তা করলেন যে, মারকে সম্পূর্ণভাবে বন্দী না করলে সঙ্গায়নের বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে। এ মনে করে তিনি ঋদ্ধি শক্তি দ্বারা মারকে বন্দী করে এক পাহাড়ের গুহায় ফেলে রেখে ছিলেন। কথিত আছে মারের গলায় একটা পঁচা কুকুর বেঁধে দেয়া হয়েছিল। সঙ্গায়ন শেষ হওয়ার পর যখন মারকে বন্দী থেকে মুক্ত করে দেয়া হয় তখন মার খুবই আক্ষেপ করে বলেছিল- স্বয়ং সম্যক সম্বুদ্ধকে আমি কত কষ্ট দিয়েছি, তিনি আমাকে কোনদিন এভাবে দুঃখ দেননি। ঠিক আছে আমার আয়ু সুদীর্ঘ অর্থাৎ কয়েক লক্ষ বৎসর। মনুষ্যের আয়ু হল অতি সামান্য। ঋদ্ধি মান উপগুপ্ত কতদিন পৃথিবীতে থাকবেন? আমার প্রতিপত্তি আপাততঃ স্থপিত রাখলাম। শ্রদ্ধেয় উপগুপ্ত মহাথের মারের এ উক্তি শুনে বলেন- বুদ্ধের ধর্মের আয়ু যতদিন পৃথিবীতে থাকবে (পাঁচ হাজার বৎসর) ততদিন আমি বেঁচে থাকব। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আয়ু সংস্কার বৃদ্ধি করলেন। তা দেখে নাগলোকের নাগরাজা চিন্তা করলেন মনুষ্যদের আয়ু অতীবক্ষীন। নাগদের আয়ু অতীব দীর্ঘ। কথিত আছে উক্ত নাগরাজা মারবিজয়ী উপগুপ্ত মহাথেরকে সাদরে আমন্ত্রণ জানিয়ে নাগলোকে নিয়ে যান।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে লংগদু থাকালীন ১৯৭৩ ইংরেজী হতে এখানে সর্বপ্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে তুলা থেকে সুতা কেটে, রং করে এবং সেলাই করে কঠিন চীবর দান প্রবর্তন করেছেন। ১৯৭৪ ইংরেজীতে তিনি রাজবন বিহারে যখন শুভ আগমন করেন। সে বৎসরেই বনবিহারে উপযুক্ত পরিবেশ

না থাকায় রাজ বিহারে মহা সমারোহে কঠিন চীবর দান উৎযাপন করা হয়। কঠিন চীবর দান আরম্ভ হওয়ার পূর্বদিন হতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ও দমকা হাওয়া বইতে থাকে। অনুষ্ঠানের দিন প্রবল বেগে ঝড় প্রবাহিত হয়। তা জ্ঞান চোখে দেখে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেছিলেন- অনেক সময় দেবপুত্র মার পূণ্য কর্মে নানাভাবে বাঁধার সৃষ্টি করে। সুতরাং প্রত্যেককে সাবধানে চলাফেরা করা উচিৎ। ঘটনাক্রমে দেখা গেল সেদিনই যাত্রীবাহী লঞ্চ ঝড়ের কবলে পড়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়। তাতে কিছু যাত্রী নিহত হয়।

কঠিন চীবর দান উপলক্ষে লঞ্চ দুর্ঘটনায় পূণ্যার্থী নিহত হওয়ায় স্বল্প বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কঠোর সমালোচনা করেন। তাদের বক্তব্যে বলা হয় তিনি যদি মহৎ পুরুষ হয়ে থাকেন উক্ত দুর্ঘটনা বন্ধ করতে পারতেন। এ সমালোচনা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে অবহিত করার পর তিনি ১৯৭৫ ইংরেজীতে কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে মার বিজয়ী অর্হৎ উপগুপ্ত মহাথেরকে সশ্রদ্ধচিত্তে বন্দনা ও আমন্ত্রণ জানানোর জন্য নির্দেশ দেন। তিনি আরো বলেন উক্ত মারবিজয়ী মহাথেরো সমুদ্রের তলদেশে আছেন। সুতরাং পানিতেই মাচা করে তিন দিনের জন্যে আমন্ত্রণ করতে হবে। বিহারে যেভাবে ভোরবেলায় ফুল, অন্ন-পানীয়, ১১ টায় অন্ন এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ দিয়ে পূজা করা হয়। সেভাবে পূজা করতে হয়। যিনি শ্রদ্ধেয় উপগুপ্ত মহাথেরকে আমন্ত্রণ ও বন্দনা করিবেন তিনি অষ্টশীলধারী হওয়া বাঞ্চনীয়। ১৯৭৫ ইংরেজী হতে এযাবত প্রতি বৎসর কঠিন চীবর দান উপলক্ষে মারের উপদ্রব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে মার বিজয়ী অর্হৎ উপগুপ্তের বন্দনা ও আমন্ত্রণ প্রচলিত হয়।

১। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি দেশনা প্রসঙ্গে মার সম্বন্ধে বহুবার বলেছেন। তৎমধ্যে মাত্র ২টি উদাহরণ ব্যক্ত করছি। তিনি বলেন- সরকারী চাকুরিয়া যেমন সরকারের অধীনে আইন মেনে চলে ঠিক তেমন তোমরাও মারের অধীনে আছ। মারের অধীনে থাকা দুঃখজনক। মার পুনঃ জন্ম হওয়ার জন্য সহায়তা করে। কিন্তু লোকোত্তরে যেতে দেয়না। মুক্তির উপায় বা নির্বাণ লাভ করতে বিভিন্ন বাঁধার সৃষ্টি করে। সহজে কেহ বিমুক্ত হয় না। যাদের অসীম ধৈর্য্য, নির্ভীক এবং নিরলস অধ্যবসায় বিদ্যমান তারা মারের রাজ্য পার হতে পারে। যারা হীন, ধৈর্য্যহীন, ভয়ার্ত ও অলস তারা ভবে ভবে মারের অধীনে ঘুরাফেরা করে। বলবান পুরুষ যেমন দুর্বল ব্যক্তিকে ঘাড় চেপে ধরে ঠিক তেমন মার তোমাদের ঘাড় চেপে

ধরেছে। উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেন- ভন্তে, আমাদের প্রবল ইচ্ছা আছে লোকোত্তরে যাওয়ার এবং ধর্ম কর্ম করার। কিন্তু এগিয়ে যেতে পাচ্ছি না। বনভন্তে বলেন- সরকারী চাকুরীর মত মধ্যে মধ্যে ছুটি নাও নতুবা মারের চাকুরী হতে অব্যাহতি লও। অর্থাৎ ভগবান বুদ্ধের পথ বা আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে চলো। সে পথে চললে মার দেখতে পাবে না বা নাগাল পাবে না। তোমরা স্বাধীন হও। মারের অধীনে থাকিও না। মারের শক্তি ও কার্য্যকারীতা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন।

২। ১৯৭৬ ইংরেজীতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাকে বললেন- পূণ্যার্থীদের জন্য লংগদু উপযুক্তস্থান নয়। সুতরাং রাঙ্গামাটিই প্রত্যেকের জন্য অনুকুল পরিবেশ মনে করি। চাক্‌মা এবং বড়ুয়াদের জন্যে মধ্যবর্ত্তী স্থান বর্ডারও বটে। তখন থেকে তিনি বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে ধর্ম অভিযাত্রায় পরিভ্রমণ করেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন- আগামীকাল গহিরায় ধনীরাম বড়ুয়ার বাড়ীতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি তোমাকেও যেতে হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে বহু সংখ্যক উপাসক উপাসিকা এবং কয়েকজন ভিক্ষু ও উপস্থিত ছিলেন। ওখান থেকে আসার সময় জনৈক যুবক ভিক্ষু আমাদের সঙ্গে চলে আসেন। বন বিহারের রীতি নীতি ও পরিবেশ দেখে উক্ত ভিক্ষু স্থায়ীভাবে থাকার অভিপ্রায় জানান। কিন্তু শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে সুপারিশের জন্য আমাকে অনুরোধ জানালেন। আমি শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে সুপারিশ করায় তিনি আমাকে বললেন- সে এখানে থাকার উপযুক্ত নয়। কারন পূর্ব অভ্যাস সহজে ত্যাগ করতে পারবে না। অধিকন্তু সে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকুরী করে। সর্ব বন্ধন ছিন্ন করা তার পক্ষে মহা কঠিন ব্যাপার। উক্ত ভিক্ষুর আগ্রহ দেখে পরীক্ষামূলকভাবে রাজ বনবিহারে অবস্থানের জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ জানালাম। বনবিহার এলাকার উত্তরপাশে যে বড় গাছ আছে সে গাছের গোড়ায় বসে মৈত্রী ভাবনা করার জন্য তিনি নির্দেশ দেন। রাত যখন ২টা হয় তখন উক্ত ভিক্ষু বনভন্তেকে বললেন- ভন্তে, আমার ভীষণ ভয় লাগতেছে। পরদিন সকালে আমি বনবিহারে গেলে বনভন্তে আমাকে বললেন- তুমি এ কাপুরুষের জন্যে সুপারিশ করেছ। পরবর্ত্তী রাত উক্ত ভিক্ষু বনভন্তেকে বললেন- ভন্তে, আজ আপনার সামনেই (দেশনালয়ে) ভাবনা করব। রাত যখন ১টা হয় তখন বনভন্তেকে বললেন- ভন্তে, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়ি। কিছুক্ষন পর অনুগ্রহ করে আমাকে ডেকে দিন। এখানে খুবই রহস্যের ব্যাপার হলো যে তিনি একখানা রশি (সুতলী) তাঁর হাতের কব্জিতে বেঁধে অন্য মাথা বনভন্তের

হাতে দিলেন। এতক্ষন যে মারের উদ্দেশ্যে স্মৃতিচারণ করছি তিনি হলেন দেবপুত্র মার। আগন্তুক ভিক্ষু গভীর ঘুমে অচেতন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধ্যানস্থ আছেন। এমন সময় দেবপুত্র মার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ধ্যান ভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়। কিন্তু বনভন্তের ধ্যানের প্রভাবে উক্তমার থরথরিয়ে কেঁপে চলে যেতে বাধ্য হয়। চলে যাওয়ার সময় উক্ত ভিক্ষুকে তুরী দিয়ে যান। ধ্যান থেকে উঠে বনভন্তে উক্ত ভিক্ষুর রশি টেনে জাগানোর জন্যে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রশি টেনে শুধু হাতটি নড়া চড়া করে। ভিক্ষুর কোন খবর নেই। তা শুনে আমি হাসলাম। অতঃপর বনভন্তে উক্ত ভিক্ষুকে দেখিয়ে দিয়ে বলেন এ ভিক্ষু বীর পুরুষ নয় বরং কাপুরুষও বটে। এ কাপুরুষের জন্যে তুমি সুপারিশ করেছ। কালক্রমে দেখা গেল সে ভিক্ষু কিছুদিন অবস্থান করে বনবিহার থেকে অন্যত্র চলে যান।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি দেশনা প্রসঙ্গে বলেন- পঞ্চ মার থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় হল আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সে পথে চললে মারের নাগালের বাহিরে যেতে পারবে। অর্থাৎ পরম সুখ নির্বাণ লাভ করতে পারবে। দেবপুত্র মার নাগলোকে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয় উপগুপ্ত মহাথেরকে শুধু ভয় করেন। যে কোন পূণ্যানুষ্ঠানে অথবা সব সময় মারবিজয়ী উপগুপ্ত মহাথেরকে শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা করা প্রত্যেকে একান্ত উচিত।

উপগুপ্ত বন্দনা

উপগুপ্ত মহাথেরো ঋদ্ধি শ্রেষ্ঠ আর।
তাঁহাকে বন্দনা করি সদা অনির্বান।।
তাঁর সমমার বিজয়ী অন্য নাহি আর।
তৃষ্ণাক্ষয় করি তিনি এই ভব পার।।
তাঁহার প্রভাবে মোর মার জয় হোক।
ইহ পরলোকে যেন নাহি পাই শোক।।
ভক্তি ভরে দিয়ে সদা করি শত প্রণতি।
মোর কল্যান হোক প্রভু কৃপা কর অতি।।
সমুদ্রের গর্ভে তুমি আছ হেথা শুনি।
করজোড়ে বন্দি আমি স্মরি মহামুনি।।

- o -

পুন্যরূপ প্যারাস্যুট জোগাড় কর

পুর্নজন্ম কি সত্য? যুগ যুগ ধরে পুর্নজন্ম সম্পর্কে বিশ্বাস অবিশ্বাসের খেলা চলে আসছে। পুনর্জন্মের ঘটনা এমনভাবে ঘটে থাকে যা বিশ্বাস না করে পারা যায় না। এ নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণাও শুরু করেছেন। একে বিজ্ঞান সম্মত বলে ঘোষণা না করলেও বিষয়টিকে তারা এখনো উড়িয়ে দেননি। বিজ্ঞানীরা এ ধরনের ঘটনা যেখানে ঘটে থাকে সেখানে ছুটে যান বিষয়টি অনুধাবন করার জন্যে। হয়তো অদূর ভবিষ্যতে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে।

পুনর্জন্ম মানে কোন ব্যক্তি মরে যাবার পর আবার পৃথিবীতে জন্ম নেয়। যেমন রাজা হিসেবে মৃত্যুবরণ করে কোন গরীব প্রজা হিসেবে জন্ম নেয়া। কোন গরীব না খাওয়া মানুষ মৃত্যুর পর কোটিপতি হয়ে আবার পৃথিবীতে আসা। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মমতে পুর্নজন্মকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা হয়।

ত্রিপিটকে বর্ণিত ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ পাঁচশত পঞ্চাশ জন্ম সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন। তা বাংলা ভাষায় ষষ্ঠ খন্ডে জাতক গ্রন্থ নামে পরিচিত। অনেকে মনে করেন ভগবান বুদ্ধ মাত্র পাঁচশত পঞ্চাশ বার জন্ম গ্রহণ করেছেন। সেটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এগুলি তিনি দেশনা প্রসঙ্গে অথবা উদাহরণ স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। সেবক আনন্দ স্থবিরকে বলেছিলেন- আমি পুনঃ পুনঃ যতবার জন্ম গ্রহণ করেছি ততবার যদি আমার দেহগুলি স্তুপাকারে স্থাপন করা হতো সেগুলি একটা পর্বতে পরিণত হতো। তাহলে

বুঝা যাচ্ছে তিনি কত যে অগনিত বার জন্ম গ্রহণ করেছেন তার কোন পরিসীমা নেই।

পূর্ব পূর্বজন্ম সম্বন্ধে জানা জ্ঞানকে জাতিস্মর জ্ঞান বলে। জ্ঞানের তারতম্য ভেদে কেউ এক জন্ম, কেউ একাধিক জন্ম, কেউ একশত জন্ম, কেউ এক হাজার জন্ম এবং কেউ লক্ষাধিক জন্ম নিজের পূর্ব জন্ম সম্বন্ধে ব্যক্ত করতে পারেন। কিন্তু ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ তিনি নিজের এবং অপরের অসংখ্য জন্ম সম্বন্ধে পুংখানুপুংখরূপে ব্যক্ত করতে পারেন। যাঁরা জন্মান্তর্বাদী শুধু তারাই মনপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন। জন্মান্তর্বাদ, কর্মবাদ এবং নির্বানবাদ নিয়ে বৌদ্ধ দর্শন অতীব সমৃদ্ধ।

আমাদের আশে পাশে অসংখ্য জীবানু ছড়িয়ে আছে। সেগুলি খোলা চোখে দেখা যায় না। কেউ কেউ মনে করেন কিছুনেই। কিন্তু অনুবীক্ষন যন্ত্র দিয়ে নিরীক্ষন করলে অসংখ্য জীবানুর প্রমাণ পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি যাদের জাতিস্মর জ্ঞান আছে তাঁরা তাদের পূর্ব পূর্বজন্ম সম্বন্ধে অবগত আছেন। বৌদ্ধ শাস্ত্রে পনের প্রকার জ্ঞানের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে চৌদ্দ প্রকার লৌকিক জ্ঞান এবং এক প্রকার অর্থাৎ আসবক্ষয় জ্ঞানই লোকোত্তর জ্ঞান। লৌকিকগুলি কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং লোকোত্তরে নির্বান সাক্ষাৎ হয়।

১। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জাতিস্মর জ্ঞান লাভীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে। তন্মধ্যে শ্রীলংকার জনৈক কিশোর অনর্গল সূত্রপাঠ ও ধর্মভাষণ দিতে পারেন। তিনি পূর্বজন্মে তথায় একজন ত্রিপিটক বিশারদ ভিক্ষু ছিলেন। তাঁর পঠিত ক্যাসেট বাংলাদেশেও পাওয়া যায়। আমি নিজেও তাঁর কন্ঠস্বর শুনেছি।

২। বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক ও পত্রিকা ছাড়া ইদানিং বিভিন্ন দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকায় জাতিস্মর জ্ঞান লাভীর সঠিক বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত দৈনিক বাংলার বাণী ও মাসিক রহস্য পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে এগুলি পরিলক্ষিত হয়। গত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৮৯ ইংরেজী বুধবার দৈনিক বাংলার বাণীতে এক চাঞ্চল্যকর পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ঘটনা ছাপিয়েছে। আপনাদের অবগতির জন্যে সংক্ষিপ্তাকারে বিবরণ দিয়ে যাচ্ছি।

এঘটনাটি ঘটেছে ভারতে। কানপুরের শুকদেব রায় সিনহা শিক্ষা দপ্তরে চাকুরী করতেন। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। তাঁর মেয়ে সুধা রায় সিনহাকে কলেজে পড়া অবস্থায় জনৈক ডাক্তার বিনয়জির সাথে বিবাহ দেন। তার স্বামী হাসপাতালের জনৈক সেবিকার প্ররোচনায় সুধাকে কৌশলে খুন করেন। সে খুন প্রমাণিত হয়ে ডাঃ বিনয়জির দশ বৎসর কারাদন্ড হয়। সুধার মৃত্যুর পর সে প্রদেশের উন্নাহ জেলার বেথার গ্রামের ইন্দ্র বাহাদুর সিংহের ঘরে জন্মগ্রহণ করে। তার বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর তখন সে আবোল–তাবোল কথা বলতে থাকে। সকলে মনে করছে- তার বোধ হয় মাথা খারাপ হয়েছে। কেউ কেউ তার কথা শুনার জন্যে বাড়ীতে ভীড় জমায়। পরিশেষে সেখানকার বিশিষ্ট সাংবাদিক বাবু চন্দ্রমৌর্য শুক্লা রহস্য উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি সুধার সাক্ষাৎকার নিয়ে তার পূর্বজন্মের বাবার ঠিকানায় যান। দেখা গেল সুধার কথার সঙ্গে ঘটনাগুলি হুবহু মিলে যায়। বর্তমানে সে তিন বৎসরের শিশু। তার নাম মিনু। উক্ত সাংবাদিক মিনু ও তার বাবাসহ কানপুরের মন্দিরের পাশে শুকদেব সিনহার বাড়ীতে যান। মাত্র তিন বৎসরের শিশু মিনু একুশ বৎসর বয়সের সুধার মত কথাবার্তা ও কার্যকলাপ দেখে হাজার হাজার লোক বিস্মিত হয়। বিয়ের রাতে সুধার ফটো এবং অন্যান্য ফটো বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপানো হয়েছে। দৈনিক বাংলার বাণীতে বিয়ের রাতে সুধার ফটো প্রচার করা হয়।

এ নিয়ে মৃত্যুর পর আবার জন্ম নিতে পারে কিনা বিস্তর বিতর্ক। বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে এইসব জন্মান্তরের ধারণা অন্ধবিশ্বাস কিংবা কুসংস্কার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩। এ ঘটনাটি ছাপিয়েছে দৈনিক বাংলার বাণী বুধবার ১৬ই শ্রাবণ ১৩৯৭ বাংলা। ১৯৬৮ সালের ২৮শে জুলাই উত্তর প্রদেশের বলরামপুর জেলার শিবপুর গ্রামে পান্না লাল স্বর্ণকারের পত্নী শ্রীমতি তারামতির এক পুত্ররত্ন জন্মগ্রহণ করেন। তারামতি ও তার স্বামী খুব ধার্মিক। তারা শিশুর নাম রাখে পুন্ডরিক। তাদের বিয়ের কুড়ি বছর পর পুন্ডরিক জন্ম হয়। তার বয়স যখন তিন বছর তখন সে অদ্ভুদ কথা বলতে শুরু করে।

অবশেষে দেখা গেল সে পাঁচ বৎসরের শিশু পুন্ডরিক বলরামপুর মহারাজার সিংহাসনে বসে ভারতবাসী তথা সারা পৃথিবীকে অবাক লাগিয়ে

দিয়েছে। পুন্ডরিক পূর্বজন্মে বলরামপুর মহারাজা পাটেশ্বরী প্রসাদ সিংহ ছিলেন। তা প্রমাণ করলেন মহারাণী রাজলক্ষ্মী দেবী ও রাজপুত্ররা। এ ঘটনা সত্যতা নিয়ে অনেকে প্রমাণ পেয়েছেন।

একদিন গোন্ডার প্রখ্যাত চিকিৎসক অবসরপ্রাপ্ত সার্জন উমানাথ দুবে পুন্ডরিককে নিজের বাড়ীতে ডেকে আনলেন। কথাবার্তায় তিনি পুন্ডরিককে জিজ্ঞাসা করেন- আচ্ছা বলতো, গত জন্মে তোমাকে সবচেয়ে কে বেশী ভালবাসতেন? বলতো গিরিগিরিটাই বাঁধকে তৈরী করে দিলো? পুন্ডরিক সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়- আমার মামা গিরিধারাজি আমাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতেন। স্থানীয় গিরগিরিটাই বাঁধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বলে গিরগিরিটাই বাঁধ আমি নিজেই তৈরী করেছিলাম। চারশত হাতী দিয়ে কাজ করানো হয়েছিল। হাতীগুলি সরকার সরবরাহ করেছিলেন।

এ ঘটনার ব্যাপারে পত্রিকায় অনেকগুলি ছবি ছাপানো হয়েছে। বাংলার বাণীতে তিনটি ছবি ছাপানো হয়েছে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকার বহু ঘটনাবলী থাকা সত্ত্বেও আপাততঃ এ তিনটি জন্মান্তর্বাদের উদাহরণ দিয়ে শেষ করলাম। ভবিষ্যতে আরো আশা রাখি "বনভন্তে দেশনা" ৩ খন্ডে প্রকাশের সময়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংস্পর্শে এসে কয়েকজন জাতিস্মর জ্ঞান লাভীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তন্মধ্যে দু'জনের সম্বন্ধে উল্লেখ করছি।

১। দেশনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জাতিস্মর জ্ঞান সম্বন্ধে বলেন- জাতিস্মর জ্ঞান হলো লৌকিক জ্ঞান। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের উদাহরণ দিয়ে থাকেন। একদিন দেশনালয়ে হঠাৎ একজন লোক এসে উপস্থিত হলেন। বনভন্তে সে ব্যক্তিকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি যখন স্নান ও ভোজন করতে যান তখন সে ব্যক্তির সঙ্গে আমার অনেক আলাপ হয়। আমার সঙ্গে ছিলেন বিমান বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট বাবু সত্যব্রত বড়ুয়া। আলাপে জানতে পারলাম তিনি বিগত ছয় জন্মের কথা স্মরণ করতে পারেন। গত জন্মে অস্ট্রেলিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলাম। তাতে কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁর চোখ দু'টি যেন একটু লম্বা ও সাহেবী চোখের মত। চেহারাটিও যেন একটু লালচে ধরনের। গলার কন্ঠস্বর স্বাভাবিক থেকে ক্ষীন। কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে ইংরেজী বলেন।

ইংরেজীগুলি একটু খাপছাড়া ধরনের। তিনি বলেন- এগুলি অস্ট্রেলিয়ান ইংলিশ। আমি পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়তে পারছিনা। এর পরবর্তী চার জন্ম বৌদ্ধকুলে জন্মগ্রহণ করেছি। জন্মে জন্মে আমি ধ্যান সমাধি করেছি। ইহজন্মে ছোট বেলা থেকে ধ্যান সাধনা করি।

ইতিমধ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ভোজনশালা হতে দেশনালয়ে উপস্থিত হলেন। বর্তমানে তিনি কি ভাবনা করতেছেন জানতে চাওয়া হলে বলেন- আমি পঞ্চস্কন্ধ ভাবনা করি। পঞ্চস্কন্ধ কিভাবে জানেন জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন- পূর্বজন্মের সংস্কার এবং ইহজন্মেও কিছুটা বই পড়ে আয়ত্ব করেছি। তিনি আরো বলেন- আমার বয়স এখন উনত্রিশ বৎসর। ভগবান বুদ্ধ উনত্রিশ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন। আমিও গৃহত্যাগ করেছি। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট প্রব্রজ্যার জন্যে প্রার্থনা জানালেন। কিন্তু বিশেষ অসুবিধার দরুন তাঁকে প্রব্রজ্যা দেননি। তাতে তিনি আমাদেরকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে বললেন- আপনারা আমাকে একটু সাহায্য করুন। আমরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট অনুরোধ করেও কোন ফল হয়নি।

অবশেষে খবর পেলাম তিনি ভারতের অরুনাঞ্চল প্রদেশ চলে গিয়েছেন। সেখানকার জনগন তাঁকে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনায় এবং মহা সমারোহে প্রব্রজ্যা ও উসম্পদা প্রদান করেন। তিনি এখন গভীর অরণ্যে ধ্যান সমাধিতে রত আছেন।

২। এতক্ষন পর্যন্ত এ প্রবন্ধের শিরোনামের কয়েকটি উদাহরণ ও সঠিক প্রমাণ পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করছি। আনুমানিক ১২ বৎসর আগে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদের প্রতি ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। তিনি মানুষের চ্যুতি উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রজ্ঞাচোখে দেখে বলেছিলেন- আজকাল মানুষ মরে পুনরায় মানুষ হতে পারছেনা। প্রায় লোক চারি অপায়ে পতিত হচ্ছে। মনুষ্য লোকে যারা আসতে পারছে তারা সংখ্যায় খুবই নগন্য। স্বর্গে যাওয়া দূরের কথা। তিনি বলেন- যাদের পূন্যরূপ প্যারাস্যুট আছে তারাই পুনরায় মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করছে।

উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন- বিমান দূর্ঘটনা হলে প্রায় লোক মারা যায়। বিমানের পাইলট বা যাদের নিকট প্যারাস্যুট থাকে তারা

তাৎক্ষনিকভাবে নিজকে রক্ষা করতে পারে। ঠিক সেরূপ যারা ইহজন্মে প্যারাস্যুট জোগাড় করতে পারে তারাই মরনের পর চারি অপায় হতে রক্ষা পাচ্ছে।

তিনি আরো একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন- আমি যখন দিঘীনালায় ছিলাম তখন শিবচরণ চাক্‌মা নামে জনৈক বৃদ্ধ দিঘীনালা বনবিহারে প্রায় সময় আসতো। উক্ত ব্যক্তি পরিণত বয়সেই মারা যায়।

উল্লেখ্য যে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ১৯৪৯ ইংরেজী হতে ১৯৬০ ইংরেজী পর্যন্ত ধনপাতায়, ১৯৬০ ইংরেজী হতে ১৯৭০ ইংরেজী পর্যন্ত দিঘীনালায় এবং ১৯৭০ ইংরেজী হতে ১৯৭৪ ইংরেজী পর্যন্ত লংগদুর তিনটিলায় ছিলেন। ১৯৭৪ ইংরেজী হতে এ পর্যন্ত রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারে অবস্থান করছেন।

তিনি যখন বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের খারিক্ষ্যং গ্রামে প্রথম যান তখন জনৈক বৃদ্ধা তার নাতি রত্নকুঞ্জ চাক্‌মাকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সহিত পরিচয় করিয়ে দেয়। কথা প্রসঙ্গে উক্ত বৃদ্ধা বলল- ভন্তে, আমার বড় ভাই শিবচরণ ছেলের ঘরে নাতি হয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এটা সত্যতা প্রমাণের জন্যে আপনার নিকট তাকে নিয়ে এসেছি।

বনভন্তেঃ- তুমি কি শিবচরণ?

রত্নকুঞ্জঃ- হ্যাঁ, ভন্তে।

বনভন্তেঃ- আমি যখন দিঘীনালায় ছিলাম তখন তুমি মদ পান করতে। মদপান করলে মনুষ্যলোকে আসতে পারে না। তুমি কি করে মনুষ্যলোকে আস্‌ছ?

রত্নকুঞ্জঃ- সে সময় আমি মধ্যে মধ্যে মদ পান করতাম। অবশেষে মদ ত্যাগ করে আপনার একান্ত উপাসক হয়েছিলাম। শেষ বয়সে অনেক পুন্য করেছি। সে পুন্যের ফলে আমি মনুষ্যকুলে জন্ম নিয়েছি।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে চোখ বন্ধ করে জ্ঞান দৃষ্টিতে জানতে পারলেন সত্যিই সেই শিবচরণ। তার ভাগিনার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে। রত্নকুঞ্জ চাক্‌মার বয়স যখন মাত্র পাঁচ বৎসর তখন তার বাবাকে নাম ধরে ডাকত। এমন কি ভাগিনা সম্বোধন করত। ক্রমান্বয় এগার বৎসর পর্যন্ত দিঘীনালার পূর্বজন্মের

কথা স্মরণ করে বলতে পারত। সে সময় সে চল্লিশ বৎসর আগের কথা পর্যন্ত বলে মানুষকে অবাক লাগাতো। কালক্রমে সে স্মৃতিগুলি বিলীন হয়ে যায়।

একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে রাজ বনবিহার দেশনালয়ে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে দেশনা দিচ্ছিলেন। এমন সময় রত্নকুঞ্জ চাক্মা তার মা-বাবার সঙ্গে বনবিহারে উপস্থিত হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমার প্রতি সম্বোধন করে বললেন- অরবিন্দ, তোমাকে তার কথা বলেছিলাম। সে পূর্ব জন্মের কথা জানে। আমি সঙ্গে সঙ্গেই আমার জায়গা থেকে উঠে তার পাশেই বসে পড়ি। গ্রাম্য ছেলে বলে তার সাথে চাক্মা ভাষায় আলাপ করতে আরম্ভ করি। কিন্তু রত্নকুঞ্জ লাজুক ভাব দেখায়ে আমার সাথে কোন আলাপ করেনি। বনভন্তের দেশনা শেষ হওয়ার পর বনবিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্মাকে তার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্যে অনুরোধ জানাই। তিনি অনেক চেষ্টা করেও কোন কথা বলাতে পারেননি। সে সময় তার বয়স আনুমানিক ১৪ বৎসর হতে পারে।

এযাবৎ রত্নকুঞ্জের সাথে আমার কোন যোগাযোগ হয়নি। রত্নকুঞ্জ রাজবাড়ী ঘাটের জনৈক দোকানদারের (কারিগর) আত্মীয় হয়। গত ১১ই জুলাই ১৯৯৪ ইংরেজী সোমবার রাজ বনবিহার দেশনালয়ে উক্ত দোকানদারের মাধ্যমে রত্নকুঞ্জের সাথে বিশেষ সাক্ষাৎকার ঘটে। তার পিতার নাম প্রহর চন্দ্র চাক্মা, গ্রাম- খারিক্ষং (কুকি পাড়া) বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়ন। বর্তমান বয়স তেইশ বৎসর। তার নিকট অনেক প্রশ্ন করেও বিশেষ কোন উত্তর পাইনি। কারণ তার স্মৃতিতে কিছুনেই বললেই চলে। এমনকি কিশোরকালে যা কিছু বলেছে সেগুলিও তার মনে নেই।

উপসংহারে সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের অবগতির জন্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের গুরুত্বপূর্ণ দেশনাটি প্রকাশ করে এ প্রবন্ধের ইতি টানতে চাই। তিনি প্রায় সময় বলেন- যারা বিপুল উৎসাহ- উদ্দীপনার সহিত শীল-সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা করবে, অভ্যাস করবে, অনুশীলন করবে এবং পুরণ করবে তারা নিশ্চয়ই পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পারবে। আর যদি নির্বান লাভ করতে না পারে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হবে। ইহজীবনে যারা অখন্ডভাবে পঞ্চশীল পালন করে নানা প্রকার পূণ্যকর্ম করবে না তারা মৃত্যুর পর স্বর্গ

প্রাপ্ত না হলেও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহন করতে পারবে। যারা শীলপালন ও পুন্যকর্ম হতে বিরত থাকবে তারা মৃত্যুর পর চারি অপায়ে পতিত হয়ে নানাবিধ দুঃখভোগ করতে হবে। সুতরাং চারি অপায় হতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় পুন্যরূপ প্যারাস্যুট জোগাড় করা।

- ০ -

ইন্দ্রিয় দমন করলে নির্বাণ লাভ করতে সহজ

আজ মঙ্গলবার শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা ২৫৩৮ বুদ্ধাব্দ ২৪শে মে ১৯৯৪ ইংরেজী। রাজবন বিহার প্রাঙ্গন। দেব মনুষ্যের হিতের জন্যে, সুখের জন্যে এবং মঙ্গলের জন্য পূজনীয় ভিক্ষুসংঘ পরিত্রাণ সূত্র পাঠ করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিকাল ৫ টা ৪৫ মিনিট হতে ৬টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত উপাসক উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন- বৌদ্ধ পরিষদ চার প্রকার। ভিক্ষু পরিষদ, ভিক্ষুনী পরিষদ, উপাসক পরিষদ, উপাসিকা পরিষদ। কিন্তু বাংলাদেশে ভিক্ষুনী পরিষদ নেই। এখানে চাকমা, বড়ুয়া, মারমা প্রভৃতি বৌদ্ধ বলে পরিচয় দেয়। অন্যান্য বৌদ্ধ প্রধান দেশে চারি পরিষদই বেশী পরিচিত। কেউ কেউ বলে থাকে বন বিহারে লংকা–বার্মার মত নারীরা প্রব্রজ্যা নিতে পারবে কিনা? তিনি বলেন- তৃষ্ণা ক্ষয় ও জন্ম–মৃত্যু বন্ধ করতে পারলে দেয়া যেতে পারে। যেদেশ প্রতিরূপ নয় সে দেশে ভিক্ষুনী সংঘ গঠন করা উচিত নয়। বৌদ্ধ ধর্ম কঠিন, অত্যন্ত দুঃসাধ্যকে সাধ্য করতে হয় এবং প্রায় লোকই গরীব অবস্থায় কাল যাপন করছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- নির্বাণ কোন একটা জায়গা নয়। সঙ্গে সঙ্গে যাওয়ার স্থানও নয়। নির্বাণে পুরুষ নেই, নারী নেই, চাকমা নেই, বড়ুয়া নেই, মারমা নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই এবং কোন নামের পরিচয়ও নেই। মন চিত্ত আমি বললে দুঃখ হয়। তাহলে পুরুষ, নারী, চাকমা, বড়ুয়া, মারমা, জাতি, গোত্র এবং নামের পরিচয় সমূলে উচ্ছেদ করতে হবে। যারা জ্ঞানী তাঁরা এগুলিতে দুঃখ ও লজ্জা বোধ করেন।

তিনি উপমা দিয়ে বলেন- যারা অজ্ঞানী তারা বিড়ালের মত। বিড়াল কি করে জান? বিড়ালের স্বভাব যেখানে খাদ্য সেখানে মুখ দেয়া। নিষেধ করলেও শোনেনা। অজ্ঞানীকে যে বিষয়ে নিষেধ করা হয় সে বিষয়ে অনুশীলন করতে অভ্যস্ত থাকে। তোমরা জ্ঞানী হও। সমস্ত দুঃখ হতে নিজে মুক্ত হয়ে অপরকেও মুক্ত করতে চেষ্টা কর। কামসুখ ও আত্ম পীড়ন হতে বিরত থাক। পঞ্চকামসুখ ভোগ ত্যাগ কর। আমি, আত্মা বললে পাপ, দুঃখ ও অনার্য হিসেবে গণ্য হয়। অনেকে পূণ্য কর্মে লজ্জা বোধ করে।

তিনি একটি উপদেশমূলক উপমা দিয়ে বলেন- কোন এক গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। বিদ্যালয়েব আশে পাশে ছাত্রদের সমবয়েসীরা গরু চড়ায় ও ছাত্রদেরকে শাস্তি দিলে খুশী হয়। শিক্ষকের বকুনি ও শাস্তি পেয়ে যখন তারা বড় হয় বা এম. এ পাশ করে তখন তাদের ছোটকালের শিক্ষকের বকুনি ও শাস্তির কথা মনে পড়ে। তারা বুঝতে পারে শিক্ষকের বকুনি ও শাস্তি বড়ই উপকার হয়েছে। ছোটকালের শিক্ষকদেরকে গভীর শ্রদ্ধা করতে বাধ্য হয়। আর যারা বিদ্যালয়ে পড়েনি তারা সারাজীবন সে অবস্থায় থেকে যায়। এখানেও সে রকম বনবিহারে যারা সব সময় আসে তাদের মধ্যে কেউ কেউ বনভন্তের বকুনি সহ্য করতে হয়। বনভন্তের বকুনি সহ্য করতে পারলে বিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রের মত সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর যারা বিহারে প্রায়ই আসেনা তারা রাখাল ছেলের মত অনার্য থেকে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন- শিক্ষক ছাত্রদেরকে হিংসা বা রাগ করতে পারেনা। বরঞ্চ মূর্খকে পন্ডিত বানানোর জন্য বকুনি ও শাস্তি প্রদান করে থাকেন। ভিক্ষু শ্রামণ ও উপাসক-উপাসিকারা সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরম সুখ নির্বাণ লাভ করুক এ আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে- তোমরা বনভন্তে হতে কি পেয়েছ? কি দেয়? কেউ যদি এরূপ প্রশ্ন করে উত্তর দিবে- আমরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হতে আমাদের সামর্থ অনুযায়ী বুদ্ধজ্ঞান ও চারি আর্যসত্য পেয়েছি। কিন্তু এ ব্যাপারে অহংকার করতে নেই। খুর যেমন চুল কাটতে পারে অন্যদিকে চামড়াও কাটা যায়। অহংকার করলে পরকালে নীচ কুলে জন্ম গ্রহণ করবে। আর যদি অপ্রমত্তভাবে শীল পালন কর রাজকুল ও ধনীকুলে জন্ম গ্রহণ করবে। তোমরা সর্বজীবে দয়া কর। হিংসা করনা। মানুষ, দেবতা, ব্রহ্মারাও হিংসা করে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা অপ্রমাদের সহিত শীল পালন কর এবং সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয় দমন কর। ইন্দ্রিয় দমন করতে পারলে নির্বাণ লাভ করতে সহজ হয়। এ বলে আমার দেশনা এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু

খাঁড়া জায়গায় ঘুরাফেরা করনা

আজ ১লা বৈশাখ (১৪০১ বাংলা) রোজ বৃহস্পতিবার, ১৪ই এপ্রিল ১৯৯৪ ইংরেজী। স্থান রাজবন বিহার প্রাঙ্গন সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বুদ্ধ পূজা, সংঘদান ও অষ্ট পরিস্কার দান সম্পন্ন হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সকাল ১০টা তিন মিনিট হতে ১০টা ২৮ মিনিট পর্যন্ত উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে শুভ নববর্ষ উপলক্ষ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মদেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন- ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধের কথা হল অজ্ঞানতাকে ধ্বংস কর এবং জ্ঞান উৎপন্ন কর। তাহলে বুদ্ধের কথা অনুযায়ী বনভন্তে তোমাদের কতটুকু জ্ঞান দিতে পারবে। কতটুকু সুখ দিতে পারবে? কতটুকু সত্য ধর্ম উপলব্ধি করিয়ে দিতে পারবে?

বুদ্ধের জ্ঞান পরম সুখ, সত্য ধর্ম উপলব্ধি করতে হলে তোমাদের পূর্ব জন্মের পূণ্য পারমী, বুদ্ধের উপদেশ পালন এবং ইহ জন্মের বিপুল পরাক্রমের সহিত জ্ঞান উৎপন্ন করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যদি এ তিনটার মধ্যে কোন একটি অপূর্ণ থাকে তবে তোমাদের জ্ঞান ও অপূর্ণ থেকে যাবে।

তিনি বলেন- নির্বাণ লাভ করতে হয় শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে। তাতে তোমাদের বিপুল পূণ্য সঞ্চয় হবে। সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয়ে পরম সুখ অনুভব করতে পারবে। অবিদ্যাই মানুষকে দুঃখ প্রদান করে। অবিদ্যা সর্ব দুঃখের খনি স্বরূপ। অবিদ্যাকে সমূলে ধ্বংস করতে পারলে বিদ্যা বা বুদ্ধজ্ঞান উৎপত্তি হয়। বুদ্ধ জ্ঞানে চারি আর্য সত্য সম্যক রূপে অবগত হওয়া

যায়। এ চারি আর্য সত্যের উপর ভিত্তি করে ভগবান বুদ্ধ ৮৪ হাজার ধর্ম স্কন্ধ প্রকাশ করেছেন।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- যে আমার শিক্ষা গ্রহণ করবেনা। উপদেশ পালন করবেনা। সে নিশ্চয় নরকে বা অপায়ে পতিত হবে। যে আমার শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং উপদেশ পালন করবে সে অচিরেই সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি পাবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরো বলেন- ভগবান বুদ্ধের সময়ে শতকরা দুই তিন জন মাত্র অপায়ে পরতো। কিন্তু বর্তমানে মাত্র শতকরা দুই তিন জন লোক স্বর্গে গমন করছে। বাকী সব নরকে বা চারি অপায়ে পতিত হচ্ছে। তা হলে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছেনা কিসের অভাবে এ অবস্থা। একমাত্র অভাব বুদ্ধের শিক্ষা ও বুদ্ধের উপদেশ।

তিনি একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বলেন- তোমরা নিশ্চিয়ই পাহাড়ের খাঁড়া জায়গা বা কামা দেখেছ। সেখানে গরু ছাগল চড়তে গেলে হঠাৎ পা ফস্‌কে নীচে পড়ে যায়। পরিনামে গরু ছাগলের মৃত্যু ঘটে অথবা পঙ্গু হয়ে যায়। মধ্যে মধ্যে সেখানে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও খেলতে যায়। তাঁদের অভিভাবকেরা বকাবকি করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়। অথবা লাঠির ভয় দেখিয়ে সমান জায়গায় নিয়ে যায়। ছেলে মেয়েরা সেখানে গেলে ভয়ের কোন কারণ থাকে না। বকাবকিরও প্রয়োজন হয় না। ঠিক সেরূপ খাঁড়া জায়গা বা কামা হল অপায়। অবোধ ছেলে মেয়ে হল তোমরা, প্রশস্থ জায়গা হল বুদ্ধের শিক্ষা ও উপদেশ এবং তোমাদের অভিভাবক হলেন বনভন্তে।

তিনি আরো বলেন- বনভন্তে মধ্যে মধ্যে তোমাদেরকে বকাবকি করে কি জন্যে জান? তোমাদের সুখের জন্যে। তোমাদের উন্নতির জন্যে। তোমাদের মঙ্গলের জন্যে। দায়িত্ব ও কর্তব্যের কারণে বনভন্তে তোমাদের প্রতি দয়া করে বকাবকি করেন।

তিনি আরো জোর দিয়ে বলেন- যে আমার বকাবকি সহ্য করতে পারবেনা। সে নিশ্চয়ই উক্ত কামায় পতিত হবে। যে আমার শিক্ষা ও উপদেশ পালন করবে সে নিশ্চয়ই খোলা মাঠ বা সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি পাবে। শিশু যেমন ক্রমান্বয়ে বড় হয় তখন তাকে আর বকাবকি করতে হয় না। ঠিক সেরূপ তোমাদের যখন জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে তখন বনভন্তেরও বকাবকির

প্রয়োজন হবে না। তোমরা তাড়াতাড়ি জ্ঞান-বৃদ্ধ হয়ে যাও। বুদ্ধের শিক্ষায় ও উপদেশ দেব্র-ব্রহ্মা ✽ হতে উত্তম হতে পারবে। নতুবা পশু হতেও অধম হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ভগবান বুদ্ধ শুদ্ধোধন রাজাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন- উঠ, জাগরিত হও। ঘুমিয়ে থেকোনা। আলস্য পরায়ন হইওনা। সদ্ধর্ম আচরণ কর। কর্মই মানুষকে সুখ দেয়, কর্মই মানুষকে দুঃখ দেয়। ধর্মের অধীনেও কর্মের অধীনে থাকিও না। সর্বদাই অপ্রমাদের সহিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পালন কর। এ উপদেশে শুদ্বোধন রাজার ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়েছিল।

তিনি বলেন- তোমরা ধর্মের নামে অধর্ম করনা। ধর্ম পালন না করলে উচ্চ শিক্ষা বা উচ্চ ডিগ্রি লাভ করেও নরকে পড়ার আশংকা থাকবে। উত্তম ধর্ম ইহলোক-পরলোক সুখ প্রদান করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপসংহারে বলেন- তোমরা ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন করতে না পারলে দারোগা যেমন আসামীকে নির্যাতন করে ঠিক তেমন দারোগারূপী মৃত্যু অধর্মচারীকে নির্যাতন করতে করতে অপায়ে বা কামায় ফেলে দেবে। তোমরা আসামী হইওনা। নির্বাণ লাভ করতে পারলে মৃত্যু রূপী দারোগা তোমাদের ধরতে পারবেনা। সুতরাং তোমরা খাঁড়া জায়গায় ঘুরাফেরা করনা। এ বলে আমার দেশনা এখাহে শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

মদপানে বিরত

আজকাল প্রায় জায়গায় দেখা যায় মদ্যপায়ীরা যেখানে সেখানে নানা প্রকার গন্ডগোলের সৃষ্টি করছে। জানতে পারলাম পাশ্চাত্যে বা শীত প্রধান অঞ্চলে প্রায়ই নরনারী মদপান করে। কেউ অভ্যাসের কারণে, কেউ সামাজিক কারনে এবং কেউ আবহাওয়ার কারনে মদপানে অভ্যস্ত। ধর্মীয় নিষেধ থাকলেও পৃথিবীর বিভিন্ন বৌদ্ধ দেশে কেউ কেউ মদ পান করে।

পাকিস্তান আমলে অত্র পার্বত্য অঞ্চলে প্রায় লোকে মদ পান করত। বর্তমানে প্রায় হ্রাস পেয়েছে। ইদানিং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংস্পর্শে এসে অনেকে "মদপানে বিরত" হয়েছে। মদপানে বিরত হয়েছে বহু প্রমাণও পেয়েছি। আপনাদের অবগতির জন্যে মাত্র তিনটি প্রমাণ প্রকাশ করছি।

১। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ১৯৬০ ইংরেজীতে ধনপাতা হতে দিঘীনালায় আসেন। তথায় পাড়াগাঁ হতে একটু দূরে এ ধ্যান কুঠির নির্মাণ করে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি শুনতে পেলেন জনৈক প্রভাবশালী মদ্যপায়ী লোক মদপানে মাতলামী করে। এমনকি ভিক্ষুদের উপদেশ ও গ্রহণ করেনা। বরঞ্চ পাল্টা কথায় স্তব্ধ করে দেয়। তার মুখ্য বক্তব্য ছিল- আমি ভিক্ষু সংঘকে দান করব। কিন্তু মদপান থেকে বিরত হওয়ার জন্যে উপদেশ দিতে পারবে না। আমি যা দান করব তা দিয়ে আমাকে স্বর্গে নিতে হবে। দান হল স্বর্গে যাওয়ার ভাড়া স্বরূপ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যখন দিঘীনালায় যান তখন সে গ্রামের লোকেরা তাকে বনভন্তের নিকট না যাওয়ার জন্যে পরামর্শ দেন। কারণ উক্ত ব্যক্তি বনভন্তের প্রতিও সেরূপ আচরণ করার আশংকা করেছিলেন। অনেকদিন পর তার মনে উদয় হল, গ্রামের অনেক লোক বনভন্তের নিকট ধর্ম দেশনা শুনতে যায়। তারও যাওয়া উচিত। এ মনে করে একদিন গ্রামের জনৈক লোকের নিকট প্রকাশ করে। তারা প্রথমেই শর্ত দিলেন যে বনভন্তের সম্মুখে নীরবে বসে থাকতে হবে। একদিন পরিচয় হওয়ার সাথে সাথেই বনভন্তে বললেন- তুমি নাকি সেই মদ্যপায়ী ও দাম্ভিক ব্যক্তি? সে লোক নীরবে থাকার পর আবার বললেন কোন লোক কাউকে স্বর্গে নিতে পারে না। শীল পালন করলে স্বর্গে যাওয়া যায়। তুমি যদি স্বর্গে যেতে চাও আজ থেকে মদপানে বিরত হও। পঞ্চশীল অখন্ডভাবে পালন কর। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এ উপদেশ দেয়ার সাথে সাথেই উক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তি আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। কালক্রমে দেখা গেল সেদিন হতে মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত পঞ্চশীল রক্ষা করে পরলোক গমন করে।

২। নাম পদ্ম কিশোর চাক্‌মা। বর্তমান বয়স নব্বই এর উপরে। বাড়ী রাঙ্গামাটি পৌর এলাকার রাঙ্গাপানি গ্রামে। বেশ সুস্বাস্থের অধিকারী। এখনও স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারেন। আমার সাথে তাঁর সুসম্পর্ক আছে।

জানতে পারলাম তিনি নাকি সারাজীবন মদ পান করতেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যখন রাঙ্গামাটিতে আসেন তখন তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে মদপান ছেড়ে দেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে বললেন- আমি সারাজীবন কাহারো উপকার করতে না পারলেও অনিষ্ট করিনি। পঞ্চশীল পালন করতে খুব চেষ্টা করতাম। কিন্তু আমার এক কু-অভ্যাস ছিল। সেটা হল মদপান করা। মদপানে কোনদিন মাতলামী করতাম না। বয়স যখন পঞ্চাশ তখন আমার মনে এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ছেলেরা যুবক হয়েছে। তাতে আমার বড়ই লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মনে মনে চিন্তা করে একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সমীপে উপস্থিত হই। আমার দুর্বলতার কথা স্বীকার করে মদপান থেকে বিরত হবার প্রার্থনা জানাই। তিনি আমাকে বললেন- তুমি আমার চোখের দিকে চেয়ে থাক এবং এ রকম বল "আজ হতে মদপান করবনা"। বিহার হতে আসার সময় তিনি বললেন- প্রত্যহ অল্প অল্প সরবত পান করিও। কয়েক বোতল সরবত পান করে মদের কু-অভ্যাস চলে যায়। এমনকি মদের গন্ধ পর্যন্ত সহ্য করতে পারি না।

৩। বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নের জনৈক মদ্যপায়ী কর্তৃক তার স্ত্রীকে নির্যাতনের ঘটনা আপনাদের নিকট তুলে ধরছি। সে ব্যক্তি দিনের বেলায় ভাল থাকে। বাড়ীর কাজ কর্ম করে এবং অপরের সঙ্গেও ভাল ব্যবহার করে। কিন্তু রাত্রী বেলায় মদ পান করে তার স্ত্রীকে নানাভাবে নির্যাতনে ব্যস্ত থাকে। তার প্রতিরাতের রীতি হল ঘরের মাঝখানে বসে মদপান করা। সামনেই থাকবে মদের বোতল, লবন ও পোড়া শুকটি। বাম হাতের পাশেই থাকবে এক লম্বা বেত। তার স্ত্রীর কাজ হল নৌকায় বসে যেভাবে দাঁড় টানে সেভাবে দরজায় বসে দাঁড় টানতে হবে। সে মদ পান করে করে গল্প বলবে। এমনকি এক গল্পকে দুইতিনবার পর্যন্ত বলতে থাকে। এদিকে তার স্ত্রী তার সাথে প্রতি কথায় সায় দিতে হবে। না হয় বেত দিয়ে আঘাত করবে। নৌকায় যেভাবে কে-র-ত, কে-র-ত শব্দ করে দাঁড় টানে ঠিক সেভাবে শব্দ করে দাঁড় টানতে হবে। না হয় বেতের আঘাত সহ্য করতে হবে। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করে- ঘর কতটুকু গেছে? রাঙ্গামাটি আর কতটুকু বাকী? যদি সে বলে 'যাচ্ছে'। বেতের আঘাত দিয়ে বলে- তোমার বাপে দেখেছে ঘর যেতে? যদি বলে- যাচ্ছে না; বেতের আঘাত দিয়ে বলে- যাচ্ছে

না কেন? জোড়ে টান। এভাবে মধ্যরাত পর্যন্ত উক্ত মদ্যপায়ীর রহস্যজনক অভিনয় চলতে থাকে। এ ব্যাপারে স্থানীয় জনগন তার রহস্যজনক অভিনয় বন্ধ করতে পারেনি। তার কার্য্যকলাপে সমস্ত এলাকায় কেউ আনন্দ উপভোগ করে আর কেউ তাঁর স্ত্রীর জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যখন বন্দুকভাঙ্গা ইউনিয়নে যান তখন স্থানীয় লোকেরা উক্ত মদ্যপায়ীর স্ত্রীকে দেখায়ে বলেন- ভন্তে, এ মহিলাকে তার স্বামী মদপান করে নানাভাবে নির্যাতন করে। আমরা তার কার্য্যকলাপ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছি এবং বললেন- সে এখন বাড়ীতে আছে। বনভন্তে তাকে ডেকে নিয়ে আসার জন্যে নির্দেশ দিলেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশ পেয়ে গ্রামদেশে চোর ধরা পড়লে যেভাবে ধরে নিয়ে আসে ঠিক সেভাবে তাকে ধরে নিয়ে হাজির করা হল। বনভন্তে প্রথমেই তার স্ত্রীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- তুমি পূর্বজন্মে পাপ করেছ। সেজন্য ইহজন্মে তোমার স্বামীর হাতে নির্যাতন ও ফলভোগ করতেছ। তুমি দুঃখ করিও না। তাকে গালিও দিও না। শুধু তাকে সুখী হয়ার জন্য প্রার্থনা করিও। অচিরেই তোমার সুখ বয়ে আসবে। পাপের পরিনাম ফল ভোগ করতে হয়। পুন্যের পরিনাম ফল ও ভোগ করতে হয়। পাপ পুন্য জন্ম জন্মান্তরে অনুসরণ করে। এবার মদ্যপায়ীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- তোমার স্ত্রী পূর্বজন্মে পাপ করে নারীরূপে তোমার ঘরে এসেছে। আর তুমি পাপ করে কোথায় যাবে জান? হয়ত নরকে নতুবা তির্যক লোকে। তোমার ভবিষ্যৎ জীবন ঘোর অন্ধকার। সুতরাং মদপান ত্যাগ করা উচিত। মদ্যপানে বিরত থাকলে ভবিষ্যৎ জীবন উজ্জ্বল হতে পারে। আজ হতে তুমি মদপান ত্যাগ কর। কালক্রমে দেখা গেল উক্ত মদ্যপায়ী ব্যক্তি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশে এবং জনগণের চাপের মুখে "মদপানে বিরত" হয়েছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি দৃঢ়কন্ঠে বলেন- মদ্যপায়ীকে পঞ্চশীল লংঘন না করে। কেউ যদি ভবিষ্যতে পঞ্চশীল ভঙ্গ না করার নিশ্চয়তা দেয় তাকে বড় পুরস্কার ভূষিত করা হবে। সে পুরস্কার হল সকৃদাগামী ফল।

- ০ -

সংসার গতি ও নির্বাণ গতি

আজ ২৮শে জানুয়ারী '৯৪ ইংরেজী রোজ শুক্রবার। রাজবন বিহার দেশনালয়ে অনেক উপাসক-উপাসিকাদের সমাবেশে সংঘদান অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মানুষ্ঠানে পুরোহিত্য করেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবং পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষু। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা। সকাল ৯টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত হতে ১০-৩৫ মিনিট পর্যন্ত দানোষ্ঠান পর্ব শেষ হয়।

সকাল ১০-১৫ মিনিট হতে ১০টা ৩৫ মিনিট পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পুন্যার্থীদের উদ্দেশ্যে এক নাতিদীর্ঘ ধর্মদেশনা প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি মানুষের গতি সম্বন্ধে ব্যক্ত করেন। গতি হল দু'টি। একটা সংসার গতি অপরটি নির্বান গতি। পঞ্চস্কন্ধ সমন্বিত সংসার গতি। নারী বা পুরুষ জন্ম হওয়া দুঃখজনক। তাতে অনেক দুঃখের সৃষ্টি হয়। জন্ম হলে যেমন জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তুর অলাভজনিত দুঃখ, বর্তমান আহার অন্বেষণে দুঃখ, পূর্ব জন্মার্জিত পাপজনিত দুঃখ প্রভৃতি উৎপত্তি হয়। তোমরা তোমাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখগুলি পর্য্যবেক্ষন কর। ব্যক্তিগত জীবন থেকে পারিবারিক, পারিবারিক থেকে সামাজিক, সামাজিক থেকে জাতিগত, জাতিগত থেকে দেশ, দেশ থেকে বিদেশগত কত যে মারামারি, কাটাকাটি এবং যুদ্ধ বিগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাতে অনেক দুঃখের উৎপত্তি হয়। নারী বা পুরুষ মৃত্যুর পর পুনরায় নারী পুরুষ অথবা চারি অপায়ে পতিত হয়ে মহা যন্ত্রনা ভোগ করতে হয়। এগুলির কারণ একমাত্র সংসার গতি। সংসার গতি পঞ্চ মারের অধীনে থাকতে হয়। মার উর্দ্ধলোকে বা নির্বান গতিতে যেতে দেয় না। সবসময় মারের ভূবনে থাকতে বাধ্য করে।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- নোংরাজল হল সংসার গতি। বিশুদ্ধ জল বা সিদ্ধ জল হল নির্বান গতি। নোংরাজল পান করলে মানুষের নানাবিধ পেটের পীড়া ও চর্ম পীড়ার উৎপত্তি হয়। তাতে মানুষ নানাবিধ দুঃখে পতিত হয়। বর্তমানে যেমন অনুবীক্ষন যন্ত্র দিয়ে নোংরাজলে অসংখ্য জীবানু দেখা যায়। তেমন বুদ্ধ জ্ঞান দিয়ে সংসার গতিতে অসংখ্য দুঃখরাশি দেখা যায়। সাধারণ লোকে এ দুঃখ রাশি দেখতে পায় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরও উপমা দিয়ে বলেন- সংসার গতি ও নির্বান গতির মধ্যে দেখা যায় দু'জন গুরু। একজন হল মার এবং অপরজন হলেন সম্যক সম্বুদ্ধ। দু'জনের দু'পথ। তিনি পূণ্যার্থীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- আচ্ছা, বল দেখি তোমরা কোনদিকে যাবে? কেউ কেউ বললেন- ভন্তে আমরা বুদ্ধের পথে যাব। তিনি আবার বললেন- বুদ্ধের পথে কোন দুঃখ নেই। তোমরা দুঃখ ভোগ করতেছ কেন? শুধু মুখে বললে হবে না কাজে পরিণত করতে হবে।

ভগবান বুদ্ধ ও কুটদন্তের উল্লেখ করে বলেন- কুট দন্ত ভগবান বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন- আপনি কোন ধর্ম প্রচার করতেছেন?

ভগবান বুদ্ধঃ- নির্বান ধর্ম।

কুটদন্তঃ- নির্বান ধর্ম হল উচ্ছেদবাদ।

ভগবান বুদ্ধঃ- সংসার গতি উচ্ছেদ করাই নির্বান ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে মৈত্রী সম্বন্ধে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেন- যারা প্রত্যহ সকাল, দুপুর ও রাত্রীতে মৈত্রী ভাবনা অনুশীলন করবে তারা যাবতীয় আপদ-বিপদ ও নানাবিধ উপদ্রব হতে রক্ষা পেতে পারে।

সাধু - সাধু - সাধু

সর্পরূপে দেবরাজ ইন্দ্র

১৯৯৩ ইংরেজীর অক্টোবর মাসের ২১ ও ২২ তারিখ রাজ বনবিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়।এর পরবর্ত্তীতে পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান হতে দায়ক-দায়িকা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে সশিষ্যে আমন্ত্রণ করতে আসেন। তাতে তিনি প্রায় আমন্ত্রণ সাদরে অনুমোদন করেন। ২৪শে অক্টোবর রবিবার দিন তিনি এক দীর্ঘ ধর্ম অভিযাত্রায় বাহির হন। ক্রমান্বয়ে জুরাছড়ি, সুবলং, দেওয়ানছর, নানিয়ারচর, বাঘাইছড়ি, গামারিঢালা, জীবঙ্গছড়া প্রভৃতি স্থানে প্রায় দুইমাস যাবত ধর্ম প্রচারে পরিভ্রমণ করেন। বন বিহারের শাখা জুরাছড়ি বনবিহারে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন।

পরম্পর শুনতে পেলাম কোন এক বিহারে ধর্মসভা চলাকালীন এক সর্পের আভির্ভূত হয়। তা সত্যতা প্রমাণ করেন বনভন্তের গৃহী সেবক বাবু সমর বিজয় চাক্‌মা। তাঁর বিবরণে প্রকাশ জীবঙ্গছড়া বিহারের প্রাঙ্গনে এক সার্বজনীন সংঘদান অনুষ্ঠিত হয়। প্রাঙ্গনের এক পাশে ভিক্ষুসংঘের মঞ্চ তৈরী করা হয়। যথাসময়ে সংঘদান সমাপনের পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা আরম্ভ করেন। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল মঞ্চের পাশেই এক বিষধর সর্প। মঞ্চের পাশে উপবিষ্ট উপাসকরা সর্পের ভয়ে অন্যদিকে সরে যায়। তাৎক্ষনিকভাবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন- তোমরা ভয় করিওনা, ভয় করিও না। সে তোমাদের কিছু করবে না। এরূপ বলার পর মঞ্চের দিকে ফণা তুলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে জনতার মাঝে যাচ্ছিল। তখন বনভন্তে আবার বললেন- তোমরা তাকে পথ দাও। সে সেদিকেই চলে যাবে। দেখতে দেখতে উক্ত সর্প জনতার মাঝখান দিয়েই চলে গেল। পুনরায় ধর্মসভা আরম্ভ হলে তিনি বলেন- অনেক সময় দেবরাজ ইন্দ্র সর্পরূপে আভির্ভূত হয়।

- ০ -

বনভন্তের প্রিয় শিষ্য বুড়াভন্তে

রাজবন বিহার। আমার মনে হয় কাহারো অজানা নয়। প্রায় বিশ একর স্থানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্যমন্ডলী শমথ-বিদর্শন ভাবনা অনুশীলনে রত আছে। অত্র এলাকায় বহুজন ভিক্ষু বহুজন শ্রমণ আছেন। বন বিহারের শাখা যমচুগ বন বিহারের মোট ২৩ জন ভিক্ষু শ্রমন নির্জন বনে ধ্যান সমাধি

শিক্ষা করতেছেন। জুরাছড়ি বনবিহারে ৭ জন ভিক্ষু শ্রমন, সাপছড়ি বনবিহারে ৪ জন ভিক্ষু ও কাঁটাছড়ি বনবিহারের ২ জন ভিক্ষু অবস্থান করছেন। তাঁরা প্রত্যেকেই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশে চলেন। প্রত্যেক উপোসথের দিন অর্থাৎ পূর্ণিমা ও আমবশ্যা তিথিতে উপোসথের দিনে রাজবন বিহারে আসতে হয় অথবা মধ্যে মধ্যে গুরুভন্তের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ভিক্ষুত্ব-শ্রমনত্ব রক্ষা করতে হয়।

অদূর ভবিষ্যতে বনভন্তের শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে গেলে আরও শাখা বন বিহার স্থাপন করার উদ্যোগ নেয়া হবে। তন্মধ্যে রাঙ্গামাটি জেলার তিনটিলা, হারিক্ষ্যং, মারিচ্যাবিল, গামারিঢালা প্রভৃতি এবং খাগড়াছড়ি জেলার মধ্যে পেরাছড়া, দিঘীনালা, লৌগাং প্রভৃতি স্থানে বনবিহার স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেছেন- আমার শিষ্যরা যখন শিক্ষায়, দীক্ষায় অভ্যাসে অনুশীলনে এবং ধ্যান সমাধিতে ও জ্ঞান পরিপূর্ণ হবে তখন ভালভাবে ধর্ম প্রচার করতে সুবিধা হবে। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হয়ে ধর্ম প্রচার করতেছেন।

রাজবন বিহারে যতজন ভন্তে স্থায়ীভাবে অবস্থান করতেছেন তন্মধ্যে দু'জন ভন্তের নাম অনেকেই জানেন না। প্রথম জন হলেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে। তাঁর নাম শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির, দ্বিতীয় জন হলেন বুড়াভন্তে। তাঁর নাম শ্রীমৎ অতুলসেন ভিক্ষু। বয়স আশি বৎসর পূর্ণ হয়েছে। ভিক্ষুত্বের বয়স ১২ বৎসর।

বুড়াভন্তের গ্রহী নাম বাবু কেশব রঞ্জন চাক্‌মা। বাড়ী মগবান বালুখালী গ্রামে। সে সময় তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। গৃহীকালে বনভন্তের (রথীন্দ্র লাল চাক্‌মা) সাথে পরিচয় ছিল। বালুখালী ও মোরঘোনা পাশাপাশি গ্রাম ছিল। তিনি পরিণত বয়সে সংসার ধর্ম করেন। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে। বড় মেয়ে নির্মলিনী চাক্‌মা ও ছোট মেয়ে সুমনাদেবী চাক্‌মা। তাদের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে বিয়ে হয়। ছেলের নাম সংঘ প্রসাদ চাক্‌মা। তাঁর গৃহী জীবনে অভাব বলতে কিছুই ছিল না। পাহাড় ব্যতীত শুধু ধান জমি ৫ একর ছিল। রবি শস্যের জমিও ছিল সামান্য। মাতৃহারা সংঘপ্রসাদ চাক্‌মা রাঙ্গামাটি হতে এস. এস. সি. পাশ করে।

ছেলের বয়স যখন মাত্র ষোল তখন তিনি কোন এক কার্যোপলক্ষ্যে রামগড় যান। সে সময় সংঘ প্রসাদ তার বাবার আদেশে জমির চাষ দেখাশুনার কাজে যায়। হঠাৎ এক দুর্ঘটনায় সংঘপ্রসাদ মারা পড়ে। এদিকে তার বাবা রামগড় হতে এসে ছেলের মৃতদেহ দেখে পাগল প্রায় হয়ে যান। কিছুদিন পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করে তাঁর চিত্তে ভারসাম্যতা ফিরে আসে। এভাবে তিনি বন বিহারে যেতে যেতে তাঁর চিত্তে বৈরাগ্যের ভাব উৎপন্ন হয়।

আজ হতে ঠিক ১৪ বৎসর পূর্বে বাবু কেশব রঞ্জন চাক্‌মা তাঁর ...য়েদ্বয়কে যাবতীয় সম্পত্তি অর্পন করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেন। প্রথমেই তিনি ছেলের কথা মনে পড়লে মধ্যে মধ্যে কাঁদতেন। বনভন্তের উপদেশেই তা উপশম হয়।

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করেছেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যখন ধর্ম দেশনায়রত থাকেন **অথবা** অনবরতঃ স্রোতের মত দানীয় সামগ্রী আসতে থাকে, তিনি বলেন- "বুড়া ঠাকুরকে দাও"। অন্য সময় ও দেখা যায় বনভন্তে বুড়া ভন্তেকে দানীয় সামগ্রী দেয়ার জন্যে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। এভাবে দানীয় সামগ্রী যেতে যেতে বুড়াভন্তের কামরা ভর্তি হয়ে যায়।

বিকাল বেলায় লক্ষ্য করা যায় যুবক ভিক্ষু শ্রমণেরা ফান্টা-কোকা-কোলা এবং নানাবিধ পানীয় দিয়ে বুড়াভন্তেকে আপ্যায়ন করেন। রাত্রীবেলায় বুড়াভন্তের ভাল-মন্দ খোঁজ খবর নিতে আসেন। সে সময় প্রায় দেখা যায় কেউ তাঁর চোখে ঔষধ দেন, কেউ বিভিন্ন ঔষধ খাওয়ান, কেউ শরীরেও পায়ে তৈল মালিশ করেন।

বনবিহার এলাকায় যত ভিক্ষু শ্রমণ আছেন তারা নিজ নিজ কামরায় ভাবনায়রত থাকেন। কিন্তু বুড়াভন্তের কামরা সকলের জন্যে উন্মুক্ত থাকে। কারণ সারাদিন দানীয় সামগ্রী গ্রহণ করা, পঞ্চশীল ও অষ্টশীল প্রদান করা তাঁর প্রধান কাজ।

একদিন আমি তাঁর ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্য ও তৃষ্ণা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। তাতে তিনি উত্তর দেন আমি এ জ্বরাজীর্ণ দেহ নিয়ে চলতে পারছিনা। শুধু মৃত্যুর দিন গুনছি। আমার আবার গৃহী হওয়ার স্বাদ আছে। এমন গৃহী হব,

সে গৃহী হবে উন্নতমানের বৌদ্ধ কুল। আমি কোন স্থানে ও জন্মগ্রহণ করবো না। সে স্থান হবে শ্রীলংকা।

তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। আমি ও তাঁকে সামর্থানুযায়ী সেবা যত্ন করতে চেষ্টা করি। অমাবশ্যা ও পূর্ণিমা উপোসথের সময় প্রায় তাঁর কামরায় রাত্রী যাপন করি। রাত যখন ৩টা হয় তখন প্রত্যেকের ঘড়িতে এলার্ম পড়ে। বুড়াভন্তে ও তাঁর আসনে এক ঘন্টা পর্যন্ত ধ্যানস্থ হন। মধ্যে মধ্যে তিনি পায়চারী করে আমাকে গান শোনান। আপনারাও বনভন্তের প্রিয়শিষ্য বুড়াভন্তের একটা গান শুনুন।

শিশুকাল শুধু খেলায়।
যৌবনকাল রসের মেলায়।।
বৃদ্ধকাল অনেক জ্বালায়।
কি নেবে যাবার বেলায়।।
শিশু যুব বৃদ্ধ যারা।
হইও নাকো আত্মহারা।।
নির্বান পথে চলবে যখন।
অমৃত সুখ পাবে তখন।।

- ০ -

প্রবারনা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দেশনা

আজ শুভ প্রবারণা পূর্ণিমা। ২৮শে সেপ্টেম্বর '৯৩ ইংরেজী রোজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে নয় ঘটিকায় রাজবন বিহারে সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও বুদ্ধ পূজার সম্পন্ন হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ১০টা ১৮ মিনিট হতে ১০টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত এক সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি বিবিধ নেতা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন।

আত্মাবাদী নেতা অত্যন্ত অহংকারী হয়। তারা মুখে জগত উদ্ধার করে। কিন্তু কাজের বেলায় কিছু নয়। তারা মৃত্যুর পর চার অপায়ে পতিত হয়। কথা আর কাজে মিল নেই বলে তাদের পরিণতি অধোপাতে।

দেবনেতা ও মনুষ্যনেতা ও ধ্বংস হয়। পদ্ম যেমন কর্দম হতে উপরে উঠে শোভা বর্দ্ধন করে তেমন জ্ঞানবলে দেবনেতা ও মনুষ্য নেতাও চারিআর্য সত্য জ্ঞানে উপরে উঠে বা নির্বান লাভ করে। তাহলে বুঝতে হবে জ্ঞান বলে উচ্চ নেতা হওয়া যায়। পৃথিবীতে যত প্রকার নেতা আছে তাদের পতনের আশংকা থাকে।

বিদর্শন পুদ্ গল সাধারণ চোখে দেখা যায় না। যে বুদ্ধ ও ধর্মকে দেখেছেন তিনি চারি আর্য্য সত্যকেও দেখেছেন। যে চারিআর্য্য সত্যকে দেখেছেন তিনি বুদ্ধ ও ধর্মকেও দেখেছেন। একই কথা একই অর্থ। তাহলে যথার্থ দর্শন করা প্রত্যেকের একান্ত প্রয়োজন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দুঃশীল ভিক্ষুদের কঠোর সমালোচনা করে বলেন- আজকাল প্রকৃত ভিক্ষু চেনা মহা কঠিন ব্যাপার হয়ে পড়েছে। যেমন পূর্বকালে একটা বানর সিংহের চর্ম পড়ে ধান খেয়েছিল। সে এলাকার সবাই ভয়ে তাড়াতো না। তাদের মধ্যে জনৈক বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তা করল সিংহ কোনদিন ধান খায় না। সুতরাং লাঠি হাতে যাওয়ায় বানর সিংহ চর্ম ফেলে চলে যায়। সেরূপ বর্তমানে কিছু সংখ্যক নামধারী ও ছদ্মবেশী ভিক্ষু কাষায় বস্ত্র পরিধান ও মস্তক মুন্ডন করে সংঘের বেশ ধারণ করেছে। তাতে সংঘের আবিলতা ও সমাজে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। বর্তমানে ঐ ধরনের বেশধারী ভিক্ষুরা ধর্মের নামে রাজনৈতিক কর্মকান্ড, গোয়েন্দাগিরি, ব্যবসা বাণিজ্য ও সমাজের নানাবিধ কর্মে সারাক্ষন নিয়োজিত থাকে। এগুলির কারনে নানারকম গন্ডগোল ও অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে।

তিনি বলেন- ভগবান বুদ্ধ বলেছেন হে ভিক্ষু, তুমি ভব সাগর পার হও, মুক্ত হও এবং অপরকে পার করতে চেষ্টা কর। জ্ঞান-পূন্যে মানুষ মুক্ত হয়। অজ্ঞান-মিথ্যায় মানুষ অপায়ে পতিত হয়। অজ্ঞান-মিথ্যা হতে সর্ব-দুঃখের উৎপত্তি।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- ভিক্ষু হলো সুদক্ষ মাঝি বা চালক। উপাসক-উপাসিকা হলো আরোহী। মধ্যে মধ্যে দেখা যায় অসাবধানতাবশতঃ দুর্ঘটনায় পতিত হয়। অথবা রাস্তার পাশে গাছের সহিত ধাক্কা লাগায়। গাছের সহিত ধাক্কা লাগা কি জান? সেটা হলো নারীর সংস্পর্শে যাওয়া। একথা তিনি বলায় আমরা সবাই হেসে উঠি।

এগুলি থেকে পরিত্রান পেতে হলে প্রথমেই নির্বানের শিক্ষা করতে হবে, নির্বানের অভ্যাস করতে হবে, নির্বানের উপদেশ গ্রহণ করতে হবে এবং নির্বানের জ্ঞান অধিগত করতে হবে। অন্য শিক্ষা, অন্য অভ্যাস, অন্য উপদেশ এবং অন্যান্য জ্ঞানে মানুষ অপায়ে পতিত হয় সেখানে নানা প্রকার দোষ বিদ্যমান থাকে।

তিনি বলেন- বনভন্তের গুরু নেই। উচ্চ ও উদার মন হওয়া প্রত্যেকের উচিত। নীচু, খাটো ও মায়াবী মন গোপনে গোপনে পাপ করে অপায়ে পতিত হয়। কেউ কেউ পাপ করে স্বীকার করে। তাদের পাপ ক্ষয় হবে। চিকিৎসক রোগীর অবস্থা জেনে যেভাবে রোগ নিরাময় করে ঠিক সেভাবে বনভন্তে ও তোমাদের ক্লেশ রূপ চিকিৎসা করে থাকেন। যতক্ষন চারি আর্যসত্য দর্শন বা অধিগত হবে না ততক্ষন পর্যন্ত বৌদ্ধধর্ম কথন, দেশনা, প্রজ্ঞাপন, স্থাপন প্রকাশন এবং ঘোষণা করতে পারবে না।

তিনি আরও বলেন- আজকাল প্রায়ই এম. এ. পাশে বা যে কোন ভিক্ষু ভিক্ষুজীবন ত্যাগ করে সংসার জীবন পালন করে। তাদের সমালোচনা করে বলেন- যেমন ধর, সমাজে এমন কোন লোক যদি এম. এ. পাশ করে (গৃহী) তাদের উপযুক্ততা যাচাই না করে মেথরের মেয়ে বা নিকৃষ্টতম পরিবারের মেয়ের সঙ্গে অসম বিয়ে করে সমাজে নিন্দনীয় হয়। ঠিক সেরূপ যারা ভিক্ষুত্ব জীবন ত্যাগ করে সংসার জীবন যাপন করে তারা ও মেথরের মেয়ে বিয়ে করার মত অবস্থার সামিল হয় বলে উপমা করা যায়।

তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন- ভিক্ষুর ও বিয়ে আছে। সে বিয়ে কি রকম জান? সে বিয়ে হলো নবলোকত্তর ধর্মরূপ বিয়ে করা। ভিক্ষুর উপযুক্ত বিয়ে হলে ভগবান বুদ্ধের ও প্রশংসা অর্জন করে থাকে। তিনি আরও উপমা দিয়ে বলেন- রাজপুত্র যেমন তার উপযুক্ত রাজকন্যা বিয়ে করে ঠিক তেমন ভিক্ষুরও তার উপযুক্ত বিয়ে নবলোকত্তর ধর্ম। এদিকে ভোজনের সময় হলে তিনি আপাততঃ ধর্মদেশনা স্থগিত করেন।

বিকাল বেলার ধর্মদেশনা

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিকাশ ঠিক ৩টা হতে ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত ধর্মদেশনা প্রদান করেন। প্রারম্ভেই তিনি বলেন- ধর্ম শ্রবনে শ্রুত ও অশ্রুত বিষয় নিয়ে নানাজনে নানা প্রকার ধর্মকথা ভাষণ দিয়ে থাকেন। যেখানে চারি আর্য সত্য নেই সেখানে সংশোধন বা উত্থাপন করাও উচিত নয়। চারি

আর্য সত্য শুনে দর্শনে, জেনে ও বুঝে তাতে বিপুল পুন্য সঞ্চয় হয় এবং সুখ হয়। যদি না শুনে, দর্শন না করে, না জেনেও না বুঝে তাতে পরকালে চারি অপায়ে পতিত হয় এবং মহা দুঃখের অধিকারী হয়।

তিনি বলেন- লেখাপড়া করে কেন জান? বড় চাকুরী করার জন্যে, বেশী টাকা উপার্জন করার জন্যে এবং সংসারের যাবতীয় সুখ ভোগ করার জন্যে। কিন্তু সুখ ত্যাগ ও ভোগ ত্যাগ করা মহা কঠিন ব্যাপার। সুখ ভোগ ত্যাগ করলে লোভ, দ্বেষ, মোহ বা অজ্ঞান মুক্ত হতে পারে।

অসুখের পরে মুখের স্বাদ তিক্ত লাগে। ঠিক সেরূপ লোভ, দ্বেষ ও মোহযুক্ত মানুষের নির্বানের কথা ভাল লাগবে না। বুদ্ধের সময়ে বুদ্ধকে অনেকে গালি দিয়েছে। আমাকেও সেরূপ গালি দেয়। মানুষ অসাধু সাধু হয় এবং সাধু ও অসাধু হয়। যেমন অঙ্গুলীমালা বুদ্ধের সংস্পর্শে সাধু হয়েছেন। অজাতশত্রু দেবদত্তের সংস্পর্শে অসাধু হয়েছেন। ভাল-মন্দ মানুষের মধ্যে থাকে। কিন্তু ভাল ও একদিন থাকেনা মন্দও একদিন থাকে না। যেমন শিশু থেকে কিশোর, কিশোর থেকে যুবক, যুবক থেকে পৌঢ় এবং পৌঢ় থেকে বৃদ্ধকাল। সেখানে আছে শুধু অনিত্য, দুঃখ অনাত্ম। কেউ কেউ নিজে মুক্ত হয়ে অপরকে ধর্ম দেশনা করেন। অন্যান্য জন অনুমান বা আন্দাজ করে ধর্ম দেশনা করেন। কেউ কেউ বলে থাকে বনভন্তে সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হয়েছেন কিনা? পরোক্ষভাবে তিনি বলেন- মানুষ সারা রাতদিন আলাপে ও নানাকাজে ব্যস্ত থাকলে কখন তার জন্যে নির্বান? শাক্য বংশ ধ্বংস কিভাবে হয়েছে তা ব্যক্ত করে বলেন- কামাসক্ত ব্যক্তি হঠাৎ অপায়ে পতিত হয়। পূর্বজন্মে পাপ করলে ইহজন্মে মহাকষ্ট পায়। পূর্বজন্মে পুন্য করলে ইহজন্মে সুখ পায়। পুরুষ ব্যভিচার করলে নারী জন্ম হয়। নারী ব্যভিচার করলে নরকে পড়ে। মানুষের সুপ্ত দুঃখ আছে কিন্তু যুক্তি বুদ্ধি ও মুক্তির পথে চললে নিশ্চয়ই মুক্তি পেতে পারে।

তোমরা পুন্য ও সুখ জমা কর। ক্রমান্বয়ে তোমাদের জ্ঞান কুম্ভ পূর্ণ হবে। শিক্ষক যেমন ছাত্রকে তিরষ্কার করে ও শাস্তি প্রদান করে ঠিক তেমন বনভন্তেও তোমাদেরকে তিরষ্কার করে। পরকাল বিশ্বাস করে পূণ্যকর্ম কর। ফল অবশ্যই পাবে। ভিক্ষু সংঘ সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ হও। উপাসক-উপাসিকা শীলবান শীলবতী হও। জন্ম মৃত্যু দীপশিখার মত। পৃথিবীতে মা-বাপ, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কেউ আপন নয়। যারা জ্ঞানী তারা

আপনজন বলতে কাউকে মনে করেন না। তাদের আপনজন হলো শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। পুন্যে পুরস্কার পায় এবং পাপে শাস্তি পায়।

তিনি আরও বলেন- সংসারে চার প্রকার মানুষ আছে কেউ কেউ মুখে শুধু বলে কাজে পরিণত করে না। কেউ কেউ কাজে করে মুখে বলে না। কেউ কেউ মুখেও বলেনা কাজেও করে না। কেউ কেউ মুখেও বলে কাজেও করে। এগুলিহলো কাজ কথা পরিচয়। কেউ কেউ দুঃখে পড়ে কাঁদে আর সুখে হাসির অন্ত থাকে না কিন্তু জ্ঞানীরা হাসিকান্না করেন না। তোমরা স্বাবলম্বন হও। অপরের প্রতিপালক হইওনা। পাপ জমা করিও না। পূণ্য জমা কর। চারি আর্য সত্যকে বিশ্বাস, পরকাল বিশ্বাস ও কর্মফলকে বিশ্বাস কর।

তিনি ভাবনার মধ্যে সবচেয়ে উদয় ব্যয় ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কেন না বিদর্শনে যাওয়ার আগে উদয় ব্যয় ভাবনা ধ্যানীর পক্ষে খুবই সহায়ক। উদয় ব্যয় ভাবনায় অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

তিনি সুখ সম্বন্ধে বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম ত্যাগে সুখ ও দয়ায় সুখ। একদিকে ত্যাগে সুখ কি রকম? অবিদ্যা ত্যাগ করতে হবে, তৃষ্ণা ত্যাগ করতে হবে এবং উপাদান ত্যাগ করতে হবে। অন্যদিকে দয়ায় সুখ কি রকম? সর্বজীবে দয়া করতে হবে। ক্ষুদ্রানুক্ষদ্র প্রাণী হতে বৃহত্তর প্রাণী পর্যন্ত মৈত্রী ভাবাপন্ন হতে হবে। তাতেই চিত্তের মধ্যে নেমে আসবে অনাবিল ও পরম সুখ।

উপসংহারে উপমাস্বরূপ তিনি বলেন- মেঘ যেমন পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষন করে। যার প্রয়োজন তার সাধ্যানুযায়ী পাত্রে জল ধারণ করে ঠিক বনভন্তে ও মেঘরূপ ধর্মদেশনা প্রদান করে থাকেন। তা হতে উপাসক উপাসিকারা সাধ্যানুযায়ী ধর্ম ধারণ কর। এ ভাষণে তিনি ধর্মদেশনার ইতি টানলেন।

আজ সারাদিন আকাশ মেঘলা ছিল। থেকে থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টিপাত হয়। তাতে উপাসক-উপাসিকারা কেউ কেউ অর্ধভেজা, কেউ কেউ সম্পূর্ণ ভেজা অবস্থায় আকুল আগ্রহে একাগ্রতার সহিত এবং শ্রদ্ধায় তন্ময় হয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা শ্রবন করেছেন। আমি শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকাদের পক্ষ হতে ভগবান বুদ্ধ এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি প্রার্থনা জানাই প্রত্যেকের চিত্ত যেন নির্বান বারি দিয়ে সিক্ত হয়।

- o -

সীবলী পূজা উপলক্ষে দেশনা

আজ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ ইংরেজী রোজ শুক্রবার। সকাল ১০টায় রাজবন বিহার বোধিবৃক্ষ তলে বুদ্ধপূজা, সীবলীপূজা, সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষুসহ গাড়ীযোগে মঞ্চে উপস্থিত হন। অন্যান্য শিষ্যরা পায়ে হেঁটে মঞ্চে আসেন। প্রথমেই তিনি উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- বেশী কথা বললে বেশী দুঃখ। কম কথা বললে কম দুঃখ। চুপ করে বসে থাকলে মহা সুখ।

বন বিহার পরিচালনা কমিটির সম্পাদক বাবু সঞ্জয় বিকাশ চাক্‌মা অনুষ্ঠান সুচী পরিচালনা করেন। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন সহ-সম্পাদক বাবু নবকুমার তঞ্চঙ্গ্যা এবং অত্র অঞ্চলের সুখ সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে বনভন্তের নিকট প্রার্থনা পরিচালনা করেন সভাপতি বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা। ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষু। ১০ টা হতে ১০টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বাবু রনজিৎ দেওয়ান। রচনা করেছেন বাবু অমলেন্দু বিকাশ চাক্‌মা।

হে সীবলী
লাভী শ্রেষ্ঠ ওগো সীবলী,
পূজিতে তোমারে
রেখেছি মনের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালী।।
ধূপ দীপ আর পূজার সম্ভার,
সাজিয়ে রেখেছি পূজার ডালা,
লহ প্রভু মোর ভক্তির প্রণাম মালা।
অন্তরে মম গাহে মঙ্গল আরতি,
লহ প্রভু মোর পূজার অঞ্জলি।।
হে প্রভু সীবলী

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মাত্র বিশ মিনিট ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। প্রারম্ভেই তিনি বলেন- যার শ্রদ্ধার বল আছে তার দুঃখের সাগর পাড়ি দিতে অসুবিধা হয় না। শ্রদ্ধার বল অর্জন করতে হলে বুদ্ধকে বিশ্বাস, কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস এবং চারি আর্য্য সত্যকে গভীরভাবে বিশ্বাস করতে হবে। অবিশ্বাস করে বুদ্ধ বন্দনা করাও উচিত নয়। বিশ্বাস কোথা হতে উৎপত্তি হয়?

পরিস্কার পানিতে যেমন চন্দ্র-সূর্যের ছবি দেখা যায়, তেমন বুদ্ধাদি সৎপুরুষ দর্শনে বিশ্বাস উৎপত্তি হয়।

সব সময় অপ্রমাদে থাকিও। অপ্রমাদে ভয় নেই, দুঃখ নেই এবং সংসার সাগর অতিক্রম করা যায়। অপ্রমাদ হ'ল সাবধানতা অবলম্বন করা। অর্থাৎ সর্বদা স্মৃতিতে প্রতিষ্ঠিত থাকা। প্রমাদের বহু দোষ, বহু বিপদ এবং অধোদিকে যায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা দৃঢ় বীর্যের সাথে নির্বান সাক্ষাৎ কর। বীর্য অর্থ হল উৎসাহ, অধ্যবসায়, পরাক্রম ও তেজভাবকে বুঝায়। এগুলি দিয়ে অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্ষয় বা ধ্বংস করতে হয়। বীর্য দু'প্রকার। কুশল ও অকুশল। কুশলে নির্বানের দিকে নিয়ে যায়। অকুশলে অপায়ে নিয়ে যায়। যেমন অঙ্গুলিমালকে অকুশল বীর্যে দস্যুতে পরিণত এবং কুশল বীর্যে অর্হত্বে পরিণত করেছে।

মানুষ নানাবিধ বস্তু (ঘিলা) কজই বা পবিত্র জলের দ্বারা পরিশুদ্ধ হয়। তা মোটেই ঠিক নয়। মানুষ পরিশুদ্ধ হয় একমাত্র প্রজ্ঞার দ্বারা। শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সব নিজের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীতে যত প্রকার সুখ আছে, তা হতে ধ্যান সুখ অনেক উন্নত সুখ। মার্গ সুখ আরো উন্নত এবং ফলসুখই পরম সুখ বা পুর্ন সুখ। কে কতটুকু সুখ উৎপন্ন করেছে সে নিজেই অনুভব করতে পারে। সব মনচিত্তের উপর নির্ভর করে। প্রজ্ঞায় মানুষের পরম সুখ আনয়ন করে। ভগবান বুদ্ধের উপদেশে এবং প্রজ্ঞায় পূর্ণ করেমানব, দেবতা এবং ব্রহ্মরা পরম নির্বান সুখ পেয়েছেন। তাদের অজ্ঞান মিথ্যাবাদ দূরীভূত হয়ে জ্ঞান-সত্য উৎপন্ন হয়েছে।

তিনি বলেন- আত্মতত্ত্ব ও লোকতত্ত্ব অন্বেষণ না করার জন্যে উপদেশ দেন। আত্মতত্ত্ব হল পূর্বে আমি ছিলাম, বর্তমানে কি হয়েছি এবং কি ভবিষ্যতে কি হব এ চিন্তা করা উচিত নয়। কারণ ইহাতে অজ্ঞান-মিথ্যাভাব উৎপন্ন হয়। লোকতত্ত্ব হল এ পৃথিবীতে মানুষ, জীবজন্তু এবং অন্যান্য প্রাণী কোথা হতে আসে এবং কোথায় চলে যায়। এরূপ চিন্তা করলে মানুষের মনচিত্ত অজ্ঞান-মিথ্যাতে ডুবে যায়। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- জনৈক চাক্মা কলিকাতায় অসংখ্য লোক দেখে আশ্চর্য্য হয়েছিল। কথিত আছে সেখানে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস। সাধারণ লোকের তাতে মিথ্যাদৃষ্টি উৎপন্ন হয়।

তোমরা আত্মতত্ত্ব ও লোকতত্ত্বের পরিবর্তে কর্মতত্ত্ব ও নির্বানতত্ত্ব গবেষণা কর। অজ্ঞান-মিথ্যার পরিবর্তে জ্ঞান সত্যের উদয় হবে। তাতে অনাবিল পরমসুখ নির্বান প্রত্যক্ষ করতে পারবে। ভগবান বুদ্ধ জনৈক ব্রাহ্মনকে উপদেশ দিয়েছিলেন- তুমি যাবতীয় অকুশল ত্যাগ কর, কুশল উৎপন্ন কর ও চারিআর্য্য সত্য জ্ঞান আহরণ কর। তিনি বলেন- যেমন বুদ্ধের শিক্ষায়, উপদেশে এবং জ্ঞানে দক্ষ গুরু হয় তেমন মেধাবী ছাত্রেরও প্রয়োজন হয়। তোমরা মেধাবী ও যোগ্যতা অর্জন কর। যে ভিক্ষু বা গৃহী মার ভূবন, অমার ভুবন, ইহলোক, পরলোক, কর্মতত্ত্ব, নির্বানতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে দক্ষতা অর্জন করবে তার দীর্ঘকাল হিত সুখ সাধিত হবে। তোমরা যদি উপযুক্ত গুরুর সংস্পর্শে যেতে না পার তবে মূর্খের সংস্পর্শে থাকিও না। একাকী থাকাই অনেক ভাল। তিনি আবার উদাহরণ দিয়ে বলেন- শিক্ষক অংক না বুঝিলে ছাত্রকে কি পড়াবে?

অতএব তোমরা অন্ধ হইও না। জ্ঞান চক্ষু উৎপন্ন কর। সব সময় কোন রকম পরিহানি নাঘটুক অথবা অন্ধ না হওয়ার জন্য চেষ্টা করিও।

এ বলে আমার অদ্যকার বক্তব্য শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু

কুকুরেও ধর্ম কথা শুনে?

আপনারা নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন রাজ বনবিহারে পশু পক্ষীর অভাব নেই। যেখানে খাওয়ার থাকবে সেখানে তারা থাকবেই। যেমন দিনের বেলায় কুকুর, বিড়াল, কাঠবিড়াল, বানর, কাক ও অন্যান্য পাখী। রাত্রে দেখা যায় শিয়াল, সাপ ও বনরুই প্রভৃতি। আগে পোষা মোরগের মত বন্য মোরক ঝাঁকে ঝাঁকে দেখা যেতো। এখন খুবই কম দেখা যায়। শ্রীমৎ অতুলসেন ভিক্ষু (বুড়াভন্তে) বন্য মোরগদের আহার দিতেন। ওরা তাঁর পাশেই আহার করতো। বিকাল পাঁচটায় বন্য মোরগের সঙ্গে শিয়াল ও আহার করতো। এ আশ্চর্য দৃশ্য দেখার জন্যে অনেক লোকের ভীড় করাতে থাকায় নিয়ম ভঙ্গ হয়ে যায়।

বন বিহার এলাকায় অনেক কুকুরের মধ্যে দেশনালয়ে দুটি কুকুর প্রায় দেখা যায়। তন্মধ্যে একটি কুকুর অপরটি কুকুরী। কুকুরটি উপাসকদের গা ঘেসে পড়ে থাকে। কুকুরীটি উপাসিকাদের গা ঘেসে পড়ে থাকে। তাড়ালেও যায় না। মধ্যে মধ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- কুকুরগুলি লাঠি দিয়ে তাড়াও। আঘাত করিও না। তারা মানুষ থাকাকালে বিহারে আসেনি। কুকুরটি হলো এম. এ. পাশ ব্যক্তি। কুকুরীটি হলো অহংকারী ও সুন্দরী মহিলা। তারা মৃত্যুকালে একটু স্মরণ করাতে কুকুর জন্ম হয়ে আসছে। অন্য এক কুকুর ছিল তার গায়ের রং একটু লালছে ও কেশগুলি ধপধপে সাদা। বিস্কুট, সেমাই ও মাংসের হাড় আহার করতো। ঝাল দ্রব্য আহার করতো না। অন্যান্য কুকুরদের মতো ঝগড়া করতো না। সে কুকুরটির ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেছিলেন অষ্ট্রেলিয়ার জনৈক ব্যক্তি এখানে কুকুর হয়ে আসছে। মানুষ মরে গেলে তৃষ্ণার কারণে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন যোনীতে ঘুরে বেড়ায়। কুকুরদের মধ্যে বিশেষ ধরনের একটা কুকুর ছিল। হঠাৎ কাহারো প্রতি কামড়াতে চায়। কিন্তু কামড়ায় না। দৌড়ে এসে সজোরে ধাক্কা দেয়। এ কুকুরটির ব্যাপারে অনেক চঞ্চলকর ঘটনা ঘটিয়ে গেছে।

একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পশ্চিম বিনাজুরী আমন্ত্রণে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কথা আর কাজে মিল না থাকাতে তিনি যাননি। তিনি বলেছিলেন- কথা আর কাজে মিল না থাকলে মারের অধিকারে চলে যায়। আমরা মনস্থ করেছি সবাই মিলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আমন্ত্রণে যাওয়ার জন্যে অনুরোধ করবো। ইতিমধ্যে জনৈক বৃদ্ধ (বাবু রাজেন্দ্র লাল বড়ুয়া) বলেন- কাহাকেও প্রয়োজন হবে না। আমি একাই বনভন্তেকে অনুরোধ জানাব। এ কথা বলে তিনি বিহারে যাওয়ার পথে সে কুকুর এসে তাঁকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। দ্বিতীয়বার উঠে যাওয়ার তিনি সাহস পাননি। সেখানে বাবু সাধনচন্দ্র বড়ুয়া, বাবু নির্মল বড়ুয়া, বাবু বঙ্কিম দেওয়ান এবং পরলোকগত বাবু স্নেহ কুমার চাক্‌মা প্রভৃতি সহ আমরা উক্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি।

একবার এক বনরুই (মাঁলমুড়া) কুকুরের তাড়া খেয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশ্রয়ে চলে আসে। সেদিন উপোসথের তারিখ ছিল। রাত সাড়ে এগারটায় তিনি আমাদেরকে ডাকালেন। দেখা গেল উক্ত বনরুই কুকুরের কামড়ে দুর্বল হওয়ায় মাটি কুঁড়ে চলে যেতে পারে না। সুতরাং বনভন্তের নির্দেশে মাটি কুঁড়ে গর্তে চাপা দেওয়া হয়। একদিন জনৈক ব্যক্তি একটা সুন্দর

সেগুন কাঠের আলমারী দান করার জন্যে দেশনালয়ে রেখেছেন। ইতিমধ্যে একটা কুকুর এসে আলমারীতে প্রস্রাব করে দেয়। তাতে উক্ত ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে লাঠি দিয়ে মারার জন্যে তাড়াচ্ছে। এদিকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন- তাকে ক্ষমা করে দাও। সে অবোধ প্রাণী। বনভন্তের এ কথা শুনে উক্ত ব্যক্তির রাগ দমিত হয়। তার প্রতি লক্ষ্য করে বনভন্তে আবার বললেন- পক্ষান্তরে বিচার করলে দেখা যায় কোন কোন ঠাকুরের স্বভাবের চেয়ে কুকুরের স্বাভাব অনেক ভাল। অনেক মায়াবী ভিক্ষু আছে তারা গোপনে নারীর সাথে কামাচারে লিপ্ত থাকে। তিনি জনৈক ভিক্ষু উদয়ানন্দের কথা প্রসঙ্গে বলেন- এ কুকুর উদয়ানন্দ ঠাকুরের চেয়ে অনেক ভাল। একথাটি তিনি বার বার বলাতে সকলের মুখে হাসির ঝড় বয়ে যায়।

- o -

বনভন্তের দৃষ্টিতে মৎস্যকন্যা

সারাবিশ্বকে তোলপাড় করেছে দুটি ঘটনা। একটি ফ্লোরিডার সমুদ্র সৈকতে ধরা পড়া মৎস্য কুমার। আর অপরটা আরব সাগরের পশ্চিম উপকূলে ধরা পড়া জীবন্ত মৎস্যকন্যা। যার শরীরের প্রায় ৪ ভাগের তিন ভাগই যুবতী নারীর মতো। বুক, পেট থেকে পা পর্যন্ত পুরোটাই যেন এক পাতালপুরীর রাজকন্যার শরীর। বিজ্ঞানীরা তার গর্ভে মানব নির্যাস দিয়ে পরীক্ষা করতে চাইছেন যে, এ কন্যা মানব সন্তান ধারণ করতে পারে কিনা অথবা সে সন্তান নিঃশ্বাস নিতে পারবে কিনা?

এ মৎস্য কুমার ও মৎস্য কুমারীকে ঘিরে এখন অসংখ্য প্রশ্ন দেখা দিয়েছে বিশ্ববাসীর মনে। আমেরিকার (ওয়াল্ড নিউজ World news) পত্রিকায় বিস্ময়কর প্রাণী নিয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর সমগ্র বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে যায়। মূলতঃ আমেরিকার যে বিস্ময়কর প্রাণীটির সন্ধান পাওয়া যায় তা ছিলো মৎস্য কুমার। গত ২১ নভেম্বর '৯২ ইং সকাল বেলা ফ্লোরিডায় সমুদ্র সৈকতে এ মৎস্য মানবকে আবিস্কার করেন এক টুরিষ্ট দম্পতি। ৫ ফুট ২ ইঞ্চি লম্বা এ অদভুত মাছটি খুব সহজেই

আমেরিকাসহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়। এর পর প্রাণী বিজ্ঞানীদের গবেষণা শুরু হয়। সকলে রাত দিন গবেষণা চালান এ মৎস্য মানবটিকে নিয়ে শুধু তাই নয়, এ মৎস্য মানব সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধান চালানোর জন্য মার্কিন সরকারকে নাকি মোটা অংকের অনুদান বরাদ্দ করতে হয়েছে। মাছ ধরার বিশেষ ট্রলার এবং ভাসমান গবেষণাগারের সাহায্যে এ অদ্ভুদ প্রাণী খোঁজার অভিযান শুরু করেছে মার্কিন প্রাণী বিজ্ঞানীরা। বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল অবশ্যই দ্বিতীয় মৎস্য মানবের সন্ধান তারা পাবেন।

অবশেষে বিজ্ঞানীদের ধারনাই সত্যি হলো। আরব সাগরের উপকুলে পাওয়া গেছে এক মৎস্য কুমারী। ৫ ফুট ১/২ ইঞ্চি লম্ব এ মৎস্য কুমারী আবার নতুন করে সমগ্র বিশ্বে ঝড় তুলেছে। প্রাণী বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে এ অদ্ভুদ প্রার্থীকে নিয়ে গবেষণা শুরু করেছেন। চোখের ঘুম চলে গেছে প্রাণী বিজ্ঞানীদের। সকলের একই ধারণা রহস্যময় এ মহাসমুদ্রে না জানি কতকি লুকিয়ে আছে।

বাংলাদেশের অনেক দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার মৎস্যকুমার ও মৎস্য কন্যা সম্বন্ধে সচিত্র প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন। কেউ কেউ বিস্ময়কর ব্যাপার, কেউ কেউ ডারউইন এর থিউরি মতে সৃষ্টির আদি জীব এবং কেউ কেউ পৃথিবী ধ্বংস বা প্রলয় হওয়ার উপক্রম বলে অভিহিত করেছেন।

পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর আমি বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ ভদ্দজি ভিক্ষুকে উক্ত পত্রিকা শ্রদ্ধেয় ভনভন্তেকে দেখানোর জন্য অনুরোধ করি। তিনি অবসর সময়ে দেখানোর পর বনভন্তে মন্তব্য করেন- এগুলি কোন বিস্ময়কর ব্যাপার নয়। কোন সৃষ্টির আদি জীবও নয়, এটি হলো আমেরিকার বিখ্যাত একজন কামাসক্ত (বেশ্যা) মহিলা। তার পাপের পরিনাম ফল ভোগ করতেছে। এরকম প্রাণী সমুদ্রে আরো অনেক আছে। এগুলি অন্য প্রাণীর মত নয়। খুবই চালাক। সহজে ধরা পড়ে না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উক্ত মৎস্য কুমারী সম্বন্ধে এরকম মন্তব্য করেছেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে দেশনা

আজ ২২শে অক্টোবর ১৯৯৩ ইংরেজী রোজ শুক্রবার, স্থান- রাজবন বিহার। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মময় এ পৃথিবীতে জ্ঞান ও সত্যের সাধনায় একান্তভাবে নিজেকে নিবেদন করার জন্য শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তের আহবানের মধ্য দিয়ে গতকাল রাঙ্গামাটিতে রাজ বনবিহারে হাজার হাজার নর-নারীর চিত্তদানের প্রতীক দু'দিন ব্যাপী কঠিন চীবর দানোৎসব সম্পন্ন হয়। ঐতিহ্যবাহী উৎসবে তুলা থেকে সুতা কাটা, বস্ত্র বয়ন, চীবর প্রস্তুত থেকে শুরু করে সকল কাজ ২৪ ঘন্টার মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। এ ব্যয়বহুল ও শ্রমসাধ্য পদ্ধতির দানোৎসবে অংশ গ্রহণ ও প্রত্যক্ষ করেছে হাজার হাজার নরনারী।

স্বচ্ছ জলে ভরাট রাঙ্গামাটির হ্রদের পাশে অবস্থিত ছায়া সুশীতল তপোবনের ভিতর অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের সাথে আগত পূণার্থীদের চিত্ত শুদ্ধির আকাংখার সৌন্দর্য্য মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে রাজ বনবিহারের ২০ একর এলাকায় স্বচ্ছ আলোর ভিতরে সারা দিন সারারাত নারী পুরুষের শৃংখলাবদ্ধ এ অবাধ যাতায়াত গৌতম বুদ্ধের অহিংসা বাণীকে বার বার মনে করিয়ে দেয়। হিংসায় উন্মত্ত এ পৃথিবীতে রাজ বনবিহারের তপোবনকে তখন এক টুকরো শান্তি নিকেতনই মনে হয়। সবচেয়ে অবাক করে হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা তবু কোন কোলাহল নেই। রাজবন বিহারে হাজার হাজার নর-নারীর নগ্নপদ ধ্বনিকে মনে হয়েছে গভীর অরণ্যের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ জলের কল্লোল ধ্বনি।

বৃহস্পতিবার সারারাত সকাল পর্যন্ত বিপুল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে যে চীবর তৈরী করা হলো তা আজ আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তেকে প্রদানের পর উৎসবের শেষ হয়। এ চীবর প্রদান উপলক্ষ্যে মন্দিরের বাহিরে তপোবনের মধ্যে বোধিবৃক্ষমূলে তৈরী করা হয় সুবিশাল মঞ্চ। অত্যন্ত ভাবগম্ভীর এ দানোনুষ্ঠানে রাজবন বিহারের প্রধান পৃষ্ঠপোষক চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়, রাঙ্গামাটি স্থানীয় সরকার পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু পারিজাত কুসুম চাক্‌মা, খাগড়াছড়ি থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য বাবু কল্প রঞ্জন চাক্‌মা, রাঙ্গামাটি রিজিয়ন কমান্ডার

ব্রিগেডিয়ার জনাব এনায়েত হোসেন পি. এস. পি, বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা বক্তব্য রাখেন। এর আগে বনভন্তের প্রতি সাধারণ প্রার্থনা পরিচালনা করে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাবু শান্তিময় চাক্‌মা। চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় তাঁর ভাষনে মহা–উপাসিকা বিশাখা প্রবর্তিত পদ্ধতিতে কঠিন চীবর দানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে বলেন- বুদ্ধের সময়ে বাজারে চীবর পাওয়া যেত না। ঘরে ঘরে তৈরী হতো। ভিক্ষু সংঘের জীর্ণ–শীর্ণ বস্ত্র দেখে ভগবান বুদ্ধের অনুমতি নিয়ে সে সময়ের অগ্রবর্ত্তী সংঘ সেবিকা বিশাখা ২৪ ঘন্টার মধ্যে চীবর তৈরী করে ভিক্ষু সংঘকে দান করেন। সে আমলের প্রথা অনুযায়ী কঠিন চীবর দানের জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অনুপ্রেরণা ও উৎসাহে ১৯৭৩ ইংরেজী হতে কঠিন চীবর দানোৎসব হয়ে আস্‌ছে এবং বনভন্তের প্রেরণায় এখানকার বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ধর্ম ও সংস্কৃতির পুর্নজাগরণ হচ্ছে। বৌদ্ধ ধর্মের পাশাপাশি এ অঞ্চলের শত শত বছরে সংস্কৃতি রয়েছে এ বুননের মাধ্যমে তাই বনভন্তের পরিচালনায় ধর্মীয় নিয়ম কানুনের মাধ্যমে সংস্কৃতি ও পালন করা হচ্ছে।

ব্রিগেডিয়ার জনাব এনায়েত হোসেন ভগবান বুদ্ধের কাছে আমাদের সকলের জন্য শান্তি ও মঙ্গলময় জীবন প্রার্থনা জন্য শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট আবেদন জানান।

অনুষ্ঠানের পূর্বে দুপুর ১টায় বিহারে অবস্থিত তাঁতঘর (বেইন ঘর) থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়। এ শোভাযাত্রা দেড়টা বিহারের বোধিবৃক্ষ মূলের কাছে দেশনা মঞ্চে শেষ হয়। শোভাযাত্রার পরে অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চশীল প্রার্থনা। ধর্মীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির বনভন্তে ধর্ম উপদেশ দান করে বলেন- অজ্ঞানীকে জ্ঞান দান কর, ভীতুকে অভয়দান কর, অধার্মিককে ধর্ম দান কর। ধর্মদান সবদানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

বুদ্ধের মুক্তি বাণী উল্লেখ করে বনভন্তে বলেন- জ্ঞান, ধর্ম ও সত্যের অভাবে মানুষ কষ্ট পায়। দুঃখ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- প্রতিটি মানুষের দুঃখ আছে। দেশের বারকোটি মানুষের বারকোটি দুঃখ আছে। আর যে দুঃখকে চিনতে পেরেছে সে এ পৃথিবীতে লৌকিক সুখকে সুখ মনে করেনা। দুঃখ

থেকে মুক্তি পেতে হলে নির্বানকে চিনতে হবে। তিনি বলেন শিশুকাল, বাল্যকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল এবং মরণকাল ও দুঃখ। এ দুঃখকে যে বুঝতে পেরেছে সে আর দুঃখের সাথে থাকবে না। আর্যসত্যকে উপলব্ধি করতে হবে। মৈত্রী করুনা, মুদিতা ও উপক্ষো নিজের মধ্যে অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন হয়ে মার্গফল লাভ করা যাবে। দিব্যচক্ষু উৎপন্ন হলে দেবলোক, ব্রহ্মলোক ও মনুষ্যলোক এ ত্রিলোকের সবগুলো দর্শন করা যাবে। লোকসংখ্যা না বাড়ানোর জন্য বুদ্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করোনা।

এবার শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনার দু'টি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করছি। গত ১ম খন্ডে "বনভন্তের দেশনা" নাম গ্রন্থে "বনভন্তে কি রাগী?" ও "বনভন্তে রাগ ত্যাগ করেন নি" এ দু'টি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। পাঠকদের আরও জানার সুবিধার্থে আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি তা এবারও ব্যক্ত করছি। বিগত কঠিন চীবর দান উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে "অর্ন্তদৃষ্টি ভাব ও যে জানে তার জন্যে অতি সহজ"। এ দেশনা দু'টি তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন। তা আমার মনে হয় প্রায় বাঙ্গালীরা বুঝেননি। বরঞ্চ অনেক চাক্‌মারাও তাদের অজ্ঞানতার কারণে তা বুঝতে সক্ষম হয়নি।

১। "অর্ন্তদৃষ্টিভাবঃ- শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনা প্রসঙ্গে বলিছিলেন- মানুসের যতক্ষন অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন না হবে ততক্ষন বিভিন্ন আবর্তে ঘুরতে হবে। নামরূপকে সম্যকভাবে দর্শন করাকে অর্ন্তদৃষ্টিভাবে উৎপন্ন হওয়া বলে। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে পুংখানুপুংখরূপে প্রজ্ঞা চোখে দর্শন করতে হবে। ওখানে নারী বা পুরুষ বলতে কিছুই নেই। শুধু নামরূপ বা সত্ত্ব।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ডঃ বেনী মাধব বড়ুয়ার নাম উল্লেখ করে বলেছিলেন- বেনী মাধব বাবু ছিলেন একজন সুপন্ডিত, শীলবান এবং ত্রিপিটকের অনেক অংশ অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন না হওয়াতে তাঁকেও অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাহলে অন্যান্য বড়ুয়াদেরও কথাই বা কি? এ বক্তব্যটি তিনি চাক্‌মা ভাষায় বলতে অনেকে বুঝতে পারেনি। কেউ কেউ বিপরীত অর্থ বুঝে প্রকাশ করলেন- শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ডঃ বেনী মাধব বড়ুয়া এবং বড়ুয়া জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

কঠিন চীবর দানের পরবর্তী সময়ে এ প্রসঙ্গে নিয়ে কয়েকজন এ ব্যাপারে আমার নিকট আসেন। তাতে আমি ভালরূপে বুঝিয়ে দিতে পারিনি বলে তারা বেশ সন্তুষ্ট হননি। তখন আমি অনন্য উপায় হয়ে একটা উদাহরণ দিয়ে বললাম- 'বড়ুয়া জনকল্যাণ সমিতি' কাকের সমিতি নয়। এটা জ্ঞানময় সমিতি। কাক কি করে জানেন? একটা কাক কোনখানে ধরা পড়লে সব কাক এক জায়গায় আসে। এ ব্যাপারে গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করুন। অর্ন্তদৃষ্টি ভাব উৎপন্ন না হওয়াতে আমাদের এত দুঃখ, বিভেদ ও বিতর্কের সৃষ্টি। যার অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন হয়েছে তার কোন দুঃখ নেই, কোন ভেদাভেদ নেই। তার পরম সুখ। আমি এ উপমা উপস্থাপন করাতে তারা খুবই সন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। পরবর্তী সময়ে আর কোন দিন এ রকম বিতর্কিত কথা শুনিনি।

২। "যে জানে তার জন্যে অতি সহজ"ঃ- শ্রদ্ধেয় বনভন্তে টেলিভিশনের উদাহরণ দিয়ে বলেন- টেলিভিশন দেখে অনেকের মনে উৎপন্ন হয় এ রকম অত্যাশ্বর্য জিনিষ কিভাবে তৈয়ার হলো? জাপানীরা অতি সহজে তৈয়ার করতে পারে। তিনি চাক্মাদের উদ্দেশ্য করে বলেন- আচ্ছা, তোমাদের যেমন নাক চেপ্টা, তোমাদের শরীরের রং ও গঠন যেরূপ তাদেরও শরীরের রং ও গঠন সেরূপ। তারা অতি সহজে পারে আর তোমাদের অবাক লাগে। চাক্মা নুতন নুতন শিক্ষিত মনোবিজ্ঞানে গবেষণা করা দূরের কথা জড়বিজ্ঞানের ও গবেষণা করে না। শুধু বিবিধ কথায় পটু। টেলিভিশন তৈয়ার করতে শিক্ষা, অভ্যাস ও কৌশলের প্রয়োজন। "যে জানে তার জন্যে অতি সহজ" ব্যাপার। অন্যের জন্যে মহা কঠিন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন, 'যে জানে তার জন্যে অতি সহজ' এ বক্তব্যটি বিশদভাবে বলেন- নির্বান সম্বন্ধে যিনি জানেন বা অধিগত হয়েছেন তার জন্যে অতি সহজ। তা জানতে হলে প্রথমেই নির্বান সম্বন্ধে শিক্ষা করতে হবে। শিক্ষা করতে করতে অভ্যাসে পরিণত হবে। অভ্যাস হলে তা পূরণ করতে হবে। কি পূরণ হবে? নির্বাণ সম্বন্ধে জানা বা সাক্ষাত হওয়া। তার জন্যে পাথেয় বা পুঁজি হল শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা ও অসাধারণ ও অধ্যবসায় যিনি নির্বান লাভ করেছেন তার জন্যে অতি সহজ। অন্যের জন্যে মহা কঠিন ব্যাপার। উপমা হিসাবে টেলিভিশন (লৌকিক) ও নির্বানকে (লোকত্তর) প্রায় একই পর্যায়ভুক্ত উদাহরণ দেয়া যায়।

উপসংহারে আমি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চাই জ্বরযুক্ত জিহ্বায় প্রত্যেক কিছুর স্বাদ তিক্ত অনুভব হয়। ঠিক তেমনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা না জেনে না বুঝে অনেকে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে থাকেন। সংক্ষেপে বলা যায় তিনি সিংহনাদে এবং জোরগলায় দেশনা প্রদানে অনেকে মনে করেন তাঁর রাগ উঠেছে। এটা তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতীক। এ ব্যাপারে আমি যে মন্তব্য করেছি তাতে যদি কাহারো মনে দুঃখ পেয়ে থাকলে তা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

- o -

বিরল ঘটনা

প্রায় ইতিহাসে দেখা যায় কোন কোন উগ্র সাধকের উগ্রতার কারনে নির্বোধের অনিষ্ট ঘটে। যদি কেউ তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন বাঁধার সৃষ্টি বা রসিকতা করে থাকে, সেখানে উক্ত সাধকেরা তাদের সাধনালব্ধ শক্তি দিয়ে প্রতিহত করেন। যেমন- কাহারো জীবন অবসান ঘটলো, কাহারো পঙ্গুত্ব প্রাপ্তি ঘটলো অথবা কাহারো নানাভাবে শাস্তিভোগ করতে হলো। এমনকি অসাবধানতাবশতঃ বাক্য প্রয়োগ করলেও বিরাট অঘটন ঘটে যায়। এগুলি সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত বিষয়।

বৌদ্ধ ইতিহাসে দেখা যায় ভগবান বুদ্ধের বিরুদ্ধবাদীদের প্রমাণ অন্যরকম। যেমন- দেবদত্ত, অজাতশত্রু, চিঞ্চাবেশ্যা, কোকালিক প্রভৃতি। তারা ভগবান বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের বিরুদ্ধাচরণ করে অবীচি নরকে পতিত হয়েছেন। সে ব্যাপারে সম্যক সম্বুদ্ধ বলেছেন- যে যেকর্ম করবে সে সে কর্মফল ভোগ করবে। তাদেরকে কেউ শাস্তি দেয়নি। বরঞ্চ তাদের কর্মে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেছে। এ মহা পৃথিবীর উপর কত প্রাণী, কত প্রকারের অত্যাচার করে থাকে কিন্তু মহাপৃথিবী কাউকে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করে না। ঠিক সেরূপ ভগবান বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ ও কাহারো প্রতি হিংসা পরায়ণ নহেন। তিনি বলেছিলেন- বুদ্ধের কাছে রাহুলের প্রতি মৈত্রী

ভাব, দেবদত্তের প্রতিও সে মৈত্রী ভাব। গুরু কর্ম সম্পাদন করলে ইহজন্মে ফল ভোগ করে। অকুশল ও কুশলভেদে গুরুকর্ম দু'প্রকার। যাহা ইহজন্মে ত্রিরত্নের প্রতি ক্ষতিসাধন, সংঘভেদ, ভিক্ষুনী দূষণ, মা-বাবা হত্যা প্রভৃতি গুরুতর কর্ম হতে তাদের ইহজন্মে ফলভোগ অনিবার্য। আবার অন্যদিকে দেখা যায় যারা ইহজন্মে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পুরণ করে থাকেন তারাও মার্গফল লাভ করেন। তাহলে দেখা যায় গুরুকর্মের দু'দিকে দু'ফল প্রাপ্তি ঘটে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে লংগদু হতে রাঙ্গামাটি আগমনের পর হতে অনেক বিরল ঘটনা ঘটেছে। তা অনেকের স্মৃতিপটে আঁকা আছে। এ রকম অনেক ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ভবিষ্যতে পাঠকদের অবগতির জন্যে "বনভন্তের দেশনা" ৩য় খন্ডে প্রচার করার আশা রাখি। আপাততঃ তিনটি বিরল ঘটনা আপনাদের প্রতি প্রকাশ করছি।

১। গত বর্ষাকালে শুনতে পেলাম সাপ ছড়িতে এক বিরল ঘটনা ঘটেছে। আপনারা বোধ হয় জানেন- সাপছড়ি পাহাড়ের চূঁড়ায় বনবিহারের শাখা স্থাপিত হয়েছে। সেখানে বনভন্তের চারজন শিষ্য ধ্যান অনুশীলন করছেন। তাঁরা প্রত্যহ পাহাড়ের অদূরে পাড়ায় পালাক্রমে পিন্ডাচরনে যান। তন্মধ্যে এক পাড়ায় জনৈক দুষ্ট লোক আছে। সে সবসময় মদ পানে মাতলামি করে এবং অন্যান্যদের প্রতি ও সদ ভাবাপন্ন ছিল না। বনভন্তের শিষ্যরা যখন সে পাড়ায় যেতেন তখন সে তাঁদের প্রতি সম্বোধন করতো- "কুকুর গুলি এসেছে"। তাতে উক্ত পাড়ার লোকেরা তার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করতো। এমনকি বাঁধা দিলেও রহস্য করে বেশী বলতো। এভাবে অনেক দিন যাওয়ার পর সে পাড়ায় একদিন জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে সুত্রপাঠ শ্রবন করতেছে। সেদিন উক্ত ব্যক্তি নেচে নেচে বলতে লাগলো- "কুকুরগুলি ডাকতেছে"। উক্ত কার্য্যকলাপে সমস্ত এলাকার লোক তার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। কালক্রমে দেখা গেল সে ব্যক্তির এক আশ্চর্য্য ধরনের রোগ দেখা দেয়। সে হঠাৎ করে বলে- "আমাকে কুকুরে কামরাচ্ছে"। সঙ্গে সঙ্গেই সে জায়গায় কাল দাগ পড়ে যায়। কয়েকদিন পর তার কোমরে কালদাগ এবং অবশ হয়ে যায়। কিছুদিনের মধ্যে কুকুরের মত ডাক দিতে দিতে সে মারা যায়।

গত ২৭শে ডিসেম্বর '৯৩ ইং সোমবার সন্ধ্যায় সাপছড়ি বনবিহারের প্রধান ভিক্ষু শ্রীমৎ জিনবোধি ভিক্ষু মহোদয়ের সাথে রাজ বনবিহারে আমার দেখা হয়। আমার সে কৌতুহলবশতঃ উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি। তিনি উত্তরে বলেন- আপনারা যা শুনেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর আমি একথা শুনেছি। সে আমাদের প্রতি যে কটাক্ষ ও উপহাস করেছিল সেকথা লোকমুখে শুনেছি। তবে সে আমাদের সামনে কোনদিন কোন কথা বলেনি।

২। একদিন আমি ও বাবু সত্যব্রত বড়ুয়া রাজবাড়ীর ঘাটে পারাপারের অপেক্ষা করছি। এমন সময় দেখা গেল আনুমানিক ২৫ বৎসরের একজন লোককে ইজি চেয়ারসহ কুলে তুলতেছে। জানতে পারলাম সে লোকের মারাত্মক ব্যাধি হয়েছে। চন্দ্রঘোনা নেয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। সে লোকের তলপেট বেশ বড় ও শরীর পান্ডুর বর্ন। চাহনীতে তার করুণ ও বিষাদের ছাপ।

বন বিহারে গিয়ে পরস্পর জানলাম সে লোকের বাড়ী উলুছড়ি (কাচলং অঞ্চলে)। তার মনের খেয়ালে পাড়ার ছেলেমেয়েদেরকে নিয়ে বনভন্তের ব্যঙ্গ অভিনয় করেছিল। তাতে সে আনন্দ উপভোগ করতো। তার বড়ভাই জানতে পেরে সে রকম ব্যঙ্গ অভিনয় না করার জন্যে নিষেধ করে। তবুও সে তার ভাই এর অনুপস্থিতিতে সে আনন্দ উপভোগ করতো। কয়েকদিন ব্যঙ্গ অভিনয়ের পর হঠাৎ তার পায়খানা প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্যে অনেক চিকিৎসা করা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আহার পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। তার অবস্থা সাংঘাতিক দেখে তারা চিন্তা করলো উক্ত অভিনয়ে এরকম হয়েছে। একদিন তার বড় ভাই বনবিহারে এসে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেখা পায়নি। দ্বিতীয়বার এসে দেখা গেল তিনি সেদিনও অন্য এলাকায় আমন্ত্রনে গেছেন। তৃতীয়বার সেদিনই তাকে নিয়ে বনবিহারে চলে আসে। তার বড়ভাই ঘটনার পূর্ন বিবরণ দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করে। বনভন্তে তাদের প্রতি নির্দ্দেশ দিলেন

"তোমরা চিকিৎসা করে দেখতে পার" কিন্তু তার সময় অতি সন্নিকট"। জানা গেল সে রোগী চন্দ্রঘোনা যেতে যেতেই মারা যায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এ ঘটনার ব্যাপারে আমার প্রতিলক্ষ্য করে বলেন- অরবিন্দ, তুমি লোকদিগকে বলেদিও তারা যেন আমাকে শ্রদ্ধা না করলেও অশ্রদ্ধা যেন না করে। আমাকে শ্রদ্ধা করলে শ্রদ্ধার ফল অবশ্যই পাবে এবং অশ্রদ্ধা করলে অশ্রদ্ধার ফল অবশ্যই পাবে। এটা আশীর্বাদ অথবা অভিশাপ নয়। এটা হল কর্মের প্রত্যক্ষ ফল।

৩। একদিন জনৈক ব্যক্তি আমাকে নমস্কার জানাল। তার পরনে আছে লুঙ্গি ও গেঞ্জি। আমি শুধু চিন্তা করি এ লোকটি কোথাও যেন দেখেছি। আমি চিন্তা করতে করতে সে বলল- আপনি বোধ হয় আমাকে চেনেননি। আমি অমুক বিহারের ভিক্ষু। আমাকে জনৈক ব্যক্তি শত্রুতামূলক মেরেছে। এখন এ অবস্থায় আছি।

অতঃপর সে ব্যক্তি শত্রুতার কারণ ও শরীরে আঘাতের দাগগুলি দেখালো। তাতে আমি খুব মর্মাহত হয়ে সমবেদনা জানালাম। এ ঘটনা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে অবহিত করার সাথে সাথেই তিনি বলেন- আমি জানি, তোমাকে বলতে হবে না। প্রকৃত ভিক্ষুকে মেরে কেউ সারতে পারে না। আমি বললাম- এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার এবং সমাজের কলংকজনকও বটে। ভিক্ষুকে আঘাত করা উচিত হয়নি। আমার বক্তব্যের পর তিনি আবার বললেন- তা হলে তুমি ভাল করে শুন। তোমরা (মনুষ্য) যেমন আমার অনুসারী আছ তেমন অশরিরীদের (দেবগন) মধ্যেও অনুরূপ আছে। তারা তোমাদের চেয়ে একটু উন্নতমানের। তাদেরও লোভ, দ্বেষ, মোহ বিদ্যমান। আমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে তোমাদের যেমন রাগ উঠে তেমন অশরিরীদেরও রাগ উঠে। অনেক সময় তারা অঘটন ঘটায়ে ফেলে। সেরূপ উক্ত ভিক্ষু আমার বিরুদ্ধাচরণ করায় তারা সহ্য করতে পারেনি। তারাই এ ঘটনা ঘটিয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এ রকম ব্যাখ্যা শুনে আমি হতবাক হয়ে বসে রইলাম।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বিবৃতি ও অশরীরিদের কর্মকান্ডের সাথে মিল রেখে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটা উদাহরণ প্রকাশ করছি। কোন এক শীতের দিন। আমি রৌদ্রে বসে সুপারী কুটতেছি। এমন সময় আমাদের বাজারের জনৈক সওদাগর (মোস্তাফিজুর রহমান) রহস্যের ছলে আমার পিছন দিকে এসে এক টুকরা সুপারী নিয়ে যায়। ছায়া দেখে আমি বললাম- চুরি কর কেন? এমনি খেতে পার না? একথা বলার সাথে সাথেই সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল- চোর বললে কেন? তোমাকে মেরে ফেলবো। তৎক্ষনাৎ একটা কুকুর এসে তাকে কামড়াতে উদ্যত হয়। আমি হঠাৎ কুকুরটি ধরে শান্ত করতে চেষ্টা করি। অন্যদিকে মোস্তাফিজুর রহমান কুকুরের ভয়ে দোকানে লুকিয়ে গেল। এ ঘটনা সমস্ত বাজারে ছড়িয়ে পড়ল। উল্লেখ্য যে উক্ত বাজারের কুকুরটিকে আমি প্রত্যহ অল্প অল্প আহার দান করতাম।

এখানে বুঝাতে চাচ্ছি যে কুকুর যেমন আমার প্রতি অন্ধভাবে সহানুভূতিশীল তেমন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতিও অশরিরীগন (দেবগন) একান্তভাবে সহানুভূতিশীল। আমার মনে হয় আমার উক্ত কুকুরের মত তারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে।

এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পুনঃ পুনঃ বলেন- যে কোন ভিক্ষু শ্রমন আমার বিরুদ্ধাচরন করবে তার অনির্বায মৃত্যু ঘটবে অথবা তার কাষায় বস্ত্র ত্যাগ করতে হবে। গৃহীদের মধ্যেও হয়ত মৃত্যু অথবা মৃত্যু সমতুল্য হবে। তিনি দৃঢ়তার সহিত বাণী প্রদান করে বলেন- মানুষ বিপদে পড়লে হুস্ আসে এবং আমার নিকট অভয় দান প্রার্থনা করে। আমি চাই প্রত্যেকের সদ্ বুদ্ধি ও সদ্‌জ্ঞান উৎপত্তি হোক এবং পরম সুখ নির্বান লাভ করুক।

- ০ -

মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরণ

"বনভন্তের দেশনা" ১ম খন্ডে মহান সাধক শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী আপনারা বোধ হয় পাঠ করেছেন। তবুও অদ্যকার প্রবন্ধের আলোকে পুনরায় কিছু তথ্য প্রকাশ করছি।

তাঁর জন্মস্থান বড়াদমে মোরঘোনায়। পিতার নাম হারুমোহন চাক্মা। মাতার নাম বীর পুদি চাক্মা। তাঁর ভাইবোন ছয়জন। জ্যেষ্ঠপুত্র হলেন তিনিই। নিম্নে তাঁদের নামের তালিকা দেওয়া গেল।

১) রথীন্দ্র লাল চাক্মা
২) বৈকর্তন চাক্মা (মৃত)
৩) পদ্মাঙ্গিনী চাক্মা
৪) জহর লাল চাক্মা
৫) ভূপেন্দ্র লাল চাক্মা
৬) বাবুল চাক্মা

রথীন্দ্রলাল চাক্মা ছোটকাল থেকে একটু উদাসীন ও সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন। সমাজের বিভিন্ন কার্যকলাপ ও নানাবিধ অশান্তিপূর্ণ ঘটনাবলী দর্শনে তাঁর মন দিন দিন বৈরাগ্যের দিকে ধাবিত হয়। একদিন তাদের পাড়ায় জনৈক ব্যক্তির একমাত্র কন্যাসন্তান এগার বৎসর বয়সে মারা যায়। পাড়ার অন্যান্য লোকের সাথে তিনিও মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে যান। তিনি দেখতে পেলেন মৃত কন্যাকে বারান্দার এক পাশে শায়িত অবস্থায় রাখা

হয়েছে। অন্যদিকে পিতা-মাতা কখনো উচ্চস্বরে কেঁদে উঠছে, কখনো বুকে হাত দিয়ে আঘাত করছে, কখনো গাছের সাথে মাথাকে সজোরে আঘাত করছে। কখনো অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রয়েছে। উপস্থিত লোকজন মৃত কন্যার পিতা মাতাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিয়ে বুঝাচ্ছে ও সেবাযত্ন করছে। যুবক রথীন্দ্র ঐ সময় চিন্তা করলেন আমারও একদিন এভাবে মৃতপুত্র কন্যার জন্যে কেঁদে কেঁদে অজ্ঞান হতে হবে। তিনি সেখানেই মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করলেন যে তিনি আর সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হবেন না। তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ যেমন জ্বরা, ব্যাধি, মৃত ব্যক্তি ও সন্যাসী এ চতুর্বিধ দৃশ্য দেখে গৃহত্যাগ করেছিলেন ঠিক তেমনি বনভন্তে ও অপরের একমাত্র মৃতকন্যা দেখে গৃহ ত্যাগ করার সংকল্প বদ্ধ হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, আমি এরূপ শুনেছি তিনি যখন প্রব্রজ্যা গ্রহণের দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ তখন তাঁর মা রথীন্দ্রকে বলেছিলেন- তুমি যেখানে যাও না কেন আমার মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে যেন দেখা পাই। মায়ের অনুমতি নিয়ে পটিয়ার নাইখাইন নিবাসী বাবু গজেন্দ্র লাল বড়ুয়া (শিক্ষক) সহায়তায় ১৯৪৯ ইংরেজীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবিরের নিকট তিনি প্রব্রজ্যা লাভ করেন।

গুরুভন্তের সান্নিধ্যে তিনি জ্ঞানে তৃপ্ত হতে পারলেন না ও চিৎমরম চলে আসেন। উক্ত বিহারাধ্যক্ষের উপদেশে তাঁর গ্রামের অদূরে গভীর বন ধনপাতায় ধ্যানে মনোনিবেশ করেন। সেখানে এক পর্নকুঠিরে থেকে নানা প্রকার জীবজন্তুর উপদ্রব ও শীতোঞ্চ সহ্য করতেন। মধ্যে মধ্যে তিনি লোকালয়ে পিন্ডাচরনে যেতেন। এমনও প্রমাণ আছে তিনি কর্ণফুলী নদীর পশ্চিম তীরে ভিক্ষাচরনে যেতেন। শোনা যায়, নদী পারাপার হওয়ার সময় কোন সময় কেউ তাঁকে দেখেননি। সে গ্রামের অনেকেই কৌতুহল বশতঃ পারাপারের প্রত্যক্ষ করতেন। তন্মধ্যে সমবায় পরিদর্শক বাবু কুমুদ বিকাশ চাক্‌মা বলেন- আমি সে সময় নিম্ন শ্রেণী (প্রাথমিক বিদ্যালয়) শেষ করিয়া হাইস্কুলে পড়তাম। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সে সময় শ্রমন অবস্থায় আমাদের পাড়ায় ঋদ্ধিদ্বারা আসতেন ও যেতেন। কোনদিন নৌকায় আসা যাওয়া করেননি।

১৯৬০ ইংরেজীতে যখন কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দেওয়া হয় তখন তিনি দীঘিনালায় চলে যান। তাঁর মা ও ছোট ভাইয়ের মারিশ্যায় (বাঁঙ্গলতলী) নুতন বসতি স্থাপন করেন।

তাঁর মা' এর মৃত্যুর পূর্বে যখন তিনি সশিষ্যে মারিশ্যায় আমন্ত্রনে যান তখন তাঁর ভাই এর আহ্বানে নিজ বাড়ী পদার্পন করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সেবক জ্যোতিসার ভিক্ষু হতে শ্রুত- তাঁর মা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে পূর্বেকার কথা পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন- আমার মৃত্যুর পূর্বে আমি যেন তোমার দেখা পাই। তিনি তাঁর মাকে স্মৃতিতে থাকার উপদেশ প্রদান করে চলে আসেন।

এ পূন্যশীলা ও রত্নগর্ভা জননী পরলোক গমন করেন। বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম তিনি তাঁর মার মৃত্যুর দু'দিন পূর্বে মাকে দর্শন দিয়ে এসেছেন। শায়িত অবস্থায় মা বলেছিলেন- তুমি আজ বিকালে এসেছ, সকাল বেলা আসলে ছোয়াইং এর ব্যবস্থা করতাম।

তিনি বলেছিলেন- আমি আগামীকাল আসব। তাঁর মাতা এ কথা ছেলে ও বৌদেরকে বলায় তাঁরা তাকে মতিভ্রম হয়েছে মনে করেছিলেন। তবুও মায়ের একান্ত ইচ্ছায় ভোজনের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর যথাসময়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মায়ের কামরায় ভোজন করে চলে আসেন।

উল্লেখ্য যে বনভন্তের গৃহী সেবক বাবু সমর বিজয় চাক্মা কর্তৃক জানতে পারলাম সে দিন তিনি মায়ের দেওয়া ছোয়াইং ভোজন করেছিলেন। সেদিন বন বিহারে ভোজন করেননি। তাঁর শিষ্য শ্রমনদেরকে ভোজনের সময় ধ্যান কুঠির হতে না ডাকার জন্যে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কথিত আছে সেদিন তিনি তাঁর ধ্যান কুঠিরে দরজা জানালা বন্ধ অবস্থায় ছিলেন। উপসংহারে আমি প্রকাশ করতে চাই তিনি ঋদ্ধি প্রভাবে মায়ের শেষ ইচ্ছা পূরনের জন্যে মায়ের প্রদত্ত ভোজন গ্রহণ করেছিলেন।

- o -

লাল শাকের ভয়ে আতংক

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রায় সময় বলে থাকেন প্রব্রজিতের পক্ষে খাদ্য দ্রব্য আহার করা শুধু জীবন ধারন করার জন্যে ও ব্রহ্মচর্য পালন করার জন্যে, দেহ মোটা বা শ্রীবৃদ্ধির জন্য নহে। ভিক্ষু শ্রমন ছাড়া গৃহীরা ও অনাসক্তভাবে ভোজন করলে ভোজনে মাত্রাজ্ঞান উৎপন্ন হবে এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে

চলতে সুগম হবে। আজকাল প্রায়ই ভিক্ষু এটা খাব, ওটা খাবনা, এরকম খাদ্য নির্বাচন করে থাকেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশে দেখা যায় খাদ্য নির্বাচনের কোন প্রয়োজন নেই। শুধু যেটা খাদ্য সেটা অনাসক্তভাবে আহার করা। প্রসঙ্গক্রমে জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষুর খাদ্য নির্বাচনের রহস্যময় ঘটনা প্রবাহ সম্বন্ধে ব্যক্ত করছি।

কোন এক গ্রামে জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষু অনেক বৎসর যাবৎ আছেন। বৃদ্ধকালেই তিনি ভিক্ষু হয়েছেন। পন্ডিত না হলেও বেশ ভাল। সকলের সঙ্গে মৃদু ভাব বজায় রেখে বিহারের উন্নতি কল্পে বেশ মনোযোগী। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি এক উপাসিকাকে বললেন- লাল শাক আমার খুব ভাল লাগে, দামেও সস্তা, খেতেও সহজ। কারণ আমার দাঁত নেই। উক্ত উপাসিকা বৃদ্ধ ভন্তের কথা শুনে মনে মনে খুব খুশী হলেন। কারন তাদের অনেক ঝামেলা কমে গেল এবং বেশ পয়সাও বেঁচে গেল। একথাটা প্রচার করার পর গরীব দায়কেরা খুশীতে ভরপুর। কারণ এক টাকার লাল শাক দিয়ে ছোয়াইং দেয়া যায় আর কি সুযোগ থাকতে পারে? কালক্রমে দেখা গেল উক্ত গ্রামের বড় লোকেরাও লাল শাক দিয়ে ছোয়াইং দিতে লাগলেন। এদিকে বৃদ্ধ ভিক্ষু মহোদয় লাল শাক খেতে খেতে লজ্জায় লাল শাক খাবনা একথা বলতেও পারছেনা। এভাবে কিছুদিন খাওয়ার পর তিনি চিন্তা করলেন তীর্থস্থান ঘুরে আসলে বোধ হয় লাল শাকের মৌসুম ফুরিয়ে যাবে। এ মনে করে তিনি তীর্থস্থান পরিদর্শন করে আসলেন।

এদিকে দায়কেরা লাল শাকের মৌসুম ফুরিয়ে যাওয়ায় তাদের ভিটার পাশে লাল শাকের ক্ষেত করে রাখছেন। কেননা তাদের ভন্তের খুব প্রিয় খাদ্য। তীর্থস্থান থেকে এসে তিনি লাল শাখ দেখে আশ্চর্যন্বিত হয়ে বললেন- এ লাল শাক কোথায় পেলেন? দায়কেরা হেসে হেসে বললেন- ভন্তে আমরা আগে থেকেই বাড়ীর ভিটায় আপনার জন্য লাল শাকের ক্ষেত করে রেখেছি। এদিকে বৃদ্ধ ভন্তে হঠাৎ চমকে বলেন- আমি এখন লাল শাক খাই না। মানুষ ভয় পায় ডাকাতকে, সন্ত্রাসীকে এবং মারনাস্ত্রকে। কিন্তু উক্ত বৃদ্ধ ভিক্ষুর মনে শুধু "লাল শাকের ভয়ে আতংক"।

এটা কোন নিছক গল্প নহে। একটা ঘটনা প্রবাহ মাত্র। এ ঘটনা প্রবাহে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বানীতে স্পষ্টই বুঝা যায় লাল শাকের কোন ভয় নেই। শুধু আসক্তিই একমাত্র ভয়ের কারণ।

- o -

অপ্রিয় সত্যের যথার্থ উত্তর

"বনভন্তের দেশনা" প্রথম খন্ডে অপ্রিয় সত্য নামক একটা প্রবন্ধ দেয়া হয়েছে। উক্ত পুস্তকের বিভিন্ন প্রবন্ধে ও বিক্ষিপ্তাকারে অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে সংকলন করেছি। সে ব্যাপারে অনেকের চিত্তে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। এখানে দেখা যাচ্ছে যে যাঁরা আগে থেকেই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সঙ্গে জানাশুনা বা সংস্পর্শে আছেন তাঁরা ভালভাবে জেনে অপ্রিয় সত্য পছন্দ করেন। অপ্রিয় সত্যে ভুল সংশোধন হয় এবং বহু উপকার সাধন করে। তাতে অনেকে উপকৃতও হয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ যাঁরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্যে মধ্যে মধ্যে আসেন তাঁরা ভালভাবে অপ্রিয় সত্য উপলব্ধি করতে সক্ষম হন না। তাদের মধ্যে কেউ মুখে কেউ পত্রদ্বারা অপ্রিয় সত্য সংকলন না করার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। তৃতীয়তঃ যাঁরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংস্পর্শে কোন সময় আসেননি অথবা বনভন্তে সম্বন্ধে কোন বিষয়ে অবগত নন তাঁরাই সমালোচনা বা বিরুদ্ধাচরন করে থাকেন।

আমি ছোটবেলা থেকে বই পুস্তক পড়ে বা লোকমুখে মুর্খ সম্বন্ধে জেনেছি। যে লেখাপড়া জানে না তাকে মুর্খ বলে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মুর্খ সম্বন্ধে বলেন- মুর্খের ছয়টি লক্ষন- ভালকে বলে মন্দ। মন্দকে বলে ভাল। দোষকে বলে নির্দোষ। নির্দোষকে বলে দোষ। ন্যায়কে বলে অন্যায়। অন্যায়কে বলে ন্যায়। এখানে ভিক্ষু হোক, গৃহী হোক অথবা উচ্চ শিক্ষিত হোক অধিকাংশ জনই মুর্খ পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত। বনভন্তে আরও বলেন- যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা ভুল করলে অকপটে ভুলই স্বীকার করেন এবং পুনরায় ভুল করেন না। আর যারা মুর্খ তারা চিরদিনই ভুল করে থাকে। ভুল সংশোধন করার কোন উদ্যোগ নেই। লোভ, দ্বেষ ও মোহ পরায়ন ব্যক্তি নিজের ভুল-ক্রুটি সম্বন্ধে অবহিত নয়। বরঞ্চ তারা বিপরীত মনোভাব পোষন করে থাকে।

আমি প্রায়ই লক্ষ্য করে থাকি শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সাধারণতঃ তিন ব্যক্তির উপর অপ্রিয় সত্য প্রয়োগ করে থাকেন। প্রথমেই উচ্চ শিক্ষিত শীল লংঘনকারী ভিক্ষু। তিনি বলেন- উচ্চ শিক্ষিত ভিক্ষুরা ভগবান বুদ্ধের বানীগুলি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু নিজে আচরণ করেন না। শীল

লংঘনকারী ভিক্ষুকে তিনি বিড়ালের সাথে তুলনা করেছেন। বিড়াল যেখানে খাদ্য দেখে সেখানে মুখ দেয়। পর্যবেক্ষক বিড়ালকে আঘাত দিতে বাধ্য হয়। সেরূপ শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও তাদেরকে অপ্রিয় সত্য দিয়ে আঘাত করেন। তিনি বলেন- ভিক্ষুরা হলেন মুক্তির পথ প্রদর্শক। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভগবান বুদ্ধের নির্দেশিত উত্তম পথ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ পরিত্যাগ করে হীন, নীচু ও গৃহীর কাজে সর্বদা নিজকে নিয়োজিত রাখে। অন্যদিকে লক্ষ্য করা যায় যাঁরা শীল পালনকারী ও ভাবনাকারী ভিক্ষু তাদেরকে তিনি প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করছি যে, প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জিনবংশ মহাথেরো শ্রদ্ধেয় বুদ্ধ রক্ষিত মহাথেরো, শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপাল মহাথেরো, শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ জ্যোতিপাল মহাথেরো প্রভৃতি বর্তমানে বৌদ্ধ সমাজে সুপ্রশংসিত ভিক্ষু মন্ডলী ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাধনালবদ্ধ যথার্থ জ্ঞানের প্রতি প্রশংসা মুখর এবং শ্রদ্ধাশীল। সেই সুবাদে নির্দ্ধিধায় বলা যায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে একজন প্রশংসিতের প্রশংসিত ভিক্ষু। অবশ্য কতিপয় ভিক্ষুর দুঃশীল আচার-আচরন ও ধারনের কারনে তিনি মাঝে মধ্যে দেশনাক্রমে ব্যক্তি বিশেষ ভিক্ষু বা ভিক্ষুদের নিন্দা জ্ঞাপন করেন মাত্র।

বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রায় দেখা যায় দুঃশীল ভিক্ষুদের কাহিনী ও প্রতিকার। ইতিহাসের পাতা হতে মাত্র দুটি উদাহরণ আপনাদের নিকট স্মরণ করিয়েদিচ্ছি। প্রথমটি হল সম্রাট অশোকের শাসন আমলে ধর্মের সংস্কার কল্পে ৬০ হাজার ভিক্ষু গৃহী করেছিলেন। তাতে বাগানের আগাছা পরিষ্কারের মত বুদ্ধ শাসন সুন্দর ও উন্নতি হয়েছিল। দ্বিতীয়টি হল সর্বজন পূজিত সংঘরাজ শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সারমেধ মহাথেরোর কথা। তিনি অত্র অঞ্চলে কঠোর পরিশ্রম ও পরিভ্রমণ করিয়া দুঃশীল ভিক্ষুদের পুনঃ উপসম্পদা দিয়েছিলেন কিন্তু বর্তমানে শাসন সংস্কার না হওয়ায় ভগবান বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম নিষ্প্রভ হতে চলেছে।

গৌতম বুদ্ধের ধর্মের আয়ু পাঁচ হাজার বৎসর। বর্তমানে ২০৩৭ বুদ্ধাব্দ চলছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- পূর্বজন্মের সঞ্চিত পূন্য, বুদ্ধের উপদেশ এবং ইহ জন্মের চেষ্টা ফলে মানুষ এখনও মুক্তি পেতে পারে। যাঁরা ত্যাগী তাঁরা মুক্তি সম্বন্ধে বুঝতে পারেন। অজ্ঞান অন্ধদের পক্ষে ইহা কল্পনাতীত ব্যাপার।

উপসকদের মধ্যে কেউ কেউ অপ্রিয় সত্য ভাষণ না দেয়ার জন্যে প্রার্থনা জানালে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- সত্যকে সত্য বলতে হবে এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে হবে ইহাই সম্যক দর্শনের অন্তর্ভূক্ত। তিনি প্রজ্ঞা চোখে দুঃশীল ভিক্ষুদিকে উলঙ্গ হিসাবে দর্শন করেন। এ ব্যাপারে তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- কোন এক গ্রামে শুধু একজন এম. এ. পাশ লোক আছেন। শিক্ষিতের মধ্যে আছে আই. এ. পাশ পর্যন্ত। সে গ্রামের লোকেরা উচ্চ শিক্ষিতের সাথে ভালভাবে মিশতে পারে না এবং সে লোকেরও অসুবিধা হয়। তাতে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কে ব্যবধান থেকে যায়। যেদিন বি. এ. পাশ ও এম. এ. পাশের যোগ্যতা অর্জন করবে সেদিন সে উচ্চ শিক্ষিতের মর্ম উপলব্ধি করতে পারবে। সে উচ্চ শিক্ষিত লোক হলেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে। তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী ব্যক্তি শিক্ষিত নয়। তিনি শ্রদ্ধেয় ডঃ রাষ্ট্রপাল মহাথেরোকে প্রশংসা করে বলেন- এ রকম কয়েকজন ভিক্ষু হলে বৌদ্ধ ধর্ম অনায়াসে প্রচার করা যায়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরোর মত ধর্ম সংস্কারকরূপে আর্বিভূত হয়েছেন। তাঁর দূর্জয় অভিযান বীর পরাক্রমে চালিয়ে যাবেন। তাতে কোন বাধা বিপত্তির জন্য তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না। শুধু সময় ও দেশের পরিস্থিতির জন্যে মন্থর গতিতে এগিয়ে যাচ্ছেন। ভগবান বুদ্ধ যেমন সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করে ত্রিলোকের মধ্যে উপযুক্ত ব্যক্তি দেখেননি ঠিক তেমন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ও অত্র অঞ্চলে নির্বান উপলব্ধি করার ব্যক্তি ও দেখতে পান না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অপ্রিয় সত্য প্রয়োগ করেন উচ্চ শিক্ষিত গৃহীর উপর। কেননা তাঁরা উচ্চ শিক্ষালাভ করে ভুল, ত্রুটি, গলদ ও পঞ্চশীল লংঘন করেন। বর্তমানে অনেকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা অনুধাবন করতে পারছেন। আমি প্রত্যক্ষ করেছি যে অশিক্ষিত কোন গৃহী দোষ করলে তিনি অনুরূপভাবে কম ভৎসনা করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অপ্রিয় সত্য প্রয়োগ করেন ধনাঢ্য ব্যক্তির উপর। তিনি বলেন- তারা পূর্ব জন্মে দান ও শীল পালন করে ইহজন্মে অর্থ সম্পদের অধিকারী হয়েছে। তারা বাসী ভোগ করতেছে। ভবিষ্যৎ জন্মের জন্যে উপার্জন করতেছে না। তারা পরকালে অপায়ে গমন করবে। তাদের প্রতি দয়া করে তিনি র্ভৎসনা ছলে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তাতে অনেকে উপকৃতও হয়েছেন। এমনকি অনেক কৃপণ ব্যক্তি দানে উদার ও শীল পালনে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করেন।

অদ্যকার প্রবন্ধ পাঠ করে যারা আমার প্রতি যাদের সন্দেহ ও বিতর্কের উৎপত্তি হয়েছে আমি তাদের নিকট সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থী। কারণ আমি কাহারো ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে লিখিনি। আমি হলাম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সাংবাদিক স্বরূপ। ভবিষ্যতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞান প্রসূত বাণী "বনভন্তের দেশনা" ৩য় খন্ডে ও লিখার অভিপ্রায় রাখি।

- o -

হিতে বিপরীত

আপনারা বোধ হয় লক্ষ্য করে থাকেন রাজবন বিহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়কে দর্শন ও ধর্মবাণী শ্রবনার্থে জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহু নরনারী একাগ্রচিত্তে সমবেত হন। মধ্যে মধ্যে দেখা যায় কেহ কেহ তাদের নানাবিধ সমস্যা ও প্রশ্নের সমাধানের জন্য উপস্থাপিত করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সকলের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ প্রদর্শন করে থাকেন। এমন কি তিনি দয়ার্দ্র হয়ে পরম সুখের জন্য, মঙ্গলের জন্য এবং হিতের জন্য জ্ঞানদান, ধর্মদান ও অভয়দান করেন। মধ্যে মধ্যে দেখা যায় অনেক স্থলে হিতে বিপরীতে ফল ধারণ করে। অনেক উদাহরণের মধ্যে মাত্র দু'টি উদাহরণ পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে ব্যক্ত করছি।

সাধারণতঃ যাঁরা চতুর্থ ধ্যান লাভী তাঁরা ধ্যান অবস্থায় সত্ত্বগণের চ্যুতি-উৎপত্তির সম্বন্ধে জ্ঞানী হন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের আকুল আবেদনে চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে সাড়া দেন। তিনি বলেন- চ্যুতি-উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্যক্ত করা মানে অতি সাধারণ ব্যাপার। এটা সামান্য কেরানীর কাজ। আমার নিকট ডিসির কাজ নিয়ে এস। ডিসির কাজ অসাধারণ। চতুর্বিধ আস্রব ক্ষয় জ্ঞানের কথা। যেমন- কামআস্রব, ভব আস্রব, দৃষ্টি আস্রব ও অবিদ্যা আস্রব। আস্রব ক্ষয় জ্ঞানের কথা হল ডিসির কাজ। অর্থাৎ নির্বানের কথা। যেখানে আছে পরম শান্তি পরম সুখ। সেখানে নেই কোন অশান্তি ও কোন দুঃখ

১। একবার জনৈক উপাসকের ছেলে মারা যাওয়ারপর বনভন্তেকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তার ছেলে কোথায় উৎপত্তি হয়েছে? বনভন্তে বললেন-

নরকে উৎপত্তি হয়েছে। কারন সে গুরুতর অপরাধ করেছে। তাতে উক্ত উপাসক সন্তুষ্টির পরিবর্তে দুঃখিত হয়ে আসেন।

আর একদিন উক্ত উপাসককে উপলক্ষ করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হিত উপদেশ প্রদান করেন। তাতে তার অজ্ঞানতার দরুন বনভন্তের উপদেশ হজম করতে না পেরে অতীব দুঃখিত হয়ে চলে আসেন এবং পরবর্তীতে বন বিহারে যাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। তাতে আমি প্রকাশ করছি হিতে বিপরীত।

২। জনৈক ভদ্রলোক বৃদ্ধকালে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। পূর্ব থেকেই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সহিত সুপরিচিত। বর্তমানে তিনি বড়ুয়া গ্রামে থাকেন। মধ্যে মধ্যে রাঙ্গামাটি এসে বনভন্তের সমীপে উপস্থিত হন। একবার সে ভিক্ষু বন বিহারে আসেন। বনভন্তে তাঁকে বললেন- আপনি বোধ হয় বহুদিন পর আসলেন? উক্ত ভিক্ষু বললেন- হ্যাঁ ভন্তে। বড়ুয়াদের ওখানে সবসময় মাছ-মাংস ও শাক-সব্জি খেতে খেতে একেবারে অরুচি হয়ে গেছে। এবার পাহাড়ের শাক-সব্জি ও বাচ্ছুরি (বাঁশ করুল) খেয়ে রুচি পরিবর্তন করতে এসেছি।

আমি ছোটকাল থেকে জানি মাছ-মাংস আমিষ জাতীয় খাদ্য ও শাক-সব্জি নিরামিষ জাতীয় খাদ্য। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংস্পর্শে এসে জানতে পারলাম মাছ-মাংস কেন যে কোন খাদ্য দ্রব্যই আমিষ জাতীয়। যদি আসক্তি যুক্ত হয়। আসক্তি হলে নিরামিষ। তিনি লোকোত্তরভাবে এভাবেই ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তিনি আরও বলেন- যদি কেহ শাক সব্জি খেয়ে সাধু হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে, বৌদ্ধ মতে তা ঠিক নয়। সে চুরি করতে পারে, মিথ্যা বলতে পারে, এমনকি গোপনে গুরুতর পাপ কার্যে লিপ্ত থাকতে পারে। যে শীল পালন করে সে ব্যক্তি সাধু। যে আসক্তিমুক্তভাবে খাদ্যদ্রব্য আহার করে সে ব্যক্তি সাধু। যে ব্যক্তি সব সময় স্বীয় চিত্তকে নির্মল রাখে, সাবধানতা অবলম্বন করে ও নির্বানগামী করে রাখে সে ব্যক্তিই প্রকৃত সাধু। এখানে জনৈক খাদ্যে আসক্তিমুক্ত ভিক্ষু সম্বন্ধে উদাহরণ দেয়া হয়েছে।

ঘটনাক্রমে কয়েকদিন পর উক্ত ভিক্ষুর (গৃহীকালের) মেয়ে ও পুত্রবধু বনবিহারে উপস্থিত। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- তোমরা একটা কাজ কর। তোমাদের বাবা (ভিক্ষু) বাচ্ছুরি খেতে এসেছেন। ওখানে খেতে পাচ্ছেন না। ভালভাবে বাচ্ছুরি ও পাহাড়ের শাক-সব্জি দিয়ে ছোয়াইং দাও।

কালক্রমে দেখা গেল উক্ত ভিক্ষু যেখানেই ভোজন করেন সেখানেই বাঁশকরুল ছাড়া আর কিছু নেই। পক্ষান্তরে একদিন তিনি তাঁর মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলেন- কি ব্যাপার তোমরা শুধু বাচ্ছুরি বাজারে পাও নাকি? উত্তরে মেয়ে বলল- ভন্তে, আপনি নাকি বনভন্তেকে বলেছেন ওখানে বাঁশ করুল (বাচ্ছুরি) খেতে পাচ্ছেন না। সেজন্য বিভিন্ন পদ্ধতির বাচ্ছুরি রান্না করেছি। তাতে উক্ত ভিক্ষু বনভন্তের সহিত ক্রুদ্ধ হয়ে রাঙ্গামাটিতে খুব কমই আসেন। এ ব্যাপারে আমি মন্তব্য করছি "হিতে বিপরীত" হয়েছে।

- ০ -

মানস করে প্রত্যক্ষ ফললাভ

লৌকিকভাবে দেখা যায় প্রায় লোকই জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের আশা–আকাঙ্খা পূরণের জন্যে মানস করে থাকে। এটা শুধু বৌদ্ধদের নয় প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীদের মানস করার রীতিতে পরিণত হয়েছে। সম্প্রতি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট বিভিন্ন সময়ে তাদের উদ্দেশ্য পূরনের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে দেখা যায়। ছাত্র–ছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি পরীক্ষা, এস. এস. সি, এইচ. এস. সি, আই. এ. বি. এ এবং বিভিন্ন পরীক্ষার আগে ভীড় জমায়। কেউ চাকুরী লাভ, ব্যবসা–বাণিজ্য, আপদ–বিপদ, রোগমুক্তি এবং বিভিন্ন সমস্যা

নিয়ে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। আবার কেউ কেউ ভোটের আগে দলবদ্ধভাবে বনভন্তের সমীপে উপস্থিত হন। মধ্যে মধ্যে দেখা যায় কেউ কেউ পানি স্পর্শ করিয়ে নিয়ে যায়।

এ ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- নির্বান ব্যতীত অন্য প্রার্থনা করা উচিত নয়। কারন হীন ও নীচতর সংস্কারে মানুষ মুক্ত হয় না। উচ্চতর প্রার্থনায় মানুষ শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। নির্বান সাক্ষাৎ করতে পারলে আর কোন দোষ থাকেনা। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন- যদি কোন ভিক্ষুশ্রমণ নির্বান সাক্ষাৎ করার জন্যে প্রার্থনা করে তার অনাগামী ও অর্হত্বফল অবশ্যই হবে। আর যদি কোন উপাসক-উপাসিকা নির্বান সাক্ষাৎ করার জন্যে প্রার্থনা করে তার স্রোতাপত্তি ও সকৃদাগামী ফল অবশ্যই হবে। প্রয়োজন হবে শুধু গভীর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা এবং অসাধারণ বীর্যের।

অনেক সময় দেখা যায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিভিন্ন প্রার্থনাকারীকে তাদের সেরকম প্রার্থনা থেকে বিরত হওয়ার জন্যে উপদেশ দেন। একবার আমি তাঁকে বললাম- ভন্তে, আমার জানামতে অনেকের ফল হয়েছে তিনি আমাকে বললেন- এগুলি তাদের চিত্তের একাগ্রতা ও লৌকিক সত্যের প্রভাবে ফলপ্রসু হয়। লৌকিক সত্য ও মানস সম্বন্ধে "বনভন্তের দেশনা ১ম খন্ডে কিছুটা আভাষ দিয়েছি। মানস করে প্রত্যক্ষ ফললাভ করেছেন এমন বহু প্রমাণের মধ্যে শুধু একটি উল্লেখযোগ্য প্রমান আপনাদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করছি।

বাবু প্রবীর চন্দ্র চাক্‌মা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের একজন একনিষ্ঠ উপাসক। মধ্যে মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার বন বিহারে দেখা হয়। বর্তমানে বনরূপাতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন। তিনি অবসরপ্রাপ্ত রেভেনিউ অফিসার। নোয়াখালী, কুমিল্লা এবং সিলেটে চাকুরী করতেন। এক সময় তাঁর মনে উদয় হল শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে একখানা গাড়ী ক্রয় করে দিতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু তাঁর সেরকম সামর্থ নেই। তবুও সুদূর আশা নিয়ে তিনি প্রাইজ বন্ড ক্রয় করেন। তাতে আড়াই হাজার টাকা পেয়ে বন বিহারের উন্নতি কল্পে জমা দেন। তাঁর মনের ধারনা হল তিনি বোধ হয় প্রথম পুরস্কার পাবেন। আর একদিন প্রাইজ বন্ড ক্রয় করে বনভন্তের নিকট যান এবং প্রার্থনা করলেন- ভন্তে, আমি যেন প্রথম পুরস্কার লাভ করি। অনুগ্রহ পূর্ব্বক

আমাকে আশীর্বাদ করুন। কিছুদিন পর দেখা গেল দেড়লক্ষ টাকার পুরস্কার তাঁর প্রাইজ বন্ডের সঙ্গে মিলে যায়। তাঁর নিজস্ব এক লক্ষ টাকা সহ মোট আড়াই লক্ষ টাকা ব্যাংকে জমা দেন। শ্রদ্ধাবান উপাসক-উপাসিকারা বনভন্তের জন্যে গাড়ী ক্রয়ের খবর পেয়ে তাঁর হাতে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা চাঁদা শ্রদ্ধাদান অর্পন করেন। রাজ বনবিহারে যে গাড়ীটি আছে সেটি তিনিই মোট ছয় লক্ষ টাকা দিয়ে ক্রয় করে দিয়েছেন। ইহাও উল্লেখ থাকে যে, ঢাকা হতে যে আমদানীকারক থেকে গাড়ী ক্রয় করেছেন তিনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নাম শুনে শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ তাঁর লভ্যাংশ নেননি। সে গাড়ীটির নম্বর রাঙ্গামাটি ঘ-৭। সৌভাগ্যক্রমে যাকে বলা হয় লাকী সেভেন।

- o -

কর্মেই মানুষ মুর্খ, পন্ডিত, অসাধু ও সাধু হয়

আজ ১লা মে ১৯৯৪ ইংরেজী রোজ রবিবার। আসামবস্তী সার্বজননী সংঘদান উপলক্ষ্যে সশিষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শুভ পদাপর্ণ বৌদ্ধ পতাকা উত্তোলন ও উদ্বোধনী ভাষণ দেন বাবু বাদল দেওয়ান। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বাবু রনজিৎ দেওয়ান। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু শ্যাম প্রসাদ চাক্মা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমৎ ইন্দ্রগুপ্ত ভিক্ষু।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সকাল ১০টা ৪০ মিনিট হতে ঠিক ১১টা পর্যন্ত ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন অজ্ঞানতা-অবিদ্যা ধ্বংস কর, নির্মূল কর এবং উচ্ছেদ কর। তাতে সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হবে। প্রকৃত সুখ কি তা বুঝতে পারবে ও প্রকাশ পাবে। চারি আর্য সত্য দর্শন করলেই পূণ্য ও সুখ লাভ করা যায়। কেউ কেউ ধর্মের নামে পাপ করে। তোমরা সেদিক থেকে বিরত থাক।

তিনি বলেন- তোমরা মুর্খ হইওনা। পন্ডিত হও। শুধু এম. এ. পাশ বা লেখা পড়া শিখলে পন্ডিত হয় না। যারা পন্ডিত তারা ত্যাগী হয়। সর্বজীবে দয়া, ক্ষমাশীল, মৈত্রী, ও পূণ্য কর্মে নির্ভীক হয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন মুর্খকে পন্ডিত বানাও। কর্মেই মানুষ মুর্খ, পন্ডিত, অসাধু ও সাধু হয়। মুর্খ ও অসাধু নরকে যায়। পন্ডিত ও সাধু স্বর্গে যায়।

নিরামিষ বা শুধু লবন দিয়ে আহার করলে সাধু হয়না। পঞ্চশীল পালন করলে সাধু হয়। যে কোন জীব হিংসা করো না, কোন প্রাণী হত্যা করোনা, পরদ্রব্য চুরি করোনা, ব্যভিচার করোনা, মিথ্যা বাক্য, পিশুন বাক্য, ভেদ বাক্য, সম্প্রলাপ বাক্য বলোনা, যে কোন নেশা দ্রব্য সেবন করোনা। তাকে প্রকৃত সাধু বলে। যে মদ রাঁধে, যে মদ বিক্রী করে এবং যে মদ পান করে সে অসাধু ব্যক্তি। তোমরা এগুলি হতে বিরত থাক।

তিনি বলেন- তোমরা অন্যায়, অপরাধ, ভুল, ত্রুটি ও গলদ কর না। যারা জ্ঞানী তারা অন্যায় অপরাধ, ভুল ত্রুটি ও গলদ করলে সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে সংশোধন করে নেয়। আর যারা অজ্ঞানী তারা কখনো স্বীকার করে না। যেমন গরুকে অন্যায় না করার জন্য বললে কখনো শুনবে না। ঠিক সেরূপ অজ্ঞানী ব্যক্তি ও গরুর মত।

তোমরা ধর্ম চক্ষু ও ধর্মজ্ঞান লাভ করতে সচেষ্ট হও। ধর্মচক্ষুতে নির্বান ভালারূপে দেখে এবং ধর্মজ্ঞানে নির্বান ভালরূপে জানে। ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমেই সদ্ পুরুষ দর্শন করতে হবে। সদ্ধর্ম শ্রবন করতে হবে। প্রণালীবদ্ধ চিন্তা ধারা থাকতে হবে, এবং সদ্ধর্ম ভালরূপে আচরণ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন- পরামর্শ ও উপদেশ দু প্রকার। যাবতীয় হিংসা, মাৎসার্য ,ইর্ষা, লোভ, অহংকার এবং আসক্তাদি ত্যাগেই সুউপদেশ ও সুপরামর্শ বলে। আর যদি ত্যাগ না করে বিপরীত ভাবে চলার জন্য নির্দেশ দেয় তাকে কুপরামর্শ ও কু-উপদেশ বলে। আসক্তাদি ত্যাগেই পরম সুখ ও তা নিজ ধর্ম। তার বিপরীতে মহাদুঃখ ও তা পর ধর্ম।

তিনি অত্র এলাকাবাসীর প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করতে পার বনভন্তেকে আহবান করে কি জন্যে এনেছি? বকুনি শোনার জন্যে? তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- কোন একজন লোক কিছু দিন জ্বর ভোগ করার পর তার জিহবার স্বাদ তিক্ত হয়ে যায়। মিষ্টি বা যে কোন জিনিষ খেতে তিক্ত অনুভব করে। খাদ্য দ্রব্য তিক্ত নয়। তার জিহ্বার স্বাদ তিক্ত। ঠিক তেমনি যারা মুর্খ ও অসাধু তারা বনভন্তের দেশনাগুলি বকুনিরূপে মনে করবে। আর যারা পন্ডিত ও সাধু তারা বনভন্তের দেশনাগুলি মহাউপকারীরূপে গ্রহণ করবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম অহিংসার ধর্ম। শান্তির ধর্ম। সুখের ধর্ম, পূণ্যের ধর্ম এবং উন্নতির ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম যেমন একদিকে কঠিন তেমন অন্যদিকে ব্যাখ্যা করাও মহাকঠিন। বৌদ্ধ ধর্ম কথন, দেশনা প্রজ্ঞাপন, ঘোষণা ও প্রতিষ্ঠা করতে হয়। অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্ম কালবাদী, ভুতবাদী ও অর্থবাদী হিসেবে সর্বদা বিরাজমান রাখতে হয়।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- আন্দাজ বা অনুমান করে বৌদ্ধ ধর্ম পালন করা উচিত নয়। কর্মেই মানুষ মুর্খ হয়, কর্মেই মানুষ পন্ডিত হয়। কর্মেই মানুষ অসাধু হয়, কর্মেই মানুষ সাধু হয়। সুতরাং তোমরা মুর্খতা ও অসাধুতা ত্যাগ করে পন্ডিত ও সাধু হও।

সাধু - সাধু - সাধু

অবিদ্যাই সর্ব দুঃখের আকর

আজ শুক্রবার ১৪ই ফেব্রুয়ারী ১৯৯১ ইংরেজী। রাজবন বিহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ দেশনাটি সংগ্রহ করেছেন বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ সুদত্ত ভিক্ষু।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর দেশনার প্রারম্ভেই বলেন- অবিদ্যাই সর্ব দুঃখের আকর। অবিদ্যা ত্যাগ না করলে বিদ্যা উৎপত্তি হয় না। বিদ্যা উৎপত্তি করতে হলে ৪টি বিষয় পরিহার করতে হবে। যেমন জাতিবাদ, গোত্রবাদ, মানবাদ এবং আবাহ-বিবাহবাদ। এগুলি পরিহার না করলে বিদ্যা উৎপত্তি সম্ভব নয়।

তিনি বলেন- বৌদ্ধ ধর্মমতে জাতিবাদ ও গোত্রবাদ চিত্তের মধ্যে পোষণ করলে সমাজে, গ্রামে এবং দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়। তাতে হিংসা উৎপত্তি হয়, স্বার্থপরতা উৎপত্তি হয় এবং মনে ঘৃণা উৎপত্তি হয়। আমি বা আমরা চাকমা, মারমা, বড়ুয়া বললে হিংসা, স্বার্থপরতা ও ঘৃনার আবির্ভাব ঘটে। এ জাতিবাদ ও গোত্রবাদ নিয়ে বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবী আজ অশান্ত। যারা জ্ঞানী তারা জাতিবাদ ও গোত্রবাদ ত্যাগ করেন।

মানবাদ হচ্ছে অহংকার। যেমন তুমি আমার চেয়ে হীন, তুমি আমার সমান এবং তুমি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মানবাদীরা আরো বলে তুমি আমার যোগ্য, তুমি আমার যোগ্য নয়। এবাবে ৯ (নয়) প্রকার মানের অন্তরালে মানুষ মহাদুঃখে কাল যাপন করে।

আবাহ অর্থ হচ্ছে অন্য বাড়ী হতে যুবতী নারী নিজ বাড়ীর যুবকের সঙ্গে পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেয়া। বিবাহ অর্থ হচ্ছে নিজ বাড়ী হতে যুবতী নারী অন্য বাড়ীর যুবকের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করে দেয়া। এ আবাহ-বিবাদবাদ বৌদ্ধ ধর্মমতে অবিদ্যার পর্যায়ভুক্ত। বিনয়মতে ভিক্ষুদের আবাহ-বিবাহ সম্বন্ধে আলোচনা করাও নিষিদ্ধ। তাহলে আবাহ-বিবাদবাদ উচ্ছেদ করা উচিৎ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- অবিদ্যায় চারি আর্য্য সত্য জানতে দেয়না, বুঝতে দেয়না এবং কোন ধর্মের আস্বাদ উপলব্ধি করতে দেয়না। দুঃখ কি তা বুঝতে দেয়না। দুঃখের কারণ কি- তা বুঝতে দেয়না, দুঃখের নিরোধ কি তা বুঝতে দেয়না এবং দুঃখের নিরোধগামী বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি তাও বুঝতে দেয়না। অবিদ্যা হতে সকল দুঃখ রাশির উৎপত্তি। অবিদ্যা থাকলে দুঃখ ধ্বংস হয় না।

তিনি আরো বলেন- এ দুঃখ রাশি কোথা হতে উৎপত্তি হয়? অবিদ্যা হতে সকল দুঃখ উৎপত্তি হয়। এ অবিদ্যাকে নিরোধ করতে পারলে বিদ্যা উৎপত্তি হয়। অবিদ্যা ধ্বংস হলে সংস্কার ও যাবতীয় তৃষ্ণা ধ্বংস হয়। তৃষ্ণা ধ্বংস হলে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করতে হয় না। জন্মগ্রহণ না করলে দুঃখগুলিও ভোগ করতে হয় না।

বনভন্তে বলেন- স্বাধীন কাকে বলে? কেউ কেউ বলে বাংলাদেশ, ভারত বা আমেরিকা স্বাধীন। প্রকৃতপক্ষে কেউ স্বাধীন নয়। যে কোন মনুষ্যলোক, স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মলোক স্বাধীন নয়। যে ব্যক্তি অবিদ্যা থেকে, তৃষ্ণা থেকে, ধর্ম থেকে এবং কর্ম থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত সেই প্রকৃত স্বাধীন। প্রত্যেক নর-নারী চায় স্বাধীন ও নিরাপত্তা। কিন্তু আসলে কেউ স্বাধীন নয় এবং কাহারো নিরাপত্তা নেই।

জ্ঞান-সত্য সুপথ। অবিদ্যা বা অজ্ঞান-মিথ্যা কুপথ। যার মধ্যে জ্ঞান-সত্য বিদ্যমান আছে সেই নির্বানগামী। যার মধ্যে অজ্ঞান-মিথ্যা

বিদ্যমান সেই অপায়গামী। তোমরা সত্য-মিথ্যা, সুপথ-কুপথ, হিত উপদেশ, অহিত উপদেশ, সুবুদ্ধি)কুবুদ্ধি, সু-পরামর্শ ও কু-পরামর্শ যাচাই কর।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বুদ্ধের শাসন মেনে চললে সুখ। বুদ্ধের শাসন গভীরভাবে বিশ্বাস করলে সুখ পাওয়া যায়। আজকালকার প্রায়ই মানুষের আছে শুধু কামলোভ, ধনলোভ, রাজ্যলোভ, বিদ্যালোভ ও সৌন্দর্য্যলোভ। এগুলি হচ্ছে অধর্মের পাগল। তাদের মনে হিংসা ও অজ্ঞান সব সময় জাগরিত থাকে।

হীন মানুষেরা যা কিছু করে সেগুলি হচ্ছে অবিদ্যা তৃষ্ণা ও উপাদান এগুলির দ্বারাই যাবতীয় দুঃখের উৎপত্তি হচ্ছে। বর্তমান মানুষেরা যত পাপ কর্ম করবে তত গরীব হতে থাকবে। সদ্ধর্মকে বিশ্বাস না করলে আরো গরীব হবে।

চিত্ত দমন করতে হলে যেখানে স্ত্রী-পুরুষ নেই সেখানে চিত্ত দমন করতে হয়। আত্ম দমন করতে হলে গভীর নির্জন জঙ্গলে আত্ম দমন করতে হয়। ইন্দ্রিয় দমন করতে হলে ইন্দ্রিয় সেবা হতে মুক্ত থাকতে হবে। ইন্দ্রিয় সেবায় নরকে পতিত হয়। ইন্দ্রিয় চারণ সর্বতোভাবে পরিহার করতে হবে। মানুষ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হলে সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যুর অধীন হয়। চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন দ্বারে যথাক্রমে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ, স্পষ্টব্য ও স্বভাব ধর্মে প্রতিফলিত হয়। দুঃখ উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই জ্বরা মরণের আবির্ভাব ঘটে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে বলেন- তোমরা জাতিবাদ, গোত্রবাদ মানবাদ এবং আবাহ-বিবাহবাদ বর্জন কর। তোমরা অবিদ্যা, তৃষ্ণা, সংস্কার, ধর্ম ও কর্ম থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হও। এগুলি হতে অবিদ্যার উৎপত্তি হয়। সুতরাং অবিদ্যাই সর্ব দুঃখের আকর।

অবিদ্যা সংস্কার তৃষ্ণা হলে অবসান।
পঞ্চস্কন্ধ ক্ষয়ে হয় পরম নির্বান।।

সাধু - সাধু - সাধু

বুদ্ধমূর্তি দান, সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান উপলক্ষে বনভন্তের ধর্মদেশনা

(সকাল বেলায় দেশনা)

সমবেত সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি লক্ষ্য করে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মদেশনায় বলেন- আজ যারা এখানে সমবেত হয়েছে, তন্মধ্যে শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, নারী ও পুরুষ সকলে পূণ্যানুষ্ঠান উপলক্ষে যোগদান করেছ। তোমাদের মধ্যে কেহ শিক্ষিত, কেহ অশিক্ষিত, কেহ সবল ও কেহ দুর্বল। একদিন কেহই এ পৃথিবীতে থাকবে না। সকলেই মরে যাবে। সকলকে একদিন না একদিন মরতেই হবে। মরনচিন্তায় পাপ করতে পারে না। সর্বদা মরন চিন্তা কর।

মানব জীবন দুঃখজনক। দেহ ধারণ করলে নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রমণ করে। এমন কি অসহ্য দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করে মরে যেতে হয়। সংসারের নানাবিধ দুঃখ ভোগ করতে হয়। যেমন অভাব অনটনে থাকা মহা দুঃখজনক। চোর, ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের আক্রমনেও মানুষ দুঃখ ভোগ করে। এমনকি অকালে মরে যেতে হয়।

আজকাল প্রায় দেখা যায় ভাই এ ভাই এ মারামারি, পিতাপুত্রে হানাহানি, ঘরে ঘরে হানাহানি, গ্রামে গ্রামে হানাহানি লেগেই আছে। এমন কি দেশে দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ চলতেই আছে। এগুলি মাত্রেই মহা দুঃখজনক। পরিবারের মধ্যে যদি কেহ মারা যায় দুঃখজনক, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখজনক। বৃদ্ধকালও দুঃখজনক। কারণ বৃদ্ধকালে ইন্দ্রিয় শিথিল হয় এবং নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রমণ করে। মৃত্যুদুঃখ ভয়ানক। সহজে কেহ মরতে চায় না। সবাই বেঁচে থাকতে চায়। মৃত্যুর পর আবারও নানাবিধ প্রাণী হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

জন্মগ্রহণ করা ও দুঃখজনক। জন্ম-মৃত্যু প্রবাহকে জন্মান্তরবাদ বলে। জন্মান্তরবাদ ও দুঃখজনক। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এ পঞ্চস্কন্ধই দুঃখজনক। পঞ্চস্কন্ধের উত্থান পতনকে জন্মমৃত্যু বলে। এ জন্ম মৃত্যু বা পঞ্চস্কন্ধকে নিরোধ করতে পারলেই মুক্তি পাওয়া যায়। তোমরা এ

দুঃখজনক পৃথিবীতে থাকিও না। পৃথিবীতে কেন, স্বর্গে যাওয়াও দুঃখজনক। কেননা স্বর্গে চিরদিন থাকা যায় না। আবারও নানা জন্মে পরিভ্রমণ করতে হয়। পুনঃ জন্মে পুনঃবার দুঃখে পতিত হয়। যে তার মৃত্যু সম্বন্ধে চিন্তা করে সে কখনও পাপকার্য করতে পারে না। পাপে দুঃখ দেয়। পাপকে ঘৃণা কর ও ভয় কর।

মানুষ দুঃপ্রকারে বিভক্ত। অন্ধ পুদ্‌গল ও কল্যান পদুগ্‌ল। অন্ধ পুদ্‌গল মরনের পর নরক ও অপায়ে পতিত হয়। কল্যান পুদ্‌গল মরনের পর স্বর্গে, ধনীকুলে জন্মগ্রহণ করে। কল্যাণ পুদ্‌গল সংখ্যায় কম। আবার কল্যান পুদ্‌গল দু'প্রকার। পৃথকজন পুদ্‌গল পূণ্য কর্ম করে স্বর্গে ও ধনীকুলে লৌকিক সুখ ভোগ করে। আর্য পুদ্‌গল হল- স্রোতাপত্তি মার্গ, স্রোতাপত্তিফল, সকৃদাগামী মার্গ, সকৃদাগামী ফল, অনাগামী মার্গ, অনাগামী ফল, অর্হৎ ও অর্হৎ ফল। এ অষ্ট পুদ্‌গলই প্রকৃত সুখের অধিকারী। তাঁরাই প্রকৃত বুদ্ধপুত্র। তাঁদেরকে আবার লোকোত্তর পুদ্‌গলও বলা হয়।

আর্য পুদ্‌গল হতে হলে চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে জানতে হবে, বুঝতে হবে, শিক্ষা করতে হবে, গ্রহণ করতে হবে এবং উত্তমরূপে আচরণ করতে হবে- দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায়। দুঃখ নিরোধের উপায় হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ।

সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ। কাম তৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণাই দুঃখের কারণ। যার উৎপত্তি আছে তার বিনাশও আছে। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখমুক্তির একমাত্র পথ। দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারনে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধের প্রতিপদায় জ্ঞানই প্রকৃত বুদ্ধজ্ঞান। জ্ঞান আর সত্য উদয় হলে মুক্ত হওয়া যায় বা নির্বান লাভ হয়। নির্বান লাভ না হওয়া পর্যন্ত সংসারের যাবতীয় দুঃখ ভোগ করতে হয়।

কামলোক, রূপলোক ও অরূপলোক ভয়জনক। এ ত্রিলোক মুক্ত নয়। তা ত্যাগ করা একান্ত প্রয়োজন। কাম, রূপ ও অরূপকে মার ভূবন বলে। ত্রিলোক থেকে বাইরে চলে যেতে হবে। সেখানে মারের কোন অধিকার নেই। সেটাকে অমার ভুবন বলে। অমার ভুবন হল- স্রোতাপত্তি, সকৃদাগামী, অনাগামী, অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থ ও নির্বান। এ নবলোকোত্তর ধর্মকে সম্পূর্ণ নিরাপদ ও মুক্ত বলে।

মারভুবনের স্বত্বগণ সাধারণ ও খোঁড়া বিশেষ। অমার ভুবনের সত্বগন অসাধারণ ও স্বাভাবিক। তোমরা সাধারণ থেকে অসাধারণ হও। লোভ পরায়ন লোক প্রেতকুলে যায়। দ্বেষ পরায়ন লোক নরকে যায় এবং মোহ পরায়ন লোক তীর্যক কুলে গমন করে।

ইহলোক-পরলোক বিশ্বাস কর। যে পরলোক বিশ্বাস না করে, সে মহাপাপ করে। পুনঃজন্মকে বিশ্বাস করে দান করলে মহাফল হয়। বৌদ্ধ ধর্ম কঠিন ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম অনুধাবন করা মহা কঠিন ব্যাপার। কামসুখ ও আত্মপীড়ন ত্যাগ কর। দু'অন্তত্যাগ করে মধ্য অর্থাৎ আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে চললে কায়িক, বাচনিক ও মানসিক পাপ উচ্ছেদ হয়। তাতে হীনমন্যতা দূর হয়। তৃষ্ণা, মান, অজ্ঞানতা, মিথ্যাদৃষ্টি সমূলে ধ্বংস হলে উত্তম সুখ পাওয়া যায়।

সে যুগে ভগবান বুদ্ধ ও ভিক্ষু সংঘ রাজা ও ধনাঢ্য কুল থেকে প্রব্রজ্যা নিয়েছিলেন। উপাসক-উপাসিকারাও সে রকম ছিলেন। বর্তমানে প্রায় ভিক্ষু সংঘ অতীব গরীব ও হীন কুল থেকে প্রব্রজ্যা নেওয়ার দরুন উত্তম ধর্মের অভাব দেখা দিয়েছে। উত্তম ধর্ম ❀ না থাকাতে বর্তমানে নানাবিধ দুঃখের প্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে।

তিনি বলেন- বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ কর। বুদ্ধের উপদেশ ও শিক্ষায় নির্বান ধর্ম হয়। নির্বান ধর্ম পরম সুখ। তোমরা পন্ডিত হও। অনেকে মনে করে- বি. এ. এম. এ. পাশ করলে পন্ডিত ও শিক্ষিত হয়। তা ভুল ধারণা। মোটামুটিভাবে চারি আর্যসত্য জ্ঞান যাঁর কাছে আছে, তিনিই পন্ডিত শিক্ষিত। পন্ডিত ও শিক্ষিত হতে হলে দয়ালু, ক্ষমাশীল, নির্ভীক ও মৈত্রী পরায়ন হতে হবে। আগের যুগে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তাঁরা বুদ্ধজ্ঞানে পন্ডিত ও শিক্ষিত ছিলেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বর্তমান কালের নামধারী পন্ডিত ও শিক্ষিতদেরকে হুশিয়ার করে ভবিষ্যৎ বাণী দিয়ে বলেন- তোমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ও ভয় সংকুল। আমার নিকট একদিন না একদিন আসতেই হবে। না হয় তোমাদের বিপদগ্রস্থ হতে হবে। উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- তোমরা নিজকে নিজে রক্ষা কর। খুব সাবধানতা অবলম্বন করে চল। সাবধানে চললে ভয় নেই। সাবধানতার অপর নাম "অপ্রমাদ" মানুষ মাত্রেই ভয়জনক, বিপদজনক ও দুঃখজনক। মারকে পরাজয় করতে পারলে

পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পারবে। সাবধানতা অবলম্বন করলে পরম সুখ নির্বান লাভ করা যায়।

বিকাল (৩টার পরিত্রান সূত্র পাঠ করার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তের) বেলার ধর্মদেশনা

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনার প্রারম্ভেই বলেন- চারি আর্য সত্য কি? তা জানতে হবে ও বুঝতে হবে। চারি আর্যসত্য জানতে ও বুঝতে পারলে সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হলে পাপধর্ম সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্ধান হয়ে যায়। চারি আর্যসত্য দ্বারা উচ্চতর জ্ঞান লাভ হয়। উচ্চতর জ্ঞানে হীন কাজকরতে পারে না। বর্তমান উচ্চ শিক্ষাকে হীনজ্ঞান বলা হয়। তারা মুক্ত নয় এবং পাপ ধর্মে লিপ্ত থাকে।

তোমরা সহনশীলতা অর্জন কর। সর্বজীবে দয়া কর। ক্ষমাশীল হও এবং সর্বদা নিজকে অক্ষুন্ন রাখ। পন্ডিত ব্যক্তি মারকে পরাজয় করে। অসুর হওনা। যতসব মারামারি, কাটাকাটি ও নানাবিধ অকার্য অসুর দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকে। অজ্ঞানতাই অসুর রূপ ধারন করে। চারি আর্যসত্য না থাকিলে তাকে মুর্খ বলে। মুর্খের ছয়টি দোষ। যেমন ভালকে মন্দ, মন্দকে ভাল, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য, ন্যায়কে অন্যায় ও অন্যায়কে ন্যায় বলে। তাদের হিতাহিত জ্ঞান নেই বলে এক প্রকার অন্ধ। মূর্খেরা বহু-দুঃখের সৃষ্টি করে।

যাঁরা ধীর ও পন্ডিত তাদেরকে সাধু বলে। আবার শীল পালনকারীকেও সাধু বলে। শীললংঘনকারীকে অসাধু বলে। কর্মেই সাধুর লক্ষন। কর্মেই অসাধুর লক্ষন। সাধু উর্ধ্ব দিকে যায়। অসাধু অপায়ে গমন করে। অসাধু ইহলোক-পরলোক দুঃখ পায় এবং অপরকেও দুঃখ দেয়। সাধু ইহলোক-পরলোক সুখে-শান্তিতে থাকে।

তোমরা কুশল ধর্ম পালন কর। কুশলকে নির্বান ধর্মও বলা হয়। নির্বান ধর্ম পরম সুখ। আজকালকার নামধারী পন্ডিতেরা পেটের ধান্ডায় চলে। এমনকি, মেম্বার, চেয়ারম্যান, মন্ত্রী প্রভৃতিও প্রায় পেটের ধান্ডায় থাকে। তারা এক প্রকার কারাগারে আছে। তোমরা সদ্‌গুরুর উপদেশ লও। নিজের কর্ম প্রচেষ্টা দ্বারা নিজকে নিজে কৃতকার্য কর। পূর্ব জন্মের পারমী থাকলে নিশ্চয়ই তোমাদের কার্য ফলপ্রসূ হবে।

দেশনা প্রসংগে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আরও বলেন- লেখা পড়ার পূর্বকোটি বা আবিষ্কারককে জান? তিনি বলেন- জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশলই লেখাপড়ার উৎপত্তি বা পূর্বকোটি। কুশল পথে চল। মিথ্যা পথ পরিহার কর। মিথ্যা মহাপাপ। মনে দুঃখ নিয়ে ধর্ম করিও না। দুঃখকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ কর। পাপধর্ম ত্যাগ কর। সঙ্গে সঙ্গে পূণ্য ধর্ম ও ত্যাগ কর। পাপ পূণ্য উভয়ই ত্যাগ করতে না পারলে উচ্চতর জ্ঞান লাভ হবে না। উচ্চতর জ্ঞান হল নির্বান ধর্ম। সেখানে পাপ পূণ্যের কোন স্থান নেই বলে নির্বান পরম সুখ।

জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।
সকল প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হোক।।

বনভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে তাঁর সংক্ষিপ্ত দেশনায় বলেন- নানাবিধ জিনিষ পত্র রাখার জন্য মালামালের গুনাগুন অনুযায়ী জায়গা বা পাত্রের প্রয়োজন হয়। সংরক্ষিত দ্রব্যাদি বর্তমান ও ভবিষ্যতে প্রয়োজনে সেটা কাজে লাগানো হয়। ঠিক সেরূপ জ্ঞান সত্য রাখার জন্যও পাত্রের প্রয়োজন। সে পাত্র কোথায়? সে পাত্র নিজ চিত্তের মধ্যে অবস্থিত। চিত্তেই জ্ঞান-সত্য সংরক্ষন করতে হয়। জ্ঞান-সত্যের কোন রকম অপচয় করা যায় না। ক্রমান্বয়ে জ্ঞান-সত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হয়। সে জ্ঞান-সত্য কিভাবে পাওয়া যায়? অজ্ঞান মিথ্যা ত্যাগ করতে পারলে জ্ঞান-সত্য পাওয়া যায়। তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন- আপনারা ভগবান বুদ্ধের ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করুন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণ করে উত্তমরূপে আচরণ করুন। আচরনে জ্ঞান-সত্য পরিপূর্ণ হবে। সকল প্রকার মঙ্গল ও চিত্তে অনাবিল সুখ বয়ে আনবে। পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করা মহা দুঃখ জনক। জ্ঞান-সত্যে পুনঃ জন্ম বন্ধ হয়। জ্ঞান-সত্যের অধিকারী হলে নানা প্রকার দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়। বর্তমানে জ্ঞান-সত্যের অভাবে লোকেরা যাবতীয় দুঃখের আবর্তে পড়ে সাংঘাতিক ঘোরপাক খাচ্ছে। আপনারা অকুশল পথ পরিহার করে কুশল পথে চলুন। জ্ঞান-সত্যের অধিকারী হয়ে বিপুল সুখের অধিকারী হোন। এই কুশল পথই হচ্ছে নির্বান।

- ০ -

স্কন্ধ-আয়তন-ধাতু

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আজ দেশনালয়ে আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে অতি সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন ও অষ্টাদশ ধাতু সম্বন্ধে দেশনা করেন। তিনি বলেন-

১। রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞানকে নামরূপ বা পঞ্চস্কন্ধ বলে। রূপ অনিত্য, রূপ দুঃখপূর্ণ ও রূপ অনাত্ম। বেদনা অনিত্য, বেদনা দুঃখপূর্ন ও বেদনাঅনাত্ম। সংজ্ঞা অনিত্য, সংজ্ঞা দুঃখপূর্ণ ও সংজ্ঞা অনাত্ম। সংস্কার অনিত্য, সংস্কার দুঃখপূর্ণ ও সংস্কার অনাত্ম। বিজ্ঞান অনিত্য, বিজ্ঞান দুঃখপুর্ণ ও বিজ্ঞান অনাত্ম। পঞ্চস্কন্ধ অনিত্য দুঃখপূর্ণ ও অনাত্ম।

রূপ আমি নয়, আমার নয় ও আমার আত্মা নয়। বেদনা আমি নয়, আমার নয় ও আমার আত্মা নয়। সংজ্ঞা আমি নয়, আমার নয় ও আমার আত্মা নয়। সংস্কার আমি নয়, আমার নয় ও আমার আত্মা নয়। বিজ্ঞান আমি নয়, আমার নয় ও আমার আত্মা নয়। পঞ্চস্কন্ধ আমি নয়, আমার নয় ও আমার আত্মা নয়। পঞ্চস্কন্ধ সবসময় উৎপন্ন হচ্ছে, আবার ধ্বংস হচ্ছে, যে জিনিষ উৎপন্ন ধ্বংস হয় তা অনিত্য, দুঃখপূর্ণ ও অনাত্মা।

আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি এ চারটি সমন্বয়কে রূপ বলে। বেদনা তিন প্রকার। যথাঃ- সুখ বেদনা, দুঃখ বেদনা ও উপেক্ষা বেদনা। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে সুখ অনুভবকে সুখ বেদনা বলে। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে দুঃখ অনুভবকে দুঃখ বেদনা এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শে সুখ-দুঃখের মধ্যবর্ত্তীকে উপেক্ষা বেদনা বলে। ধারনার অপর নামকে সংজ্ঞা বলে। সংস্কার তিন প্রকার। কায় সংস্কার, বাক্য সংস্কার ও চিত্ত সংস্কার। বিজ্ঞান বলতে মনকে বুঝায়।

২। চক্ষু আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। শ্রবণ আয়তন পরিবর্তন শীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। ঘ্রান আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। জিব্হা আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। কায় আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। মনো আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

রূপ আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। শব্দ আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। গন্ধ আয়তন পরিবর্তনশীল বলে

অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। রস আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। স্পর্শ আয়তন পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। ধর্ম আয়তন (মনে ধারনকৃত ধর্মরূপ) পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। দ্বাদশ আয়তন ও পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

৩। চক্ষু ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। শ্রবন ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। ঘ্রান ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। জিব্হা ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। কায় ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। মনো ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

রূপ ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। শব্দ পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। গন্ধ ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। রস ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। স্পর্শ ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। ধর্ম ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

চক্ষু বিজ্ঞান ধাতু (চক্ষু দ্বারা জ্ঞাত বিষয়) পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। শ্রবন বিজ্ঞান ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। জিব্হা বিজ্ঞান ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। কায় বিজ্ঞান ধাতু পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। মনোবিজ্ঞান ধাতু (মনের দ্বারা জ্ঞাত বিষয়) পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। অষ্টাদশ ধাতু ও পরিবর্তনশীল বলে অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- পঞ্চস্কন্ধ হচ্ছে বিষয়বস্তু, দ্বাদশ আয়তন হচ্ছে উক্ত বিষয়বস্তুর সংরক্ষনের জায়গা ও অষ্টাদশ ধাতু হচ্ছে স্ব স্ব স্থানে সংস্থাপন হওয়ার জায়গা। পঞ্চস্কন্ধ বন্ধ করতে পারলে দ্বাদশ আয়তন বন্ধ হয়। দ্বাদশ আয়তন বন্ধ হলে অষ্টাদশ ধাতু ও বন্ধ হয়। যা কিছু উৎপন্নশীল তা আবার পরিবর্তনশীল। যা পরিবর্তনশীল তা অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম।

উপসংহারে বনভন্তে বলেন- যারা পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন ও অষ্টাদশ ধাতু সম্বন্ধে গভীরভাবে বিশ্বাস করে শ্রবন করলে তারা স্বর্গবাসী হয়। আর যারা পঞ্চস্কন্ধ, দ্বাদশ আয়তন ও অষ্টাদশ ধাতু সম্বন্ধে গভীরভাবে বিশ্বাস করে মনে ধারন করতে পারে তারা নির্বান লাভ করতে পারে।

- ০ -

লফন-কুহন-নিমিত্ত ও নিপ্পেষণ

আজ ২৫শে সেপ্টেম্বর '৯২ ইং শুক্রবার ভোর ৫ টায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যশিগকে উপদেশ প্রসংগে নিম্নলিখিত চারটি কু-আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

লফনঃ- আজকাল প্রায় বিহারে বিহারাধ্যক্ষরা উপাসক-উপাসিকাদিগকে লৌকিকতা বশতঃ অথবা আরো বেশী পাওয়ার আশায় বা লাভ-সৎকার বৃদ্ধির জন্যে বিভিন্ন খাদ্য-দ্রব্য চা-পান সিগারেট আপ্যায়ন করে থাকেন। কেহ কেহ উপাসক উপাসিকাদিগকে বেশী খুশী করার জন্য ধার্মিক ও শীলবান বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। আরো উদ্দেশ্য করে বলেন- জনৈক উপাসক দান করতে কার্পন্য করেন না। তাঁর পিতা ও ছিলেন সেরকম। এভাবে বিভিন্ন মনতুষ্টির জন্য লফন-ভাষন দিয়ে থাকেন। লফন ভাষন দানকারীরা মরনের পর চারি অপায়ে গমন করেন।

কুহনঃ- কিছু সংখ্যক ভিক্ষু ত্রিপিটক বিশারদ না হয়েও ত্রিপিটক বিশারদ হিসাবে দাবী করেন। কেহ কেহ পন্ডিত না হয়েও পন্ডিত ও কেহ কেহ মার্গফল লাভী না হয়ে মার্গফল লাভী বলে দাবী করেন। তাঁরা মরনের পর চারি অপায়ে গমন করেন।

নির্মিত্তঃ- কোন কোন ভিক্ষু-শ্রমন উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি এক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তাতে উক্ত ভিক্ষু শ্রমনের মিথ্যাদৃষ্টি ভাব, কামভাব, মায়ামমতায় জড়িত এবং ধ্যান সমাধির অন্তরায় হয়।

নিপ্পেষনঃ- কোন কোন ভিক্ষু অপরের গুণ, মান, সম্মান ও বিভিন্ন গুনাবলী থাকা সত্ত্বেও কোন কিছু নেই বলে ভাষন দিয়ে থাকেন। তাঁরা জন্মে জন্মে মুক্তির পথ খুঁজে পায় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্যদিগকে উপরিল্লেখিত চার প্রকার কু-আচরণ থেকে বিরত হওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করেন।

পরিশেষে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- গৃহীদের পাঁচ প্রকার কু-আচরন পরিত্যাগ করা উচিত। যেমন- মাছ মাংস ব্যবসা, প্রাণী ব্যবসা, নেশাদ্রব্য ব্যবসা, অস্ত্র ব্যবসা ও বিষ ব্যবসা।

- o -

দেবতারাও সাহায্য করে?

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে লংগদু হতে রাঙ্গামাটি রাজ বনবিহারে আসার পর তাঁর জন্যে কোন ধ্যানকুঠির বা ঘর তৈয়ার করে দেওয়া হয়নি। তিনি দেশনালয়ে ও মন্দিরে ধ্যান অবস্থায় রাত কাটাতেন। তিনি কোনদিন বলেননি তাঁর জন্যে একখানা ধ্যানকুঠির তৈয়ার করা হোক।

১৯৮৩ সনের কথা। তখন ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অবস্থানের জন্য পৃথকভাবে কোন আবাস বিহার ছিল না। শ্রদ্ধেয় ভন্তে সারাদিন দেশনালয়ে থাকতেন এবং দর্শনার্থীদেরকে ধর্মোপদেশ দিতেন। রাত্রে বিহারের ভিতরে থাকতেন। বলা বাহুল্য উপাসক-উপাসিকারা ঐ বিহারে বন্দনা ও পূজাদি করতো বলে উক্ত বিহার গৃহে তাঁর থাকা-খাওয়ার যথেষ্ট অসুবিধা হত।

একদিন বিহার পরিচালনা কমিটির বর্তমান সভাপতি বাবু সুনীতি বিকাশ চাকমা (সক্ক) শ্রদ্ধেয় ভন্তের দর্শনে গমন করেন। ঐ সময়ে তিনি ছাড়া অন্য কেহ ছিল না। ঐ দিন হঠাৎ আকাশ কালমেঘে ছেয়ে গেল। তারপর প্রচন্ড ঝটিকা প্রবাহ সহ ভীষণ বৃষ্টি বর্ষন শুরু হল। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের বসার আসন সহ গোটা দেশনালয় বৃষ্টির জলে ভিজে গেল। শ্রদ্ধেয় ভন্তে স্বীয় আসন ত্যাগ করে বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলেন। সুনীতি বাবু শ্রদ্ধেয় ভন্তের এই অবস্থা দেখে তাঁর থাকার সুখ-সুবিধার জন্য একটি আবাস কুটিরের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা ভাবছিলেন। অতঃপর অনেকক্ষন পরে বৃষ্টি থেমে গেল। শ্রদ্ধেয় ভন্তে তাকে বল্লেন- "পাকা ঘরের চেয়ে মাটির ঘরই শ্রেয়ঃ।" সুনীতি বাবু একথা ভাবতে ভাবতে বিহার ত্যাগ করলেন। এর কিছুকাল পরে শ্রদ্ধাবান উপাসক বাবু অজিত কুমার দেওয়ান বেড়াবার জন্য তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে গেলে উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা হচ্ছিল। কথা প্রসংগে বাবু অজিত কুমার দেওয়ান একটি বিহার দান করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সুযোগে সুনীতি বাবু তাঁকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জন্য একটি আবাস কুঠিরের প্রয়োজনীয়তার কথা অবহিত করেন। একথা শুনে অজিত বাবু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের থাকার জন্য একাই একটি কুটির নির্মাণ করিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। অতঃপর তাঁরা উভয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তের নিকট গিয়ে এবিষয়ে উত্থাপন করেন এবং শ্রদ্ধেয় ভন্তে তাতে সদয় অনুমোদন প্রদান করেন। ঐ বছরের শেষভাগে বাবু অজিত কুমার দেওয়ানের অর্থানুকূল্যে এবং বাবু সুনীতি

বিকাশ চাক্‌মা (সক্ক) ও বাবু লগ্নকুমার চাকমার (কারিগর) সার্বিক তত্ত্বাবধানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের থাকার জন্য অর্ধ লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে টিনের ছাউনি দেওয়া একটি মাটির কুটির নির্মিত হয়। ঐ কুটিরের চারদিকে বারান্দা করা হয়। বারান্দায় তর্জ্জার ছাউনি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে অন্যান্য পূন্যার্থীদের দানে টিনের ছাউনি দেওয়া হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ১৯৮৪ সন হতে ১৯৯৩ সনের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ঐ কুটিরে অবস্থান করেন। ১৯৯৩ সনের শেষভাগে ঐ কুটির ভাঙ্গিয়া ফেলা হয় এবং ঐ স্থানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের থাকার জন্য বর্তমান দ্বিতল পাকা কুঠি ভবন নির্মিত হয়েছে।

একদিন নদীর ঘাটে বাবু লগ্ন কুমার কারিগরের সাথে আমার দেখা হয়। কথা প্রসঙ্গে তিনি হেসে হেসে বললেন- বনভন্তের ধ্যান কুঠিরের বারান্দায় টিন দিচ্ছি। তিনি পুনরায় বললেন- টাকা 'কে দিয়েছে জানেন? আমি বললাম- জানি না। তিনি বললেন- সেই টাকা কোন লোকে দেয়নি। দেবতার দেওয়া টাকা আমি আশ্চয্যন্বিত হয়ে বললাম- কি করে পেয়েছেন, আমাকে খুলে বলুন? তিনি বিবরণ দিয়ে বলেন-

চারিখং এর জনৈক লোক সন্ধ্যার সময় তার ঘরে বসে আছে। এমন সময় নাম ধরে তাকে জনৈক ব্যক্তি ডাকল। গিয়ে দেখে পাড়ার অপর প্রান্তের বাড়ীর এক বৃদ্ধ লোক। জিজ্ঞেস করার পর বলল- তোমার উপর দয়াপরবশ হয়ে আসলাম। এখানে কিছু টাকা আছে। টুকরো কাপড়ে পুটলি বাঁধা কতকগুলি টাকা দিয়ে বলল- তোমার জন্যে টাকাগুলি এনেছি, নাও। প্রয়োজনবোধে খরচ করতে পারবে। কিন্তু এ টাকাগুলি কুপথে খরচ করতে পারবে না। শুধু এই বলে বৃদ্ধলোকটি চলে গেল। কিছুদিন পর জমা টাকার কথা মনে পড়ল। প্রয়োজনে কিছু কিছু খরচ করার পরও দেখা গেল আগের পুটলিই অটুট রয়ে যায়। আরও কিছুদিন পর বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন নিয়ে জাকজমকের সাথে খরচ করতে করতে মদ ও মুরগী কেটে খেতে লাগল। হঠাৎ একবার ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক চিকিৎসা করার পরও রোগের কোন উন্নতি দেখা গেল না। পরিশেষে চিন্তা করল- এ টাকাগুলি বোধ হয় লুটের বা অসৎ উপায়ের টাকা হবে। তা নাহলে এ রকম সাংঘাতিক অসুখের কারন কি? এই মনে করে আত্মীয় স্বজনদের নিকট রহস্যের কথা প্রকাশ করল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, যার টাকা তাকে অবশিষ্ট টাকাগুলি ফেরৎ দেওয়া দরকার। একদিন উক্ত বৃদ্ধ লোককে

ডেকে এনে টাকাগুলি ফেরত দিতে চাইলে সে অস্বীকার করে বলল- আমি কোনদিন তোমাদের বাড়ীতে আসিনি বা টাকাও দিইনি। বৃদ্ধ টাকা না নিয়ে চলে যাওয়ায় ঐ ব্যক্তির মনে অসন্তোষ দেখা দিল।

পরিশেষে ঐ ব্যক্তি সেই পুটলি বাঁধা টাকাগুলি নিয়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করার পর বনভন্তে বললেন- তুমি সেই বৃদ্ধ লোককে দোষারূপ করিও না। সে তোমাকে টাকা দেয়নি। তার ছদ্মবেশে তোমার কোন পরমআত্মীয় দেবতা সাহায্য স্বরূপ টাকাগুলি দিয়েছে। দেবতার কথামত কাজ করলেও টাকাগুলি নিঃশেষ হত না। অনেক সময় দেবতারাও সাহায্য করে।

অতঃপর উক্ত টাকাগুলি বাবু লগ্নকুমার কারিগরের হাতে দিয়ে চারিখং এর ঐ লোক চলে গেল এবং ঐ টাকা দিয়ে বনভন্তের ধ্যান কুঠিরের বারান্দার টিনের ছাউনী দেওয়ার কাজ হয়েছে।

- o -

জ্ঞানীরা বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর দেশনার পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান, জাতিস্মর জ্ঞান, দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান ও বিভিন্ন ঋদ্ধির কথা বহুবার উল্লেখ করেছেন। এগুলি হলো লৌকিক। তাদিয়ে মানুষ সহজে মুক্তি পায় না। আসবক্ষয় জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। মানুষ সর্বদুঃখ থেকে মুক্তি পায়।

একবার শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হতে ঋদ্ধি শক্তি দেখার জন্যে আমার মনে আকাঙ্খা উদয় হলো। তা খুব আগ্রহের সহিত প্রকাশ করলাম। তিনি সরাসরি বলে দিলেন এগুলি তেমন কিছু নয়। যে কেউ চেষ্টা করলে দেখাতে পারে। এমনকি তুমিও পারবে লৌকিক জিনিষ। ভূত, প্রেত, যক্ষ ও সাধারণ সাধকেরও ঋদ্ধি থাকে। তবুও আমি বিভিন্ন সময়ে সুযোগ পেলেই ঋদ্ধির কথা উত্থাপন করি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপমা দিয়ে তিনি আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করেন।

আর একদিন ঋদ্ধির কথা উত্থাপন করলে তিনি আমাকে যাদু বিদ্যা দেখার জন্যে নির্দেশ দেন। আমি জীবনে বহুবার যাদু বিদ্যা দেখেছি। তবুও বনভন্তের নির্দেশানুসারে প্রথমে হিপনোটিজম বা সম্মোহনী বিদ্যা দেখেছি। ক্রমান্বয়ে যাদু বিদ্যা দেখতে দেখতে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ যাদুকর জুয়েলআইচের যাদু বিদ্যাও দেখেছি। মানুষ কেঁটে টুকরো টুকরো করে আবার জোড়া লাগাতেও দেখেছি। এমনকি শূন্যের উপর ভাসমান অবস্থায় থাকা প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য যাদুও দেখেছি। তবুও আমার মনের তৃপ্তি মিটলোনা।

কালক্রমে মনের আশা-আকাঙ্খা পূরন করার জন্যে এক কৌশল অবলম্বন করি। একদিন অষ্টশীল পালনকারী উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি আমার মনের অভিলাষের কথা প্রকাশ করিলাম। তাতে তাঁরা উৎফুল্ল চিত্তে ঋদ্ধি দেখার জন্যে উৎগ্রীব হয়ে পড়েন। কোন এক উপোসথের দিন ধার্য করা গেল। দেখা দেল সেদিন অন্যান্য দিনের তুলনায় উপোসথ পালনকারীর সংখ্যা বেশী ছিল। তৎমধ্যে পরলোকগত বাবু জ্যোর্তিময় চাক্‌মা, বাবু সত্যব্রত বড়ুয়া, ডাঃ চিত্ত রঞ্জন চাক্‌মা, উপাসিকা ধনার মা, সোনার মা প্রভৃতি।

রাত যখন ১১টা তখন ঘুমানোর সময়। সবার ঈশারা পেয়ে আমি শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট ঋদ্ধির কথা পূনঃ ব্যক্তি করি। সঙ্গে সঙ্গেই সবাই আমার প্রস্তাবের সমর্থন জানালেন। বনভন্তে একটু একটু হাসেন। আমি মনে করলাম আজ বোধ হয় আমার আশা-আকাঙ্খার পরিসমাপ্তি ঘটবে। একটু পরে তিনি বললেন- তোমরা মন দিয়ে শোন। ভগবান বুদ্ধের সময়ে দ্বিতীয় মহাশ্রাবক মহামুদগলায়ন ঋদ্ধি শক্তির দ্বারা স্বর্গলোক, ব্রহ্ম লোক, নরকলোক ও মনুষ্যলোক মুহূর্তের মধ্যে পরিভ্রমণ করে মানুষের সুখ ও দুঃখ সম্বন্ধে দেশনাকরতেন। তাতে মানুষ শ্রদ্ধান্বিত হয়ে মার্গফল লাভ করত। মানুষের বিপুল হিতসুখ সাধিত হত। অন্যদিকে দেখা যায় জনৈক শ্রেষ্ঠীর পুত্র দানীয় সামগ্রী একটা বড় বাঁশের আগায় বেঁধে রেখেছিল। বাঁশের গোড়ায় লিখা আছে যার ঋদ্ধিশক্তি আছে তিনিই এ দানীয় সামগ্রীর অধিকারী হবেন। এদিকে জনৈক ভিক্ষু পিন্ডাচরন করতে গিয়ে উক্ত লিখা চোখে পড়ে যায়। তিনি উপরদিকে হাত বাড়ানোর সাথে সাথেই উক্ত দানীয় সামগ্রী তাঁর হাতে চলে আসে এবং শ্রেষ্ঠী পুত্রের বাহবা পেয়ে চলে যান। এ

খবর স্বয়ং সম্যক সম্বুদ্ধ শোনার পর উক্ত ভিক্ষুকে ডেকে তিরষ্কার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই ভবিষ্যতে এরকম হীন ঋদ্ধি প্রদর্শন না করার জন্যে নির্দেশ দেন। ঋদ্ধি শক্তি ক্ষেত্র ও উহার কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে যুক্তি প্রদর্শন করে তিনি আমাদের প্রতি দেশনা প্রদান করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা শুনে উপাসক-উপাসিকারা একে অপরের প্রতি নীরবে চেয়ে আছেন।

একটু পরে তিনি বললেন- এবার একটা গল্প শোন। কোন এক গ্রামে ধনশালী এক গৃহী আছে। জায়গা-জমি, টাক-পয়সা প্রভৃতি দিয়ে তার কোন অভাব নেই। সে চিন্তা করল তার অবর্তমানে উক্ত পরিবার রক্ষা করার প্রয়োজন। সুতরাং ছেলেকে গৃহস্থ কাজে নিয়োজিত করল। কিন্তু তার ছেলে কাজে কর্মে তত মনোযোগী নহে। তবু তাগিদা দিয়ে শিখতে লাগল। কোন একদিন ছেলেকে বলল- তুমি বীজ ধানগুলি নিয়ে জমিনে বপন করে আস। ছেলে তার পিতার আদেশে গরুসহ জমিনে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথিমধ্যে চোখে পড়ল কঁউগুলা (বনজ ফল) গাছ (বনজ টক ফল)। কোন চিন্তা না করেই গাছের গোড়ায় বীজধান রেখে গাছে উঠে কঁউগুলা খেতে লাগল। ওদিকে তার বীজধান খেয়ে গরুগুলি অন্যত্র চড়ছে। কিছুক্ষন পর দেখল তার বীজধান গুলিও নেই এবং গরুগুলিও নেই। এগুলি বপন করতে পারলে চারা হতো। চারাগুলি আবার রোপন করতে হতো। সেগুলি ধান হতো। সেই ধান গোলায় আসতো। খাওয়ার কোন অভাব থাকতো না। ঠিক তেমনি আমি হলাম সেই গৃহস্থ, উক্ত ছেলে হলো অরবিন্দ, বীজ ধান হলো শ্রদ্ধা এবং কঁউগুলা হলো সেই ঋদ্ধি। এ গল।পটি বলার সাথে সাথেই উপাসক-উপাসিকাদের মধ্যে হাসির জোয়ার বয়ে গেল। জনৈক উপাসক বললেন- তাহলে আমরা একই পথের পথিক। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হেসে হেসে বললেন- তা ঠিক। আবার হাসির জোয়ার বয়ে যাওয়ার পর তিনি বললেন- তোমরা খুব মনোযোগের সহিত শোন। বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্য হল নির্বান লাভ। প্রথমেই শ্রদ্ধারূপ বীজ বপন করতে হবে। ক্রমান্বয়ে চারি মার্গ, চারিফল ও নির্বান প্রত্যক্ষ করতে হবে। এগুলিকে বলে নবলোকোত্তর ধর্ম। সেগুলি গ্রহন, ধারণ ও পালন করলে বিপুল সুখের অধিকারী হবে। তিনি উপসংহারে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- জ্ঞানীরা বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

বনভন্তের দিকে তাকাতে পারি না

টাউন রেশনিং অফিসার জনাব শফিকুর রহমান প্রায় আমার দোকানে আসতেন। অবসর সময়ে মধ্যে মধ্যে আমরা বিভিন্ন আলাপ আলোচনা করতাম। পাকিস্তান আমলে তিনি করাচীতে ছিলেন। সেখানে এক কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তাঁর বড় ভাই মোহাম্মদ মুছা মিঞা চামড়ার ব্যবসা করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর উভয়ে ময়মনসিংহে চলে আসেন। তিনি বাড়ীর পাশে এক কলেজে অধ্যক্ষ হন। বি. সি. এস. পাশ করার পর রাঙ্গামাটি টাউন রেপিনিং অফিসার হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর বড় ভাই মোহাম্মদ মুছা মিঞা বৃদ্ধ বয়সে নির্জন কবরস্থানে ভাবনা করতেন। শুধু দুপুর বেলা আহার করতেন। ছোট্ট এক কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। স্নান করার জন্যে এক সপ্তাহ পর পর বাড়ীতে আসতেন। বাড়ী হতে ভাত ও পানি সরবরাহ করা হতো।

একদিন সকালবেলা হঠাৎ এসে তিনি আমাকে বললেন- দাদা, আমার বড় ভাই ফকির সাহেব এসেছেন। তিনি বাসায়ও থাকেননা।, হোটেলেও থাকেননা। আমার অফিসেই থাকেন। তিনি ধ্যান অবস্থায় রাঙ্গামাটির দৃশ্য দেখেই চলে আসছেন। সঙ্গে একজন স্থানীয় সওদাগর আছেন। গতরাত ধ্যানে কোন এক সাধকের ছবি দেখেছেন। তিনি ওখানে যাওয়ার খুব উদগ্রীব। বনভন্তের নাম শুনেছি তিনি কি সাধক? আমি হেসে হেসে বললাম- সাধকই বটে। তিনি বনে সাধনা করতেন বলে বনভন্তে তাঁর অপর নাম সাধনানন্দ মহাস্থবির। কিছুক্ষন পর উক্ত ফকিরকে নিয়ে আমার দোকানে উপস্থিত হন। গাড়ী ভাড়ার টাকা দিয়ে বললেন- দাদা, অনুগ্রহ করে তাদেরকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসেন।

সেদিন উপাসক-উপাসিকাদের তত ভীড় ছিল না। তাতে আমি খুব খুশী হলাম। কারন আলাপ করতে সুযোগ হবে। পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বললাম- ভন্তে, ফকির সাহেব আপনার সাথে একটু আলাপ করতে চান। প্রথমেই ফকির সাহেব বললেন- ভন্তে, আমি ধ্যানে নানারকম বিভীষিকা, ছবির দৃশ্য ও মধু পোকার মত দেখি কেন? বনভন্তে বললেন- মানুষ রাস্তা দিয়ে চললে অনায়াসে তার গন্তব্যস্থলে যেতে পারে। কিন্তু রাস্তা ছেড়ে উচু-নীচু, কাঁটাবন ও কষ্টকর জায়গায় চললে সহজে তার গন্তব্যস্থানে যেতে পারে না। তোমারও সে রকম অবস্থা হয়েছে। বনভন্তে

ফকির সাহেবকে আবার প্রশ্ন করলেন- আপনি কিভাবে ধ্যান করেন? ফকির সাহেব বললেন- হাটুপিছন দিকে ঘুরিয়ে, মাথা ডান দিকে নুইয়ে "আল্লাহ হু, আল্লাহ হু" জিকির করি। বনভন্তে আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন- এ ধ্যান কি রকম জান? আমি বললাম- না, ভন্তে। এটা বৌদ্ধ মতে আনাপান বা উদয়-ব্যয় ধ্যান। শ্বাস প্রশ্বাসের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। শমথ ধ্যানের পর্যায়ভুক্ত। এধ্যান করার আগে কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা ও মৈত্রী ভাবনা করতে হয়। এগুলি পূর্ণ হলে আনাপান বা উদয় ব্যয় ভাবনা করা সহজ হয়। হঠাৎ কেহ কৃতকার্য হতে পারে না।

তিনি একটা উদাহরণ দিয়ে বলেন- বনের মধ্যে যারা গাছ-বাঁশ কাটে তারা আধুনিক ধরনের ম্যাচ ও বিড়ি-সিগারেট রাখে। যখন প্রয়োজন তখন ধুমপান করে থাকে। কিন্তু আগের দিনে তারা কি করত জান? তাদের সঙ্গে কোন আগুন জ্বালানোর জিনিষ থাকতো না। শুধু থাকতো তামাক আর বাঁশের ডাবা বা হুক্কা। তামাক সেবনের প্রয়োজন হলে তাঁরা বাঁশের বেত জোগাড় করতো। সে বেত দিয়ে বিরতিহীনভাবে ঘর্ষন করতো। কিছুক্ষন ঘর্ষনের ফলে আগুনের উৎপত্তি হতো। সে আগুন হতে তারা তামাক সেবন করতো ঠিক তেমনি আনাপান বা উদয় ব্যয় ভাবনা যারা করে তারা শ্বাস প্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে পঞ্চম ধ্যানে পর্যন্ত উঠতে পারে। ধ্যানের পদ্ধতি আরো বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ফকির সাহেবের দিকে সম্বোধন করে বলেন- আপনি যদি কায়গতানু স্মৃতি ও মৈত্রী ভাবনা করেন, তবে আপনি যেটা ভাবনা করতেছেন সেটা অতি সহজ হবে। সঙ্গে সঙ্গেই ফকির সাহেব বললেন- ভন্তে, অনুগ্রহ করে একটু শিখায়ে দিলে খুবই উপকৃত হব। কাগজ কলম দিয়ে আমাকে বললেন- আমি বলি, তুমি লিখ। কায়গতানুস্মৃতি, ভাবনা খুবই সহজ ও সংক্ষেপভাবে ব্যাখ্যাও করে দিলেন। মৈত্রী ভাবনা শুধু ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। লিখিত ভাবে দেননি।

তিনি বলেন- এ দু'টো আয়ত্ব করেন আপনার আগের ভাবনাটি করিবেন। কিন্তু একটা কাজ করিবেন আপনার কুঁড়ে ঘরে ভাবনা করিবেন। খোলা আকাশের নীচে করিবেন। আপনি যেভাবে বসেন সেভাবে বসিবেন না। পদ্মাসনে বসিবেদন। ঘাড় ও মেরুদন্ড সোজা রাখিবেন। তাতে আপনার ধ্যান তাড়াতাড়ি সফল হবে। তিনি পদ্মাসনে কিভাবে ধ্যান করে তা বুঝিয়ে দিলেন।

এদিকে বেলা ১১ টায় বনভন্তের ভোজনের সময় হলে তিনি ভোজন শালায় যান। আমরা দেশনালয়ে বনভন্তের জন্যে অপেক্ষা করছি। ভোজনের পর ফকির সাহের বললেন- ভন্তে, আপনার ধ্যানের পদ্ধতিগুলি এখানে শিখিতে চাই। আমার খাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। ভাই এর বাসা হতে সরবরাহ করবে। অনুগ্রহ করে অনুমতি পেলেই আমি খুবই ধন্য হব। অতঃপর বনভন্তে বললেন- তুমি যেখানে ভাবনা কর, সেখানেই পুনরায় আরম্ভ কর। এখানে তোমার জন্যে নানাবিধ অন্তরায় আছে। বনভন্তে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন- এবার তোমরা যেতে পার। আমি ফকির সাহেবকে বললাম- খাওয়ার সময় হয়েছে, চলে গেলে ভাল হয়। অবশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হতে বিদায় নিয়ে খালের ঘাটে চলে আসি।

এতক্ষন যে শিরোনামের জন্য অবতারনা করছি তা ব্যক্ত করছি। বড় রহস্যের ব্যাপার হলো ফকির যখন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সঙ্গে আলাপে রত থাকেন তখন তিনি মাথা নীচু করে আলাপ করেন। মধ্যে মধ্যে বনভন্তে বলেন- "হে ফকির, এদিকে দেখুন"। কিন্তু ফকির সাহেব মাথা একটু তুলে আবার মাথা নীচু করে কথা বলতে থাকেন। এ ব্যাপারে আমি বিরক্ত মনে করতাম। যখন আমরা নৌকায় পারাপারের জন্য বসি তখন ফকির সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম- আপনি বনভন্তের সাথে আলাপ করার সময় মাথা নীচু করে কথা বলেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন- ডাক্তার বাবু, "বনভন্তের দিকে আমি তাকাতে পারি না"। আমি বললাম- কেন? তিনি বললেন- অতি আশ্চর্য্যের বিষয়। বনভন্তে হতে এক উজ্জ্বল আলো বাহির হয়। ওদিকে তাকালে আমার চোখ ঝলসিয়ে যায়। ফকির সাহেবের বর্ণনা শুনে আমি হতবাক হয়ে নৌকায় বসে রইলাম।

বর্তমানে তিনি ধ্যানে বেশ উন্নতি লাভ করেছেন। প্রথমে তাঁর সাথে পত্রে যোগাযোগ ছিল। এখন লোক দ্বারা যোগাযোগ হয়। নানাবিধ অলৌকিক শক্তি, (ঋদ্ধি), দিব্যচক্ষু ও পরচিত্ত বিজানন জ্ঞান লাভ করেছেন। তিনি অনেক শিষ্য উপযুক্ত করেছেন। তাঁর সংস্পর্শে গেলেই লোকের মনের অবস্থা বলে দিতে পারেন। আমার জানা মতে দুইজন লোকেরও প্রমান পেয়েছি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এরকম আলোময় ঋদ্ধি আমি কখনো দেখিনি। ফকির সাহেবের মুখে শুনে চিত্তে প্রসন্নতা অর্জন করলাম।

- সমাপ্ত -

রাজবন বিহার এলাকার বিদ্যুতায়নে বৈদ্যুতিক খুঁটির প্রসংগে

এক সময় রাঙ্গামাটিতে জনসাধারনের নিরাপত্তা ও শান্তি শৃঙ্খলার জন্যে প্রত্যেকের স্থানীয় অবস্থান তালিকা ও পরিচয় পত্রের প্রয়োজন হয়েছিল। আমাদের প্রায় সময় গাড়ীতে পরিচয় পত্র দেখাতে হতো।

একদিন দুইজন সামরিক বাহিনীর সিপাই রাজবন বিহারে উপস্থিত হন। তাঁরা শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রতি বিহারে ভিক্ষু শ্রমনেদের অবস্থান তালিকা দেয়ার জন্যে অনুরোধ জানালেন তিনি সরাসরি বলে দিলেন- আপনারা ডাঃ হিমাংশু বিমল দেওয়ান হতে নিতে পারেন। দ্বিতীয়বার বলার পর তিনি বললেন- হঠাৎ কি জন্যে?। একজন সিপাই একটু হেসে বললেন- ভন্তে, সাহায্য দেয়ার জন্যে। বনভন্তে পিছন দিকে বৈদ্যুতিক খুঁটি দেখায়ে বলেন- সাহার্য্য দিলে এ খুটিগুলি ষ্টীলের দিয়ে দিন। প্রতি বৎসর কাঠের খুঁটি উইপোকায় খেয়ে ফেলে।

কিছুদিন পর রাজবন বিহারে কয়েকজন সামরিক বাহিনীর লোক আসেন। বনভন্তে তাদেরকে দেখেই বললেন- খুঁটি এনেছেন? হঠাৎ করে এ কথা বলায় তাঁরা অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। আবার তিনি বললেন- আপনাদের দুইজন লোক সাহায্য দেয়ার জন্যে বন বিহারের ভিক্ষু শ্রমনদের তালিকা নিয়েছেন। জনৈক লোক বললেন- ভন্তে, তা আমরা জানিনা। এভাবে যে কোন সময় সামরিক বাহিনীর লোক বন বিহারে আসলেই খুঁটির কথা উত্থাপন করেন। তাঁরা জানিনা বললেই বনভন্তে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেন। আরো বলেন- কথা আর কাজে ঠিক থাকা দরকার। সাহায্যের জন্যে আপনাদের নিকট কেউ আবেদন করেনি। বনভন্তের এ কথা সামরিক বাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে একদিন জনৈক ক্যাপ্টেন বন বিহারে আসেন। ক্যাপ্টেন সাহেবকে দেখার সাথে সাথেই বনভন্তে জিজ্ঞাসা করলেন- খুঁটি এনেছেন? তিনি হেসে হেসে বললেন- ভন্তে, কি ব্যাপার তা জানতে এসেছি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ক্যাপ্টেন সাহেবকে পুনরায় প্রকাশ করলেন। তাতে তিনি সম্পূর্ণ ঘটনা মাননীয় ব্রিগেড কমান্ডার কর্ণেল ইব্রাহিমকে অবহিত করেন। শেষ পর্যন্ত তদন্ত করে দেখা গেল প্রথমেই ভুল বশতঃ সাহায্যের কথা বলা হয়েছে।

একদিন ব্রিগেড কমান্ডার মহোদয় চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায়কে টেলিফোনে এ ব্যাপারে অবহিত করেন। রাজাবাবু এ ঘটনা শুনে বললেন- বন বিহারে যদি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এরশাদ আসেন তাঁকেও মিথ্যাবাদী বলবেন। সামান্য ব্যাপারে খুব গুরুতর আকার ধারণ করায় উভয়ে বন বিহারে উপস্থিত হন। রাজাবাবুকে দেখেই বনভন্তে খুঁটির কথা উত্থাপন করেন। তিনি বললেন- সে ব্যাপারেই ব্রিগেড কমান্ডার সাহেবকে নিয়ে এসেছি।

ব্রিগেড কমান্ডার মহোদয় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের পারমার্থিক ধর্মদেশনা শুনে চিত্তে খুবই প্রসন্নতা অর্জন করলেন। মাত্র কয়েকটি খুঁটির পরিবর্তে সমস্ত ষ্টীলের খুঁটি দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। প্রায় বিশ একর জায়গায় বিদ্যুতায়ন এবং চারটি পাকা পায়খানা নির্মাণ করেন। তাতে খরচ হয় প্রায় ৮ লক্ষ টাকা। তিনি ব্যক্তিগতভাবে বনভন্তের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে অনেক জিনিষ দান করতেন। তিনি যখন খাগড়াছড়িতে বদলী হন তখন সেখানকার বিশিষ্ট উপাসক দ্বারা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মধ্যে মধ্যে তিনি ব্যক্তিগতভাবে রাঙ্গামাটি এসে বনভন্তের সহিত সৌজন্য মূলক সাক্ষাত করতেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আশীর্বাদ নিয়ে তিনি উচ্চতর ট্রেনিং এর জন্যে আমেরিকা যাত্রা করেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

শীলরূপ কাপড় পরিধান কর

১১-৩-৯৩ ইং রোজ বৃহস্পতিবার রাঙ্গামাটির শিক্ষিত চাক্‌মা অধ্যুষিত স্থান ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী। তথায় আয়োজন করা হয় অষ্ট পরিষ্কার ও সংঘদান। উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এবং তাঁর শিষ্যমন্ডলী। রাঙ্গামাটির প্রায় গন্যমান্য ব্যক্তি ও এ মহতী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

শীল গ্রহণ করে প্রথমে অষ্ট পরিষ্কার দান ও সংঘদান সম্পন্ন হয়। ভিক্ষু সংঘের ভোজনের পূর্বে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এক নাতিদীর্ঘ তাৎপর্যপূর্ণ দেশনা প্রদান করেন। দেশনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন- আজ তোমাদের নিকট এক

ব্রিটিশ আমলের ঘটনা শোনাব। জনৈক ইউরোপিয়ান সাহেব শুনতে পেলেন কুকীরা কাপড় পরিধান করেনা। অথবা কেউ কেউ লেংটি পরিধান করে। তিনি তাদের প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে কতকগুলি পেন্ট-শার্ট নিয়ে যান। তিনি প্রথমে কুকীদেরকে দেখেই লজ্জাবোধ করলেন। কেননা সবায় উলঙ্গ। শুধু তিনিই কাপড় পরিধান করা ব্যক্তি। সাহেবের লজ্জা লাগলে কি হবে? তাদের কোন লজ্জা-শরম নেই। তিনি তাদের প্রতি পেন্ট-শার্ট বিতরণ করলেন। কেউ কেউ অসুবিধা বোধ করে খুলে ফেললো। কেউ কেউ মধ্যে মধ্যে পরিধান করে। উক্ত সাহেব তাদের প্রতি ধর্ম প্রচার ও কাপড় পরিধান করতে শিখাতে লাগলেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সে এলাকায় একজন লোকও কাপড় পরিধান করেনা। এমন কি তাদের রাজা সে অবস্থায় দিন কাটায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ব্রিটিশ আমলের ঘটনা বলার পর বললেন- আজ এখানে আমিও কুকী পাড়ায় ইউরোপিয়ান সাহেব এসেছি। একথা বলার সাথে সাথেই আমরা সমস্বরে হেসে উঠলাম। আমরা হাসতে দেখেই তিনি বললেন- এটা কতটুকু সত্য কথা তোমরা বল? কেউ কেউ বললেন- ভন্তে এটা সম্পূর্ণ সত্য। বনভন্তের দেশনা চলাকালে কাহারো কাহারো হাসির ঢেউ বন্ধ হচ্ছে না। অন্যদিকে লক্ষ্য করা গেল- মানুষ যত বলবান হোকনা কেন ফোড়ায় চাপ পড়লে চেহারায় বিষাদের ছবি নেমে আসে। ঠিক তেমনি কাহারো কাহারো চেহারায় ঘনকালো মেঘ নেমে এল। তিনি দেশনায় বলেন- গরু বা পশু পক্ষী মদ খায়? উপাসকেরা বললেন- না, ভন্তে বললেন- মানুষ মদ খায় ঠিকই। কিন্তু মানুষ মরে পশুপক্ষী হয়ে আসলে আর খেতে পারবে না। ইহজীবনে যত পারে তত খেয়ে নেয়। জৈনেক মদ্যপায়ী উপাসকের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- তুমি বৃদ্ধ হয়েছ। এখনও সময় আছে। মানুষ ভুল করে। কিন্তু সংশোধন করা যায়। "শীলরূপ কাপড় পরিধান কর"। আজকে শীল গ্রহণ করেছ তা কুকীদের মত ফেলে দিও না। উক্ত সাহেব খৃষ্টান ধর্ম প্রচার ও কাপড় বিতরণ করেছিলেন। আর আমি নির্বান ধর্ম প্রচার ও শীলরূপ কাপড় বিতরণ করতেছি। লজ্জা-শরম কি জান? তাহল পাপের প্রতি লজ্জা। পাপের প্রতি লজ্জা না থাকলে কেউ মুক্ত হতে পারবে না। মুক্ত হওয়ার জন্যে সচেষ্ট হও।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পুনরায় দেশনা প্রসঙ্গে বলেন- পূর্বেকারদিনে বা ভগবান বুদ্ধের সময়ে উপাসক-উপাসিকারা শীল গ্রহণ করে নির্বান ধর্ম পালন করত এবং মার্গফল লাভ করে পরম বিমুক্তি সুখ প্রত্যক্ষ করত। কিন্তু বর্তমানে

কোন ফল লাভ হচ্ছে না কেন? একমাত্র কারন হচ্ছে শীলরূপ কাপড় পরিধান করছেনা।

শীলরূপ বস্ত্র পড় অন্যথায় নয়।
ধ্যান প্রজ্ঞা পূর্ণ হলে তম তৃষ্ণা ক্ষয়।।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

দশবিধ বন্ধন ছিন্ন করে কাম, মার ও আত্মজয় কর

আজ ২৭শে ডিসেম্বর '৯৩ ইং রাত ৮টা। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপোসথ পালনকারীদের প্রতি ধর্মদেশনা দিচ্ছিলেন। এমন সময় জনৈক যুবক ভিক্ষু কাঁদতে কাঁদতে বন্দনা করলেন। বনভন্তে জিজ্ঞাসা করলেন। কি হলো তোমার? কোন অসুখ হয়েছে নাকি? অন্য ভিক্ষু বললেন- ভন্তে, তার ভাই এসেছে। তাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হচ্ছে।

এবার আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- সে প্রথমেই পরীক্ষায় ফেল করে ফেললো। নির্বান লাভ করার আগে কি কাজ করতে হবে জান? প্রথমেই দশবিধ বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। দশবিধ বন্ধন হল- মা, বাপ, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আধিপত্য, লাভ-সৎকার ও দেশ। এগুলির মায়া-মমতা ত্যাগ করা মহা কঠিন ব্যাপার। তিনি নিজেকে উদাহরণ দিয়ে বলেন- আমি যদি এগুলি ছিন্ন না করতাম আজকে তোমাদের মধ্যে এমন থাকতাম না। অন্যান্য লোকের মত নানাবিধ দুঃখ কষ্টের মধ্যে কাল যাপন করতে হতো।

ভগবান বুদ্ধ শাক্য রাজ্যের সিংহাসন, বিপুল ধন, ঐশ্বর্য, মায়ার বন্ধন রাহুল ও গোপাকে ছেড়ে নির্বানের পথে ধাবিত হয়েছিলেন। এগুলিকে তুচ্ছ, হীন, দুঃখ ও শুধু অসার মনে করেছিলেন।

দশবিধ বন্ধন ছিন্ন করলে শুধু চুপ করে বসে থাকলে হবে না। কামজয় করতে হবে। কামজয়ের মধ্যে প্রথমে নারীর প্রতি আসক্তি ত্যাগ। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চ ইন্দ্রিয় সংযম করতে হবে। রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শের প্রতি সর্বদা অনাসক্তভাবে থাকতে হবে। তিনি জোড় দিয়ে বলেন- নারী-পুরুষ ও

পঞ্চকাম হতে অনন্ত দুঃখের সৃষ্টি হয়। সামান্য ইতর প্রাণী হতে দেব ব্রহ্ম পর্যন্ত হয়। আবার দেব ব্রহ্মা হতে নীচতর প্রাণী হওয়া কত যে দুঃখ কষ্ট সহিতে হয় তার কোন পরিসমাপ্তি নেই। কামজয় হলে মুক্তির পথ আরো একটু সুগম হয়।

পাঁচ প্রকার মার- ক্লেশমার, স্কন্ধমার, অভিসংস্কার মার, মৃত্যুমার ও দেবপুত্র মার। এগুলিকে জয় করতে না পারলে মুক্তির পথ বন্ধ থাকে। দেবপুত্র মার সম্বন্ধে তিনি নাটকীয় ভঙ্গিমায় বলেন- "হে সিদ্ধার্থ, মায়ার বন্ধন রাহুল- গোপাকে ফেলে তুমি চোরের মত পালিয়ে এসেছ"। পুনরায় ফিরে যাও বাড়ীতে।" দেবপুত্র মার স্বয়ং সম্যক সম্বুদ্ধকে পর্যন্ত বিভিন্ন বাঁধার সৃষ্টি করেছিল। অন্যলোকের কথায় বাকি?

তিনি বলেন- নিজকে যে জয় করেছে সেই প্রকৃত জয়ী। নিজ কি? আমি কি? কেউ কেউ বলে রামচন্দ্র শ্যামচন্দ্র প্রভৃতি থেকে নিজ বা আমি'র উৎপত্তি। কেউ কেউ বলে রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার, বিজ্ঞান হতে নিজ বা আমি'র উৎপত্তি। সাধারণের মতে আমি সত্য, স্থায়ী ও ধ্বংস হয় না। জন্মে জন্মে ঘুরে ঘুরে থেকে যায়। তাদের মতে এগুলিকে আত্মাও বলে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- এগুলির সমন্বয়ে নিজ, আমি ও আত্মার সৃষ্টি হয়। তা কিছু নয়। যেখানে আমি'র উৎপত্তি সেখানে অহংকারের (মান) উৎপত্তি, মান উৎপত্তি হলে ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান উৎপত্তি হয় না। তারা জন্মান্ধ। জন্মান্ধ ব্যক্তি যা ধারনা করে তা মুখে ব্যক্ত করে। তা আবার সত্যেও পরিণত করতে চায়।

মান সাধারণতঃ তিন প্রকার। আমি শ্রেষ্ঠ, আমি সমান ও আমি অধম। আবার এগুলিকে তিনগুন করলে নয় প্রকার হয়। এ নয় প্রকার মান এর জন্যে মানুষ জন্মে জন্মে মুক্তি পায় না।

তিনি দেশনায় বলেন- এগুলি আমি নয়, আমার নয় ও আমার আত্মাও নয়। শুধু ভ্রান্ত ধারণা। অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম ছাড়া আর কিছু নয়। এমান অনাগামী পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে। অতএব মান জয় করাই প্রকৃত জয় ও পরম সুখ।

তিনি উপসংহারে বলেন- মনুষ্য জন্মে যে দু'টির মধ্যে একটি লাভ করতে পারবেনা তার জন্ম বৃথা। প্রথমটি হল বুদ্ধ অথবা বুদ্ধের প্রতিনিধির সাক্ষাত লাভ এবং অন্যটি হল চারিআর্যসত্য লাভ।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

মৃত্যুর পর সব বিলীন হয়ে যায়

কোন একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর ধ্যান কুঠিরের বারান্দায় (মাটির ঘর) উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে দেশনা দিচ্ছিলেন। সে সময় কয়েকজন উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত হন। আগত উপাসক-উপাসিকাদের জিজ্ঞাসা করলেন- আপনারা কোথা হতে এসেছেন। জনৈক উপাসক (বাবু দিলীপ চৌধুরী) ভন্তে, আমরা তবলছড়ি বাজার হতে এসেছি। অন্য একজন উপাসক (বড়ুয়া) পরিচয় দিয়ে বলল- ভন্তে, তারা হিন্দু। হিন্দু শব্দটি বলার সাথে সাথেই উক্ত উপাসককে জোর দিয়ে বললেন- এগুলি বল কেন? তুমি মরে গেলে বড়ুয়া থাকবে? তারা মরে গেলে হিন্দু থাকবে? হিন্দু, বড়ুয়া, চাক্‌মা, মারমা, মুসলমান প্রভৃতি মৃত্যুর পর সব বিলীন হয়ে যায়। যেমন ধর, তুমি আম, জাম, ভাত, তরকারী, মিষ্টি, পান প্রভৃতি খেয়ে কিসে পরিণত হয়? উপাসক-পায়খানা পরিণত হয়। ওখানে বিভিন্ন জিনিষ চেনা যায়? উপাসক-না ভন্তে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন গোত্রের মানুষও মরে গেলে চেনা যায় না। এগুলি হল নাম মাত্র, ব্যবহারিক সত্য। পারমার্থিকভাবে এগুলি কিছু নয়। গোত্র, বর্ণ, জাত প্রভৃতিতে কি উৎপন্ন হয় জান? উপাসক-না, ভন্তে। বনভন্তে- এগুলিতে উৎপন্ন হয় শুধু হিংসা, ঘৃণা ও স্বার্থপরতা। সেজন্যেই দেশের মধ্যে তথা সারা পৃথিবীতে যত হানাহানি, মারামারি, কাটাকাটি প্রভৃতি অসন্তোষের সৃষ্টি। একজন অপরজনকে হিংসার কারনে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে। একজন অপর জনকে ঘৃনার কারনে মিলেমিশে মৈত্রী ভাবাপন্ন হয়ে থাকতে পারে না। স্বার্থ ত্যাগ করা বড় কঠিন ব্যাপার। স্বার্থের জন্য একজন অন্যজনকে মেরে ফেলতেও পারে। হিংসা, ঘৃণা ও স্বার্থপরতা ত্যাগ করতে না পারলে কোনদিন শান্তি আসতে পারে না।

তিনি উপমা দিয়ে বলেন- এ রাঙ্গামাটি হ্রদের পানির মত হতে হবে। ওখানে বিভিন্ন নদী বা খালের পানির কোন পরিচয় নেই। ঠিক লোকোত্তরে নানা বর্ন, গোত্র ও জাতের পরিচয় নেই। শুধু আছে নামরূপ বা মাটি, পানি, আগুন ও বায়ু। এগুলি যতদিন দর্শন না হবে ততদিন ভবে ভবে বিভিন্ন দুঃখে পতিত হবে। বিভিন্ন দুঃখে জ্ঞান লাভ করতে হবে। যা দুঃখ আছে তা নিরোধ ও আছে। নিরোধ প্রত্যক্ষ করতে হবে। আবার দুঃখ নিরোধ করার উপায়ও আছে। তাহল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা। যতদিন পর্যন্ত নির্বান লাভ না

হবে ততদিন পর্যন্ত বিভিন্ন দুঃখের আবর্তে পতিত হবে। সুতরাং প্রত্যেকের নির্বান লাভ করার সচেষ্ট হওয়া একান্ত দরকার। নির্বানই পরম সুখ। পরিশেষে তিনি বর্ণ, গোত্র ও জাতকে আবরন বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন চোখের আবরন বা ছানি পড়লে ভালভাবে দেখা যায় না। অপসারণ করলে নিখুঁতভাবে দেখা যায়, ঠিক তেমনি বর্ণ, গোত্র জাত উচ্ছেদ করলে উচ্চতর জ্ঞান লাভ হয়। তাতে পরম সুখ নির্বান সাক্ষাৎ করা যায়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংক্ষিপ্ত দেশনায় বাবু দিলীপ চৌধুরী অত্যন্ত প্রীত হন ও শ্রদ্ধাভরে আমার নিকট প্রকাশ করেছেন।

-ঃ সমাপ্ত ঃ-

নির্বানের শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণ কর

আজ ১৮ই মার্চ ১৯৯৪ ইংরেজী। রোজ শুক্রবার। পাথরঘাটা সার্বজনীন সংঘদান ও অষ্ট পরিস্কার দান উপলক্ষে সশিষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শুভ আগমন।

সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগীত গেয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু মুরতি সেন চাক্মা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ ভৃগু ভিক্ষু।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উক্ত অনুষ্ঠানে ১০টা ৫ মিনিট হতে ১০টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ধর্ম দেশনা করেন। তাঁর দেশনার প্রারম্ভেই বলেন- বনভন্তে কতজন চাক্মাকে বুঝিয়েছেন? ইহার অর্থ হলো নির্বানের শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান সম্বন্ধে কতজনকে উপযুক্ত হিসাবে গড়ে তুলেছেন। বড়ুয়াদের মধ্যে একটা প্রশ্ন থাকবে বনভন্তে কতজন চাক্মাকে বুঝিয়েছেন বা উপযুক্ত করেছেন। চাক্মারা বনভন্তের সংস্পর্শে এসে যদি উপযুক্ততা লাভ করতে না পারে বড়ুয়ারা দূরে থেকে কোনদিন কৃর্তকার্য হতে পারবে না।

তিনি বলেন- প্রায় লোকে বলে থাকে বৌদ্ধ ধর্ম অত্যন্ত কঠিন ও দুঃখ। তা বুঝতে পারবেনা। তাহলে অত্যন্ত সোজা, সুখ হয় এবং সহজে বুঝতে পারে মত বুঝিয়ে দিলে সুবিধা হবে। তার একমাত্র উপায় হলো নির্বানের

শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণ করতে হবে। শুধু বনভন্তে বললেই হবেনা। তোমাদের নিজে নিজেই দৃঢ়তার সাথে উদ্যোগ নিতে হবে।

তিনি নিজকে উদাহরণ দিয়ে বলেন- আমি প্রথম জীবন অক্লান্ত ও গভীর পরাক্রম দিয়ে নির্বানের শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণে গবেষণা করেছি। বর্তমানে ভিক্ষুরা পারতেছেনা কেন? একমাত্র কারণ হলো গভীর গবেষণা নেই।

তিনি উপমা দিয়ে বলেন- যেমন ধর, কোন এক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ভালভাবে অংক জানে না। সে কিভাবে তার ছাত্র-ছাত্রীকে অংক শিখাবে? শিক্ষক যেমন অদক্ষ ছাত্র-ছাত্রীও তেমন অদক্ষ থেকে যায়। বর্তমানে ঠিক যেমন ভিক্ষু ঠিক তেমন তাঁর শিষ্যরা। দক্ষ শিক্ষক যেমন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দক্ষতার আলোকে দক্ষ করে তোলে ঠিক তেমন দক্ষ ভিক্ষুর পরিচালনায় ভিক্ষু শ্রমণ ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে দক্ষ হিসাবে গড়ে তোলতে পারে।

তিনি আরও উদাহরণ দিয়ে বলেন- যারা পাহাড়ে, পর্বতে, ভূমিতে, জলাভূমিতে, কাঁটাবন প্রভৃতি স্থানে কঠোর পরিশ্রমে ভূমি জরিপ করে তাদেরকে কানুনগো বলে। যদি তারা বিনা পরিশ্রমে শুধু ঘরে বসে বসে অনুমানের উপর ভূমি জরিপ করে তাদের কর্তব্য যথাযথ হবেনা। অতঃপর তাদের মনে উদয় হলো কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীর উপর শিক্ষকতা করলে সমাজে উপকার হয়। কিন্তু কালক্রমে দেখা গেল সেখানে ও অদক্ষতার কারণে কৃতকার্য হলো না। তাতে উভয় দিকে নিন্দনীয় হয়।

দক্ষ ভিক্ষু হলো চারি আর্য্য সত্যের কানুনগো যেমন কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড়, পর্বত জরিপ করে তেমন দক্ষ ভিক্ষুও দক্ষতার পরিচয়ে চারি আর্য্যসত্য পুংখানুপুংখরূপে আয়ত্ব করতে সক্ষম হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- নির্বান অধিগত হলে সব ডিগ্রী অকেজো হয়ে যায়। এমন কি আজ কি বার, কি মাস পর্যন্ত বিস্মৃত হয়। তোমরা হীন মনুষ্যত্ব ত্যাগ কর। হীন তৃষ্ণা ত্যাগ কর। চারি আর্য্য সত্য জ্ঞান ও পটিচ্চ সমুপ্পাদ জ্ঞান আহরণ কর। জ্ঞান বলে উচ্চতা লাভ কর। বৌদ্ধ ধর্ম উচ্চ ও পরম সুখ। না জেনে, না বুঝে বৌদ্ধ ধর্ম অনুধাবন করতে পারেনা।

হিংসা মহাপাপ। হিংসায় শত্রুতা বাড়ে। তোমরা ভাল হয়ে যাও। উপযুক্ততা লাভ কর। তোমরা সব সময় আত্ম দমন করতে সচেষ্ট হও। চিত্ত

দমন ও ইন্দ্রিয় দমন কর। অসংযত ইন্দ্রিয় ও অসংযত চিত্ত যে কোন সময় বিপদে পড়ে। অসংযুত ইন্দ্রিয় ও চিত্ত মহাশত্রু। দমিত ইন্দ্রিয় ও দমিত চিত্ত পরম মিত্র ও মহাসুখ। নিজেও সর্ব দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারে। অপরকেও উদ্ধার বা মুক্ত করতে পারে। সুতরাং তোমরা নির্বানের শিক্ষা, উপদেশ ও জ্ঞান আহরণ কর।

সাধু - সাধু - সাধু

বনভন্তে চারি আর্য সত্যের ইঞ্জিনিয়ার

আজ ৭ই মার্চ ১৯৯৪ ইংরেজী। সোমবার রাজবন বিহার দেশনালয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক উপাসিকাদের প্রতি বলেন- বনভন্তে কি বলতে চায়? বনভন্তে বলতে চায় চারি আর্য সত্য সম্পর্কে। চারি আর্য সত্য কি? তা তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে চায়। বুঝিয়ে দিতে চায়। জানিয়ে দিতে চায়। প্রকাশ করিয়ে দিতে চায়। শিখিয়ে দিতে চায়।

কেউ কেউ হুজুকে পড়ে জানতে বা শিখতে চায়। তা ঠিক নয়। কারন ভালমন্দ যাচাই না করে জানা বা শিখা উচিত নয়। এখানে অন্ধবিশ্বাসের কোন স্থান নেই। আছে শুধু প্রমান আর যুক্তি।

চারি আর্য সত্যের মধ্যে আছে চারটি জ্ঞানের বিষয়। যেমন দুঃখে জ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধ প্রতিপদায় বা আর্য-অষ্টাঙ্গিক মার্গ জ্ঞান। এগুলি সম্বন্ধে জানা, বুঝা, শিখা অভ্যাস করা, পালন করা, প্রকাশ করা এবং জ্ঞান পরিপূর্ণ করাই প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাতে চিত্তের অজ্ঞানতা ও মিথ্যা দূরীভূত হয়ে বিপুল পূন্যের ও জ্ঞানের অধিকারী হয়। যে যতটুকু জ্ঞানসত্য অর্জন করেছে সে ততটুকু পারমার্থিক সুখের অধিকারী হয়েছে।

তিনি উপমা দিয়ে বলেন- পাকা ঘর তৈরী করতে ৪টি জিনিষের প্রয়োজন হয়। যেমন ইট, সিমেন্ট, বালি ও লৌহা। এগুলি দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারের পরিচালনায় সুন্দর ও মজবুত ঘর তৈরী করা হয়। সেরূপ নির্বান লাভ করতে হলে ৪টি বিষয়ের প্রয়োজন। যেমন- দুঃখ জ্ঞান, দুঃখের কারনে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধ প্রতিপদায় বা

আর্য–অষ্টাঙ্গিক মার্গ জ্ঞান। এগুলি চারটি জ্ঞানদ্বারা পটিচ্চ সমুপ্পাদ ও ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম সম্বন্ধে পুংখানুপুংখরূপে জানা যায়।

তিনি আরও উপমা দিয়ে বলেন- ডাক্তার সুপ্রিয় বড়ুয়া (সিভিল সার্জন) হলেন রোগ ও দেহের ইঞ্জিনিয়ার, বাবু অশোক কুমার বড়ুয়া হলেন পাকা ঘরের ইঞ্জিনিয়ার এবং আমি হলাম চিত্ত ও চারি আর্য সত্যের ইঞ্জিনিয়ার।

- o -

চিত্তকে সোজা কর

নির্মানাধীন বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে রাজ বনবিহারে পাকার কাজ প্রায় সময় চলতে থাকে। একদিন দুইজন রাজমিস্ত্রী লোহার রড সোজা করার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ওদিকে দৃষ্টি পড়ল। তিনি এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষন চেয়ে রইলেন। দেশনা প্রসঙ্গে তিনি চিত্তকে লোহার রডের সহিত তুলনা করেন। লোহার রড সোজা করা বেশ কষ্টসাধ্য। সেগুলি সোজা না করলে বিভিন্ন কাজে লাগাতে পারে না। কিন্তু মানুষের চিত্ত লোহার রডের চেয়ে সহস্র গুণে আঁকা বাঁকা। মানুষের চিত্ত সোজা করতে হলে বহুগুনে কষ্ট করতে হয়। আবার দেখা যায় লোহার রড সোজা করলে সোজাই থেকে যায়। কিন্তু মানুষের চিত্ত বহু পরিশ্রম করে একটু সোজা করলে আবার আঁকা বাঁকা হয়ে যায়। এ কি বিস্ময়কর ব্যাপার কি হতে পারে। সে স্বীয় চিত্তকে যতক্ষন সোজা করতে পারবে না ততক্ষন সে নির্বান লাভ করতে পারবেনা। নির্বান লাভ করতে হলে লোহার রড সোজা করার যে কৌশল আছে সেভাবে চিত্তকে সোজা করার কৌশলও আছে। সে কৌশল হলো শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা। তাঁর শিষ্য ভিক্ষু শ্রমন ও উপাসক–উপাসিকার প্রতি লক্ষ্য করে তিনি বলেন- আমি অতি কষ্ট স্বীকার করে তোমাদের চিত্তকে একটু সোজা করলে আবার আঁকা বাঁকা হয়ে যায়। রাজ মিস্ত্রী লোহার রড সোজা করলে পুনরায় মিস্ত্রীর প্রয়োজন হয় না। চিত্তের ব্যাপারে তোমাদের বেশী তৎপর হতে হবে। আমার উপদেশেই তোমাদের চলতে

হবে। যে যার চিত্তকে শান্ত, দান্ত ও সোজা করতে পারবে সেই বীরপুরুষ, জ্ঞান ও বিচক্ষণ বলে অভিহিত। সুতরাং চিত্তকে সোজা করা প্রত্যেকের একান্ত দরকার।

আঁকা বাঁকা চিত্ত যার অতি দুঃখ তার।
দুঃখ ঘুরে ভবে ভবে শুধু দুঃখ সার।।

- ০ -

দিব্য চোখে ও দিব্য কর্ণে শুনে প্রকাশ

অনেক সময় দেখা যায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর ধ্যান কুঠিরে ধ্যানস্থ থাকেন। এদিকে উপাসক-উপাসিকারা তাঁর অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিতভাবে বসে থাকেন। কেউ সাহস করে তাঁকে ডেকে আনেন না। ধ্যান কুঠিরের বাহিরে বন্দনা করে চলে আসেন। কোন এক মধুপূর্ণিমা উপলক্ষে সকাল বেলা বুদ্ধপূজা, সংঘদান ও অষ্টপরিস্কার দান সম্পাদিত হয়। বিকাল বেলার কর্মসূচীতে ছিল ২টায় ধর্মসভা। যথাসময়ে উপাসক-উপাসিকারা দেশনালয়ে উপস্থিত হন। সে সময় তিনি ধ্যান কুঠিরে আছেন। বেলা আড়াইটায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দেশনালয়ে ডেকে আনার জন্যে সকলে সিদ্ধান্ত নেন। ডেকে আনার দায়িত্বভার দিলেন আমার উপর। আমার সঙ্গে ছিলেন জনৈক উপাসক। প্রথমেই আমার কুঠিরের বারান্দা থেকে বন্দনা জানাই। অতঃপর আমি মনে মনে বললাম- শ্রদ্ধেয় ভন্তে, অনুগ্রহ পূর্বক ধ্যান হতে উঠুন। আপনার অপেক্ষায় উপাসক-উপাসিকারা দেশনালয়ে বসে আছেন। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারলাম তিনি আসন হতে উঠতেছেন। একটু পরেই দরজা খুলে আমার প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- দেখতেছি এবং শুনতেছি। কে কি বলে? স্বয়ং সম্যক সম্বুদ্ধকে অনেকে সন্দেহ করত। তিনি ত্রিলোকের মধ্যে শক্তিশালী রাজা, পন্ডিত, তর্কবিদ, দেবতা, ব্রহ্মা, নাগ, যক্ষ প্রভৃতির সন্দেহ তিরোহিত করেছিলেন। সম্যক সম্বুদ্ধই একত্রিশ লোকভূমির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বেলা ৩টায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দেশনালয়ে নিয়ে আসি। সেদিন দেশনা করার আগ্রহ তেমন ছিল না। মাত্র কয়েক মিনিট দেশনা করার পর বললেন- এখন তোমরা যেতে পার।

বন বিহার হতে আসার পথেই দেখলাম হেলিকপ্টার মাঠে কতকগুলি লোক সমবেত হয়েছে। কে যেন হেলিকপ্টার হতে নামতেছেন। পরদিন ভোরবেলায় প্রাতঃ ভ্রমণ করার সময় জনৈক সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা হলে তিনি আমাকে বললেন- গতকাল বিকালে আপনাদের বন বিহারে গিয়েছিলাম। চট্টগ্রাম হতে সে অঞ্চলের মাননীয় জিওসি জনাব আবদুস ছালাম এসেছিলেন। তিনি বনভন্তের সহিত সৌজন্য সাক্ষাত করেছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম- ভোরবেলায় আপনি খুব আনন্দের সংবাদ শুনালেন। তাঁদের মধ্যে কোন আলাপ হয়েছে কি? তিনি বললেন- হ্যাঁ, জিওসি সাহেব বনভন্তের নিকট অত্র অঞ্চলের শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে দোয়া কামনা করেছেন। বনভন্তে মাত্র কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন- প্রত্যেকে জ্ঞান ও সত্যের গবেষনা করা উচিত। জ্ঞানের আশ্রয় ও সত্যের আশ্রয় নিলে আপনা আপনিই শান্তি প্রতিষ্ঠা হয়। অজ্ঞান ও মিথ্যার আশ্রয় নিলে সংসারে নানাবিধ বিশৃংখলা, অশান্তি ও বহু দুঃখের সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রত্যেকের জ্ঞান ও সত্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত দরকার।

অতএব আমি ধারনা করলাম শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধ্যানযোগে দিব্য চোখে দেখে ও দিব্য কর্ণে শুনে বোধ হয় পরোক্ষভাবে মাননীয় জিওসি সাহেবের কথাই আমাকে প্রকাশ করেছেন।

- ০ -

জ্ঞানবল, জ্ঞানশক্তি ও জ্ঞানচক্ষু

আজ ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ইংরেজী। ভোর ৫টা বুধবার। ভোরবেলায় বুদ্ধ বন্দনা করার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে তাঁর ধ্যান কুঠিরে বন্দনা করে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছি। কারন সে সময় তিনি শিষ্যদেরকে দেশনা দিচ্ছিলেন। দেশনায় তিনি বলেন- তোমরা জ্ঞানবল, জ্ঞানশক্তি ও জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন কর, দেশনায় বুঝতে পারলাম জ্ঞানবল ও জ্ঞানশক্তি প্রায় একই অর্থ। কিন্তু একটু পার্থক্য মনে হল। জ্ঞান বলতে তিনি চারি আর্য সত্যকে বলেছেন। যেমন দুঃখজ্ঞান, দুঃখে সমুদয়ে জ্ঞান, দুঃখ

নিরোধে জ্ঞান এবং দুঃখ নিরোধের উপায় বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ জ্ঞান। চারি সত্যজ্ঞান উৎপন্ন হলে ততোধিক জ্ঞানশক্তি উৎপন্ন হবে। উক্ত জ্ঞান শক্তির দ্বারা জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হবে। সে জ্ঞান চক্ষু দ্বারা কুশল-অকুশল নির্ণয় করতে পারবে। যা অকুশল তা ত্যাগ করে কুশল বৃদ্ধিতে নির্বান প্রত্যক্ষ করতে পারবে। তাতে তোমাদের সবকিছু অবগত হলে প্রতীত্য সমুপ্পাদ, দ্বাদশ আয়তন, অষ্টাদশ ধাতু ও সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম অনায়াসে বুঝতে পারবে।

এ রকম গভীর তথ্যমূলক ধ্যানময় ও জ্ঞানময় দেশনা প্রায় ভোরবেলায় তাঁর শিষ্যদেরকে ভাষন দিতে দেখা যায়। প্রায় এক ঘন্টা যাবত বিভিন্ন পর্যায়ে দেশনা প্রদান করেন। এগুলি আমার পক্ষে বুঝা মহা কঠিন ব্যাপার। কারন দশম শ্রেনীর ছাত্র এম. এ. শ্রেনীর সমমানের পাঠ সম্বন্ধে হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। মধ্যে মধ্যে মনে করি আমি দশম শ্রেনীতে ও ভন্তের শিষ্যমন্ডলীরা বি. এ. এবং এম. এ. শ্রেণীতে অধ্যয়ন করতেছেন। এগুলি শ্রবন, গ্রহণ, ধারন এবংআচরণ করার ক্ষমতা তাঁদের আছে মনে করি।

উল্লেখ করা যেতে পারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যখন ধ্যান হতে উঠে গভীর জ্ঞানময় লোকোত্তর ধর্মদেশনা প্রদান করেন তখন আমি খুব প্রীতি অনুভব করি। মধ্যে মধ্যে মনে করি যেন নির্বান অধিগত করেছি। কিন্তু বনবিহার ত্যাগ করলে মনে হয় সবকিছু হারিয়ে ফেলেছি। আমার মত অনেকের মুখে এরকম অনুভবের কথা শুনতে পাই।

- o -

উত্তম সুখ

আজ সোমবার। ৭ই ডিসেম্বর ১৯৯২ ইংরেজী। গ্রামাঞ্চল হতে আগত বিপুল সংখ্যক উপাসক-উপাসিকা রাজবন বিহারে দেশনালয়ে সমবেত হয়েছেন। খুব কম সংখ্যক রাঙ্গামাটির উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে অষ্টপরিষ্কার দান, সংঘদান ও পরিত্রান সূত্র পাঠ করা হয়। খুব অল্প সময়ের মধ্যে শ্রদ্ধেয় ভন্তে সংক্ষিপ্তাকারে ধর্মদেশনা প্রদান করেন।

প্রারম্ভেই তিনি বলেন- আজ তোমরা অষ্টপরিষ্কার দান ও সংঘ দান করে সুকর্ম করেছ। যাবতীয় মিথ্যা ত্যাগ কর। মিথ্যা ত্যাগ করতে পারলে সত্য উৎপন্ন হবে। তার সঙ্গে সর্ব দুঃখের আকর অজ্ঞান ও ত্যাগ কর। অজ্ঞান ত্যাগ করতে পারলে জ্ঞান উৎপন্ন হবে। সত্য ও জ্ঞান উভয়ই উৎপত্তি হলে লোকোত্তরে যেতে পারে। লোকোত্তরে কোন প্রকার দুঃখ নেই। ইহকালে ও সুখ এবং পরকালেও সুখ।

এ সংসারে দেখা যায় কেউ কেউ ইহ জীবনে অতীব দুঃখে কালযাপন করে পরকালেও মহাদুঃখে পতিত হয়। কেউ কেউ পূর্বজন্মের সুকর্মের ফলে ভোগ সম্পত্তির অধিকারী হয়ে যাবতীয় মনুষ্য সুখ ভোগ করে পরকালে মহাদুঃখে পতিত হয়। আবার কেউ কেউ বিভিন্ন দুঃখের ভিতর দিয়ে শীল পালন করে পরকালে দেবসুখ বা মনুষ্য সুখ ভোগ করে। এ তিন প্রকার সুখ হল লৌকিক। খুব কম সংখ্যক লোকই মনুষ্য সুখ, হীন সুখ (কাম) ও সংসারের যাবতীয় লৌকিক সুখ ত্যাগ করে লোকোত্তরে যায়। তারা অজ্ঞান–মিথ্যা ত্যাগ করে ইহজীবনে পরম সুখ এবং পরজীবনেও পরমসুখ নির্বান লাভ করে থাকে।

তিনি উপমাদিয়ে বলেন- যেমন ধর, প্রকান্ড এক ফলের গাছ। প্রায় লোকই গাছে উঠে ফল খেতে পারে না। যাদের সাহস ও উপায় কৌশল আছে তারাই ঐ ফলের অধিকারী হয়। তেমনি তোমরাও অজ্ঞান–মিথ্যা ত্যাগ করে লোকোত্তর ফলের অধিকারী হও। যারা হীন ও নীচুমনা তারা গরুর গাড়ীর চাকার মত দুঃখ বহন করে পরকালে নিয়ে যায়। আর যাঁরা পূণ্য কর্মে নির্ভীক, দয়ালু, সহিষ্ণু ও মৈত্রী পরায়ণ তারা হাটতে যেমন আপন ছায়া সঙ্গে সঙ্গে যায় সেরকম ইহজীবন থেকে পরজীবনে ছায়ার মত লোকোত্তর সুখের অধিকারী হয়।

ইহাই উত্তম সুখ। এ বলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা আপাততঃ শেষ হলে সকলের মুখে ধ্বনিত হল - সাধু--সাধু--সাধু।

- ০ -

কুশলের বল থাকলে নির্বান লাভ করতে সোজা

আজ ১লা বৈশাখ বৃহস্পতিবার ১৪০১ বাংলা, ১৪ই মে ১৯৯৪ ইংরেজী। বিকাল ৩ টায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্যমন্ডলী কর্তৃক দেশের মঙ্গলার্থে সূত্রপাঠ করা হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ৪টা ২৫ মিনিট হতে ৫টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত পূণ্যার্থীদের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন- নিজের প্রতি নিজে মৈত্রী স্থাপন কর। নিজের প্রতি মৈত্রী স্থাপন হলে অপরের প্রতি মৈত্রী স্থাপন করা হয়। মৈত্রী স্থাপনে চিত্তে সুখ আসে। তোমরা অহি-নকুলের যুদ্ধ দেখেছ? সাপ আর বেজীর যুদ্ধ খুব সাংঘাতিক। তারা উভয়ে চির শত্রু। মানুষের মধ্যে এরকম আছে। অহি-নকুল যুদ্ধের ঔষধ হল মৈত্রী ভাবনা।

ভগবান বুদ্ধ ৪ প্রকার বৌদ্ধ পরিষদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছিলেন- যে আমার কথায় কর্ণপাত করবেনা তার অপায় গতি ছাড়া আর কিছু নেই। সদ্ধর্ম শ্রবন ও আচরণ করা দুর্লভ ও পরম সুখ। তোমরা বুদ্ধ জ্ঞান আহরণে সচেষ্ট হও।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- অতীতের সুকর্ম ও বর্তমানের সদ্‌গুরুর উপদেশ ও প্রচেষ্টাই অগ্রগতির ফল প্রদান করে। উদয় ব্যয় ভাবনা শিক্ষা করলে অর্হত্ত্বফল পর্যন্ত হতে পারে। ভাবনাকারীর অক্ষর জ্ঞান থাকাও দরকার। জনৈক ভিক্ষুর অক্ষর জ্ঞান না থাকায় বিপথে পরিচালিত হয়েছিল। সে ভিক্ষু গুরুর নির্দেশে নদীর কুলে উদয় ব্যয় ভাবনা অনুশীল করে। ভাবনা করতে করতে একটা বক চোখে পড়ে। তাতে তাঁর পূর্ব ভাবনা ভুলে নূতন করে উদয় বক, উদয় বক ভাবনা আরম্ভ করে। অন্য একজন ভিক্ষু এরূপ শুনতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি কি ভাবনা করছেন? তিনি বললেন- উদয় বক, উদয় বক। তিনি বললেন- আমি এরূপ ভাবনা জীবনে কোনদিন শুনিনি? অতঃপর গুরুর নিকট বলার পর গুরু বললেন- যার অক্ষর জ্ঞান বা সামান্য জ্ঞানও নেই সে ভাবনা করতে পারবেনা।

তিনি আরো বলেন- উদয় ব্যয় ভাবনায় নারী পুরুষ বা অন্য কিছু নেই। শুধু শ্বাস ও প্রশ্বাসের উপর নির্ভর করে। একবার ধর্ম সেনাপতি সারিপুত্রের বোন ভাবনা করছেন। এমন সময় পাপমতি মার এসে বলল- তুমি একজন

যুবতী সুন্দরী নারী। নির্জনে বসে আছ কেন? তোমার মত একজন সুন্দর যুবকের দরকার। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন- হে পাপমতি মার, যার কাছে নারী পুরুষ ভেদাভেদ আছে, তার কাছে বল। নারী পুরুষ অজ্ঞান ও মিথ্যা।

বিদেশ থেকে আগত কয়েকজন পর্যটক শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে নারী পুরুষ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। বনভন্তে বলেছিলেন- নারী পুরুষ হল স্বপ্নের মত। স্বপ্নে যেমন কতকিছু দেখা যায়। ঘুম ভাঙ্গলে সব বিলীন হয়ে যায়। ঠিক সেরূপ নারী পুরুষ, স্ত্রী পুত্র আত্মীয় স্বজন, জায়গা জমি প্রভৃতি স্বপ্নের মত। মারা গেলেই নিমিষের মধ্যে বিলীন হয়। তাহলে বুঝা যাচ্ছে নিজেই নিজের মালিক নয়। লৌকিকভাবে অতিথি হিসেবে বলতে হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা মৈত্রী ভাবনা ও উদয় ব্যয় ভাবনা কর। ভাবনায় সত্য জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মচক্ষু ও উৎপন্ন হয়। কিন্তু অতীতের পারমী না থাকলে হবে না। যেমন- রাজা অজাত শত্রু বিপুল পুন্য সঞ্চয় করেও অতীতের পারমী না থাকাতে নরকে পতিত হয়েছে। তিনি উপমা দিয়ে বলেন- শুধু ছাই এ ফু দিলে আগুন বের হবেনা। যেখানে আগুন নিহিত থাকে সেখানে ফুদিলে আগুন বের হবে। ঠিক তেমনি যদি তোমাদের পূর্বের পুন্য পারমী এবং বর্তমানে সদ্গুরুর উপদেশ ও নিজের প্রবল চেষ্টা থাকে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হতে পারবে।

সংসারের যাবতীয় সুখ ভোগ হল স্বপ্নের মত। পরিণামে দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। জ্ঞান চক্ষু উৎপন্ন হলে নারী বা পুরুষ গ্রহণ করে না। তাতে মনচিত্তে দুঃখ পায়। চারি মহাভূত হিসেবে দেখলে অজ্ঞান হয়না। চিত্তে থাকবে শুধু জ্ঞান ও বিশ্বাস। জ্ঞান ও বিশ্বাস না থাকলে ছিদ্র কলসীতে পানি ঢাললে যে রূপ অবস্থা হয় ঠিক তেমনি তোমাদের অবস্থা সেরূপ হবে।

তিনি বলেন- অর্হত্ত্ব ব্যতীত সকলের অবিদ্যা-তৃষ্ণা ও অহংকার থাকে। নিষ্পাপ ব্রহ্মচার্য পালন ও শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা আচরণে পুন্য ও সুখ। হাতে হাতেই ফল পাওয়া যায়। অজ্ঞান ও মিথ্যা থাকলে এম. এ. পাশ করে ভাবনা করলেও কোন ফল হবে না। জমিনে কর্ষন ছাড়া চাষ হয় না। ঠিক তেমনি ভাবনা ছাড়া জ্ঞান সত্য উদয় হবে না। জ্ঞানের আইন, জ্ঞানের শাসন ও জ্ঞানের ক্ষমতা অর্জন করতে পারলে পরম সুখ ও পুন্য অর্জন হয়।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বনভন্তের কথাগুলি অতি সোজা। কাজগুলিও সোজা। সবাই পারে মত অর্থাৎ সবার উপযুক্ততা সাপেক্ষে নির্দেশ মতে চলতে হবে। সে পথ হল কুশলের বল থাকলে নির্বান লাভ করতে সোজা হয়। এ বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা (২৫৩৮ বুদ্ধাব্দ)

আজ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা ২৫৩৮ বুদ্ধাব্দ। ২৪শে মে ১৯৯৪ ইংরেজী মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বুদ্ধ পূজা, বুদ্ধ মূর্ত্তি দান, সংঘদান ও অষ্টপরিষ্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু নব কুমার তঞ্চঙ্গ্যা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ বৃক্ষজিত ভিক্ষু।

সদ্ধর্মের উন্নতির জন্যে, দেবমনুষ্যের সুখের জন্যে এবং সকল প্রাণীর মঙ্গলের জন্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আয়ু সংস্কার বৃদ্ধি কল্পে সমবেত উপাসক–উপাসিকাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করেন বন বিহার পরিচালনা কমিটির সাবেক সভাপতি ডাঃ হিমাংসু বিমল দেওয়ান। রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ব্যারিষ্টার রাজা দেবাশীষ রায় এক নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। তাঁর ভাষনে বলেন- আমাদের পূর্বজন্মের মহাপূণ্যের ফলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে মহোদয়ের সান্নিধ্যে আসতে পেরে আমরা সবাই খুবই ভাগ্যবান বলে মনে করি। এ মহান আর্য্য পুরুষের সুখ নিঃসৃত নির্বানপ্রদ বাণী শ্রবন ও ধর্ম পালন করা আমাদের উপযুক্ত সময় ও সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। এহেন সময় ও সুযোগ যেন আমাদের বিরতি না ঘটে এজন্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট সশ্রদ্ধ প্রার্থনা জানাই।

তিনি বলেন- শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংস্পর্শে থেকে সদ্ধর্মের, সমাজের এবং জাতির উন্নতিকল্পে "আদর্শ বৌদ্ধ মালা সমিতি" সংগঠন করার জন্যে পূণ্যার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। সে সংগঠনে থাকিবে শুধু সদ্ধর্মের প্রচার ও বিশ্বমৈত্রী সৌভ্রাতৃত্ব।

উপসংহারে তিনি বলেন সম্প্রতি সাপছড়ি পাহাড়ে রাজবন বিহারের শাখা স্থাপিত হওয়ায় আমি খুবই আনন্দিত ও প্রীতি অনুভব করছি। ভারতের গৃধ্রকুট পর্বতে এবং অন্যান্য বৌদ্ধ দেশে পাহাড়ের চুঁড়ায় যে ভাবে সুউচ্চ বৌদ্ধ মন্দির স্থাপিত হয়েছে সেভাবে সাপছড়ি পাহাড়ের চুঁড়ায় ও বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন করার জন্যে সমবেত উপাসক-উপাসিকদের প্রতি সহযোগীতা কামনা করেন।

সকাল ১০টা ৫ মিনিট হতে ১০টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পূণ্যার্থীদের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান করেন। দেশনার প্রারম্ভেই বলেন- ভিক্ষুর কর্তব্য কি? ভিক্ষুর কর্তব্য হল ভিক্ষু শ্রমন ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে জ্ঞানদান, ধর্মদান এবং অভয় দান দেয়া। বর্তমানে যে সকল ভিক্ষুরা ধর্মের নামে সমাজের এবং দেশের বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত আছেন সে ব্যাপারে ভগবান বুদ্ধ কখনো নির্দেশ দেননি। ভগবান বুদ্ধ রাজপুত্র হয়ে তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্যপূর্ন রাজ্য ত্যাগ, স্ত্রী ত্যাগ, পুত্র ত্যাগ এবং যাবতীয় সুখ ভোগ ত্যাগ করে কি জন্যে গৃহ ত্যাগ করেছিলেন? তিনি শুধু দু'টি বিষয় অন্বেষণ করেছিলেন। সে দুটি হল কুশল ও সর্বজ্ঞতা। কুশল ও সর্বজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে তিনি কঠোর ধ্যান করেছিলেন। অবশেষে তিনি কঠোর সংকল্প করেছিলেন যে- যতক্ষন পর্যন্ত আমার উদ্দেশ্য সফল না হয় ততক্ষন পর্যন্ত এ ধ্যান আসন হতে উঠব না। যদিও আমার রক্তমাংস শুকিয়ে দেহের অবসান ঘটে তবুও আমার দৃঢ় সংকল্প পরিত্যাগ করব না।

এমতাবস্থায় পাপমতি মার এসে সিদ্ধার্থকে ধ্যান হতে উঠে যাওয়ার জন্যে বলল। হে ভন্ড তাপস, তুমি এখান থেকে উঠে চলে যাও। তুমি স্ত্রী, পুত্র ও রাজ্য ত্যাগ করে এখানে বসে আছ কেন? এটা আমার জায়গা। এ দেখ দেব, ব্রহ্মা, ভূত, প্রেত, যক্ষ প্রভৃতি আমার সাক্ষী। তোমার কেউ সাক্ষী নেই। তখন সিদ্ধার্থ বললেন- আমারও সাক্ষী আছে। আমার সাক্ষী হল জন্মে জন্মে যে ১০ পারমী, ১০ উপ পারমী এবং ১০ পরমার্থ পারমী পূর্ণ করে এ মহা পৃথিবীতে জল ঢেলে উৎসর্গ করেছি, এ মহা পৃথিবীই আমার একমাত্র সাক্ষী। তখন তাঁর কুশল ও পূণ্যের প্রভাবে মহাপৃথিবী হতে জল উঠে জলমগ্ন হয়ে যায়। তাতে পাপাত্মা মারও তার সঙ্গীরা পালাতে বাধ্য হয়। অবশেষে সিদ্ধার্থ আজ এ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করেন।

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করে বুদ্ধজ্ঞানে জানতে পারলেন পাপাত্মা মার ছাড়া মানুষের মধ্যে আরো কতকগুলি ক্লেশ নিহিত থাকে। সেগুলিকে ও জয় করতে না পারলে নির্বান লাভ করা সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধ যখন কুশল, সর্বজ্ঞতা ও যাবতীয় ক্লেশ জয় করে ত্রিলোক তথা সহস্র চক্রবাল সম্বন্ধে অবগত হলেন তখন পাপমতি মার বলল- এখন আপনার সবকিছু পুর্ণ হয়েছে। সুতরাং পরিনির্বান লাভ করা উচিত। ভগবান বুদ্ধ বললেন- হে পাপমতি মার, যতদিন পর্যন্ত আমার ভিক্ষু ভিক্ষুনী ও উপাসক-উপাসিকাদিগকে জ্ঞানদান, ধর্মদান ও অভয়দান সম্পূর্ণরূপে দিতে পারব না ততদিন পর্যন্ত আমি পরিনির্বাপিত হব না। ভগবান বুদ্ধের এরূপ ভাষণ শুনে মারের অন্তর্ধান ঘটে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদিগকে উৎসাহ দিয়ে বলেন- তোমরা আজ এ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে এমন এক দৃঢ় সংকল্প কর যাতে তোমরা অচিরেই দুঃখ মুক্তি ও নির্বান লাভ করতে পার। আমি তোমাদের প্রতি জ্ঞান দান, ধর্ম দান ও অভয় দান দিতে সর্বদা প্রস্তুত আছি।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ছোট বেলার কথা স্মরণ করে বলেন- গৃহীকালে অনেক ধর্ম বই পড়ে জেনেছি যে অনেক ভিক্ষুদের সাথে ও মার থাকে। সে ভিক্ষুরা জ্ঞানদান, ধর্মদান ও অভয়দানের পরিবর্তে কুপথে নিয়ে যায়। পরিণামে বহু দুঃখে পতিত হয়, বিপদে পড়ে এবং নানাবিধ অসম্মানজনিত কাজে জড়িত হয়।

তিনি বলেন- তোমরা এমন কাজ কর, যে কাজে মার নেই, অধোপথে যেতে না হয়, কোন ভয় নেই, কোন প্রকার দুঃখ নেই, কোন বিপদ নেই, ধর্মজ্ঞান এবং ধর্মচক্ষু যেন লাভ হয়।

তিনি আরো বলেন- এ সংসারে জন্ম মৃত্যু আছে। সকলেই মরতে হবে। কিন্তু যার জন্ম মৃত্যু নেই তার কোন দুঃখ নেই, পাপ নেই, পূন্য নেই এবং অবিদ্যা তৃষ্ণাও নেই। বনভন্তের নির্দেশ খুবই সোজা ও সহজ। অন্যদের নির্দেশ আঁকাবাঁকা ও কঠিন। যদি কেউ সে নির্দেশ অনুযায়ী চলে তার অর্হত্বফল পর্যন্ত লাভ হতে পারে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসকিাদের প্রতি বলেন- তোমরা দক্ষ ও উপযুক্ত হও। কি সম্বন্ধে? মারভুবন, অমারভুবন, ইহকাল, পরকাল এবং চিত্ত সম্বন্ধে দক্ষতা ও উপযুক্ততা অর্জন কর। বুদ্ধজ্ঞান অর্জন করতে পারলে চারি আর্যসত্য জানতে, বুঝতে, চিনতে এবং ভালরূপে দেখতে সক্ষম হবে।

তিনি ব্রিটিশ আমলে জনৈক অদক্ষ ডাক্তারের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন- সে অল্প শিক্ষিত ডাক্তার ফুস ফুস পরীক্ষা করার যন্ত্র দিয়ে (ষ্টেথেস্কোপ) রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করে। যারা অশিক্ষিত তারা অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। আর যারা শিক্ষিত তারা এরূপ কান্ড দেখে হাসাহাসি করত। ঠিক তেমনি বর্তমানেও কিছু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত অদক্ষ ভিক্ষু বৌদ্ধ ধর্মের নামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা অন্ধ হও না। চক্ষুস্মান হও। শ্রীবৃদ্ধি লাভ কর। সব সময় লক্ষ্য রাখ যাতে ধর্মের পরিহানি না ঘটে। বিশুদ্ধভাবে শীল পালন করলে অনবদ্য সুখ (নির্দোষ) অনুভব করতে পারবে। সমাধি ও প্রজ্ঞায় মার্গ সুখ, ফলসুখ বা লোকোত্তর সুখ লাভ করতে পারবে। এ বলে আমার দেশনা আপাততঃ এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু

নির্বানের নিকট আত্মসমর্পন কর

এক সময় রাজবন বিহার দেশনালয়ে শ্রদ্ধবান উপাসক-উপাসিকারা গভীর মনোযোগের সহিত ধর্মদেশনা শুনছেন। দেশনা প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা কাহারো নিকট আত্মসমর্পন কর না। একমাত্র আত্মসমর্পন কর নির্বানের নিকট। কেউ কেউ প্রানের ভয়ে সন্ত্রাসী বা অস্ত্রধারীর নিকট আত্মসমর্পন করে। কেউ কেউ প্রভাবশালীর নিকট আত্মসমর্পন করে। লোভ, দ্বেষ ও মোহের নিকট সব সময় আত্মসমর্পন করার শেষ নেই। আবার কেউ কেউ নারীর নিকট আত্মসমর্পন করে। যেমন কোন কোন ভিক্ষুকে নারীরা আত্মসমর্পন করিয়ে নিয়ে যায়। ভিক্ষুরা নারীর নিকট আত্মসমর্পন করার চেয়ে বনের বাঘের নিকট আত্মসমর্পন করা অনেক ভাল। কারন বনের বাঘে খায় রক্ত-মাংস। আর নারীরা খায় জ্ঞানপুন্য।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর শিষ্য ভিক্ষু শ্রমনদিগকে দেখায়ে বলেন- এগুলি হল বনের হাতী (হেইত)। বন বিহার এলাকা হল হাতীর খেদা। এখানে তাদের শুঁড় তুললে গা-উ-ত শব্দ করতে পারে না। শুঁড় তুললে শেলের আঘাত খেতে হয়।

তিনি আরো বলেন- ভিক্ষু শ্রমন, উপাসক ও উপাসিকাদের প্রকৃত খেদা হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এ খেদায় পড়লে দেব মনুষ্যগণ নির্বানের নিকট আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হয়।

শান্ত দান্ত হও তবে খেদায় পড়িয়া।
সর্ব দুঃখ ঘুচে যাবে অবিদ্যা নাশিয়া।।

- o -

লংগদু বনবিহারে কঠিনচীবর দান ও বনভন্তের দেশনা

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলায় লংগদু একটি প্রসিদ্ধ নাম। আবার অন্যদিকে সুন্দর এবং মনোরম স্থানও বটে। কেননা এ স্থানটির অন্য নাম তিনটিলা নামে পরিচিত। হ্রদের পাশে প্রায় জায়গা সমান পরিলক্ষিত হয়। পানি কমে গেলে চাষাবাদ ও পাহাড়ে প্রচুর বনজ সম্পদ উৎপন্ন হয়।

লংগদুবাসীর শ্রদ্ধার প্রবলতায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রথম লংগদু পদার্পণ করেন ১৯৭০ ইংরেজীতে। তখন হতেই লংগদু বন বিহার প্রতিষ্ঠা হয়। সে সময় বিহার পরিচালানার প্রধান ভূমিকা পালন করেন বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মা। ১৯৭৪ ইংরেজীতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে রাজবন বিহারে প্রথম পদার্পন করেন। ১৯৭৬ ইংরেজী হতে তিনি স্থায়ীভাবে এযাবত তথায় অবস্থান করতেছেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে লংগদু থাকাকালীন প্রত্যহ শত শত সদ্ধর্মপ্রান উপাসক-উপাসিকা তাঁর দর্শনে যেতেন। ১৯৭৩ ইংরেজীতে সর্বপ্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুতা কেটে, রং করে চীবর তৈয়ার এবং সেলাই করে কঠিন চীবর দান প্রবর্তন করা হয়। সে সময় মনে হয়েছিল লংগদু একটি প্রতিরূপ বৌদ্ধ অঞ্চল। ১৯৭৬ ইংরেজীতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে লংগদু ত্যাগ করার পর হতে সে অঞ্চল ঘোর অমানিশার অন্ধকারে সদ্ধর্মের আচরন অদৃশ্য হয়ে যায়।

কালক্রমে লংগদুবাসীর কর্ম বিপাক ভরিয়ে এল ১৯৯৪ ইংরেজী। তাদের প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনা ও শ্রদ্ধার গভীরতা দেখে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর অনুগত শিষ্য শ্রীমৎ ভৃগু-ভিক্ষু, শ্রীমৎ বৃক্ষজিত ভিক্ষু সহ ৫ জন ভিক্ষু ও ৬ জন শ্রমন দিয়ে লংগদু বনবিহার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। বিগত বর্ষাবাসের সময় লংগদুবাসীর পুনরায় ধর্মের চেতনা ও জাগরন উন্মোচিত হয়। তাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এক শক্তিশালী বনবিহার পরিচালনা কমিটি সংগঠিত হয়। তাতে অগ্রনীভূমিকা পালন করেন বাবু প্রতুল বিকাশ চাক্‌মা।

পরিচালনা কমিটি এবং শ্রদ্ধেয় ভৃগুভন্তের কর্ম প্রেরণায় প্রথমে মন্দির সংস্কার, মন্দিরের পশ্চিমে ভিক্ষু সংঘের ভোজনশালা, মন্দিরের সামনে মাটি কেটে প্রশস্ত মাঠ, উত্তরে দেশনালয় এবং সর্ব উত্তরে যথাক্রমে বনভন্তে ও প্রজ্ঞালংকার ভন্তের জন্যে ২টি পৃথক ধ্যান কুঠির স্থাপন করা হয়। মন্দিরের দক্ষিন পূর্বে অতিথি ভিক্ষুদের জন্যে একখানা বড় অতিথিশালা নির্মান করা হয়। বনবিহার এলাকার পশ্চিম পাশে কঠিন চীবর তৈরীর জন্যে বেইনঘর স্থাপন করা হয়। জানতে পারলাম এ স্থানটি দান করেছেন লংগদু নিবাসী বাবু বিজয় কুমার চাক্‌মার পুত্র বাবু শ্যামল চাক্‌মা। তিনি ৫ একর ভূমি দান করায় বন বিহার এলাকা আরও প্রশস্ত ও মনোরম স্থানে পরিণত হল। বন বিহার হতে বেইনঘর সংযোগ রাস্তা করাতে মাঝখানে একটা লম্বা ও সুন্দর জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। বনবিহারের পূর্বে জঙ্গল কেটে সম্প্রসারণ করা হয়। সেখানে গড়ে উঠে নতুন ধ্যান আশ্রম। এ ধ্যান আশ্রম আপাততঃ অবস্থান করছেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধুতাঙ্গধারী শিষ্য শ্রীমৎ শাসন রক্ষিত ভিক্ষু (বড় হারিকাটা) শ্রীমৎ প্রজ্ঞাপাল ভিক্ষু (মধ্যম লংগদু) শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু (কাট্টলী) শ্রীমৎ যোগ্য বৃদ্ধি ভিক্ষু (মধ্য লংগদু) ও শ্রীমৎ জ্ঞান বর্দ্ধন ভিক্ষু (কাট্টলী)। সাক্ষাৎকারে জানাগেল উক্ত ৫ জন ভিক্ষু অরণ্যেই থাকেন। তারা কোন ধ্যান কুঠিরে বা বিহারে থাকেন না। কঠিন চীবর দান উপলক্ষে লংগদু বনবিহারে এসেছেন। ভিক্ষাচরনেই তাঁরা জীবন ধারন করেন।

জানাগেল লংগদু বন বিহার ব্যাপক উন্নয়ন প্রকল্পে শুধু লংগদুবাসীর প্রচেষ্টা নয়। অন্যান্য এলাকা হতে দামী গাছ, বাঁশ ও বিবিধ গৃহ নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করেছেন। উন্নয়নমূলক কাজে সে সব এলাকা হতে উদ্যমশীল জনগণ অংশগ্রহণ করেছেন সে এলাকাগুলি হল- (১) পাবলাখালী, (২) সারবয়াতলী, (৩) দুরছড়ি, (৪) খেদারমারা, (৫) উলুছড়ি, (৬) সিজক, (৭) নলবুনিয়া, (৮) জীবঙ্গছড়া, (৯) খিড়াচর,

(১০) বাঘাইছড়ি, (১১) তুলাবান, (১২) উগলছড়ি, (১৩) মোষপইজ্যা, (১৪) চিন্তরামছড়া, (১৫) বরকল, (১৬) চাউক্যাতলী। উক্ত ১৬ এলাকাবাসী শুধু দান করে ক্ষান্ত হননি। রাতদিন নিরলস ও নিঃস্বার্থভাবে শ্রম দিয়ে ও পূণ্য অর্জন করেছেন। এবারের উন্নয়মূলক কর্মকান্ডে স্থানীয় ও পারিপার্শ্বিক জনগনের মনে নতুন উদ্যমে সদ্ধর্মের জাগরন প্রবাহিত হয়। এমনকি মদ-জুয়ার প্রচলন পর্যন্ত প্রায় বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছে।

৩রা নভেম্বর '৯৪ ইংরেজী বৃহস্পতিবার লংগদুর ঘরে ঘরে পড়ে গেল আনন্দধারা। প্রায় ঘরে ঘরে আত্মীয়স্বজনের আগমন। রাস্তার দুপাশে বসে গেল নানাবিধ দোকানপাট। কোথাও তিল ধরনের ঠাঁই নেই। বহুদিনের আকাংখিত মেলায় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কেনাকাটার ধুম পড়ে যায়। বিকাল ৩ টায় কঠিনচীবর তৈরীর কর্ম প্রবাহ শুরু হয়। সন্ধ্যায় বেইনঘরে ও বনবিহার এলাকায় ২টি ডায়নেমো চালু হয়। তাতে শত শত বাতির আলোতে অগনিত সদ্ধর্মপ্রান উপাসক-উপাসিকার মন শ্রদ্ধায় ভরে যায়। কেননা সুদীর্ঘ ২০ বৎসর পর আবার সেই হারানো মানিক হাতের মুঠোয় এসেছে। প্রচন্ড ভীড়ের মধ্য দিয়ে অনেকে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বন্দনা করার জন্যে উৎকণ্ঠিতভাবে ধ্যানকুঠিরের বাইরে অপেক্ষা করতে দেখা গেছে। কেউ কেউ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সান্নিধ্য পেয়ে প্রসন্ন বদনে বন বিহার এলাকায় ঘুরাফেরা করতে দেখা যায়।

৪ঠা নভেম্বর '৯৪ ইংরেজী শুক্রবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বুদ্ধ পূজা, সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান ও বুদ্ধমুর্তি উৎসর্গ করা হয়। বিকাল ২টা ২২ মিনিটে বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগীত গেয়ে দ্বিতীয় পর্ব উদ্বোধন করা হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু বিনিময় খীসা। সভাপতির ভাষন দান করেন বাবু প্রতুল বিকাশ চাক্‌মা ও বিশেষ প্রার্থনা করেন বাবু অনিল বিহারী চাক্‌মা। অনুষ্ঠান পরিচালনা ও কঠিন চীবর উৎসর্গ করেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার থেরো।

নির্ধারিত সময়ে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তাঁর অমূল্য ধর্মদেশনা দেয়ার কর্মসূচী ছিল। কিন্তু উপাসক-উপাসিকাদের পর্যাপ্ত পরিমান বসার স্থান না থাকায় ও এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কিছুক্ষন পর্যন্ত ধর্মদেশনা দিতে বিরত থাকেন। অতঃপর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিকাল ৪টা ১৫ মিনিট হতে ৫ টা ২০ মিনিট পর্যন্ত উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান করেন। দেশনার প্রারম্ভেই তিনি বলেন প্রায় উপাসক-উপাসিকারা ধর্ম দান, জ্ঞানদান ও অভয়দান প্রার্থনা করে থাকে। তারা কি ভালভাবে জেনে ও বুঝে

প্রার্থনা করে? তাদের প্রথমেই জানতে হবে কোথায় ভুল, ত্রুটি, গলদ ও অপরাধ আছে? সেগুলি অতি সাবধানের সহিত সংশোধন করতে হবে। ধর্মদান হল- কোনটা পাপ, কোনটা পূণ্য, কোনটা কুশল, কোনটা অকুশল, কোনটা সুখ, কোনটা দুঃখ, কোনটা ভাল এবং কোনটা মন্দ ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, চিনায়ে দিতে হবে, দেখায়ে দিতে হবে এবং পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এসব সম্বন্ধে বুঝিলে, চিনিলে, দেখিলে এবং পরিচয় হলে পাপ ত্যাগ, অকুশল ত্যাগ, দুঃখ ত্যাগ এবং মন্দ ত্যাগ করতে পারলেই ধর্মদানের স্বার্থকতা হয়।

জ্ঞানদান হল যে সকল দুঃখসমূহ সম্বন্ধে জ্ঞান, দুঃখের কারনে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধ জ্ঞান ও দুঃখ নিরোধ প্রতিপদায় বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে যে জ্ঞান উৎপত্তি হয় তা যথাযথভাবে জানিয়ে, বুঝিয়ে, চিনিয়ে এবং পরিচয়ে যে জ্ঞান লাভ করা হয় সে জ্ঞান অপরকে যথাযথভাবে অবগত করানোকে জ্ঞানদান বলে।

দেহ ধারন করলেই নানাবিধ ভয়ের কারন হয়। যেমন মৃত্যুভয়, রোগভয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ভয়, জীবজন্তুর ভয়, শত্রুর ভয়, দন্ড-অস্ত্রের ভয়, রাজভয় এবং নানাবিধ উপদ্রবের ভয়। যারা এ সমস্ত ভয় হতে উত্তীর্ণ হয়েছেন বা ভয়শূণ্য ব্যক্তি তাঁরাই অপরকে অভয়দান দিতে পারেন। অভয়দানে নানাবিধ ভয় হতে রক্ষা পায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জনৈক ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করে বলেন- সে ভিক্ষু ধর্মসভায় দাঁড়িয়ে বললেন- আমি কি বলব? কি ধর্ম কথা বলব? উদ্দেশ্য খুঁজে পাচ্ছিনা। অতঃপর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বললেন- পালি হতে সকল ভাষায় অনুবাদ করা যায়। কিন্তু নিজের মাতৃভাষায় ধর্ম ভাষণ দেওয়া অতি উত্তম। তাহলে কি ধর্ম ভাষন দেওয়া উচিত? চারি আর্যসত্য দেশনা, কথন, প্রজ্ঞাপন, ঘোষনা ও প্রতিষ্ঠা করাই একমাত্র উচিত। চারি আর্য-সত্যের বাহিরে বর্গনন্দী ও বর্গরাম ভাষণ দেওয়া উচিত নয়। তাতে জাতিবাদ, গোত্রবাদ ও বর্ণবাদ প্রকাশ পায় বা গম্ভীর মধ্যে থেকে যায়। সমগ্রকরনী ও সমগ্ররাম ভাষন দেওয়া উচিত। তাতে সকলের পূণ্য বৃদ্ধি হয় ও চিত্তে অনাবিল সুখ স্থাপিত হয়।

তিনি বলেন- বনভন্তে তোমাদের কোন পথে যেতে বলেন? তোমরা কোন পথে যাচ্ছ, চেয়ে আছেন যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা সুপথ কুপথ যাচাই করে। সুপথ কুপথ ভালভাবে চিনে কুপথ ত্যাগ করে সুপথে অগ্রসর হয়। খাঁটি

সত্য অনুধাবন করতে পারলে পূণ্য ও সুখ উৎপন্ন হয়। মনে কোন প্রকার দুঃখ পায় না। কুপথে বহু দুঃখ ভোগ করে ও নরকে বা অপায়ে পতিত হয়। অনেক ভিক্ষুদের মুখেও শুনেছি- আমি দুঃখ পাচ্ছি। তিনি বলেন- তাহলে ভিক্ষুজীবনের সার্থকতা কি? দুঃখ না পাওয়ার জন্যে ভিক্ষুত্ব জীবন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য কি? ভগবান বুদ্ধের উপদেশে কি বলেন? বুদ্ধের উপদেশে জীবিত থাকা দুঃখজনক। তাহলে মরে গেলে কি সুখ? না, তা নয়। জীবিতও নয়। মৃতও নয়। কেউ কেউ বলে তাকে মরে গেলে সুখ। তা মারাত্মক ভুল কথা। মরে যাওয়ার পর চার অপায়ে গেলে কি সুখ? কেউ কেউ অতিরিক্ত দুঃখ পেয়ে, কেউ কর্জের দরুন এবং কেউ পাপে আত্মহত্যা করে। সুখ ও পূন্যের আত্ম হত্যা করে না। যাহা সমস্ত দুঃখ ও পাপ হতে মুক্ত হতে পারছে তারাই প্রকৃত সুখী ও মুক্ত। ক্ষুদ্র পাপে ক্ষুদ্রশীল, মধ্যম পাপে মধ্যম শীল এবং মহাপাপে মহাশীল পালন করতে হয়। চিত্তে পাপ যেন স্পর্শ করতে না পারে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। চিত্তে অনাবিল সুখ যেন হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। পাপের শাস্তি ও পূন্যের পুরস্কার। পূন্যকাজে দেবতাও অন্যান্য ধর্মের লোকেরাও ভালবাসবে এবং প্রশংসা করবে।

তিনি বলেন ধর্মদেশনায় জ্ঞান ও বিশ্বাসের দরকার। কে কখন মরবে তা ঠিক নেই। সুতরাং ক্ষুদ্র, মধ্যম ও মহাপাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত হও। বনভন্তের উপদেশ পালন করলে ধনী হতে পারে। মুবাছড়িতে বনভন্তের উপদেশে শীলপালন করে বৃষ্টি হয়েছিল। প্রচুর পরিমাণ ফসল পেয়ে ধর্মের উপর বিশ্বাস স্থাপন হয়েছে। শীল ও পূণ্যকর্ম করলে ধনবৃদ্ধি পায় ও সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বনভন্তের বয়স এখন ৭৫ বৎসর চলছে। অনেক কষ্ট করে দেশনা দিতে হয়। সুতরাং তোমরা মুক্তির জন্যে এগিয়ে যাও। কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস কর। বুদ্ধের ধর্মকে মনেপ্রাণে মেনে চল এবং বিশ্বাস কর। যদি আমার নির্দেশিত পথে চল নিশ্চয়ই তোমাদের মঙ্গল হবে এবং মুক্তির পথ সুগম হবে। অন্যথায় তোমাদের বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। বনভন্তের উপদেশ গ্রহণ না করতে পার। তাঁকে শ্রদ্ধা না করতে পার। কিন্তু সমালোচনা করনা। সে ব্যাপারে কোন আপত্তি নেই। সমালোচনা করলে মহা বিপদও হতে পারে। এমন কি বন্ধুকের চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে। ভগবান বুদ্ধের আমলে ভগবান বুদ্ধের সমালোচনা করে

রক্ত বমনে মৃত্যু হয়েছে। বিপদে পড়লে অনেকে অভয়দানের জন্যে বনভন্তের নিকট আসে। কিন্তু বিপদ কেটে গেলে প্রায় দেখা যায়না। সর্বদা মনে রেখো ধর্মচারীকে সবসময় ধর্মে রক্ষা করে।

তিনি বলেন- মানুষ ক্রমান্বয়ে বুড়া হয়। সারাজীবন অনেক দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। নির্বান ব্যতীত দুঃখ কষ্টের অবসান হয় না। তোমরা পাপধর্ম ত্যাগ কর। নির্বান ধর্ম গ্রহণ কর। সত্যধর্ম অনুশীলন কর এবং জ্ঞানধর্ম গবেষনা কর। একে অপরকে মানুষ বলে গণ্য কর। যারা শীলবান, ধার্মিক, জ্ঞানী ও পন্ডিত হয় তাদের সুখ, শান্তি, পূণ্য এবং নির্বাণ লাভ হয়।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি আশীর্বাদ প্রদানে বলেন- ভগবান বুদ্ধের ধর্মের ও সত্যের প্রভাবে তোমাদের চিত্তের যাবতীয় পাপ দুর হোক, সত্যধর্ম উদয় হোক এবং যাবতীয় রোগ, শোক, অমঙ্গল ও উপদ্রব তিরোহিত হয়ে সুখে শান্তিতে বাস করে নির্বান লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

সাধু - সাধু - সাধু।

ফোরমোন কঠিন চীবর দানে শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার থেরোর ধর্ম দেশনা

চট্টগ্রাম ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রামে অসংখ্য ছোট বড় পাহাড় পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে চারিটি পাহাড়ের সারি উল্লেখযোগ্য। প্রথমেই দেখা যায় রাউজান রবার বাগান পাহাড়ের সারিটি উত্তর দিক থেকে ক্রমান্বয়ে দক্ষিনে কর্ণফুলী নদীর কুলে মিশে যায়।

দ্বিতীয়টি হল সাপছড়ি পাহাড়ের সারি। এ পাহাড়ের চুড়ায় বাংলাদেশ টেলিভিশন এন্টিনা স্থাপন করা হয়। এন্টিনার উত্তর পাশে অর্থাৎ এ পাহাড়ের সারির সর্বোচ্চ চুড়ার নীচে 'ফোরমোন' বন বিহার বা ধ্যান আশ্রম গড়ে উঠে। এ সারিটি পার্বত্য অঞ্চলের উত্তর সীমান্তে হতে ক্রমান্বয়ে চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী নদীতে মিশে যায়।

তৃতীয় পাহাড়ের সারিটি হল সুবলং পাহাড়ের সারি। এ সারিটি উত্তরে ভারত সীমান্ত হতে ক্রমান্বয়ে দক্ষিনে বার্মা সীমান্তে মিশে যায়। এ সারির

সর্বোচ্চ চূড়ায় 'যমচুগ বনবিহার' ১৯৮৩ ইংরেজীতে স্থাপন করা হয়। বর্তমানে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রীমৎ নন্দপাল মহাথেরোর পরিচালনায় ১৫ (পনের) জন ভিক্ষু ও ১০ (দশ) জন শ্রমণ শমথ- বিদর্শন ভাবনায়রত আছেন।

চতুর্থ পাহাড়ের সারিটি দেখা যায়, জুরাছড়ি বন বিহারে গেলে। সেখান থেকে আনুমানিক ২০ (বিশ) মাইল পূর্বে প্রায় ভারত সীমান্তে উত্তর দিক হতে দক্ষিনে পরিলক্ষিত হয়। এটা ঠেগা পাহাড়ের সারি নামে পরিচিত।

ফোরমোন বা সাপছড়ি পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া প্রায় জনের সুপরিচিত। কারন এ চূড়ায় দক্ষিন পাশ দিয়ে চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি প্রধান সড়ক অবস্থিত। ২৫৩৮ বুদ্ধাব্দে অর্থাৎ শুভ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে মাননীয় চাক্‌মা রাজা ব্যারিষ্টার দেবাশীষ রায় ফোরমোনে সুউচ্চ বুদ্ধ মন্দির স্থাপন করার জন্যে রাজবন বিহার প্রাঙ্গনে ঘোষনা প্রদান করেন। পরবর্তীকালে তিনি ফোরমোন পরিদর্শন করে এসেছেন।

ফোরমোনে সুউচ্চ বুদ্ধ মন্দির নির্মিত হলে চার দিক থেকে সবার দৃষ্টি গোচর হবে। এমনকি ফোরমোন হতে দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত দেখা যাবে। ফোরমোনে উঠে চারিদিক অবলোকন করলে বিভিন্ন পাহাড়ের এবং রাঙ্গামাটি শহর ও হ্রদের দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর। ফোরমোনে বৌদ্ধ মন্দির স্থাপন করা হলে ভারতের গৃধ্রকুট পর্বতে যে আন্তর্জাতিক শান্তি স্তুপ আছে সেটার মত শোভা পাবে।

ফোরমোন বনবিহারে যেতে হলে ২ (দুই) টি বন পথ আছে। একটি হল প্রধান সড়ক থেকে টেলিভিশন এন্টিনার পাশ দিয়ে যেতে হয়। তা খুবই বন্ধুর ও কষ্টসাধ্য। অন্যটি হল মানিকছড়ির উত্তর দিকে ইটাখোলার পাশ দিয়ে যেতে হয়। পথ শুরুতেই ১০টি ছড়া, ১৬টি ছোট পাহাড় এবং ৮ (আট) টি বড় পাহাড় অতিক্রম করতে হয়। অনেক কষ্টের বিনিময়ে সর্বোচ্চ চূড়ায় পৌছলে শীতল বাতাস ও চারিদিকের নৈসর্গিক দৃশ্য দেখে যাবতীয় পরিশ্রমের কথা সাময়িকভাবে ভুলে যেতে হয়।

বন বিহার পরিচালনা কমিটি হতে জানতে পারলাম অত্র এলাকা প্রায় ১০০ (একশত) একর হবে। তা বন্দোবস্তীর জন্যে আবেদন করা হয়েছে। বন বিহার এলাকায় ৫ (পাঁচ)টি ধ্যান কুঠির ১ (এক) টি ভোজনশালা ও ১ (এক) টি বেইন ঘর স্থাপিত হয়েছে। ফোরমোন ২৪ (চব্বিশ) তম

পাহাড়ের গোঁড়ায় একটা মৃসন ও গোলাকার প্রকান্ড শিলা দেখা যায়। রাজবন বিহারে যে ২ (দুই) টি কাল ও মৃসন শিলা আছে, দেখতে ঠিক সেরকম কিন্তু এ গুলির চেয়ে দ্বিগুন বড় হবে।

বিগত বর্ষামাসে (১৯৯৪ ইংরেজী) শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ অনোমদর্শী ভিক্ষু, শ্রীমৎ জিনপাল ও শ্রীমৎ ধর্মানন্দ শ্রমণ বর্ষাবাস যাপন করেছেন। বিহার পরিচালনায় যারা আছেন, তারা হচ্ছেন বাবু তিরস চন্দ্র চাক্‌মা (সভাপতি) বাবু মৃনাল কান্তি চাক্‌মা (সহ-সভাপতি) বাবু মানিক লাল দেওয়ান (সহ-সভাপতি) বাবু পুর্ণ ভূষণ চাকমা (সম্পাদক) ও বাবু সমর বিজয় চাক্‌মা (উপদেষ্টা)।

বিগত ১৪/১১/৯৪ ইংরেজী সোমবার ফোরমোন বন বিহারে কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠিত হয়। রাজবন বিহার হতে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার থেরোসহ ১১ (এগার) জন ভিক্ষু ও ১০ (দশ) জন শ্রমণ উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পূর্বদিন বিকাল ৩.০০ টা হতে চীবর তৈরীর কাজ শুরু হয়। সকাল ১০.০০ টায় সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় ৩.০০ টায় কঠিন চীবর দান ও ধর্ম সভা আরম্ভ হয়। প্রথমে পঞ্চশীল গ্রহন ও কঠিন চীবর দান উৎসর্গের পর শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার থেরো বিভিন্ন স্থান হতে আগত সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি ৫৫ মিনিট যাবত এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও লোকোত্তর ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন- ত্যাগ ধর্ম পরম সুখ ও স্বাধীন ধর্ম। লোভ ত্যাগ, হিংসা ত্যাগ, অজ্ঞানতা এবং পঞ্চ আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে চিত্তে অনাবিল সুখ অনুভব হয়। ত্যাগ ধর্ম এমন একটা ধর্ম যে কেউ অন্য কাউকে জোর করে বা বাধ্য করাতে পারে না। স্বেচ্ছায় এবং মনেপ্রাণে ত্যাগ করতে হয়। ভগবান বুদ্ধ দেখে দেখে ত্যাগ করতে বলেন। যার ত্যাগ করার ইচ্ছা উৎপন্ন হয় তার উন্নতি বা মুক্তি হতে পারে। নীচে পড়বে না বা ৪ (চার) অপায়ে পতিত হবে না।

শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞালংকার ভন্তে আরো বলেন- রাজশক্তি বা আজ্ঞা চক্র প্রয়োগ হলে অবশ্যই পঞ্চশীল পালন করতে বাধ্য হয়। পঞ্চশীল পালন করাও ত্যাগ ধর্ম বুঝায়। সম্রাট অশোকের আমলে তাঁর রাজাজ্ঞায় বা আজ্ঞাচক্রে পঞ্চশীল পালন করতে বাধ্য করেছেন। জ্ঞান আর সত্য দিয়ে ভগবান বুদ্ধ মার্গ ফলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে বলেছেন। যারা সত্য মিথ্যা

বুঝতে পারে না তারা পঞ্চশীল পালন করতে পারে না। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হলে বুদ্ধজ্ঞান ও সত্য সমুহ উপলব্ধি হয়।

যারা অজ্ঞানী তারা সংসারের নানাবিধ সাময়িক ও লৌকিক সুখ দর্শন করে মোহান্বিত হয়। জ্ঞানীরা সুক্ষ জ্ঞান দিয়ে নিরীক্ষন করে ওখানে কিছু নেই বলে প্রমাণিত করেন। যেখানে কিছু নেই, সার নেই সেখানে সাময়িক সুখ ভোগের কোন প্রশ্নই উঠেনা। সুতরাং প্রত্যেকেই যাবতীয় সুখভোগ ত্যাগ করা অবশ্যই উচিত।

তিনি বর্তমান যুগের বিজ্ঞানের উন্নতিতে সুখ ভোগের কথা উল্লেখ করে বলেন- জড় বিজ্ঞানের উন্নতিতে মানুষ সাময়িকভাবে সুখে বিমোহিত হয় এবং জাগতিক সুখ-শান্তি প্রত্যক্ষ করে। বর্তমান জড় বিজ্ঞান ছাড়া চক্ষু বিজ্ঞান, শ্রোত্র বিজ্ঞান, ঘ্রাণ বিজ্ঞান, জিহ্বা বিজ্ঞান ও কায় বিজ্ঞানে বুদ্ধজ্ঞান বা লোকোত্তর জ্ঞান উৎপন্ন 'হয় না। পঞ্চ ইন্দ্রিয় দমন ও সংঘত করে মন ইন্দ্রিয় দিয়ে আসল জ্ঞান ও সত্য উপলব্ধি করা যায়। যে মন ইন্দ্রিয় দিয়ে সত্যধর্ম যথাযথ উপলব্দি করতে পারেন তিনিই সত্যিকার ভাগ্যবান।

নির্বাণ ধর্ম হল নিরোধ ও অনাসক্ত। তা কিভাবে বুঝা যায়? একমাত্র উপলব্দি করা যায় আকাশ ও বাতাসের দ্বারা। অনন্ত আকাশ যেমন তার কোন সীমা নেই ঠিক নির্বাণেরও কোন সীমা নেই। বাতাস যেমন দেখা যায় না, শুধু কায় দ্বারা অনুভব করা যায়, ঠিক নির্বান ও একত্রিশ লোক ভূমিতে নেই। শুধু চিত্তে অনুভব ছাড়া আর উপায় নেই। তা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করার ব্যাপারও নয়। যেমন বাতি জ্বলে নিভে যায়। তৈল রূপ উপাদান ফুরিয়ে যায়; তেমন নির্বাণেও অবিদ্যা তৃষ্ণা আসক্তাদি ফুরিয়ে নির্বাপিত হয় বলে নির্বাণ নামে অভিহিত। তৈল দীপ নির্বাপিত হলে কোথায় গিয়ে অবস্থান নিয়েছে তা কেউ দেখায়ে দিতে পারে না। ঠিক সেরূপ নির্বাণও কোন জায়গায় অবস্থান নেই, মনুষ্য লোকে নেই, দেবলোকে নেই, ব্রহ্মালোকে নেই অথবা অন্য কোথাও নেই। নির্বাণ শুধু মন-চিত্তে একমাত্র উপলব্ধি করা যায়।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন- লৌকিক থেকে লোকোত্তর জ্ঞান লাভ করতে হলে অসাধারণ অধ্যবসায়ের দরকার। তাতে বিভিন্ন দুঃখ হতে মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। সদ্ধর্ম ও সত্য ধর্ম যথাযথভাবে আচরণ কর। অতিসত্বর প্রাচীন নীতি বাদ দিয়ে বুদ্ধ নীতি বা নতুন নীতি অবলম্বন কর। নুতন নীতি অবলম্বন করলে চিত্তে অনাবিল সুখ ও শান্তি মিলিবে। জন্ম হলেই নানাবিধ

দুঃখ ভোগ করতে হয়। অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত নানাবিধ জরা ব্যাধি ভোগ করতে হয়। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় অশান্তি ও দুশ্চিন্তা নেই। আছে শুধু অনাবিল সুখ।

যার মন সরল ও দমিত তারা সহজেই নানাবিধ দুঃখ হতে মুক্তি পায়। আর যার মন সরল নয় ও চিত্ত দমিত নয় তারা অতি সহজে দুঃখে পতিত হয়। যারা চালাক বা বুদ্ধিমান তারা সাময়িকভাবে সুখ ভোগ করে। কিন্তু তাদের চিত্ত কলুষিত থাকায় দুঃখের আগুনে পুড়ে ছাই হয়। অনেক সময় দেখা যায় সরল মানুষ বিপদে পড়ে। তা পূর্ব জন্মের কর্মের ফলে সাময়িকভাবে কষ্ট পায়। যারা জ্ঞানী তারা অন্যায়, অপরাধ ও কাহারো ক্ষতি সাধন করতে পারেন না।

ফোরমোন এলাকাবাসী, পরিচালনা কমিটি ও উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি শ্রদ্ধেয় ভন্তে উৎসাহ দিয়ে বলেন- তোমরা জ্ঞানীর আশীর্বাদ নিয়ে এ ধ্যান আশ্রমের উন্নতি কল্পে এগিয়ে যাও। পিছু হঠো না। পিছু হঠলে নিশ্চয় লজ্জা লাগবে। সকলে মিলে মিশে পূণ্য কাজ কর এবং সাহার্যের জন্যে এগিয়ে এস। অধিকাংশ লোকই গরীব হলেও আমার মনে হয় কেউ অনাহারে নেই। দশজনের সাহায্যে যথাযথ কাজে কৃতকার্য হতে পারবে। পরিচালনার ব্যাপারেও ত্যাগ করতে হবে। উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছাড়া কোনদিন সুখ মিলে না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ছোট বেলা হতে কঠোর পরিশ্রম, উৎসাহ ও অসাধারণ অধ্যবসায় দিয়ে কৃতকার্য হয়েছেন। তা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

তিনি আরো বলেন- সম্যক জ্ঞান বা লোকোত্তর জ্ঞান উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত কঠোর ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। সুদক্ষ কৃষক যেমন কঠোর পরিশ্রম করে নানাবিধ ফসলের অধিকারী হয় তেমন যারা সর্ববিধ বন্ধন ও দুঃখ হতে মুক্তি হওয়ার ইচ্ছুক তাদের ও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। মুক্ত হওয়া ও মহা কঠিন ব্যাপার। লৌকিকভাবে বন্ধন ২ (দুই) প্রকার। পূণ্য কর্ম হল স্বর্ণের বন্ধন। কেন না পূন্যের প্রভাবে স্বর্গে বা মনুষ্যলোকে জাগতিক সুখ ভোগ করে প্রকৃত মুক্ত হতে পারেনা। পাপ বন্ধন হল লৌহার বন্ধন। ৪ (চার) অপায়ে অবিরাম দুঃখ ভোগ করে মুক্তির পথ পায় না। এ ব্যাপারে এখানে একটা উপমা প্রদান করা যায়। যেমন জেল খানায় রাজবন্দীরা বিপুল সুযোগ-সুবিধা, আমোদ-প্রমোদ এমনকি নিজের বাড়ীতে যেভাবে থাকে সেভাবে কালযাপন করতে পারে। কিন্তু আইনের ক্ষেত্রে সহজে মুক্তি পায় না। এটাও একপ্রকার স্বর্ণের শিকল বলা যায়। অন্যদিকে দেখা যায় রাতদিন

জেলখানার নানাবিধ কাজকর্ম করে কয়েদীরা শাস্তি ভোগ করে। এটাকে লোহার শিকল বলা যায়। স্বর্ণের শিকল ও লোহার শিকল থেকে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় শপথ-বিদর্শন ভাবনা। বিদর্শন ভাবনা ছাড়া কেউ জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ হতে মুক্তি পায়না। আজ তোমরা কঠিন চীবরদান করে যে পূণ্য অর্জন করেছ, তাও এক প্রকার স্বর্ণের শিকল। কঠিন চীবর দান খুবই ফল প্রদ। যেমন কঠিন চীবর দান করে সহস্রবার দেব সুখ ভোগ করা যায়।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে বলেন- তোমরা পাপ ধর্ম ত্যাগ কর অন্যদিকে পূণ্য ধর্ম ও ত্যাগ কর। অবশেষে দেখা যাবে তৃষ্ণা ও অজ্ঞানতার ক্ষয় হচ্ছে। আমি আগেই বলেছি সবকিছু বা ৬ (ছয়) প্রকার বিজ্ঞান ভেদ করে নির্বাণ দর্শন হয়।

শ্রদ্ধেয় ভন্তে উপসংহারে বলেন- আমার দেশনা আর দীর্ঘায়িত করতে চাই না। আমার মনে হয় অনেক দুর থেকেও উপাসক-উপাসিকারা এসেছেন। দুর্গম বনপথ অতিক্রম করতে অসুবিধা হতে পারে। সুতরাং আর ২ (দুই) টি বক্তব্য রেখে আমার দেশনা এখানেই পরিসমাপ্তি করছি। জ্ঞান, কুশল ও কৌশল না থাকলে এ সংসারে বাঁচতে পারে না। অন্যজনকে দুঃখ দিয়ে নিজে কোনদিন সুখী হতে পারে না। বিপদ মুক্ত ও সুখে থাকতে হলে সকল প্রাণীর প্রতি মৈত্রী কামনা ও সুখ কামনা কর। লোভ, হিংসা ও মোহকে ভালভাবে জেনে তা ত্যাগ কর। বিভিন্ন ক্লেশাদি ত্যাগ করে ধর্মাচরণ করতে পারলে বিপুল সুখের অধিকারী হতে পারবে।

সাধু - সাধু - সাধু।

অপ্রমাদের সহিত পঞ্চশীল পালন কর

আজ ২১শে মার্চ ১৯৯৪ ইংরেজী রোজ সোমবার। বড়াদম পদ চাকমার বাড়ী। সকাল ১০টা ২৫ মিনিটে অষ্ট পরিস্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ ভৃগু ভিক্ষু।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্ম দেশনায় বলেন- ভয় হলো দ্বিবিধ। আহার ভয় ও অপায় ভয়। আহার ভয় দূরীভূত করার জন্য মানুষ লেখাপড়া করে, শিল্প

কাজ করে, ব্যবসা বাণিজ্য করে এবং নানাবিধ কৃষি কর্মে জীবিকা নির্বাহ করে। কারন মানুষ কর্মছাড়া চলতে পারে না।

অপায় ভয় হলো ৪ প্রকার- নরক ভয়, তীর্ষক ভয়, অসুর ভয় এবং প্রেত ভয়।

দ্বিবিধ ভয় হতে পরিত্রান পাওয়ার জন্যে একমাত্র পথ দান শীল ও ভাবনা। মনুষ্য জীবন অতি স্বল্প সময়। এ স্বল্প সময়ের মধ্যে কে কোন সময় মরতে হবে তা বলা যায় না। কেউ শিশুকালে কেউ কিশোরকালে, কেউ যৌবনকালে কেউ পৌঢ়কালে এবং কেউ বৃদ্ধকালে মারা যায়। সবসময় মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। যারা সব সময় শীল পালন করে মরন স্মৃতি ভাবনায় রত থাকে তারা মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যু বরণ করে।

মৃত্যুর পর তারা স্বর্গে গমন করে অথবা মনুষ্য লোকে উচ্চ কুলে জন্ম গ্রহণ করে।

তিনি আরো বলেন- তোমরা দুর্নীতি ত্যাগ করে সুনীতিতে প্রতিষ্ঠিত হও। পাপকার্যে ইহকালে দুঃখ পরকালেও দুঃখ ভোগ করে থাকে। সর্ব জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করে মৈত্রী ভাবাপন্ন হও। চাকমা, বড়ুয়া, মারমা, মুসলমান, হিন্দু এমনকি যে কোন প্রানীর প্রতি গভীর মৈত্রী ভাবাপন্ন হও। পঞ্চশীল পালন করে মৈত্রী ভাবনা করলে ইহ জীবনে এবং পর জীবনে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়। মৃত্যুর পর স্বর্গ সুখ ভোগ করা যায়। ভালভাবে শীল পালন করে ভাবনা করলে নির্বান সুখ প্রত্যক্ষ করা যায়।

শীল পালন না করলে মৃত্যুর সময় নানা রকম বিভীষিকা দেখে অজ্ঞানে মৃত্যু বরন করে। মৃত্যুর পর বিভিন্ন দুঃখময় অপায়ে পতিত হয়।

সৎকাজ বা পূন্য কাজে অবহেলা করে ফেলে রেখো না। অসৎকাজে বহু দোষ থাকে। সৎকাজে বহু উপকার হয়।

পঞ্চশীল লংঘনকারী বহু দুঃখ ভোগ করে। প্রাণী হত্যাকারী মৃত্যুর পর অপায়ে পড়ে। যদিও মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহন করে সে বহু বিধ রোগগ্রস্ত হয়। অকালে মৃত্যু বরণ করে। বিভিন্ন আঘাতে কষ্ট পায় অথবা মৃত্যু বরণ করতে বাধ্য হয়। চুরি কর্মে মানুষ মৃত্যুর পর অপায়ে পতিত হয়। যদিও মনুষ্য জন্ম লাভ করে থাকে তার জীবন অতি দুঃখে অতিবাহিত হয়। সারা জীবন দারিদ্রতায় কাটাতে হয়। পরনারী বা পুরুষ কামাচারে মৃত্যুর পর অপায়ে পতিত হয়। যদিও মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহণ করে তার সাংঘাতিক ব্যাধিতে

ভোগ করতে হয়। মিথ্যা ভাষনকারী মৃত্যুর পর মহাদুঃখ ভোগ করে। যদিও মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে সে বোবা, তোৎলা ও মুখে দুর্গন্ধযুক্ত হয়। মদ্যপায়ী মৃত্যুর পর বিবিধ যন্ত্রনা দায়ক অপায়ে পতিত হয়। যদি মনুষ্য লোকে জন্ম গ্রহণ করে সে পাগল হয় অথবা মুর্খ জীবন ধারন করে। তিনি জোর দিয়ে বলেন তোমরা ভুলেও কোন দিন মদপান করিও না। মদপানে বহুদোষ থাকে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- পঞ্চশীল রক্ষাকারীর পুরস্কার পাওয়া যায়। আর পঞ্চশীল লংঘন কারীর শাস্তি পাওয়া যায়। পাপের প্রতি লজ্জা কর, পাপের প্রতি ভয় কর এবং পাপকে প্রত্যক্ষ ভাবে ঘৃণা কর। তাতে তোমাদের ইহকাল পরকাল সুখময় জীবন কাটাতে পারবে।

বর্তমানে মানুষের জীবন অতীব ক্ষীণ। সুতরাং পূণ্য কাজে সর্বদা নিজেকে নিয়োজিত রাখা একান্ত দরকার। ভবিষ্যতে মানুষের জীবন আরো ক্ষীণ হবে। এমন কি অদূর ভবিষ্যতে ১০ বৎসর পর্যন্ত পরমায়ু হবে। সে সময় পূণ্যকেই বুঝতে (-) পারবেনা। পশুপক্ষী হতে ও অধম হবে। হিংসা ত্যাগ কর। অজ্ঞানতা ত্যাগ কর। পূণ্য কর্মে নির্ভীক হও। সব সময় শীল পালন কর। ধর্মাচারীকে ধর্মে রক্ষা করে। সুতরাং তোমরা অপ্রমাদের সহিত পঞ্চশীল পালন কর।

- o -

জন্ম হতে সব ধরনের দুঃখ ও ভয় উৎপত্তি হয়

আজ ২৫শে মার্চ ১৯৯৪ ইংরেজী। রোজ শুক্রবার। বনরূপা ত্রিদিব নগর। সকাল ৯ টা ৩৫ মিনিটে বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করেন বন বিহারের সাবেক সভাপতি বাবু ডাঃ হিমাংশু বিমল দেওয়ান। কণ্ঠ দিয়েছেন কয়েকজন শিল্পীবৃন্দ। শ্রদ্ধাভিনন্দন পাঠ করেন বন বিহার পরিচালনা কমিটির সভাপতি বাবু সুনীতি বিকাশ চাকমা (সক্ক)। অনুষ্ঠান সূচী পরিচালনা ও পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু সঞ্চয় বিকাশ চাকমা। যথাক্রমে বুদ্ধপূজা, সীবলী পূজা, সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

আজ সকাল বেলা হতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অনুষ্ঠানের শুরুতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিপাত হয়। এ বৃষ্টিপাত ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ১০টা ১৫ মিনিট হতে ১০টা ২০ মিনিট পর্যন্ত মাত্র ৫ মিনিট ধর্মদেশনা করেন।

দেশনার প্রারম্ভেই তিনি বলেন- চারি-আর্যসত্য দেশনা, প্রজ্ঞাপন, প্রকাশন, স্থাপন, ঘোষনা ও প্রতিষ্ঠা করার নামই ধর্ম কথা বা ধর্ম দেশনা। দুঃখে জ্ঞান, দুঃখের কারনে জ্ঞান, দুঃখ নিরোধে জ্ঞান, ও দুঃখ নিরোধগামী প্রতিপদায় জ্ঞানকে ধর্মজ্ঞান বলে। মানুষ কেউ অধোপাতে যায় আবার কেউ উর্দ্ধলোকে যায়। যারা আর্যসত্য ধারন করতে সক্ষম তারা উর্দ্ধলোকে যায়।

তিনি আরো বলেন- যত প্রকার দুঃখ ও ভয় উৎপত্তি হয় শুধু জন্ম হতে। জন্ম ধারন করলে সংসারের নানা প্রকার ভয় ও দেহ ধারণে ভয়। যার প্রাণ থাকে তার নানাবিধ ভয় ও থাকবে। যেমন শোনা গেলো ঘাগড়াতে বহুলোকের মধ্যে কাটাকাটিতে বহুলোক হতাহত হয়েছে। যাদের প্রাণেরভয় আছে তাদের ভয় উৎপত্তি হবে। যাদের ধর্মজ্ঞান লাভ হয়েছে তাদের ভয় ও মরন ভীতি থাকবে না। কারন তারা মরনকে জয় করেছে।

পৃথিবীর যত প্রকার দান আছে তৎমধ্যে জ্ঞানদান, ধর্মদান ও অভয়দানই শ্রেষ্ঠ দান নামে অভিহিত। যাঁরা ধর্মজ্ঞান লাভী তারাই শুধু এ ত্রিবিধ দান দিতে পারেন।

হুজুকে পড়ে কেউ ধর্ম গ্রহন বা পালন করবে না। প্রত্যেকের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে ধর্ম কি? ধর্মেতে আছে শুধু চারি আর্যসত্য। চিত্তে আসে অনাবিল সুখ ও শান্তি, পাপকে ধ্বংস করে, দুঃখকে সম্পূর্ণ রূপে বিনাশ করে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- আজ তোমরা বৃষ্টিতে ভিজে ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মদেশনা শ্রবন করতেছ। সে রকম বনভন্তে ও অনেক বার বৃষ্টিতে ভিজে ধ্যান সমাধি করেছেন। এ পূন্যের ফলে তোমাদের সুখ ও শান্তি আসুক। এ বলে আমার দেশনা আপাততঃ শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

পঞ্চস্কন্ধের উত্থান পতন বা জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ বন্ধ কর

আজ ১৫ই মার্চ ১৯৯৪ ইংরেজী রোজ মঙ্গলবার। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধ্যান কুঠির উৎসর্গ, শ্রীমৎ বোধিপাল ভিক্ষু ও শ্রীমৎ নন্দপাল ভিক্ষুর মহাস্থবির বরন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংক্ষিপ্ত ধর্মদেশনা।

তিনি প্রথমেই বলেন- পঞ্চস্কন্ধের উত্থান পতনে মানুষ বা সত্ত্বরা একবার জন্ম গ্রহণ করছে আর একবার মৃত্যু বরণ করছে। এভাবে চক্রাকারে অনন্তকাল পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করা এবং মৃত্যু বরণ করা মহা দুঃখজনক। এ দুঃখ হতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় নির্বাণ। এখানে যারা উপস্থিত হয়েছে তাদের্ও একদিন না একদিন মৃত্যু বরন করতে হবে। কিন্তু পুনরায় জন্মগ্রহণ করেও বিবিধ দুঃখের ভাগী হতে হবে।

এরূপ দেশনা করায় মুবাছড়ির বিন্দু কুমার চাক্মা বলেছিল- প্রত্যেকের যদি জন্ম মৃত্যু হয়ে থাকে, তবে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ও জন্ম মৃত্যু হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পরোক্ষভাবে উত্তরে বলেন- জন্মগ্রহণ করে যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করুক না কেন নির্বাণ লাভ না করা পর্যন্ত মৃত্যু হবেই। জন্ম হলেই জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, যা চায় তা পায়না এ কারণে দুঃখ, আহার অন্বেষনে দুঃখ, পূর্ব জন্মের পাপ জনিত দুঃখ, প্রাকৃতিক নানা প্রকার দুর্যোগ জনিত দুঃখ, সংসারের নানাবিধ অশান্তি জনিত দুঃখ প্রভৃতি লেগেই থাকবে। মনুষ্য জন্মের দুঃখগুলি বর্ণনা করা যায়। কিন্তু অন্যান্য প্রাণীর দুঃখ বর্ণনাতীত।

এ দুঃখগুলির কারণ অবিদ্যা-তৃষ্ণা। যা দুঃখ আছে তা দুঃখ নিরোধও আছে। দুঃখ নিরোধের উপায় হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। সংক্ষেপে শীল, সমাধিও প্রজ্ঞা। জন্মগ্রহণ না করলে মৃত্যুও হবেনা। সুতরাং নানাবিধ দুঃখ ও ভোগ করতে হবে না।

মানুষের চিত্ত হল শিশুর মত চঞ্চল মতি। এ চঞ্চল চিত্তকে স্থির করার একমাত্র উপায় শমথ-বিদর্শন ভাবনা। একটা ব্যবসা করতে হলে তার পূঁজির দরকার। ঠিক বিদর্শন ভাবনা করতে হলেও শীল ও শমথ ভাবনার দরকার।

বিদর্শনে প্রথমে পঞ্চ স্কন্ধকে চিনতে হবে, জানতে হবে এবং পুংখানুপুংখরূপে বুঝতে হবে। পঞ্চ স্কন্ধ সম্বন্ধে ভালভাবে পরিচয় হলে উদয়-ব্যয় ভাবনা করতে হবে। বিশুদ্ধভাবে উদয় ব্যয় ভাবনায় ক্রমান্বয়ে বুদ্ধজ্ঞান উৎপত্তি হয়। এ বুদ্ধজ্ঞানে সর্ববিধ দুঃখ নিরোধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম-মৃত্যু ও নিরোধ হয়। নির্বাণে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নেই।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- জনৈক ব্যক্তির পাহাড়ের পাশে তিন কানি জমি আছে। জমিগুলি ততসুবিধাজনক নয়। হাঁটু পর্যন্ত কাদায় পা ঢুকে যায়। জমির মধ্যে মধ্যে বড় বড় আগাছায় ভর্তি। (চাক্‌মা ভাষায় গুইট্যা বলে)। সে জমিতে চাষ করা মহা কষ্টকর। সারা বৎসরের ফসল উৎপন্ন হয় না। অতি দুঃখে জীবনযাপন করতে হয়। যদি অন্য জায়গায় ২৪ কানি জমি পায় সে লোকের অবস্থা নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে। সারা বৎসর অনায়াসে খেয়ে আরো উদ্বৃত্ত ফসল থাকবে। তা হলে বৃহত্তর স্বার্থের জন্যে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করা উচিৎ। সেরূপ তিন কানি খারাপ জমি হল হীন জীবন যাপন করা, আর ২৪ কানি উত্তম জমির চাষ হল শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

মানুষ মৃত্যুকালে নানা প্রকার মুর্তি দর্শন করে। কর্মফলে যার যে নিমিত্ত দর্শন করে তার সে কর্মে গতি প্রাপ্ত হয়। তৃষ্ণাই পাঁচ প্রকার গতি নির্ণয় করে। নির্বাণে পঞ্চ গতি একেবারে বন্ধ করে দেয়। শমথ ভাবনায় স্বর্গে বা ব্রহ্মের দিক নির্ণয় করে। শীল পালন করলে স্বর্গে গমন করে। যদিও মনুষ্য লোকে জন্মগ্রহন করে তার জন্ম হয় উচ্চ কুলে। যারা শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা পালন করবেনা, তারা ভূত প্রেত, যক্ষ, অসুর বিভিন্ন ইতর প্রাণী, এবং এমন কি মহাযন্ত্রনা দায়ক নরকে পতিত হবে। তোমরা শীল সমাধি, প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত হও। আমার উপদেশ, শিক্ষা গ্রহণ ও পালন না করলে নিশ্চয়ই চারি অপায়ে পতিত হবে। সুতরাং পঞ্চ স্কন্ধের উত্থান পতন বা জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ বন্ধ কর।

সাধু - সাধু - সাধু।

অন্তর দৃষ্টি ভাব উৎপন্ন কর

আজ বৃহস্পতিবার ১২ই নভেম্বর ১৯৯২ ইংরেজী। রাজবন বিহার দেশনালয়। বিভিন্ন স্থান হতে আগত সদ্ধর্মপ্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মদেশনা প্রদান করেন। এ দেশনাটি সংগ্রহ করেছেন বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ সুদত্ত ভিক্ষু।

তিনি দেশনায় বলেন- সদ্ধর্মকে বুঝবার যার আগ্রহ থাকবে তার অন্তর দৃষ্টিভাব উদয় হবে। আর অন্তর দৃষ্টিভাব যার নেই সে কখনো সদ্ধর্মকে বুঝতে সক্ষম হবে না। তা হলে অন্তর দৃষ্টিভাব কি? নিজকে বুঝবার ক্ষমতা বা আত্মদর্শন নিজকে বুঝবার ক্ষমতা জন্মিলে সদ্ধর্মকে বুঝবার সামর্থ অর্জন করে। তাতে অন্তর দৃষ্টির ধারায় নিজের মনে বা চিত্তে শান্তি লাভ করতে পারে। যার চিত্তে অশান্তি অনুভব করে তার অন্তর দৃষ্টিভাব ও উৎপন্ন হয় না। সে জন্য ধর্মদেশনা শ্রবনের সময় প্রত্যেকের অর্ন্তদৃষ্টিভাব উৎপন্ন করা একান্ত দরকার। অন্তর দৃষ্টিতে লোকোত্তর জ্ঞান ও ধর্ম চক্ষু উৎপন্ন হয়।

তিনি বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম-কঠিন এবং বুঝাও কঠিন ব্যাপার। যথা- স্কন্ধ, আয়তন, ধাতু, ইন্দ্রিয়, সত্য, স্ত্রী-পুরুষ, যোনিগতি এবং ভব সম্বন্ধে জানা বা বুঝা মহা কঠিন। এগুলি সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বুঝা সম্ভব নয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- সাধারণ মানুষ তার সাধারণ জ্ঞান দিয়ে আমার ধর্ম অনুধাবন করতে পারবে না। যারা অসাধারণ তারা আমার ধর্ম অনুধাবন করতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- মানুষের মনে যে ভুল ভ্রান্তি থাকে সে ভুল ভ্রান্তি নিরসনের জন্য ভগবান বুদ্ধ সত্যের বাণী ও অহিংসার বাণী এ পৃথিবীতে প্রচার করেছেন। মানুষ ভুল ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে কত অন্যায় কত অপরাধ করে থাকে তার কোন অন্তসীমা নেই। ভগবান বুদ্ধ মানুষের সে ভুল ভ্রান্তিগুলি মোচন করে দিতে পেরেছেন। দুঃখ হতে উদ্ধার করে দিতে পেরেছেন এবং চিত্তেআনাবিল শান্তি এনে দিতে পেরেছেন। এ ভুল ভ্রান্তিগুলি কোথায় থাকে? মানুষের মনের মধ্যে বা চিত্তের মধ্যে লুকায়িত থাকে। মানুষ পীড়াগ্রস্থ হলে ঔষধের প্রয়োজন হয় সেরূপ নানাবিধ ভুল ভ্রান্তির জন্য চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

তিনি বলেন- পাপমতিমারকে দমন করতে হবে। পাপ মতি মার কি? বৌদ্ধ ধর্ম মতে মার বলা হয়। হিন্দু ধর্ম মতে শনি। ইসলাম ও খৃষ্টান ধর্ম মতে শয়তান নামে আখ্যায়িত করেছেন। ভগবান বুদ্ধ নাম দিয়েছেন পাপ আত্মামার। এ পাপ আত্মা মার দ্বারাই মানুষ যাবতীয় দূর্নীতির কাজ এবং অন্যায় অপরাধ করে। মানুষের মনের ভিতরে থেকে সব সময় মানুষকে কুপথে পরিচালিত করে। ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ তাঁর বুদ্ধজ্ঞানে দেখেছেন মানুষের মনে কতগুলি শত্রু লুকায়িত আছে। এ শত্রুগুলিকে জ্ঞানের বলে, সত্যের বলে এবং পূণ্যের বলে বাহির করে দিতে হবে। যারা শত্রুগুলি চিত্ত হতে বাহির করে দিতে পেরেছেন, তাহা অনুভব করতে পেরেছেন তাদের চিত্ত এখন আরোগ্য ও স্বাধীন।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- প্রত্যেক মানুষের ভিতরে রিপু শত্রু আছে। এ শত্রুগুলিকে দিবারাত্র আহার্য্য দ্বারা পোষন করা উচিত নয়। সে শত্রুগুলি থাকলে প্রত্যেক মানুষকে ধ্বংস করবে, আক্রমণ করবে এবং বিভিন্ন দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে দেবে না। কাম প্রবৃত্তি, হিংসা প্রবৃত্তি এবং রাগ প্রবৃত্তি হচ্ছে মানুষের প্রধান শত্রু। কাম প্রবৃত্তি যখন উৎপন্ন হবে সঙ্গে সঙ্গেই দমন করতে হবে। হিংসা প্রবৃত্তি যখন উৎপন্ন হবে সঙ্গে সঙ্গেই দমন করতে হবে। রাগ প্রবৃত্তি যখন উৎপন্ন হবে সঙ্গে সঙ্গেই দমন করতে হবে। এ শত্রুগুলিকে জ্ঞানের বলে, সত্যের বলে এবং পূণ্যের বলে জয় করতে পারলে চিত্তে অনাবিল সুখ ও শান্তি আসে। যারা অজ্ঞানী বা যারা দমন করতে চেষ্টা করে না তারা অধো পথে যায়। ভগবান বুদ্ধ ধর্ম প্রচারে বলেছেন মানুষ যাতে অধোপথে না যায় অর্থাৎ নিম্নগামী না যায় প্রত্যেকের উর্দ্ধগামী হওয়া একান্ত দরকার।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- মানুষ বা উপাসক-উপাসিকারা নিম্নগামী না হোক, উর্দ্ধগামী হোক এবং অজ্ঞান পথ পরিহার করে জ্ঞানের পথে চলুক, মিথ্যার পথ পরিহার করে সত্যের পথে চলুক। পরিশেষে সর্বদুঃখ বিনাশ করে পরম শান্তি নির্বাণ প্রত্যক্ষ করুক। এ বলে আমার দেশনা এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

১লা বৈশাখ (১৪০১ বাংলা) উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ নন্দপাল মহাথেরোর ধর্মদেশনা

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের প্রধান শিষ্য শ্রদ্ধেয় নন্দপাল ভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ধর্মদেশনায় বলেন- ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ দেব, ব্রহ্মা ও মনুষ্যদের উদ্দেশ্যে যে ধর্মদেশনা প্রদান করতেন তা সঙ্গে সঙ্গেই মার্গফল লাভ করতো। কিন্তু বর্তমানে মার্গফল লাভ করতে পারছে না কেন?

বুদ্ধের ধর্মের শাসনকাল হলো পাঁচ হাজার বৎসর। তাঁর জীবদ্দশা হতে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত ধর্মের তেজ খুব উজ্জল ছিল। সে সময় ভিক্ষু-ভিক্ষুনী, উপাসক-উপাসিকারা সহজেই মার্গফল লাভ করতে পারতো। কিন্তু পরবর্তী সময় যখন দুই হাজার বৎসরের পরে তখন মার্গফল লাভীর সংখ্যা কমে যায়। বর্তমান দুই হাজার পাঁচ শত সাইত্রিশ বুদ্ধাব্দ চলছে। এখন মার্গফল লাভীর সংখ্যা প্রায় কমেই উঠেছে। ভবিষ্যতে আরো কমে যাবে। ক্রমান্বয়ে চার হাজার বৎসর যখন হবে তখন পৃথিবীর মধ্যে খুব কচিৎ মার্গফল লাভীর দর্শন পাওয়া যাবে। পাঁচ হাজার বৎসর পরে যখন মার্গফল লাভী শূন্য হবে তখন বৌদ্ধ ধর্ম ও পৃথিবী হতে বিলুপ্তি ঘটবে।

তিনি বুদ্ধের সময়ের একটা উপমা দিয়ে বলেন- জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করেছিলেন কোন ব্যক্তি ভগবান বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে থাকলে বেশী ধন্য? না দূরে থেকে ধর্ম পালন করছে সে বেশী ধন্য? ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন কাছে বা দূরে কোন প্রশ্নই না, যে বুদ্ধের আদেশ ও উপদেশ যথাযথ ধর্ম আচরণ করেন সেই ধন্য।

তিনি আরো বলেন- এক কথায় বলতে গেলে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা যার কাছে আছে তিনিই ভগবান বুদ্ধের অতি নিকটে আছেন। অন্যেরা বহুদূরে অবস্থান করছে। যেমন চন্দ্র-সূর্য্য চোখে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বহু দূরে অবস্থিত। ঠিক সেরূপ অন্যদের ও ভগবান বুদ্ধ বা বৌদ্ধধর্ম হতে অনেক দূরে অবস্থান করছে।

ভগবান বুদ্ধের ধর্মের যুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয়। কেননা যার আদিতে কল্যান, মধ্যে কল্যান, এবং অন্তে কল্যান সাধিত হয়। দ্বিতীয়তে সমাধি

শীলকে শক্তভাবে ধরে রেখে প্রজ্ঞা আহরণ করতে হবে। প্রজ্ঞা আহরনেই মার্গফল প্রাপ্তি ঘটে।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- কোন এক রাখালের কতকগুলি গরু আছে। তার প্রধান কাজ হলো গরুগুলি যথাযথ ভাবে চড়ানো এবং ভালমন্দ দায়িত্ব নেয়া। ঠিক সেরূপ মধ্যে কল্যান বা শমথ ভাবনা। শমথ ভাবনায় যেমন ত্যাগনুস্মতি, শীলনুস্মতি, মরনস্মতি প্রভৃতি ভাবনায় যোগীর চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং মৃত্যুর পর উর্দ্ধলোকে যায়।

অন্তে কল্যানে বা বিদর্শনে সর্বদাই গভীর স্মৃতিতে থাকতে হয়। তাতে যোগীর নামরূপ সম্বন্ধে জানে, বুঝে এবং ভালভাবে চিনে। ক্রমান্বয়ে নামরূপ দর্শনে উদয় ব্যয় জ্ঞান উৎপত্তি হয়। উদয় ব্যয় জ্ঞানে অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম বা ত্রিলক্ষন জ্ঞান উৎপত্তি হয়। এভাবে যোগীর ষোল প্রকার বিদর্শন জ্ঞান উৎপন্ন হয়। জ্ঞান পরিপূর্ণ হলে নিজকে নিজে বুঝতে পারে কতটুকু মুক্তির পথে অগ্রসর হয়েছে।

পূর্বকালে বা বুদ্ধের সময়ে কাম ও ভোগ বিলাস কম ছিল। বর্তমানে খুব বেশী। সেজন্য গম্ভীর ভীতরে থাকতে হচ্ছে। বিভিন্ন কাজ কর্ম হলো অপরের কাজ। শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞাই নিজের কাজ। সদ্ধর্ম আচরনই একমাত্র নির্বাণ লাভ করার উপায়। নির্বান পরম সুখ, মুক্ত এবং নিজধর্ম নামে অভিহিত।

ত্রিবিধ তৃষ্ণায় মানুষ মুক্ত হয় না। তৃষ্ণাই মানুষ বা সত্ত্বকে কতবার জন্ম-মৃত্যু করাচ্ছে তার কোন পরিসীমা নেই। শীল পালনে দেবলোক ও মনুষ্যলোক পরিভ্রমণ করতে হয়। সমাধিতে ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে। কিন্তু পুনজন্ম হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। প্রজ্ঞায় সত্ত্বদেরকে নির্বানের দিকে ধাবিত করে। যে জিনিষ পেয়ে আবার হারিয়ে যায় বা পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি অনিত্য দুঃখ ও অনাত্ম। এ ত্রিলক্ষন জ্ঞানই চারিমার্গ, চারিফল ও নির্বান বা নবলোকত্তর ধর্ম উপলব্ধি হয়। নির্বানে কুশল ও অকুশল নেই।

পরিশেষে শ্রদ্ধেয় নন্দপাল ভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন তোমাদের এখনও সময় ও সুযোগ আছে সদ্ধর্ম আচরণ করতে সচেষ্ট হও। এবলে আমার দেশনা আপাততঃ এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

ত্যাগ, অনাসক্ত ও বিবেকই উত্তম সুখ

আজ ৬ই মে ১৯৯৪ ইংরেজী। রোজ শুক্রবার। দক্ষিণ কালিন্দিপুর সার্বজনীন সংঘদান উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সশিষ্যে শুভ আগমন। বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাবু চিত্ত রঞ্জন চাক্‌মা। সঙ্গীত পরিবেশনে বাবু রঞ্জিত দেওয়ান ও তাঁর সঙ্গীরা। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু অতনু রায় ও ধর্মানুষ্ঠান পরিচালনা করেন বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ বৃক্ষজিৎ ভিক্ষু।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ৯টা ৪৫ মিনিট হতে ১০টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক উপাসক-উপাসিকাদের উপস্থিতিতে এক গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ ধর্ম দেশনা প্রদান করেন।

তিনি বলেন- ভগবান বুদ্ধ যতদিন পর্যন্ত জীবিত ছিলেন ততদিন পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বা বুদ্ধের শাসন নির্মল ছিল। কালক্রমে বৌদ্ধ ধর্ম কর্দমে পরিণত হয়ে আসছে। ইহার একমাত্র কারণ ভিক্ষুদের লাভ-সৎকার অবলম্বন করা।

তিনি বলেন- লাভ-সংস্কার, সম্মান ও পূজার পথ এক এবং নির্বানের পথ এক। ভিক্ষুরা লাভ, সৎকার, সম্মান এবং নিজকে পূজা করার সুযোগ তালাশ করতে পারেনা। একমাত্র তালাশ করতে পারে নির্বাণ।

কাহারো কাহারো মনে উদয় হতে পারে বনভন্তে কি তালাশ করেন? তিনি কি লাভ্‌সৎকার, সম্মান ও পূজা তালাশ করেন? না বিধা্‌ন তালাশ করেন? কেউ কেউ মন্তব্য করে বলেন- বনভন্তে যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন তাঁর নীতি ও আদর্শ বজায় রাখবেন। পরবর্তীতে বিলীন হয়ে যেতে পারে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ত্যাগ, অনাসক্ত ও বিবেকই উত্তম সুখ। প্রথমেই হীন মনুষ্যত্ব ত্যাগ করতে হবে। যাবতীয় তৃষ্ণা ত্যাগ করতে হবে এবং হীন সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। যাবতীয় তৃষ্ণা ত্যাগ করতে হবে। এবং হীন সংস্কার ত্যাগ করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ কামাসক্ত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, আহারাসক্ত মিত্রাসক্ত, নিদ্রাসক্ত ও কর্মাসক্ত সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। তৃতীয়তঃ ত্রিবিধ বিবেক অবলম্বন করতে হবে। লোকালয় বর্জন করে নির্জনে ধ্যান করাকে কায় বিবেক বলে। মানুষের চিত্ত চঞ্চল ও অস্থির। এ চঞ্চল ও

অস্থির চিত্তকে স্থির করাকে চিত্ত বিবেক বলে। মানুষের চিত্তে বিভিন্ন সংস্কারও স্থাপিত থাকে। এ সংস্কার পূঞ্জ ও ক্লেশগুলি উচ্ছেদ করে চিত্তকে নির্বাণ উপলব্ধি করাকে উপধি বিবেক বলে।

তিনি আরো বলেন- মন চিত্তে অনাবিল সুখ অনুভব করতে হবে। নির্বাণে অনাসক্ত ও বিবেক পূর্ণ। মানুষ দুঃখ, যাবতীয় তৃষ্ণা দুঃখ, কায় সংস্কার দুঃখ, বাক সংস্কার দুঃখ এবং চিত্ত সংস্কার দুঃখ পূর্ণ। নারী বা পুরুষ অনাসক্ত হলে মহাসুখ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন- প্রত্যেককে দৃঢ়কণ্ঠে বলতে হবে- হে মন চিত্ত, তুমি অনাসক্ত ও বিবেকপূর্ণ হও। অনাসক্ত ও বিবেক পূর্ণ হলে চারি আর্য সত্যকে ভালরূপে বুঝতে সক্ষম হয়। যার কাছে চারি আর্য সত্য ও অপ্রমাদ আছে তার অগাধ পূণ্য লাভ হয়।

চারি আর্য সত্য দেখলে ও বুঝলে পরম সুখ উৎপত্তি হয়। তাতে স্রোতাপত্তি, চারি মার্গ ও চারি ফল প্রাপ্ত হয়। চারি আর্য সত্য না দেখলেও না বুঝলে অজ্ঞান অন্ধকারে থাকতে হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বনভন্তের নীতি ও আদর্শ মেনে চললে হাতে হাতেই ফল হবে। আর যদি বিরোধীতা করা হয় তাও ফলপ্রসু হবে। আমি চাক্‌মার ঘরে জন্মগ্রহণ করায় চাক্‌মা ভাষায় ধর্ম প্রচার করতে সুবিধা হচ্ছে। বড়ুয়া বা মারমার ঘরে জন্মগ্রহণ করলে পুংখানু-পুংখরূপে বুঝিয়ে দিতে পারতাম না।

তিনি উপমা দিয়ে বলেন- যেমন ধর, জনৈক ব্যক্তি খুব সুন্দর ও মজবুত করে ঝুড়ি (লেই) বানাতে পারে। যদি কেউ শিখতে আগ্রহ থাকে, সে নিশ্চয়ই বানাতে পারবে। ঠিক সেরূপ বনভন্তে যেভাবে ত্যাগ করছেন, যেভাবে অনাসক্ত ভাবে থাকছেন এবং বিবেক অবলম্বন করছেন সেভাবে যে কেউ চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হতে পারবে।

তিনি আরো উপমা দিয়ে বলেন- ভগবান বুদ্ধের প্রধান শিষ্য সারিপুত্র মহাথের ৮০ কোটি ধন ত্যাগ করে অনাসক্ত ভাবে বিবেকসুখ অনুভব করেছেন। ২টি কারণে ভোগীরা ত্যাগ করতে বাধ্য হন। একদিকে কৃপণ (কুলি) হয় অন্যদিকে তারা ক্রমান্বয়ে গরীব হয়। কৃপণ ও গরীবের শ্রদ্ধা

কম থাকে। কম শ্রদ্ধায় মানুষ মুক্তি পায় না। গভীর শ্রদ্ধার মুক্তির পথ দেখে।

তিনি বলেন- প্রায় ধনাঢ্য ব্যক্তি ও উচ্চ শিক্ষিত লোকের অহংকার (মান) থাকে। যতক্ষন বুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্তি না ঘটবে ততক্ষন তারা অহংকারের আবরনে আবদ্ধ থাকবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অতীব দৃঢ়কণ্ঠে বলেন- বেঙ পাল্লাতে মাপতে মহাকষ্ট কর। লাফ দিয়ে পড়ে যায়। ভিক্ষু শ্রমন ও উপাসক-উপাসিকারাও বেঙ এরমত। কেননা, তাদেরকে মাপতে হলে বা বুদ্ধ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে একটা উপায় কৌশল অবলম্বন করতে হবে। যেমন বেঙগুলি একটা পলিথিনের থলের মধ্যে আবদ্ধ করে মাপতে হবে। তেমন ভিক্ষু শ্রমন ও উপাসক-উপাসিকাদেরকে শক্তি থাকতে দুর্বলের ন্যায়, মুখ থাকতে বোবার ন্যায়, কান থাকতে বধিরের ন্যায় এবং চোখ থাকতে অন্ধের ন্যায় থাকতে হবে। এ কৌশলগুলি হল পলিথিনের থলের মত উপমা।

তিনি বলেন- বুদ্ধ জ্ঞানে নিজে নিজেই বুঝতে পারে আমি অন্ধকার হতে আলোতে এসেছি। মিথ্যা হতে সত্যে এসেছি এবং অজ্ঞান হতে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি। বিভিন্ন জনে বিভিন্ন প্রকার প্রার্থনা করে। কিন্তু উপরোক্ত প্রার্থনাগুলি করা উচিৎ। এটাই হল সর্বদুঃখ নিবৃত্তির প্রার্থনা।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- চারি ইর্য্যা পথে সুখ নেই। যেমন দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বসার ইচ্ছে হয়। বসে থাকতে থাকতে হাটতে ইচ্ছে হয়। শোয়ার মধ্যে ও সুখ পাওয়া যায় না। যে কোন বয়সে ও সুখ নেই। যেমন শিশুকালে সুখ নেই। কিশোর কালেও সুখ নেই। যৌবন কালেও সুখ নেই। বৃদ্ধকালেও সুখ নেই। তাহলে কোথায় সুখ? সুখ একমাত্র নিহিত আছে মার্গফলে। মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হলে তোমরা প্রথমেই পাপের প্রতি লজ্জাবোধ কর, পাপের প্রতি ভয় কর এবং পাপকে সর্বান্তকরনে ঘৃনা কর। তাহলেই তোমরা ত্যাগ, অনাসক্ত ও বিবেক সুখ অনুভব করতে পারবে। এ বলে আমার দেশনা এখানে আপাততঃ শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

মশারীরূপ অভয়দান

মধ্যে মধ্যে লক্ষ্য করা যায় অত্র অঞ্চলে নানাবিধ পরিস্থিতির কারণে সাধারণ লোকের মনে ভয় উৎপন্ন হয়। উক্ত ভয় নিরসনের জন্যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নিকট দলে দলে উপস্থিত হয়ে অভয় প্রার্থনা করে। একদিন রাজবন বিহার দেশনালয়ে বহু সংখ্যক উপাসক-উপাসিকাদের ভীড় ছিল। জনৈক অর্দ্ধ বয়সী উপাসিকা বনভন্তেকে বন্দনান্তে বলল- ভন্তে, আমাকে একটু আশীর্বাদ করুন। আমি যেন নিরাপদে বাড়ীতে যেতে পারি। আমার বাড়ী জুরাছড়িতে। বর্তমানে বনরূপাতে ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকি। বাড়ীতে যাওয়া আমার খুব দরকার। বনভন্তে বললেন- ঠিক আছে যাও। উক্ত মহিলা বনভন্তের অভয়বাণী পেয়ে উত্তফুল্লচিত্তে দেশনা শুনতেছে। অতঃপর তিনি আমার প্রতি লক্ষ করে বললেন- উক্ত উপাসিকা আমার নিকট হতে মশারী চেয়েছে। মশারী থাকলে মশা ও নানাবিধ পোকার উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। অভয়দান হলো মশারীর মত নানাবিধ দূর্যোগ ও মনুষ্য উপদ্রব হতে রক্ষা পাওয়া। তার চলাফেরা করতে কোন অসুবিধা হবেনা। পৃথিবীতে যত প্রকার দান আছে তৎমধ্যে ধর্মদান, জ্ঞানদান ও অভয়দানই শ্রেষ্ঠদান। ত্রিবিধ দান সম্বন্ধে তিনি বিভিন্ন উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। ভিক্ষুরা ত্রিবিধ দান ছাড়া অন্য দান দিতে পারে না।

তিনি আরো বলেন- চারি আর্য সত্য ও পাটিচ্চ সমুপ্পাদ সম্বন্ধে পুংখানুপুংখরূপে বুঝিয়ে দেয়াকে ধর্মদান বলে। লোকোত্তর জ্ঞান ও নির্বাণ সম্বন্ধে পুংখানুপুংখরূপে বুঝিয়ে দেয়াকে জ্ঞান দান বলে। বিভিন্ন আপদ বিপদ ও বিভিন্ন উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রতিশ্রুতি বা আশীর্বাদ প্রদানকে অভয়দান বলে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মশারীরূপ অভয়দান দেশনা শুনে উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাদের যাবতীয় ভয় অন্তর্ধান হয়।

- o -

অন্যায়, অপরাধ, ভুল, ত্রুটি, দোষ ও গলদ করো না

আজ ১লা এপ্রিল ১৯৯৪ ইংরেজী। রোজ শুক্রবার। ট্রাইবেল অফিসার্স কলোনী, রাঙ্গামাটি। সার্বজনীন সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সশিষ্যে শুভ আগমন। বৌদ্ধ ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন করেন বাবু বংকিম চন্দ্র চাকমা। উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন বাবু রন্‌জিত দেওয়ান। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু প্রগতি রঞ্জন খীসা। অনুষ্ঠানের আহ্‌বায়ক বাবু যামিনী কুমার চাক্‌মা ও পরিচালনা করেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার ভিক্ষু।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সকাল ১০টা ২০ মিনিট হতে ১০ টা ৫৫ মিনিট পর্যন্ত ধর্মদেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন- শ্রদ্ধার সহিত ধর্ম কথা বা ধর্ম দেশনা শ্রবণ, গ্রহণ, ধারন ও আচরণ করতে হয়। তাতে শ্রোতার অনেক ফল লাভ হয়। শ্রদ্ধা দু'প্রকার। লৌকিক ও লোকোত্তর। ত্রিরত্ন, কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করলে লৌকিক শ্রদ্ধা হয়। ইহকাল-পরকাল ও চারি আর্য্যসত্যকে বিশ্বাস করলে লোকোত্তর শ্রদ্ধা হয়। অশ্রদ্ধার সহিত ধর্মদেশনা শ্রবণ করলে কোন ফল হয় না।

মনুষ্য ধর্ম পাপ মুক্ত নয় ও দুঃখ। প্রথম সত্য ও দ্বিতীয় সত্য লৌকিক। অর্থাৎ নানাবিধ দুঃখ ও দুঃখের কারণ লৌকিক নামে অভিহিত। এ দু'সত্যে মানুষ সহজে মুক্তি পায়না। তৃতীয় ও চতুর্থ সত্য লোকোত্তর। অর্থাৎ নিরোধ সত্য ও মার্গসত্য বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে মানুষ মুক্তি পায়। নির্বানের পথকে মার্গ সত্য বলে। আবার নির্বাণ সত্যকে কুশলও বলা হয়।

এ কুশলকে কর্মস্থান বা শমথ-বিদর্শন ভাবনাও বলা হয়। ভাবনা হলো মনের কাজ। ভাবনা ছাড়া বুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ ব্যক্তি ভাবনা করতে পারে। এগুলিকে ত্রিহেতুক পুদগল বলে। তারা সহজে মুক্তির পথে চলতে পারে বা নির্বাণ লাভ করতে পারে।

কেউ কেউ দান করে ইহজীবনে সুখভোগ করার জন্যে এবং পর জীবনেও সুখভোগ করার জন্যে। কিন্তু নির্বাণ যাওয়ার জন্যে দান করা অতি উত্তম। যেমন দান এভাবে করতে হয়- এ দানের ফলে আমার নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ একত্রিশ লোকভূমির মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী। তাঁর প্রচারিত ধর্মই জ্ঞানের ধর্ম। তাও অসংখ্য বৎসর পর আবির্ভূত হন। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি উৎপত্তি হয়। কিন্তু বর্তমানে কিছু সংখ্যক লোকের ধারনা ভগবান বুদ্ধ অজ্ঞানী ও গরীব। তাদের অবিশ্বাসের ফলে তারা বুদ্ধের নির্বাণ পথ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে। যেমন কোন কোন ভিক্ষু অনাথ আশ্রম গড়ে তোলতেছে। কেউ কেউ সামাজিক কর্মে নিজকে সারাক্ষণ নিয়োজিত রাখছে। আর কেউ নানাবিধ কর্মের অধীনে থাকে। অর্থের ও প্রতিপত্তির মোহে নিজেও মুক্ত হতে পাচ্ছেনা এবং অপরকেও মুক্ত করতে পারছে না।

অন্যদিকে সত্যের আশ্রম হলো শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার আশ্রম। সত্যের আশ্রমে অকুশল ধর্মগুলি ত্যাগ করা যায় এবং উচ্চতর জ্ঞানলাভ হয়। কুশলে পূণ্য উৎপত্তি হয়, পাপ ক্ষয় যায়, দুঃখ সমূলে ধ্বংস হয় এবং ইহকাল পরকাল পরম সুখ লাভ হয়। কর্মের অধীনে থাকা মহা দুঃখজনক। নির্বাণের অধীনে মহাসুখ।

দেশনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন- এম. এ পাশ করে নরকে পড়লে সে লেখাপড়ার কোন মূল্যই নেই। যে যতটুকু লেখাপড়া করুক না কেন তার পাপে লজ্জা থাকতে হবে। ভয় থাকতে হবে। পাপের প্রতি ঘৃনা থাকতে হবে। তবেই এম. এ পাশের মূল্য থাকবে। অপ্রমাদ বা সাবধানে থাকলে পাপ নেই ও মার নেই। নিজকে নিজে সর্বদা সাবধানে থাকলে পরম সুখ উৎপত্তি হয় এবং অপরকেও সাবধানতা অবলম্বন করতে নির্দেশ দিতে পারে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- অন্ধকে যে কোন জিনিষ দেখানো বৃথা। মূর্খকে চারি আর্যসত্য ও উচ্চতর জ্ঞান সম্বন্ধে বুঝানো তেমন বৃথা। মূর্খেরা নানাবিধ দোষ করে ও অবাধ্য থাকে। সব সময় অজ্ঞানে অজ্ঞানে সংঘর্ষ বাঁধে। দুঃশীল, অধর্ম পরায়ন ব্যক্তি বৌদ্ধ ধর্মের নষ্টের কারণ।

তিনি উপসংহারে বলেন- তোমরা মিথ্যার আশ্রয়ে যেয়োনা। সত্যের আশ্রয়ে যাও। সত্যে তোমাদের রক্ষা করবে এবং পরম সুখ প্রদান করবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি মুহূর্তে, কথায় কাজে ও চিন্তায়, অন্যায়, অপরাধ, ভুল, ত্রুটি, দোষ ও গলদ করোনা। অচিরেই তোমাদের পরম সুখ বয়ে আসবে। এ বলে আমার দেশনা আপাততঃ এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

যক্ষিনীর সাথে তিন বৎসর বসবাস

ছোট বেলায় লোক মুখে অনেক যক্ষের গল্প শুনেছি। আধুনিক যুগে ভূত, প্রেত, দৈত্য, যক্ষ প্রভৃতি অশরীরি প্রাণী অনেকে কাল্পনিক বলে মনে করেন। জড় বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার সময় এগুলির সংখ্যাও ক্ষীণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে কেউ কেউ বিশ্বাস করেন।

বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে অনেক ভূত, প্রেত, যক্ষ, দেবতা, ব্রহ্মা এবং বিবিধ অশরীরির বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলিকে উপপাতিক জন্মজ প্রাণী বলা হয়। এ সম্বন্ধে অনুলোম- শুচি-লোম এবং আলবক যক্ষের উল্লেখ করা যায়। ত্রিপিটকে বর্ণিত আলবক যক্ষ ভগবান বুদ্ধকে ১২টি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছিল। তা বর্তমানে বৌদ্ধ নরনারীর অমূল্য সম্পদ হয়ে রয়েছে। যারা বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী তাদের নির্দ্ধিধায় স্বীকার করতে হয়। এ সম্বন্ধে বিমান বত্থু, প্রেত কাহিনী এবং বিভিন্ন অটট্ কথায় প্রচুর অশরীরির প্রমান পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য যে, বিগত ১৯৮৩ ইংরেজীতে বন বিহারের শাখা যমচুগ বন বিহার স্থাপিত হয়। যমচুগ পাহাড়ের উত্তর পাশে এক যক্ষের সন্ধান পাওয়া যায়। পূর্বে সেখানে কেউ বসতি স্থাপন বা জুম চাষ করতে পারত না। সে ব্যাপারে "বনভন্তের দেশনা" ১ম খন্ডে কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের আগমনে যম পাহাড় যক্ষের উৎপাত থেকে মুক্ত হয়েছে। উক্ত যক্ষ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন- সে এলাকায় জনৈক ব্যক্তি মহিষের আঘাতে মৃত্যুর পর যক্ষরূপে আভির্ভূত হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় বনভন্তের শিষ্য বুড়া ভন্তের সাথে জনৈক ব্যক্তি যক্ষের ধন সম্বন্ধে আলাপ করতে শুনেছি। আমি সে ব্যাপারে আগ্রাহান্বিত হয়ে উক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলাম। আপনার বাড়ী কোথায়? এ ব্যাপারে আমাকে

একটু বলুন। তিনি বললেন- আমি আপনাকে চিনি। আমার বাড়ী বেতবুনিয়া থানার মনাইপাড়া গ্রামে। আজ কয়েক বৎসর যাবত যক্ষের ধন সম্বন্ধে স্বপ্নে দেখতে পাই। দিনের বেলায় বাস্তবেও প্রমাণ পেয়েছি। এগুলি উত্তোলন করে প্রথমে বিহারের কাজে ব্যয় করতে, অবশেষে নিজে খরচ করতে পারব। এরূপ নির্দেশ পেয়েছি। এ ব্যাপারে আমি অনেক তন্ত্রমন্ত্র ধারী বৈদ্য দ্বারা চেষ্টা করেছি। এমনকি ভিক্ষু নিয়ে পরিত্রাণ সূত্রও শ্রবন করেছি। পরিশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সমীপে উপস্থিত হলাম। উক্ত বিষয় অবগত হয়ে বনভন্তে বললেন- যাও, যাও। অতঃপর উক্ত ব্যক্তি আমাকে বললেন- এ ব্যাপারে আমাকে আপনারা সহযোগীতা করলে ঐ অর্থ সম্পদ প্রায়ই বন বিহারের কাজে ব্যয় করব। আমি সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বললাম- শ্রদ্ধেয় বনভন্তের না সূচক নির্দেশে পুনঃবার উথাপন করা উচিত হবে না।

অন্য একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কোন সাড়া না পেয়ে এক বয়স্ক দম্পতি চলে যাচ্ছিলেন। আমি এ ব্যাপারে তাদের নিকট হতে কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাদের বাড়ী মারিশ্যায় এক গ্রামে। বাড়ীর পাশেই এক প্রকান্ড বটগাছ। সব সময় স্বপ্নে দেখতে পায়- "তোমাদের ধন সম্পদ তোমরা নিয়ে যাও। এগুলি তোমাদের জন্যে রেখেছি"। সত্যি সত্যি ওখানে অনেক স্বর্ণ মুদ্রা দেখেছি। শুধু কয়েকজন ভিক্ষু দিয়ে সূত্র পাঠ করলেই হবে। তাতে কোন ফল লাভ হয়নি। এবার শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শরণাপন্ন হলাম। তাতেও বিফল হয়েছি।

এমন কতগুলি ঘটনা আছে তার কোন যথাযথ লিপিবদ্ধ প্রমান নেই। কালক্রমে মানুষের স্মৃতি অতলতলে ডুবিয়ে যায়। আজ হতে ছয় বৎসর পূর্বে এক যক্ষিনীর কাহিনী উদঘাটিত হয়। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সশিষ্যে উক্ত স্থানে পদার্পন করায় যক্ষিনীর অন্তর্ধান ঘটে। তার সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে আমার অনেকদিন সময় লেগেছে। এ তথ্যের প্রতিবেদন লিখে দিয়েছেন বাবু প্রমোদ রঞ্জন চাক্মা। উক্ত কাহিনী অতি দীর্ঘ বিধায় পাঠকদের দৈর্য চ্যুতির ভয়ে সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করছি।

বাবু নির্মল কান্তি চাক্মা বনভন্তের একনিষ্ঠ উপাসক এবং বন বিহার পরিচালনা কমিটির সাবেক সহ-সভাপতি। তিনি উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিত ব্যক্তি। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উপদেশে ১৯৮৩ ইংরেজীতে রফতানী ও মার্কেটিং অফিসার পদ হতে পদত্যাগ করে বাগান ও ব্যবসা বাণিজ্যে রত আছেন। তাঁর স্থায়ী ঠিকানা বনরূপায় ত্রিদিব নগরে। নির্মল বাবু বাগান করার জন্যে

উপযুক্ত স্থান খুঁজতে খুঁজতে হাজারী বাঁক মৌজায় কান্দেব ছড়া কাগত্যায় ৬ (ছয়) একর পাহাড় বন্দোবস্তী করেন। তিনি শুনতে পেলেন এ জায়গায় বহু বৎসর যাবৎ কোন লোক বসতি বা জুম চাষ করতে পারে না। সুতরাং অনাবাদী অবস্থায় পড়ে আছে। কারন অমনুষ্যের উৎপাতে হয়ত লোক মারা পড়ে নতুবা হঠাৎ রোগে আক্রান্ত হয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। তিনি দুঃসাহস করে সেখানে বিভিন্ন গাছ এবং ফলের বাগান করেন। হ্রদের ধারে একখানা খামার বাড়ীতে তাঁর মেঝ ভাই বাবু প্রমোদ রঞ্জন চাক্‌মা, মিসেস্ বিজয় লক্ষ্মী চাক্‌মা ও দুই ছেলে মেয়ে থাকেন। মধ্যে মধ্যে নির্মল বাবু বাগানের কাজের জন্যে কিছু সংখ্যক মজুর নিয়ে সেখানে সাময়িকভাবে অবস্থান করেন। এভাবে কোন উপদ্রব ছাড়া তিন বৎসর কেটে যায়। তাঁরা মনে করছেন ওখানে বোধ হয় কোন অমনুষ্য বা যক্ষের উপদ্রব নেই অথবা কালক্রমে তা তিরোহিত হয়েছে।

কোন একদিন পাহাড়ের অপর প্রান্তে বাগানের কাজে ব্যস্ততায় প্রমোদ বাবু সন্ধ্যার একটু পরে খামারে ফিরছিলেন। অন্ততঃ পঞ্চাশ হাত দূরে দেখতে পেলেন এক বিভৎস ধরনের মূর্তি। কপালে দুটি ও দুই বাহুতে দুটি ইলেকট্রিক বাল্ব এর মত বড় বড় চারটি চোখ দেখতে পান। চোখগুলি খুব উজ্জ্বল ও ঝক্ ঝক্ করে। চোখের আলোতে শরীরের অন্য অংশ ও দেখা যায়। প্রথম দর্শনেই হুঁস চলে যায় এবং নিশ্চল মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকেন। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অন্ততঃ ২০ (বিশ) মিনিট পর একটু হুস আসে। মনে মনে চিন্তা করলেন বোধ হয় সে আমাকে কিছু করবে না। অবশেষে বললেন- তুমি আমাকে কিছু করতে পার না। আমি সবসময় পঞ্চশীল পালন করি। সেকথা বলার পর উক্ত বিভৎস মূর্তি অন্তর্হিত হয়। অতঃপর তিনি কম্পমান দেহে খামারে চলে যান। এ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর স্ত্রী বিজয় লক্ষ্মী চাক্‌মাকে অবহিত করেননি।

প্রমোদবাবু মধ্যে মধ্যে চিন্তা করেন- ওটা বোধ হয় নিশ্চয় যক্ষ হবে। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতের জন্য সন্দেহ উপস্থিত হল। আবার চিন্তা করলেন সে বোধ হয় আমাকে কোন ক্ষতি করবে না। ক্ষতি করলে প্রথম দিনেই করত। কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আর একদিন সন্ধ্যার পর খামারে ফিরছিলেন। হঠাৎ দেখতে পেলেন পথ রোধ করে এক লম্বা গাছ। চিন্তা করলেন এ গাছ কোথা হতে আসবে? অন্ততঃ ৪ (চার) হাত কাছে গিয়ে দেখতে পেলেন ওটা গাছ নয় বিরাটাকায় কাল সাপ। তাতে শরীর শিহরিয়ে

উঠল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তা করলেন এরূপ সাপ থাকতে পারে না। বোধ হয় সেদিনের যক্ষ। কয়েক মিনিট পর অন্যদিকে দৃষ্টি দেয়ার সাথে সাথেই যক্ষটি অন্তর্হিত হয়। অতপর তিনি ত্রিরত্নের নাম স্মরণ করতে করতে খামারে চলে যান। প্রথম দিনের তুলনায় একটু কম ভয় লেগেছে। কিন্তু দ্বিতীয়বারও কাহারো প্রতি এ বিষয় ব্যক্ত করেননি।

তৃতীয়বার কোন একদিন প্রমোদ বাবু কান্দেব ছড়া গ্রামের জনৈক লোকের বাড়ী হতে নিমন্ত্রণ খেয়ে আসছেন। তখন রাত প্রায় ৮.০০ টা। তাঁর বাগানে যখন পৌঁছেন তখন দেখা গেল পথের উপর একজন মেয়ে লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখা মাত্রই তিনি দাঁড়িয়ে ত্রিরত্নের নাম স্মরণ ও তাঁর শীলগুণ স্মরণ করতে লাগলেন। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বলেন- আমাকে পথ ছেড়ে দাও। তুমি আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছ কেন। সে বলল- তুমি এদিকে এস। তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ দরকার আছে। তিনি বললেন- তোমার সঙ্গে আমার কোন দরকার নেই। পথ ছাড়। সে আবার বলল্- তুমি ভয় করনা। তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে কথা দিচ্ছি। তুমি আমার দিকে এস। তিনি আবার বললেন- তোমার সঙ্গে আমার কোন কথাই নেই। পথ ছাড়। সে বলল্ আচ্ছা, আজ তোমাকে পথ ছাড়ছি। কিন্তু আগামীকাল এখানে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যেয়ো। প্রমোদ বাবু তাঁর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন পরনে সাদা কাপড় এবং চোখ দুটি ঝক্ ঝক্ করে জ্বলতেছে। চেহারাটি যেন একজন চাক্মা মেয়ে। অতঃপর খামারে এসে এ বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরবর্তীরাত তিনি সকাল সকাল খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঠিক রাত যখন ১.০০ টা তখন কে যেন তাঁর বাড়ীর পাশ থেকে কলার ছড়ি কেটে নিয়ে যাচ্ছে। শব্দ শুনে তিন ব্যাটারী টর্চ দিয়ে দেখলেন কলাগাছ ঠিকই আছে এবং আশে পাশে কাহাকেও দেখতে পেলেন না। তিনি প্রস্রাব করে ঘরে ঢুকার পথে অর্থাৎ দরজার সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে সে মেয়ে লোকটি। প্রথমেই সে বলল্ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করনি কেন? তিনি বললেন- কোন প্রয়োজন নেই, সে জন্যে। সে বলল- আজও তুমি যাও। আগামীকাল আমার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করিও। অনেক কথা ও প্রয়োজন আছে। ক্রমান্বয়ে ভয় কমে যাওয়াতে তিনি বললেন- আচ্ছা কথা দিচ্ছি। দেখা করব। সে রাতও সে বিষয়ে চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তারপর প্রতিশ্রুতি মতে সেখানে গেলেন। দেখা গেল সাদা কাপড় পরিহিত মেয়েটি গাছের গোড়ায় বসে আছে। দেখার সাথে সাথেই বলল- এ দিকে এস। তোমার কোন ভয় নেই। আমাকে কোন সন্দেহ করিও না। তিনি বললেন- তুমি ওখান থেকে বল। কি দরকার শুনতে এসেছি। সে আবার বলল- এখনও তোমার ভয় ও সন্দেহ রয়ে গেছে। তুমি আমার পাশে এসে বস। তারপর প্রয়োজনীয় কথাগুলি তোমাকে বুঝিয়ে বলব। তিনি ও তার কথামত পাশেই বসে পড়লেন। প্রায় বিশ মিনিট পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে থাকার পর বলল- তোমরা এ পাহাড়ে এসেছ অনেক দিন যাবত। আমি তোমাদের সবাইকে চিনি ও ভালবাসি। কিন্তু তোমাকে এবং তোমার মেয়েকে খুব ভালবাসি। তুমি খুব পরিশ্রম কর। তোমার আর পরিশ্রম করতে হবে না। এমন কি তোমার ছেলে মেয়েদেরও অভাব ঘুচে যাবে। আমি তোমাকে কতকগুলি সম্পদ দিতে চাই। অনুগ্রহ করে এগুলি নিয়ে যাও। শুধু তোমাকেই দিচ্ছি। অন্য কাহারো ও প্রাপ্য নয়। এ কথাগুলি বলার পর তিনি বললেন- আমার কোন সম্পদের প্রয়োজন হবে না। আমার যা আছে তা দিয়ে যথেষ্ট। এ বলে উঠে চলে যাচ্ছেন। তখন সে বলল- আজ তোমাকে চিন্তা করার সময় দিচ্ছি। আগামীকাল নিশ্চয় আমাকে বলতে হবে। সেদিনও দেখা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খামারে চলে গেলেন।

পরের রাত প্রমোদ বাবুর যাবতীয় ভয়, সন্দেহ ও সংকোচভাব একেবারে চলে যাওয়ায় সরাসরি তার পাশে গিয়ে বসলেন। কিছুক্ষন বসার পর সে বলল- আমার সাথে এস। তোমার ধন সম্পদ বুঝিয়ে নাও। তিনি বললেন- আমি সে দিকে যাব কেন? না আমি যাব না। সে আবার বলল- দেখতে পাচ্ছি তোমাদের মানব জাতির সন্দেহ ও সংকোচভাব এখনও রয়ে গেছে। একথা বলার পর তার পিছনে পিছনে অন্ততঃ ত্রিশ হাত পর্যন্ত গেলেন। দেখা গেল্ল দিনের মত পরিস্কার আলো। সামনেই দুটি বড় বড় মাটির কলসী। কলসীর ঢাকনী খুলে বলল- ধরে দেখ, তোমার ধন সম্পদ। তিনি সেগুলি ধরে দেখলেন। এক কলসীতে স্বর্ণের মোহর অন্য কলসীতে স্বর্ণের পাতে ভর্তি। সেগুলি স্পর্শ করতে প্রমোদ বাবুর শরীর যেন কেমন কেমন লাগতেছে। একটু পরে বললেন- এগুলি আমার দরকার নেই। তোমার ধন সম্পদ তোমার নিকট থাক। সে পুনঃবার বলল- এগুলিত তোমার জন্যে রেখেছি। তুমিই এগুলির মালিক। তিনি বললেন- আমার মালিক হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাওয়ার সময় সে

বলল- এ ব্যাপারে চিন্তা করার জন্যে তোমাকে আরো সময় দিচ্ছি। মধ্যে মধ্যে আমার সহিত দেখা করিও। প্রমোদ বাবু বললেন আচ্ছা, ঠিক আছে।

প্রায় রাতেই প্রমোদ বাবু যক্ষিনীর পাশে বসে থাকতে অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। চাক্‌মা ভাষায় আক্ক্যাং বলে এভাবে আসতে যেতে তাঁর স্ত্রী সন্দেহ করে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি গভীর রাতে প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত কোথায় যাও? তিনি হেসে হেসে বললেন- তোমাকে বলতে পারব না। তুমি এ কথা জিজ্ঞাসা করিও না। দিন দিন তাঁর স্ত্রীর সন্দেহের দানা গভীর হওয়ায় বললেন- বলতে পারি, কিন্তু একটা শর্ত আছে। কাউকে প্রকাশ করতে পারবে না। ভয়ানক ক্ষতি হতে পারে।

অতঃপর উক্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলার পর তাঁর স্ত্রী বিজয় লক্ষ্মী চাক্‌মা যক্ষিনীকে দেখার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলেন। প্রমোদ বাবু যক্ষিনীর অনুমতি নিয়ে তাঁর স্ত্রীকে সেখানে নিয়ে গেলেন। প্রায় কাছে গিয়ে দেখা মাত্রই প্রমোদ বাবুকে জড়িয়ে ধরে বিজয় লক্ষ্মী বললেন- আমি যাব না। থর থর করে কেঁপে কেঁপে চলে যেতে চাচ্ছে। প্রমোদ বাবু বললেন- ভয় নেই, চল তার পাশে বসে আলাপ করে আসি।

খামারে গিয়ে বিজয় লক্ষীর ঘুম মোটেই হলনা। মধ্যে মধ্যে ভয়ে চমকে উঠে। ভোর হওয়ার পর ছেলে মেয়েদেরকে নিয়ে বনরূপার ত্রিদিব নগরে চলে আসেন। এদিকে প্রমোদ বাবু তাঁর দশ বৎসরের মেয়েটিকে নিয়ে খামারে চলে আসেন। মেয়েটি রান্নার কাজ ও তিনি বাগানের কাজে ব্যস্ত থাকেন। যক্ষিনীর সঙ্গে পুনঃবার দেখা হলে বলল- তোমার স্ত্রী আমাকে দেখে ভয়ে চলে গেছে। ভয় কিসের? মানব জাতির সাধারণত ভয়, সন্দেহ ও সংকোচ ভাব থাকে। তোমার এখনও সময় আছে তোমার ধন সম্পদ গুলি নিয়ে সুখে শান্তিতে চলতে পারবে। প্রমোদ বাবুর তবুও লোভ উৎপন্ন হল না।

আর একদিন গ্রীষ্মের সময় রাত্রীবেলায় প্রমোদ বাবু ত্রিদিব নগরস্থ বাড়ীর উঠানে বসে আছেন। হঠাৎ তাঁর সামনে যক্ষিনী উপস্থিত হল এবং বলল- কি ব্যাপার, তোমাকে এবং সবাইকে খামারে দেখা যাচ্ছে না কেন? তিনি উত্তরে বলেন- কোন ব্যাপার নয়। শুধু আমার স্ত্রীকে সন্দেহ করি। যদি কাউকে বলে দেয়? প্রতি উত্তরে যক্ষিনী বলেন- কি হবে, বলতে পারবে। কোন অসুবিধা হবে না। এ কথাগুলি বলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। একটু পরে তাঁর স্ত্রী চা নিয়ে এসে বললেন- তুমি কার সঙ্গে কথা বলেছ? তিনি

বললেন- যক্ষিনী এইমাত্র চলে গেল। তোমার কথাই বলেছি। অন্য কাহারোর নিকট প্রকাশ করতে পারবে। অনুমতি নিয়েছি। কোন অসুবিধা হবে না।

পরদিন সকালে নির্মল বাবু এবং পরিবারের অন্যান্যদের প্রতি বিগত তিন বৎসরের ঘটনা প্রবাহের বর্ণনা করলেন। তাতে সবাই আশ্চর্য ও হতভম্ব হয়ে পড়েন। এমন কি সমগ্র ত্রিদিব নগর এলাকায় এ ঘটনা নিয়ে এক তোলপাড় পড়ে যায়। সকলের মতামত নিয়ে নির্মল বাবু ও প্রমোদ বাবু শ্রদ্ধেয় বনভন্তের উদ্দেশ্যে বন বিহারে গমন করেন। বন্দনাদি করার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে এ বিষয়ে বিস্তারিত অবহিত করেন। এ দিকে বনভন্তের স্নান করার সময় হলে তিনি বললেন- আজ তোমরা চলে যাও। আগামীকাল আবার আস।

পরের দিন যথাসময়ে উভয়ে দেশনা লয়ের দিকে যেতে না যেতেই বনভন্তে রসিকতা করে বললেন- যক্ষিনীর স্বামী আসতেছে। (যক্ষিনীর নেক্ক্যা এঝের) তাঁরা বন্দনা করে বসার পর উপাসক উপাসিকাদের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি আবার বললেন- প্রমোদ পাঁচশত বৎসর পূর্বে কান্দেবছড়া গ্রামের এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিল। তাঁর কোন পুত্র কন্যা ছিল না। অর্ধ বয়সে সে মারা যায়। তাঁর স্ত্রী পরিণত বয়সে মারা যায়। কিন্তু সম্পত্তির প্রতি লোভ-মোহ পরায়ণ হওয়ায় মৃত্যুর পর সে যক্ষিনীরূপ ধারন করেছে। কিন্তু তারা যক্ষিনীকে চিনে না। যক্ষিনী তাদেরকে ভালভাবে চিনে। মানুষ যেভাবে মূলা বা খিড়া খায় যক্ষিনীও সেভাবে মানুষ খেতে পারে। মায়া মমতার কারনে সে তাদেরকে কিছু করে না। এ যক্ষিনীকে কেউ তাড়াতে পারবে না। এমনকি দক্ষ তন্ত্র মন্ত্রধারী বৈদ্য বা কোন ভিক্ষু ও তাকে তাড়াতে পারবে না। কিন্তু একটা পথ আছে সেটা হল তার উদ্দেশ্যে সংঘদান করে পুন্যদান করা।

(উল্লেখ্য যে পার্বত্য এলাকার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে জানা যায় কান্দেবছড়া বা তার আশে পাশে কোন চাক্মা বসতি ছিল না। সেখানে ত্রিপুরাদের বসতি ছিল। সুতরাং প্রমোদ বাবু ত্রিপুরাই ছিলেন।)

সঙ্গে সঙ্গেই নির্মল বাবু ও প্রমোদ বাবু শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে সশিষ্যে সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান এবং সূত্র পাঠ করার জন্যে আমন্ত্রন জানালেন। এ উপলক্ষ্যে একটি বড় লঞ্চ ও বনভন্তের জন্যে বোট নিয়ে খামার বাড়ীতে যাত্রা করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বনরূপা ও কান্দেবছড়ার অনেক

উপাসক-উপাসিকা উপস্থিত ছিলেন। যথাসময়ে পঞ্চশীল প্রার্থনা, সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান সম্পন্ন হয়।

ভিক্ষু সংঘের ভোজনের সময় উপাসক-উপাসিকারা পাহাড়ের এদিক ওদিক ঘুরাফেরা করতেছেন। বন বিহার পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক বাবু সঞ্জয় বিকাশ চাক্মা ও সহ সভাপতি বাবু পংকজ দেওয়ান যে গাছের গোড়ায় বসে যক্ষিনী থাকে তাঁরা সেখানে বসলেন। কিছুক্ষন বসার পর তাদের কিসের যেন দুর্গন্ধ অনুভব হচ্ছে। আশে পাশে বেশ পরিষ্কার এবং কোন কিছুর পঁচা জিনিসের চিহ্ন ও নেই। ভিক্ষু সংঘের ভোজনের পর গৃহীদের ভোজনের সময় হলে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে দুর্গন্ধের কথা অবহিত করেন। বনভন্তে সঙ্গে সঙ্গেই বললেন- যক্ষের দুর্গন্ধ আছে। এখানে ও সে এসেছে। অন্যান্যরা ও দুর্গন্ধ পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, প্রমোদ বাবু বিগত তিন বৎসর যাবৎ কোন সময় দুর্গন্ধ পাননি। এমন কি যক্ষিনীর পাশাপাশি বসে থাকাকালীন কোন সময় দুর্গন্ধ অনুভব করতে পারেন নি।

দুপুর বেলা পরিত্রান প্রার্থনা ও ভিক্ষু সংঘের সূত্রপাঠ আরম্ভ হয়। ক্রমান্বয়ে তিনটি সূত্রপাঠ করার পর শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শিষ্যদেরকে বললেন- যক্ষিনী চলে যাচ্ছে। উপাসক-উপাসিকারা বড় করে সাধুবাদ প্রদান কর। মাইকে এবং সকলের মুখে সমস্বরে সাধুবাদ ধ্বনিতে কান্দেবছড়া এলাকা মুখরিত হয়ে উঠেছে। যক্ষিনী যাওয়ার সময় গামারী গাছ ও আম গাছের মধ্যবর্তী স্থানে গোল্লার মত শব্দ শোনা যায় এবং গাছের শাখা প্রশাখাগুলি তুফানে নাড়াচড়া করার মত নাড়াচড়া করতে দেখা যায়। আরও একটি অত্যাশ্চর্য ঘটনা হল পাহাড়টি কম্পমান হয়েছিল। মনে হল সকলে একখানা বড় লঞ্চের ছাদে বসে আছেন। আরও তথ্য পাওয়া গেল রান্না করার জন্যে যে চুলা খুঁড়েছিল তা কম্পনের ফলে কিছু অংশ ভেঙ্গে পড়েছে।

অবশেষে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। দেশনায় বলেন- মানুষ যেমন বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন প্রকৃতির ও বিভিন্ন স্বভাব চরিত্রের থাকে তেমন অশরীরিদের মধ্যে ভূত, প্রেত, যক্ষ, বৃক্ষ দেবতা, আকাশবাসী দেবতা, ভূমিবাসী দেবতা এবং নানা প্রকার অদৃশ্য প্রাণী থাকে। তারা অনেক সময় মানুষের মত উপকার করে আবার

অপকারও করে থাকে। পরিশেষে দেখা যাচ্ছে যে, শ্রদ্ধেয় বনভন্তে কান্দেবছড়ার খামার বাড়ীতে আগমনের পর হতে এ যাবত উক্ত যক্ষিনীর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি।

- ০ -

ঘাগড়ায় বনভন্তের দেশনা

আজ ২২শে জানুয়ারী ১৯৯৫ ইংরেজী রোজ রবিবার। সকালে ১০ টায় ঘাগড়া এলাকার সদ্ধর্মপ্রান উপাসক-উপাসিকাদের উদ্যোগে এক মহতী ধর্মানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ঘাগড়া বাজারের দক্ষিন পাশে এক খোলা মাঠে। অনুষ্ঠানের প্রথমেই পঞ্চশীল গ্রহণ করে অষ্ট পরিষ্কার দান ও সংঘদান সম্পাদিত হয়।

সকাল বেলা পর্বে ১০টা ১৮ মিনিট হতে ১০টা ৫০ মিনিট পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ধর্মার্থীদের প্রতি এক নাতিদীর্ঘ ধর্মদেশনা প্রদান করেন। দেশনার প্রারম্ভেই তিনি বলেন- কথিত আছে জনৈক বনবাসী ভিক্ষু গভীর বনে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। এক ব্যাধ বনে ঘুরতে ঘুরতে তাকে দেখতে পায়। ধ্যানী ভিক্ষুকে বন্দনা করে বলল- পূজনীয় ভন্তে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে সামান্য ধর্মদেশনা করুন। ধ্যানী ভিক্ষু ব্যাধের প্রতি অনুকম্পাপূর্বক ধর্মদেশনা আরম্ভ করলেন। কিছুক্ষন ধর্মদেশনা করার পর জনৈক বনবাসী দেবতা ভিক্ষুকে বললেন- শ্রদ্ধেয় ভন্তে, অনুগ্রহপূর্বক আপনার ধর্মদেশনা বন্ধ করুন। আপনার মূল্যবান সময় অপচয় হচ্ছে। সে আপনার ধর্মদেশনা বুঝতে পাচ্ছে না। সে অন্ধ ও মোটেই জ্ঞান নেই। সে সামান্য ধর্মদেশনা ও ধারন করতে পাচ্ছে না। অতঃপর বনবাসী ভিক্ষু দেখলেন উক্ত ব্যাধের ধর্মদেশনার প্রতি একাগ্রতা নেই। সুতরাং তিনি ধর্মদেশনা বন্ধ করে দিলেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এ রকম উপমা দিয়ে বলেন- আজ তোমরা ত্রিশরনসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করে ধর্মদেশনা শুনতেছ। যদি তোমরা ধনে, জনে, স্ত্রীপুত্রে নানা প্রকার অহংকারে অন্ধ হও, তবে এ ধর্মদেশনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না। যদি অজ্ঞানতা থাকে ব্যাধের মত ধর্ম দর্শন হবে না। ধর্ম দর্শন হল

ত্রিশরনসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করার পর ধর্মদেশনা শুনার সাথে সাথেই চারি আর্যসত্যকে দেখতে হবে, বুঝতে হবে ধর্মের আস্বাদ গ্রহন করতে হবে এবং ধর্মের রুচি আনতে হবে। যদি ধর্মকে না দেখে, না বুঝে, আস্বাদ না পেয়ে এবং রুচি না লাগলে কিছুই ফল হবে না। বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি অর্থ আমি উচ্চতর জ্ঞানে আশ্রয়ে যাচ্ছি। ধম্মং শরণং গচ্ছামি অর্থ- আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করছি যেন সকল দুঃখ হতে মুক্ত হতে পারি। সংঘং শরণং গচ্ছামি অর্থ- ভিক্ষু সংঘ উচ্চতর জ্ঞান ও সত্য জ্ঞানের অধিকারী। আমি সংঘের জ্ঞানের আশ্রয়ে যাচ্ছি। ভিক্ষুদের যদি চারি আর্য সত্য জ্ঞান না থাকে, অহংকার থাকে এবং অজ্ঞান অবস্থায় থাকে তারাও চারি অপায় বন্ধ করতে পারবে না। যারা নির্বান ধর্মের স্রোতে পড়ে তারা চারি আর্য সত্য ভালভাবে দেখে, বুঝে, শুনে, জানে, স্বাদ পায় এবং রুচি পেয়ে বুদ্ধজ্ঞান লাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বনভন্তে ত্রিশরণ গ্রহণে সত্যসমূহ উপলব্ধি করে যে জ্ঞান লাভ করেছেন সে জ্ঞানগুলি তোমাদের নিকট অকাতরে বিতরণ করতেছেন। সে জ্ঞানের প্রভাবে তোমাদের যাবতীয় দুঃখগুলি তিরোহিত হোক। তোমাদের জ্ঞান সত্য উদয় হোক, গভীর ও উচ্চতর জ্ঞানে অধিকারী হও যাতে তোমাদের চিত্তে অনাবিল সুখ জাগরুক থাকে। উপমায় বলেন চন্দ্র সূর্য চোখে দেখা যায়, কিন্তু তাদের অবসহান তোমাদের থেকে অনেক দূরে। সেরূপ বৌদ্ধধর্ম ও না জানলে, না বুঝলে, না শুনলে, না চিনলে, না দেখলে, স্বাদ না পেলে এবং রুচি না হলে তোমরাও ধর্ম হতে অনেক দূরে অবস্থান করবে।

তিনি আরো বলেন- ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল পালন করলে বিপদে পড়ে না ও সহজে দুঃখে পড়ে না। বৌদ্ধধর্ম কঠিন। শুধু এম. এ. পাশ বা উচ্চ শিক্ষিত হলে বৌদ্ধ ধর্ম বুঝতে পারবে না। যতক্ষন পর্যন্ত চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে দেশনা, ঘোষনা, প্রকাশন, প্রজ্ঞাপন ও প্রতিষ্ঠা করতে না পারে ততক্ষন পর্যন্ত তোমাদের ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হবে না। ধর্ম জ্ঞানে ধর্মসমূহ ভালভাবে জানে এবং ধর্ম চক্ষুতে ধর্মসমূহ ভালভাবে দেখে। যেমন- অন্ধকারে বিদ্যুৎ চমকালে যেভাবে পৃথিবী দেখা যায় সেভাবে ধর্মচক্ষুতে নির্বান ধর্ম দেখা যায়। তা চর্মচক্ষুতে কোন সময় দেখা যায় না। মানুষ অহেতুক, একহেতুক, দ্বিহেতুক ও ত্রিহেতুক থাকে। যারা ত্রিহেতুক তাদের নির্বান লাভ করতে সহজ হয়। লোভহীন, দ্বেষহীন ও মোহহীনকে ত্রিহেতুক বলে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- অনেকে ধর্মের নামে পাপ করে। যার নিকট ধর্মজ্ঞান নেই সে নিশ্চয়ই পাপ করবে। বুদ্ধ জ্ঞানে পাপ করতে পারে না। পাপে দুঃখ পায়, বিপদে পড়ে ও ভয় উৎপন্ন হয়। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন ভিক্ষুরা ধর্মদান, জ্ঞানদান ও অভয়দান দিতে পারবে। ভিক্ষু মুর্খকে পন্ডিত বানাতে পারে। অসাধুকে সাধু বানাতে পারে। মুর্খ ও অসাধু নরকে যায়। সাধু ও পন্ডিত স্বর্গে যায়। এমনকি নির্বান লাভ করতে পারে। কর্মেই মুর্খ, পন্ডিত, সাধু ও অসাধুর লক্ষন। যে শীল পালন করে সে সাধু। যে নিরামিষ বা শুধু লবন দিয়ে আহার করলে সে সাধু হয় না। যে পন্ডিত সে সকলের প্রতি মৈত্রী ক্ষমা, সহ্য, দয়ালু, সর্বদা নিজকে অক্ষুন্ন রাখে এবং পূণ্যকর্মে ও মার জয় করতে পারে। ক্ষুন্ন মনে থাকলে পাপ হয়। যারা সাধু ও পন্ডিত তারা পাপ করতে ঘৃনা করে, লজ্জাবোধ করে এবং নরকে পড়বে বলে ভয় করে।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা অহংকার ত্যাগ কর। ত্যাগই পরম সুখ। ভোগেই সর্বদুঃখের আকর। ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু যাতে অর্জন করতে পার সে ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা কর, যাতে পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পার। এ বলে আমার দেশনা আপাততঃ এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

দ্বিতীয় পর্ব

দুপুর পর্বে পঞ্চশীল গ্রহণ করে দেশের মঙ্গলের জন্যে, সুখের জন্যে এবং সর্ব প্রাণীর হিতের জন্যে পরিত্রান সূত্র শ্রবন করা হয়। বেলা ২টা ৫ মিনিট হতে ২টা ৪৫ মিনিট পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পুন্যার্থীদের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান করেন। তিনি দেশনায় বলেন- ভগবান বুদ্ধ মুক্তি লাভেচ্ছুদের জন্যে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা ব্যবস্থা করেছেন। যারা মনোযোগের সহিত ধর্মদেশনা শুনে, লক্ষ্য করে, গ্রহণ করে, ধারন করে এবং আচরণ করে তারা মুক্ত হন। আর যারা এলোমেলোভাবে শুনে, লক্ষ্য না করে, গ্রহণ না করে, ধারন না করে এবং আচরণ না করে তারা মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। সদ্ধর্ম শ্রবন করতে তৃষ্ণা ও মারে বাঁধা দেয়। তৃষ্ণা ও মারে পরধর্ম সুখ এবং ভোগ করার জন্যে উৎসাহিত করে। লোভ, হিংসা ও অজ্ঞানতাকে

পরধর্ম বলে। তৃষ্ণা ও মার সবসময় পরধর্ম করার জন্যে প্রভাবিত করে। এগুলিকে কামের আদীনব বলে। লোভে পরের জিনিষ সুখ বলে। হিংসায় অপরকে সবসময় অনিষ্ট করতে বলে। মোহে নানাবিধ কাজে ও বিষয়ে আবদ্ধ রাখে। তাহলে লোভ ত্যাগ, হিংসা ত্যাগ ও মোহ ত্যাগ করা মহা কঠিন ব্যাপার। যারা জ্ঞানী ও মুক্তি হতে উদ্যমশীল তারা সহজে ত্যাগ করতে পারে। আর যারা অজ্ঞানী ও মুক্তি হওয়ার উদ্যম নেই তারা পারে না। মানুষের মধ্যে ৪ প্রকার পুদগল আছে।

১। অধিগম পুদগলঃ- যারা মেধাবী ও উদ্যম শীল তারা সামান্যমাত্র ধর্মদেশনা শ্রবন করে বুঝতে সক্ষম হয়।

২। স্মৃতি পুদগলঃ- যারা স্মৃতি শক্তি দ্বারা চেষ্টা করে ধর্মদেশনা বুঝতে পারে তারা স্মৃতি পুদগল নামে অভিহিত।

৩। গেয় পুদগলঃ- যারা পুনঃ পুনঃ বহুদিন চেষ্টা করে ধর্মদেশনা বুঝতে সক্ষম হয় তারা গেয় পুদগল বলে।

৪। পদাবরন পুদগলঃ- যারা সারাদিন সারারাত ধর্মদেশনা শ্রবন করে একটু মাত্রও বুঝতে সক্ষম নয় তারাই পদাবরন পুদগল। যে কলসীতে ছিদ্র থাকে সে কলসীতে পানি ঢাললে যে অবস্থা হয় পদাবরন পুদগল ও সেভাবে ধর্মদেশনা শ্রবন করে থাকে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- লোভ, হিংসা ও অজ্ঞানতাসহ কথা বললেও কাজ করলে নিজেও দুঃখের ভাগী হয় এবং অপরকেও দুঃখের ভাগী করে। আর যারা লোভহীন, হিংসাহীন ও অজ্ঞানতাহীনভাবে কথা বলে ও কাজ করে তারা নিজেও সুখী হয় এবং অপরকেও সুখী করতে পারে। বর্তমানে দেশ পর্যালোচনা করে তোমরা বুঝতে পার প্রায় লোকই নিজে দুঃখ পাচ্ছে এবং অপরকেও দুঃখ দিচ্ছে। এগুলি হচ্ছে শুধু কথাও কাজের দরুন।

তিনি আরো বলেন- চিত্তের একাগ্রতা নিয়ে ধর্মকথা শুনলে নিজের সুখ ও সুফল প্রাপ্ত হয়। কুশলে উচ্চ হতে উচ্চে উঠতে পারে। কুশল কাজ গভীর শ্রদ্ধার সহিত করতে হয়। পরকাল বিশ্বাস করে দান দিলে উত্তম ফল পাওয়া যায় এবং মৃত্যুকালে সজ্ঞানে মৃত্যুবরন করতে পারে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যার চিত্ত সত্য পথে যায় তাকে নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু, হিংস্র জন্তু অথবা অপর কেউ তাকে ক্ষতি করতে পারবে না। যার চিত্ত মিথ্যা পথে যায় তাকে মাতাপিতা, স্ত্রীপুত্র, জ্ঞাতী, বন্ধু, বান্ধব

অথবা কেউ রক্ষা করতে পারবে না। সবসময় মনে রাখিও ধর্মের জয় অধর্মের পরাজয় এবং যারা জ্ঞানী তারা সবকিছু জয় করে নিতে পারেন। সবসময় ধর্মাচারীকে ধর্মে রক্ষা করে।

তিনি আরো বলেন- তোমরা সবসময় একটা বিষয় লক্ষ্য করিও। বনভন্তে কোনপথে যাচ্ছেন? সামনের দিকে না পিছনের দিকে? বনভন্তে যদি সামনের দিকে বা উন্নতির দিকে যান তোমরা সে দিকে যাও। তোমরা পারবে না কেন? নিশ্চয়ই পারতে হবে। বৌদ্ধধর্ম জ্ঞানীর ধর্ম। নামমাত্র বৌদ্ধ হলে চলবে না। শীলবান, ধার্মিক ও প্রজ্ঞাবান হলে স্বর্গের দেবতারাও সাহায্য করে। যদি দুঃশীল, অধার্মিক ও দুষপ্রাজ্ঞ হলে কেউ সাহায্য করবে না। সবসময় সাবধানে থাক। সাবধানে থাকলে পাপ হবে না। সাবধানে মার নেই ও বিপদ নেই। যারা কাপুরুষ তারা সাবধানতা অবলম্বন করে না এবং পালিয়ে থাকে। অসাবধান ব্যক্তি কুকর্মে লিপ্ত থাকে। কুকর্মকারীর কার্যকলাপে বনভন্তে ও লজ্জাবোধ করেন। তারা ঘরে ঘরে দলাদলি, হিংসা, রেষা-রেষি প্রভৃতি করে বহু দুঃখের সৃষ্টি করে। অলোভ, অহিংসা ও অমোহের শত্রু থাকে না এবং নির্বানগামী হয়। প্রাণী মাত্রেই সুখবিলাসী। সকলে দন্ড, অস্ত্র উত্তোলন, বধ, বন্ধন ও প্রহার কর না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- পূর্বকালে মানুষ বাঘ, ভালুক, হাতী প্রভৃতি হিংস্র জন্তুকে ভয় করতো। বর্তমানে সেগুলি প্রায়ই নেই। বর্তমানে মানুষ মানুষকে ভয় করছে। দন্ড-অস্ত্রধারী ভয়ের কারন। যদি মানুষ মানুষকে বিশ্বাস করে এবং মৈত্রীভাবাপন্ন হয় দন্ড-অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। যারা অজ্ঞানী তারা এ সমস্ত কথাগুলি বুঝবে না। যারা জ্ঞানী তারা আমার কথাগুলি বুঝতে সক্ষম হবে। যার যতটুকু জ্ঞান থাকে তার সামর্থ অনুযায়ী বুঝতে পারবে।

তিনি বলেন- কেউ কেউ প্রকাশ্যে পাপ করে। কেউ কেউ গোপনে পাপ করে। যারা জ্ঞানী তারা কখনো প্রকাশ্যে বা গোপনে পাপ করেন না। চিত্তে পাপ পোষন করলে দুঃখ ভোগ করে। চিত্তে কোন পাপ না করলে সুখ অনুভব করে। খাদ্য নিয়ে মানুষ দুঃখ পায়। অনাসক্তভাবে আহার করলে দুঃখ আসতে পারে না। ভোগ আসক্তিই দুঃখের মূল কারন। তাহলে দেখা যাচ্ছে একদিকে ত্যাগেই সুখ অন্যদিকে দয়ায় সুখ পাওয়া যায়।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সবাইকে আশীর্বাদ দিয়ে বলেন- তোমাদের কুশলের বলে ও জ্ঞানের বলে উন্নতি হোক শ্রীবৃদ্ধি হোক, কোন প্রকার

পরিহানি না ঘটুক, সর্ব বিষয়ে মঙ্গল হোক এবং ধর্মের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি হয়ে নির্বান লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

সাধু - সাধু - সাধু।

কাটাছড়ি বন বিহার বনভন্তের দেশনা

১৯৯৩ ইংরেজীতে কাটাছড়ি বন বিহার স্থাপিত হয়। রাঙ্গামাটি সরকার কলেজের পশ্চিম পাশ দিয়ে জলপথে যেতে হয়। বোটযোগে মাত্র ২০ মিনিট সময় লাগে। বনবিহার এলাকাটি ছোটখাট হলেও দেখতে বেশ মনোরম। উত্তর দক্ষিনে লম্বা পাহাড়। আনুমানিক ৬ একর হতে পারে। উত্তরে মন্দির ও দেশনালয়। সামনেই খোলা মাঠ। পাহাড়ের মাঝখানে সাধনাকুঠির ও ভিক্ষু সংঘের ভোজনশালা এবং সর্বদক্ষিনে চংক্রমন ঘর স্থাপন করা হয়।

কাটাছড়ি বন বিহারের বিহারাধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য শ্রীমৎ জ্ঞানবংশ ভিক্ষু (বৃদ্ধ) এবং শ্রমন আছেন শ্রীমৎ মহাতিস্‌স শ্রমন (বৃদ্ধ)। বিহার পরিচালনায় বাবু নিরঞ্জন কার্বারী (সভাপতি) ও বাবু রাজমনি চাক্‌মা (সম্পাদক) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৭ই নভেম্বর '৯৪ ইংরেজী সোমবার বিকাল ৩ ঘটিকায় শ্রদ্ধেয় বনভন্তে শিষ্যসহ ২টি বোটযোগে কাঁটাছড়ি বন বিহারে যথাযোগ্য মর্যাদার সহিত শুভ পদার্পন করেন।

৮ই নভেম্বর '৯৪ ইংরেজী মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগীত গেয়ে প্রথম পর্ব অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু সমর বিজয় চাক্‌মা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার থেরো। বুদ্ধ পূজা, বিহার দান, ভূমিদান, সংঘদান, অষ্ট পরিষ্কার দান ও বোধিবৃক্ষ উৎসর্গ হয়।

দ্বিতীয় পর্বে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সকাল ১০টা ২৫ মিনিট হতে ১১টা ১০ মিনিট পর্যন্ত সমবেত উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান করেন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে প্রথমেই বলেন- যে জাতিতে সৎপুরুষ উৎপন্ন হয় সে জাতি অতীব সম্মান অর্জন করে, গৌরবান্বিত হয়, সর্বদিকে উন্নতিলাভ করে এবং

বিপুল ধনের অধিকারী হয়। উদাহরনে তিনি বলেন- কোন এক জায়গায় ৫০ জন ছোট ছোট ছেলে আছে। সেখানে একজন ও বৃদ্ধলোক নেই। তারা রান্না করে খেতে জানেনা। এখন তাদের অবস্থা কি হবে? তারা শুধু কথাবার্তা বলতে পারে। কোন কাজকর্ম জানে না। বনভন্তের দৃষ্টিতে পাহাড়ী সবাই ছোট ছোট ছেলে। একমাত্র বনভন্তেই বৃদ্ধ বা মুরব্বী। কেউ যদি গরুর কাছে পেন্ট, শার্ট ও ছাতা কামনা করে সেগুলি পাবে? কোন দিন পাবে না। যার কাছে আছে তার কাছে খোঁজ করতে হবে। যদি তারা মুরব্বীর উপদেশে চলে, ভগবান বুদ্ধের ধর্ম মেনে চলে এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করে তাহলে তাদের সম্মান, গৌরব, উন্নতি ও ধনী হতে পারবে।

তিনি বলেন- সিদ্ধার্থের নিকট কি ছিল না? সবকিছু ছিল। কেন তিনি বনে বনে ঘুরেছিলেন? তিনি ঘুরে ছিলেন একমাত্র কুশল ও সর্বজ্ঞতা অর্জন করার জন্যে। তিনি যখন বোধিবৃক্ষের নীচে বসে ধ্যান করেছিলেন তখন মাররাজার মেয়ে বলেছিল-

"ওহে যুবরাজ এ কি কর কাজ
বুঝি গাছের নীচে কি চায়?"

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ভগবান বুদ্ধের প্রাপ্য কেউ দিতে পারবে না। বুদ্ধ কাহারো উপদেশ না নিয়ে আপন প্রতিভা বলে সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন। বুদ্ধের উপদেশে নির্বান লাভ হয়। চারি আর্য সত্য জানলে, বুঝলে, চিনলে, দেখলে ও ভালভাবে পরিচয় হলে নির্বান লাভের হেতু উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ মনে করে এম. এ. পাশ বা বড় বড় ডিগ্রি নিলে মুক্তি পায়। সেগুলি শুধু ভাত খাওয়ার ডিগ্রি।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা কাহারো নিকট আত্মসমর্পন কর না। একমাত্র আত্মসমর্পন কর নির্বানের কাছে। জ্ঞান না থাকলে বৌদ্ধ ধর্ম পাপ বলে মনে করে। অজ্ঞানে বৌদ্ধ ধর্ম গোপন রাখে। সম্যক জ্ঞানে সমস্ত দুঃখ ও পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে দেখা যায় যারা অর্হৎ তারা ধর্ম করেন না। কারন নির্বানে পাপ ধর্ম ত্যাগ ও পুন্যধর্ম ত্যাগ করতে হয়। বনভন্তে ও কোন ধর্ম করেন না। পাপ ধর্ম ও করেন না। পূণ্য ধর্মও করেন না। কারন ধর্মের অধীন ও কর্মের অধীন থাকলে পুনঃজন্ম হতে হবে। পুনঃজন্মে বিবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়।

তিনি বলেন- প্রায় নারী পুরুষ পাপ ধর্মই করে। যাঁরা জ্ঞানী তাঁরা দুঃখ পেলে দুঃখ বলে ভালভাবে জানেন। কিন্তু যাঁরা অজ্ঞানী তাঁরা দুঃখ পেলে সুখ

বলে অনুভব করে। যেমন ছোট শিশু আগুন ধরলে পুড়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধলোকে কখনো ধরবে না। তাহলে দেখা যাচ্ছে নারী ও পুরুষ ও দুঃখ। সুতরাং নারী পুরুষ দুঃখ বলে জান।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ধর, কাঁটাছড়িতে একজন এম. এ. পাশ লোক আছে। শহরে বড় চাকুরী করে। হঠাৎ যদি একজন মেথর মেয়ে বিয়ে করে এখানে নিয়ে আসে, তখন তোমরা তাকে কি বলবে? নিশ্চয়ই তাকে নিন্দা, তুচ্ছ ও হীনলোক বলে গণ্য করবে। কারন সে তার যোগ্যতা অনুযায়ী বিয়ে করেনি। ঠিক তেমনি কোন ভিক্ষু চীবর ছেড়ে গৃহী জীবন-যাপন করে, সেও নিন্দিত, তুচ্ছ ও হীনলোক বলে গণ্য হবে। তার যোগ্যতা অর্জন করা উচিত একমাত্র মার্গফল।

তিনি আরো উদাহরণ দিয়ে বলেন- কোন লোকের খিড়া বা মুলা খেতে অতি সহজ। কিন্তু গাছের টুকরা খেতে পারবে? কখনো পারবে না। যুবতী নারীদের নিকট যুবক ভিক্ষু খিড়া বা মুলাস্বরূপ। আর এ বৃদ্ধ ভিক্ষুও এ বৃদ্ধ এমন গাছের টুকরার মত। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এ রকম উদাহরণ দেয়ার পর আমাদের মধ্যে হাসির কলরব বয়ে যায়। অতঃপর তিনি বললেন- প্রতি বিহারে কমপক্ষে ১৫ জন ভিক্ষু থাকা উচিত। কারন একজন যুবক ভিক্ষু প্রায় সেচ্ছাচারিতা হয়। মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কোন যুবক ভিক্ষুর বিশ্বাস নেই।

তিনি বলেন- শুনেছি ভিয়েতনামের ২ জন যুবতী নারী ফ্রান্সে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করছে। কিন্তু ধর্মজ্ঞান না থাকলে ধর্ম প্রচার করা সহজ নয়। চাক্মা মেয়েদের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। বনভন্তে অহিংসার বাণী প্রচার করতেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম মেনে চল। গভীরভাবে বিশ্বাস কর। বর্তমানে প্রায় ভিক্ষুরা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করে না। সেজন্যে ধর্মের, দেশের এবং সমাজের বিপর্যয় ঘটছে। কাহারো অন্যায় ও হিংসা করনা। উত্তমভাবে শীল পালন কর ও অবিরত পূণ্য কাজ কর। শীল ও পুন্য কাজে সর্বদিকে উন্নতি ও সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বনভন্তে তোমাদেরকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মত জানেন। সেভাবেই অকৃত্রিম স্নেহ করেন। সবাই ভালভাবে চল ও ভাল হয়ে যাও। ভাল হওয়ার অর্থ বুদ্ধজ্ঞান অর্জন করা। আজ তোমরা পুন্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছ। অনেক টাকা পয়সা খরচ হয়েছে বলিও না। উন্নতি হয়েছে বলিও। আমি তোমাদেরকে আশীর্বাদ করি যাতে তোমাদের

সর্বদিকে উন্নতি হয়। ধর্মের উজ্জ্বলতা বাড়ে, নীচে না পড়ে উপরে উঠতে পার, ধর্মে পরিহানি না ঘটুক এবং এ পুন্যের ফলে পরম সুখ নির্বান লাভের হেতু উৎপন্ন হোক।

সাধু - সাধু - সাধু।

বিকালবেলা পঞ্চশীল গ্রহণ ও কঠিন চীবর দান উৎসর্গের পর ২টা ৫০ মিনিট হতে ৪টা ৭ মিনিট পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম কি দেখা যায়? কি শুনা যায়? না, তা শুধু চিত্তে অনুভব করা যায়। ত্যাগধর্ম কি সুখ? হ্যাঁ, তা ত্যাগ করলেই প্রমান পাওয়া যায়। ভোগ ধর্ম কি দুঃখ? হ্যাঁ, তাও জ্ঞানদ্বারা অনুভব করা যায়। ভোগধর্মে অনেক দোষ নিহিত থাকে।

তিনি বলেন- কুশলকর্ম জ্ঞান ও বিশ্বাস দিয়ে করতে হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় জন্ম হলেই জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তু অলাভজনিত দুঃখ, আহার অন্বেষনে দুঃখ, পূর্ব পাপজনিত দুঃখ ও মৃত্যুদুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চস্কন্দই দুঃখজনক। মৃত্যু হলেই আবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়। জন্মের সাথে সাথেই আবার ৮ প্রকার দুঃখ উপস্থিত হয়। তাহলে এ দুঃখগুলি কোথা হতে আসে? তা অবিদ্যা-তৃষ্ণা হতে আসে বা দুঃখের কারন। তাহলে যে দুঃখ উৎপত্তি আছে সেটার নিরোধও আছে। আবার দুঃখের অবসান হওয়ার উপায়ও আছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তাহলে প্রকৃত সুখ কোথায়? তোমরা বনভন্তের নিকট জিজ্ঞাসা করতে পার। প্রকৃত সুখ আছে শুধু লোকোত্তরে। দুঃখ ও দুঃখের কারন হচ্ছে লৌকিক। দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধের উপায় হল লোকোত্তর। যিনি ত্যাগ করেন, যিনি নিবৃত্তি করেন এবং যিনি অনাসক্তভাবে থাকেন তিনি প্রকৃত সুখ ও শান্তির অধিকারী হন।

তিনি বলেন- মনে মনে চিত্ত না করলে, পঞ্চস্কন্দকে (রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান) দুঃখ বলে জানলে এবং অবিদ্যা তৃষ্ণাকে ত্যাগ করলে দুঃখগুলি হাল্কা হয়ে যায়। অন্যদিকে ত্যাগ না করলে দুঃখগুলি বাড়তেই থাকে। তোমরা নিরোধ সত্য ও মার্গসত্য নিজ অভিজ্ঞাদ্বারা প্রত্যক্ষ কর। তাতেই দুঃখের উপশম হবে। মার্গসত্য শমথ বিদর্শন ভাবনা দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। পৃথিবীর মধ্যে যত প্রকার সত্য আছে তৎমধ্যে চারি আর্যসত্যই প্রধান এবং মার্গের (পথ) মধ্যে যত প্রকার মার্গ আছে তৎমধ্যে

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই প্রধান। খাঁটি ধর্ম ও সত্যধর্ম অন্বেষন কর। ভেজাল ধর্মে ও অসত্য ধর্মে চলিও না। সুমার্গ বুঝিলে সুখ হয় ও গভীর বিশ্বাস হয়।

ভগবান বুদ্ধ বলেছিলেন- প্রায় মানুষ অজ্ঞান। তখন মহাব্রহ্মা ভগবান বুদ্ধকে প্রার্থনা করে বলেছিলেন-

"অবশ্য মিলিবে শ্রোতা
অবশ্য জ্ঞানীও মিলিবে"

বনভন্তেও বর্তমানে একটু ভোরবেলা দেখতেছেন। সেজন্যই ধর্ম প্রচার করতেছেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা ভগবান বুদ্ধের ধর্ম ভালভাবে মেনে চল। গভীরভাবে বিশ্বাস কর। যথাযথভাবে শিক্ষা কর। উপদেশ গ্রহণ কর। বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন কর। পুংখানুপুংখরূপে ট্রেনিংপ্রাপ্ত হও। এগুলি ছাড়া কোন দিন কৃতকার্য হতে পারবেনা। সুদক্ষ কৃষক যেমন ভালভাবে কৃষি কাজ না জানলে ভাল ফল পায়না তেমন মুক্তিকামী ও উপরোক্ত গুনাবলী না থাকলে কৃতকার্য হতে পারে না। সুচিন্তায় পুন্য ও দুশ্চিন্তায় পাপ উৎপন্ন হয়। খাঁটি বৌদ্ধের আচার বিচার গ্রহণ কর। গভীর জ্ঞান ও উচ্চতর জ্ঞান লাভ কর। শীলে উচ্চ চরিত্র বুঝায়। সুত্র ও বিনয়ে উচ্চ চিন্তা বুঝায় এবং অভিধর্মে উচ্চতর জ্ঞান বুঝায়।

তিনি উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন- বনভন্তের উপদেশ না মানলে তোমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তোমাদের নিশ্চয়ই উপরে উঠতে হবে। নীচে পড়বে কেন? চারি আর্যসত্য জ্ঞান পেলে যথেষ্ট। অংগ, জীবন ত্যাগ করা সুখ। তোমরা মৃত্যুকে জয় কর। প্রত্যেক লোকের মৃত্যুকালে কর্ম নির্মিত্ত বা গতিনির্মিত্ত আছে। কেউ কেউ মৃত্যুকালে মানুষের ছবি বা নির্মিত্ত দর্শনে মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করে। কেউ কেউ সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর ও ফুলের বাগান দর্শনে স্বর্গে উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ আগুন বা ভয়ার্ত মূর্তি দর্শনে নরকে উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ নরকংকাল বা জীর্নশীর্ন দেহের নির্মিত্ত দর্শনে প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়। কেউ কেউ নিশ্চুপভাবে পশুপক্ষীর কীট পতঙ্গ প্রভৃতি জীবজন্তুর নির্মিত্ত দর্শনে তীর্যককুলে জন্মগ্রহন করে। প্রত্যেক মানুষের প্রাণ যাওয়ার সময় যে নির্মিত্ত দর্শন করে সে সে নির্মিত্ত তার কর্মফলানুযায়ী সে জায়গায় জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু নির্বানে কোন

নির্মিত্ত দর্শন করে না। তাঁরা পুনঃজন্মের কারন অবিদ্যা-তৃষ্ণা আসক্তাদি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় করে পরিনির্বাপিত হন। চিত্ত মুক্ত হতে না পারলে উক্ত পঞ্চগতিতে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুপ্পাদ না জানলে ও না বুঝলে বুদ্ধজ্ঞান উদয় হবে না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- যার কাছে শ্রদ্ধা নেই সে কোনদিন দান দিতে পারবে না। যার কাছে হাত নেই সেও দান দিতে পারবে না। যার কাছে দান, শীল ও ভাবনা নেই তার হাতও নেই পাও নেই। উক্ত ব্যক্তি সেরূপ লোক। এখানে শ্রদ্ধা হল হাত। দান, শীল ও ভাবনা হল পা। সুতরাং যার হাত ও পা নেই তার জীবনের কোন মূল্যই নেই। যারা দান, শীল ও ভাবনায় প্রতিষ্ঠিত থাকে তাদেরকে স্বর্গের দেবরাজ ইন্দ্র ও চারিলোকপাল দেবতারা সাহায্য করেন।

তিনি এক ভবিষ্যৎ বাণী প্রদান করে বলেন- তোমরা শীলবান ও প্রজ্ঞাবান হও। যদি তোমরা আমার উপদেশে অগ্রসর হতে পার আগামী ৩০ বৎসর পর তোমাদের ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটবে। এমনকি স্বর্নের খনি, লৌহার খনি, সীসার খনি, তৈলের খনি ও গ্যাসের খনির অধিকারী হতে পারবে। যারা জ্ঞান, বুদ্ধি ও কৌশলের অধিকারী হয় তারা এ পুন্যের ফলে অনেক সময় বিপুল ধনের অধিকারীও হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করলে স্বর্গে যেতে পারে। তা লৌকিক ধর্ম। যারা চারি আর্য্য সত্যকে বিশ্বাস করে তারা নির্বান লাভ করতে পারে। তা লোকোত্তর ধর্ম। সম্প্রযুক্ত জ্ঞানে দান দিয়ে নির্বান প্রার্থনা করা উচিত। শীল ও ভাবনা করেও দুঃখ মুক্তির প্রার্থনা করা উচিত। কারন নির্বান জীবিত ও নয়, আবার মৃতও নয়। জন্ম মৃত্যু নিরোধে নির্বান লাভ হয় যারা মুক্তিকামী তারা ধন কামনা, পুত্র কামনা, রাষ্ট্র কামনা এমনকি আপন সমৃদ্ধির জন্যে কোন কামনাই করেন না। অতীতের পাপে বর্তমানে দুঃখ পায়। অতীতের পূন্যে বর্তমানে লৌকিক সুখ পায়। বনভন্তের প্রধান উদ্দেশ্য হল তোমাদের যাবতীয় দুঃখ দূর করে দেওয়া। অন্যটা হল তোমাদের দারিদ্রতা মোচন করে দেওয়া। তোমরা দিবারাত্র পূণ্য কর। আজ তোমরা যা কিছু পুন্য কাজ করেছ সে পুন্যের ফলে পরম সুখ নির্বান লাভের হেতু উৎপন্ন হোক। এ বলে আমার দেশনা এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

কুশলকর্মে জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে

প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা ও যথাযোগ্য ধর্মীয় মর্যাদায় পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটি ঐতিহাসিক রাজবন বিহারের একবিংশতিতম দানোত্তম কঠিন চীবর দানোৎসবের দুদিন ব্যাপী বর্নাঢ্য অনুষ্ঠানমালা আজ শেষ হয়েছে।

১০ই নভেম্বর '৯৪ ইংরেজী বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটায় কঠিন চীবর তৈরীর কাজে নির্বাচিত উপাসক-উপাসিকারা পঞ্চশীল গ্রহণ করেন। বেলা ৩টায় পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ সারিবদ্ধভাবে বেইন ঘরে উপস্থিত হয়ে স্বস্তিবাচন পাঠ করেন কঠিন চীবর তৈরীর কর্ম প্রবাহ উদ্বোধন করেন।

১১ই নভেম্বর' ৯৪ ইংরেজী শুক্রবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বোধি তরুমূলে সংঘদান, অষ্টপরিষ্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ২টা ৩০ মিনিটে উদ্বোধনী ধর্মীয় সংগীত গেয়ে দ্বিতীয় পর্বের অনুষ্ঠান সূচনা হয়। পঞ্চশীল প্রার্থনা করেন বাবু সঞ্জয় বিকাশ চাক্মা। পরিচালনা করেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞালংকার থেরো। উক্ত অনুষ্ঠানে বুদ্ধমূর্তি দান, অষ্ঠপরিষ্কার দান, কল্পতরু দান ও কঠিন চীবর দান উৎসর্গ করা হয়।

বিকাল ৪টা ৫ মিনিট হতে ৫টা পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হাজার হাজার পুন্যার্থীদের উদ্দেশ্যে এক ধর্মীয় ভাষন প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি বলেন- স্বধর্ম শ্রবণ খুবই দুর্লভ। মানুষই স্বধর্ম শ্রবণ করতে পারে। অন্য কোন প্রাণীই পারেনা। লোভহীন, দ্বেষহীন ও মোহহীন হতে হবে। যাদের মধ্যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ বিদ্যমান থাকে তারা স্বধর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা। সেরূপ যারা স্বধর্ম সম্বন্ধে কিছুমাত্র উপলব্ধি করতে পেরেছে তারাই প্রব্রজ্যা গ্রহন করতে পারে। প্রব্রজ্যাই মানুষ মুক্তির পথ খুঁজে পায়। স্বধর্ম শ্রবন যেমন দুলর্ভ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করা তেমন আরো দুলর্ভ।

তিনি বলেন- যে দান করে তার কর্ম ও কর্মফলকে বিশ্বাস করা উচিত। যে শীল পালন করে তার কর্ম, কর্মফল, ইহকাল ও পরকাল বিশ্বাস করা উচিত। যে ভাবনা করে তার কর্ম, কর্মফল, ইহকাল, পরকাল এবং চারি আর্যসত্যকে বিশ্বাস করা উচিত। দান, শীল ও ভাবনাকে কুশলকর্ম বলে। "কুশলকর্মে জীবনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে।" পরম সুখ ও মহৎফল উৎপন্ন হয়। অকুশল কর্মে নানাবিধ পরিহানি ঘটে ও বহু দুঃখে পতিত হয়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- আজ যে কঠিন চীবর দান সম্পন্ন হলো। এ কঠিন চীবর দান সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নাগিত স্থবির সর্বপ্রথম বর্ণনা করেছিলেন। তা অনেকের বিশ্বাস হয়না। কারণ শাস্ত্রের কথা, পুথিগত বিদ্যা এবং পরকথায় সহজে মনে বিশ্বাস জন্মে না। যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের চিত্তের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে না পারে ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাস জন্মানো সহজ নয়। ছাই এ আগুন না থাকলে সারাদিন ফুঁদিলেও আগুন জ্বলবে না। তেমনি যার মধ্যে শ্রদ্ধাজ্ঞান না থাকে তার কোনদিন বিশ্বাস জন্মানো কঠিন ব্যাপার। যাদের মধ্যে শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাস নেই, জ্ঞান নেই এবং ধর্মদেশনা শ্রবণ করার একাগ্রতা নেই তাদেরকে ধর্মদেশনা করার ইচ্ছাও হয়না। এমন কি বনভন্তের গলা পর্যন্ত ভেঙ্গে যায়। যদি সবকিছু পূর্ণ থাকে ধর্মদেশনার ইচ্ছাশক্তিও গলার স্বর অটুট থাকে।

তিনি বলেন- মহাকশ্যপ কোন সময় ত্রিপিটক পড়েননি। কিন্তু তিনি নানা যুক্তি উপমা দিয়ে ধর্মদেশনা প্রদান করতেন। টিপিটকে চারি আর্য সত্যের বাহিরে কিছু নেই। দান করা চারি আর্যসত্যকে বুঝায়। শীলপালন করা চারি আর্যসত্যকে বুঝায় এবং ভাবনা করাও চারি আর্যসত্যকে বুঝায়। যারা চারি আর্যসত্য না জানে, না বুঝে তারা অজ্ঞান ও মুর্খ ব্যক্তি। রাখাল যেমন অপরের গরু চড়ায়, কিন্তু গরুরও দুধের অধিকারী হতে পারেন না। শুধু পেটে ভাতে চাকুরী করে। যারা ত্রিপিটক মুখস্ত করে নবলোকোত্তর ধর্মের অধিকারী হতে পারেনা তাদেরকে রাখালের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যাঁরা নবলোকোত্তর ধর্মের অধিকারী হয়েছেন তাঁরা নিজ অভিজ্ঞতায় দুঃখ কি তা জানেন, দুঃখের কারণ কি তা জানেন, দুঃখের নিরোধ কি তা জানেন এবং দুঃখ নিরোধের পথ বা আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ তা যথাযথভাবে জানেন। যারা চারি আর্যসত্য না জানে, না বুঝে, না দেখে, পরিচয় না হয়, স্বাদ না পায় এবং রুচি না লাগে, তারা অবিদ্যার অন্ধকারে মুক্তির পথ খুঁজে পায় না। যারা জ্ঞানী তারা অবিদ্যাকে পরাজয় করে বিদ্যা উৎপন্ন করেন। মারকে জয় করে নির্বাণ সাক্ষাত করেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিশেষভাবে জোর দিয়ে বলেন- সকলে বুদ্ধের শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। শুধু উচ্চ ডিগ্রী বা ত্রিপিটক দিয়ে কেউ মুক্তি পাবেনা। সত্যিকার শিক্ষায় মানুষ মুক্তি পায়। যার কাছে শ্রদ্ধা নেই তার হাত নেই। যার কাছে জ্ঞান নেই তার পা নেই। তহলে কি করতে হবে? শ্রদ্ধার বলে ও

প্রজ্ঞার বলে উচ্চতর জ্ঞান লাভ করে দুঃখ সমুদ্র অতিক্রম করতে হবে। তোমরা শ্রদ্ধার বীজ অংকুরিত কর।

শ্রদ্ধায় মনুষ্য সম্পত্তি দেব সম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। ভগবান বুদ্ধের আভির্ভাব হলে মনুষ্য সম্পত্তি, দেব সম্পত্তি ও নির্বাণ সম্পত্তির আর্ভিভাব ঘটে।

চক্রবর্তী রাজার আর্ভিভাব হলে শুধু মনুষ্য সম্পত্তি ও দেব সম্পত্তির আর্ভিভাব ঘটে। মনুষ্যের মনুষ্য সম্পত্তি, দেবগনের দেব সম্পত্তি এবং নির্বাণ গামীর নির্বাণ সম্পত্তি না থাকলে কোন মূল্যই নেই। সম্পত্তি ছাড়া কেউ সুখ করতে পারে না। যারা গরীব তাদের পূর্ব রক্ষিত পূণ্য নেই। তারা পাপের দ্বারাই গরীব হয়েছে।

তিনি বলেন- নারী সুখের জন্য স্বামীকে গ্রহন করে এবং পুরুষ ও সুখের জন্যে নারীকে গ্রহন করে। সবাই সুখ চায়। কিন্তু, সুখের পরিবর্তে দুঃখ পায় কেন? এ দুঃখগুলি সংঘটিত হয় শুধু অবিদ্যা ও তৃষ্ণার কারনে সুখ যদি লাভ করতে চাও অপরের আশায় থেকো না। নিজের পায়ে নিজ দাঁড়াও। ভগবান বুদ্ধ চারি আর্য সত্য ও প্রতীত্য সমুপ্পাদ আবিস্কার করেছেন কিসের জন্যে? সকলের মুক্তির জন্যে পরমসুখ নির্বাণনের জন্যে। নির্বান কেউ বানাতে পারে না। নির্বাণ কোন জায়গা নয়। কোন জিনিষও নয়। তা সাধারণ মানুষের বোধগম্যও নয়। শুধু জ্ঞানীরাই চিত্তের দ্বারা উপলব্ধি করতে পারে।

শ্রদ্ধেয় বনভান্তে বলেন- কেউ কেউ ধর্মের নামে পাপ করে। কেউ কেউ কর্ম ও কর্মফলকে না দেখে পাপ করে। তাহলে ধর্মকেও কর্মকে কে দেখে? যার কাছে চারি আর্য সত্য জ্ঞান থাকে তিনিই ধর্মকে, কর্মকে ও কর্ম ফলকে দেখতে পান। যুগে যুগে কালের পরিবর্তন ঘটে। অনেক সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সত্যেরও পরিবর্তন হয়। সেটা হল লৌকিক সত্যের। কিন্তু চারি আর্য সত্যের পরিবর্তন হয় না। ভগবান বুদ্ধকে তথাগত বলে কেন? অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্যক সম্বুদ্ধরা একই চারি আর্য সত্য প্রচার করেন বলেই তথাগত নামে অভিহিত করেছেন। বর্তমান গৌতম বুদ্ধ যেভাবে ধর্ম প্রচার করেছেন আগামী আর্য মৈত্রেয় বুদ্ধ ও সেভাবে ধর্ম প্রচার

করবেন। লংকা-বর্মায় সেভাবে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞা পালন করে পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় ও সেভাবে শীল সমাধি ও প্রজ্ঞা পালন করে।

তিনি আরো বলেন- অনেকের খাদ্য দ্রব্যের প্রতি লোভ থাকে। লোভ পরায়ণ ব্যক্তি প্রকৃত ধর্মকে দর্শন করতে পারে না। তাদের ভোজনে মাত্রাজ্ঞান থাকতে হবে এবং এক সংজ্ঞা ভাবনা খুবই প্রয়োজন। তাতে খাওয়ার জিনিষের প্রতি ঘৃনা হয়। যে কোন জিনিষ খাওয়ার পর মলে পরিবর্তন হয়। এ বিষয়ে যে ভাবনা করবে সে কখনো খাদ্যের প্রতি লোভ করতে পারে না। ভাবনা অর্থ মনের কাজ। জ্ঞান উৎপাদক চিন্তা। কর্ষন ছাড়া যেমন ফলস উৎপন্ন হয় না তেমন ভাবনা ছাড়াও জ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারলে পাপ থেকে দূরে থাকা যায়। এমন কি মারে ও কোন সুযোগ করতে পারে না। সাবধানতাকে পালিতে অপ্পমাদ বলে। সাধারণ কথায় হুসিয়ার থাকাকে বুঝায়। উদাহরনে তিনি হরিণ জাতক বর্ণনা করেন। বোধিসত্ব হরিণ জন্মে সাবধানতা অবলম্বন করায় ব্যাধের হাত থেকে রক্ষা পান। বোধিসত্ব ব্যাধকে বলে ছিলেন- তুমি আমাকে হারিয়েছ বড় কথা নয় তোমার দুষ্কর্মকে হারাওনি। কর্মফল কেউ এড়াতে পারে না। বনভন্তে নিজেও সবসময় সাবধানতা অবলম্বন করে চলেন। এমনকি কোথাও যেতে হলে পূর্ব হতে জ্ঞান দৃষ্টি যোগে ভালমন্দ নিরীক্ষন করে তথায় গমন করেন।

তিনি আরো বলেন- যারা জ্ঞানী তারা সত্য পথে চলেন এবং অপরকেও সত্য পথে চলার জন্যে সুপরামর্শ দেন, উৎসাহিত করেন এবং সত্য পথ প্রর্দশন করান। তারা অতীব হিতকামী হয়ে বুদ্ধের শিক্ষায়, বুদ্ধের উপদেশ ও মুক্ত হওয়ার আচরণ শিক্ষা দেন। যারা মুক্তিকামী তারা সত্য মিথ্যা যাচাই করে। যা সত্য তা গ্রহণ করে এবং যা মিথ্যা তা বর্জন করে। তাতেই ধর্মজ্ঞান লাভ হয়ে মার্গফলে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই যাবতীয় ক্লেশ ও মারের অন্তর্ধান ঘটে। চিত্ত সত্য পথে চললে যত উপকার ও মঙ্গল সাধিত হয় নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু এবং হিংস্র, জন্তুরা তত ক্ষতি করতে পারে না। যার চিত্ত দুর্দমনীয় ও অসংযত থাকে নির্দয় রাজা, প্রবল শত্রু এবং হিংস্র জন্তু হতেও ভয়ানক পরিনতি ঘটে।

উসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিপুল সংখ্যক পুন্যার্থীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন- চিত্তকে দমন করতে পারলে পরম সুখ, পূণ্য এবং চিরমুক্ত হওয়া যায়। তাহলে তোমরা কিসের চিত্ত করবে? একমাত্র নির্বাণ মন বা নির্বাণ চিত্তই আসল সুখ পাওয়া যায়। এ বলে আমার দেশনা এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

জুরাছড়ি বনবিহার ও বনভন্তের দেশনা

জুরাছড়ি রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল। রাঙ্গামাটি হতে সুবলং এর দক্ষিন পূর্বকোনে জলপথে যেতে হয়। কথিত আছে জুরাছড়ি ছড়ার পানি অত্যন্ত ঠান্ডা। চাক্মা ভাষায় ঠান্ডাকে জুর বলে। সাধারণত পাথরময় এলাকায় ছাড়ার পানি স্বভাবতঃ ঠান্ডা থাকে। কাপ্তাই হ্রদের পানি বেড়ে গেলে ছড়াগুলি ডুবে বড় জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। পানি নেমে গেলে উক্ত এলাকার বাসিন্দারা চাষাবাদ জীবিকা নির্বাহ করে। জুরাছড়ি বিলের ধারেই অত্র এলাকার লোকেরা বসবাস করে। অন্যান্য পার্বত্য এলাকার চেয়ে এ এলাকার জনসাধারনের আর্থিক অবস্থা কিছুটা ভাল।

পাকিস্তান আমলে বাবু ভুবনজয় চাক্মা ছিলেন একজন প্রখ্যাত ব্যক্তি। অল্প শিক্ষিত হলেও উদার এবং দানবীর ছিলেন। কথিত আছে তিনি অতিরিক্ত তামাক সেবন করতেন বলে প্রায় কাশি রোগ লেগেই থাকতো। সেজন্য যক্ষা বাজার। বাজারের পাশেই ভুবনজয় প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশেষে সরকারের সুদৃষ্টিতে জুরাছড়ি একটি আদর্শ থানায় পরিণত হয়। বাংলাদেশে যত থানা আছে তৎমধ্যে জুরাছড়ি থানাই সর্বকনিষ্ঠ।

পার্বত্য এলাকায় যত বন বিহার আছে তৎমধ্যে রাঙ্গামাটি রাজবন বিহারই কেন্দ্রীয় বন বিহার। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শিষ্য ভিক্ষু শ্রমনের সংখ্যা বর্তমানে প্রায় দেড়শত। কেন্দ্রীয় বন বহিারে ভিক্ষু ৪৫ জন ও শ্রমন ৪৯ জন আছেন। ১৯৯০ ইংরেজী হতে বিভিন্ন এলাকায় শাখা বনবিহার স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সুনন্দ থেরো শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আমতলী

বনবিহারে সর্বপ্রথম শুভ পদার্পন করান। সেখানে মহা-উপাসিকা বিশাখা প্রবর্ত্তিত নিয়মে কঠিন চীবর দান করা হয়। শ্রদ্ধেয় সুনন্দ ভন্তে সর্বপ্রথম জুরাছড়িতে বনবিহার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহন করেন। জুরাছড়ির সদ্ধর্ম প্রান উপাসক-উপাসিকারা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত জুরাছড়ি বনবিহার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। বনবিহার স্থাপনের জন্য স্থান নির্বাচিত হল থানার দক্ষিন পাশে। তা লোকালয় হতে একটু দূরে ও নিরিবিলি স্থান। পরলোকগত বাবু ভুবন জয় চাক্‌মার উত্তরাধিকারীরা ১০ একর ভূমিদান করায় বনবিহার প্রতিষ্ঠা করা হয়। জুরাছড়ি বনবিহার পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা পালন করেন বাবু ধ্বল কুমার চাক্‌মা (শিক্ষক)।

১৯৯৪ ইংরেজীতে জুরাছড়ি বনবিহারে বর্ষাবাস যাপন করেন যথাক্রমে ১। শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দ ভিক্ষু, ২। শ্রীমৎ সুদত্ত ভিক্ষু, ৩। শ্রীমৎ সুমন ভিক্ষু, ৪। শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক ভিক্ষু, ৫। শ্রীমৎ ধর্মযোগ ভিক্ষু, ৬। শ্রীমৎ চুলকাল ভিক্ষু, ৭। শ্রীমৎ সিদ্ধি নন্দ ভিক্ষু। ৮। শ্রীমৎ জিনরক্ষিত শ্রমন। উক্ত বনবিহারে ৯ খানা ভাবনা কুঠির নির্মান করা হয়। দক্ষিন পাশে পাহাড় কেটে ধর্ম সভার জন্যে বিরাঠ মাঠ তৈরী করা হয়। ইতিমধ্যে পাকা মন্দিরের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে চল্‌ছে।

১৪ই নভেম্বর '৯৪ ইংরেজী সোমবার বিকাল ৩ ঘটিকায় মহা-উপাসিকা বিশাখা প্রবর্তিত কঠিন চীবর তৈরীর কর্ম প্রবাহ আরম্ভ হয়। সন্ধ্যায় ডায়নেমার আলোতে বিহার এলাকা এক সৌন্দর্যের স্বর্গপুরীতে পরিণত হয়। বিহারের পূর্ব পাশে প্রায় সমতল জায়গায় মেলার আয়োজন করায় জনসাধারণের মধ্যে আনন্দের জোয়ার বহে যায়।

১৫ই নভেম্বর '৯৪ ইংরেজী মঙ্গলবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩ ঘটিকায় পঞ্চশীল গ্রহণ করে কঠিন চীবর দান উৎসর্গ হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ ভৃগু থেরো। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বিপুল সংখ্যক উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে ৩টা ৪০ মিনিট হতে ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রথমেই বলেন- দেবরাজ ইন্দ্র একসময় ভগবান বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন- দানের মধ্যে কি দান শ্রেষ্ঠ? উত্তরে তিনি বলেছিলেন- দানের মধ্যে ধর্মদান, জ্ঞানদান, ও অভয়দানই শ্রেষ্ঠদান। চারি আর্যসত্য ও প্রতীত্য সমুপ্পাদ যথাযথভাবে বুঝিয়ে দেয়াকে ধর্মদান বলে। চারি আর্যসত্য লব্দ জ্ঞান অন্যকে অকাতরে বিতরণ করাকে জ্ঞানদান বলে। ভয়ার্ত ব্যক্তিকে ভয়

তিরোহিত করানোকে অভয়দান বলে। এ ত্রিবিধ দান কেবলমাত্র ভিক্ষুই দান করতে পারেন। অন্যদান দেয়া ভিক্ষুর পক্ষে শোভা পায়না।

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- অসাধুকে সাধু বানাও। শুধু নিরামিষ খেলে সাধু হয় না। যে শীল পালন করে সেই সাধু। তাহলে যারা পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত নয় তারা শীল পালন করে সাধু হও। ভগবান বুদ্ধ আরো বলেছেন মুর্খকে পন্ডিত বানাও। এম. এ. পাশ বা ত্রিপিটক বিশারদ হলে পন্ডিত হয় না যার কাছে ধৈর্য্য আছে, সহ্য আছে, সর্বজীবে দয়া আছে, ক্ষমাশীল, কুশলকর্মে নির্ভীক এবং সব সময় নিজকে অক্ষুন্ন রাখে তিনিই সত্যিকারের পন্ডিত বলে অভিহিত হন। পন্ডিত ব্যক্তি মনে দুঃখ অনুভব করেননা।

উদাহরনে তিনি বলেন- যদি কোন ভিক্ষুকে দেশের প্রেসিডেন্ট এসে বন্দনা করলে মনে উৎফুল্লভাব উৎপন্ন করতে পারেনা। অন্যদিকে কোন গরীব লোক তাকে বন্দনা না করলেও অন্যায় বলে মনে করতে পারেনা। অর্থাৎ সুখে দুঃখে চিত্ত বিচলিত করতে পারে না। মুর্খ ও পন্ডিতের চিহ্ন বা লক্ষণ কি? কর্মই মুর্খ ও পন্ডিতের লক্ষণ। রোগের যেমন লক্ষণ আছে, মুর্খেরও সেরূপ লক্ষণ আছে। ঔষধ প্রয়োগ করলে যেমন রোগ আরোগ্য হয়, তেমন মুর্খব্যক্তি পন্ডিতের পথে চললে পন্ডিত হয়। পন্ডিত ব্যক্তি সমস্ত দুঃখ ত্যাগ করেন, সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করেন এবং অনাসক্তভাবে থাকেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমরা বৌদ্ধ ধর্ম গবেষনা কর। যাতে কৃতকার্য হতে পার। তোমরা আমার দিকে চেয়ে থাক। বনভন্তে যদি পারেন আমরা পারব না কেন? এরূপ সংকল্প কর। বনভন্তে যদি পিছটান দেন তোমরাও দিও। পিছনদিকে যাওয়া কাপুরুষের লক্ষণ। এ কথাটা সবসময় মনে রাখিও। আমি যখন ধনপাতায় গভীর ভাবনায় ছিলাম তখন কেউ কেউ বলেছিল- বনশ্রমন কৃতকার্য হতে পারবেনা। হঠাৎ একদিন কাপড় ছেড়ে বিয়ে করবেন অথবা মরে যাবেন। সাধারণতঃ যুবককে খুব কমলোকেই বিশ্বাস করে। তাদের এ রকম মন্তব্য একটা ও ফলপ্রসূ হয়নি। বরঞ্চ আমার গন্তব্য পথে আমি এগিয়ে আছি।

ভগবান বুদ্ধ অতীতের জ্ঞান দিয়ে অতীতের কথা বলতে পারতেন। বর্তমানের জ্ঞান দিয়ে বর্তমানের কথা বলতে পারতেন এবং অতীত ও বর্তমানের জ্ঞান দিয়ে ভবিষ্যতের কথা বলতে পারতেন। আজ তোমরা যে কঠিন চীবর দান করেছ তা তোমাদের শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করবে। শ্রদ্ধায় দুঃখ সমুদ্র অতিক্রম করা যায়। অপ্রমাদেই সংসার সাগর পার হওয়া যায়।

বীর্যের বলে বাঁধার পর বাঁধা অতিক্রম করে সমস্ত দুঃখ মুক্তি লাভ হয়। যারা কাপুরুষ ও হীনবীর্য ধারী তারা কখনো কৃতকার্য হতে পারেনা।

তিনি বলেন- কেউ শুদ্ধ আর কেউ অশুদ্ধ হতে পারেনা। আবার কেউ কেউ "ঘিলাকজি" বা সোনারূপার পানি দিয়ে পরিশুদ্ধ করে। তা নিছক ভ্রান্ত ধারনা। মানুষ একমাত্র পরিশুদ্ধ হয় প্রজ্ঞার দ্বারা। তোমরা ভগবান বুদ্ধের মতে বা প্রজ্ঞায় পরিশুদ্ধ হও। কায় পরিশুদ্ধির চেয়ে চিত্ত পরিশুদ্ধি অনেক শ্রেয়ঃ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জোর দিয়ে বলেন- বনভন্তের উপদেশে না চললে কোন আপত্তি নেই। বনভন্তেকে শ্রদ্ধা না করলেও কোন কিছু আসে যায় না। কিন্তু বনভন্তের বিরুদ্ধে বিরুদ্ধাচরন বা বিরূপ কথা বলে কেউ রক্ষা পাবে না। তা বন্ধুকের গুলির চেয়ে ভয়াবহ হতে পারে। ভাল করে মনে রাখিও বর্তমানে বনভন্তেকে ভিত্তি করে বৌদ্ধ ধর্মের পুনঃ জাগরণ আরম্ভ হয়েছে। তা কেউ রোধ করতে পারবে না। ভগবান বুদ্ধ চারি আর্যসত্য কে ভিত্তি করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। মহা-উপাসিকা বিশাখা গভীর শ্রদ্ধাশীলা উপাসিকা ছিলেন। তাঁর পুর্বজন্মের পূণ্য ও পারমী এবং ইহজন্মের গভীর শ্রদ্ধার বলে প্রত্যহ ৫ হাজার ভিক্ষু সংঘকে অন্নদান দিতেন। বুদ্ধাদি সৎপুরুষকে বন্দনা, পূজা, সম্মান এবং দান দিলে আয়ু, বর্ণ, সুখ, বল ও প্রজ্ঞা বেড়ে যায়। প্রত্যেকে ভাল চায়। মন্দটা কেউ চায় না। কিন্তু দুঃখটা ঘাড়ে এসে পড়ে কেন? একমাত্র প্রজ্ঞার অভাবে অন্যটা হচ্ছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকে খারাপ বা ভাঙ্গা রেডিও বাজাচ্ছে। প্রত্যেকের উদ্দেশ্য ভাল ছাড়া খারাপ কাহারো কাম্য নয়। তবুও ঘটতেই আছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম উন্নতি করতে হলে প্রথমেই আর্থিক অবস্থা ভাল করতে হবে। আমি নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি যদি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বাঁধা না দিয়ে অনুকুলে চলতে থাক ভবিষ্যতে তোমাদের আর্থিক উন্নতি নিশ্চয়ই হবে। বনভন্তে চাক্‌মার ঘরে জন্মগ্রহণ করে চাক্‌মা জাতিকে জ্ঞানদান করতে না পারলে তা হবে মহা লজ্জাজনক ব্যাপার। যদি চাক্‌মা জাতি হতে কমপক্ষে ২ হাজার ব্যক্তি বুদ্ধজ্ঞান লাভ করতে পারে তবে বড়ুয়া সম্প্রদায় বলতে পারবেন- "হ্যাঁ, বনভন্তে আমাদেরকেও বুদ্ধজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করাতে পারবেন। সেজন্য আপাততঃ বড়ুয়াদের আমন্ত্রন গ্রহন করছি না।

তিনি বলেন- আচ্ছা, তোমরা মনে মনে বলতে পার বনভন্তে (তোমাদের কে) জ্ঞানদান করতে পারবেন? তিনি কি তোমাদেরকে

ভালভাবে বুঝাতে পারবেন? উত্তরে তিনি বলেন- নিশ্চয়ই তিনি পারবেন। যদি তোমাদের প্রবল শ্রদ্ধার বল থাকে, বীর্যের বল থাকে এবং একাগ্রতার বল থাকে। নিশ্চয়ই তোমরা বুদ্ধজ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে। তোমরা অজ্ঞানের সাথে থাকিও না। জ্ঞানের সাথে থাক। মিথ্যার সাথে থাকিওনা। সত্যের সাথে থাক। পরস্পর হিংসাভাব পরিত্যাগ করে মৈত্রীভাব পোষন কর। সত্যধর্ম গ্রহন করলে ইহলোক পরলোক সুখ পাবে। শীলবান ব্যক্তি ইহকাল পরকাল সুখ পায়। দুঃশীল ব্যক্তি ইহকাল দুঃখ পায়, পরকাল ও দুঃখ ভোগ করে। চারি আর্যসত্য না জানলে দুষ্প্রাজ্ঞ হয়। তা ভালভাবে জানলে প্রজ্ঞাবান হয়। যদি তোমরা সদ্ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পার তবে তোমাদেরকে স্বর্গের দেবতারাও সাহার্য্য করবেন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- তোমাদের ভাল গুরু নেই বলে নানাবিধ দুগর্তি হচ্ছে। তোমাদের জীবন সুশৃংখল করতে হলে গভীর শ্রদ্ধার প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধার মধ্যে তীব্র সংগ্রাম হয়। অশ্রদ্ধাকে পরাজিত করে অসীম শ্রদ্ধা অর্জন করতে হবে। ভিক্ষু সংঘকে দক্ষতা অর্জন ও দায়কদের উপযুক্ততা অর্জন করতে হবে। তা হলে মারভুবন, অমারভুবন, ইহকাল, পরকাল, মৃত্যুরাজ, অমৃত্যুরাজ সম্বন্ধে বুঝতে পেরে ধর্মজ্ঞান ও ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হবে। ধর্মজ্ঞান অর্থ চারি আর্যসত্যকে ভালভাবে জানা। ধর্মচক্ষু অর্থ হল চারি সত্যকে ভালভাবে দেখা। যেমন- অন্ধকারে বিদ্যুত চমকালে ক্ষনিকের জন্য দেখা যায় তেমন ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হলে অবিদ্যার অন্ধকারে ধর্মচক্ষুতে ভালভাবে চারি আর্যসত্য দেখা যায়। তাতে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ পুদগলে পরিণত হয়। অর্থাৎ ত্রিহেতুক পুদগল পরম সুখ নির্বাণ লাভ হয়। এ বলে আমার দেশনা এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

ভাই এর বেশে দেবতার আগমন

১৯৯১ বাংলা সনের চৈত্র মাস শ্রদ্ধেয় বনভন্তে খাগড়াছড়ি জেলার সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক-উপাসিকাদের বিশেষ প্রার্থনায় বিভিন্ন স্থানে শুভ পদার্পন করেন। তাঁদের বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও শ্রদ্ধার প্রবলতা দেখে তিনি মাসাধিকাকাল তথায় অবস্থান করেন। সে সময় অনাবৃষ্টির দরুন চাষাবাদ ও নানাবিধ ফসলাদির উৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল।

অতীব সুখের ও আনন্দের বিষয় যে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যে স্থানে পদার্পন করেন সে স্থানেই তাঁর সত্যের ও পুন্যের প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয়ে সেখানকার জনগনের মনে উৎফুল্লতার জোয়ার বয়ে যায়।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন জায়গায় ধর্ম অভিযান করার পর পানছড়ি সার্বজনীন বিহারে আমন্ত্রিত হন। সেদিন ছিল ২৯শে চৈত্র সোমবার। সে বিহারের সার্বিক পরিচালনা করেন বাবু মংচাই থোঅং চৌধুরী। তাঁর বড়ছেলে বাবু সুইলাপ্রু চৌধুরী খাগড়াছড়ি উন্নয়ন বোর্ডে চাকুরী করেন। স্ত্রী পুত্র নিয়ে তিনি খাগড়াছড়ির মহাজন পাড়ায় থাকেন।

২৬শে চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যায় স্কুটার যোগে তাঁর নিজ বাড়ী পানছড়িতে যান। বাড়ীর সামনেই তাঁর ছোট ভাই বাবু ক্যয়চিং প্রু চৌধুরীর সাথে দেখা হয়। সুইলাপ্রু আমি এক বিশেষ খবর নিয়ে এসেছি।

বোরো ধানের জন্যে যে পাম্প মেশিনের আয়োজন করেছ তা প্রয়োজন হবে না। কারন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে যেখানে পদার্পন করেন সেখানেই প্রবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। আর মাত্র ৩ দিন অপেক্ষা কর।

ক্যয়চিংপ্রুঃ- বাড়ীতে আসবে না?

সুইলাপ্রুঃ- আমার তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে। এখন বাড়ী যাওয়ার সময় নেই।

২৯শে চৈত্র সোমবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিট পানছড়ি বিহারে সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন অধিক সংখ্যক উপাসক-উপাসিকারা উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেননি। পূর্ব রাত হতে প্রবল বৃষ্টিপাত আরম্ভ হয়েছে। বেলা ১টায় হঠাৎ আকাশ পরিষ্কার হয়ে বৃষ্টি থেমে যায়। চারদিক থেকে উৎফুল্ল ধর্মপ্রান নরনারী ধর্ম সভায় উপস্থিত হয়। এদিকে বাবু সুইলাপ্রু চৌধুরী ও স্কুটার যোগে খাগড়াছড়ি হতে পানছড়ি ধর্ম সভায় যোগদান করেন। যথা সময়ে ধর্ম সভা শেষ হওয়ার পর বাবু সুইলাপ্রু চৌধুরী তাঁর বাড়ীতে যান। তার ছোট ভাই ক্যয়চিং প্রু চৌধুরী হেসে হেসে বললেন গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তোমার কথায় বহু উপকার হয়েছে। অনেক টাকা পয়সার খরচ থেকে বেঁচে গেছি।

সুইলাপ্রু কি কথা বলেছি? (আচার্যন্বিত স্বরে) সেদিন ত আমি এখানে আসেনি? তাদের কথা ও কাজে মিল না থাকাতে কিছুটা জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ৩০শে চৈত্র মঙ্গলবার বাবু খুলারাম চাকমা বাজারে গেলে

বাবু মংচাই থোঅং চৌধুরীর সাথে দেখা হয়। উভয়ে কুশাল বিনিময়ের পর তাঁর বড়ছেলে সুইলাপ্রু ও ক্যয়চিংপ্রুর মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি এবং চাঞ্চল্যকর রহস্যের কথা উথাপন হয়। বাবু খুলারাম চাকমা একটু চিন্তা করে বললেন এটা ভুল বুঝাবুঝির বিষয় নয়। অনেক সময় স্বর্গের দেবতারা ও মনুষ্যের বেশে পৃথিবীতে এসে জনগণের উপকার সাধন করে থাকেন। সুতরাং তাই এর বেশে দেবতার আগমন হয়েছিল। বাবু মংচাইথোঅং চৌধুরী বাবু খুলারাম চাকমার গ্রহনযোগ্য ও উপযুক্ত মন্তব্য শুনে খুবই প্রীতি অনুভব করেন। এ তথ্যটি পরিবেশন করেন ধর্মপুর (পেরাছড়া) নির্বাসী বাবু খুলরাম চাকমা।

- o -

আগুন লেগেছে! বেরিয়ে এস!

শ্রদ্ধেয় ভনভন্তে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশনা প্রসঙ্গে পারমার্থিক ও গভীর ধর্মদেশনা দিয়ে থাকেন। আমার মনে হয় প্রায় উপাসক উপাসিকারা তাঁর এরূপ ধর্মদেশনা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম নয়। আমি ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি অনেক সময় শ্রদ্ধেয় বনভন্তের ধর্মদেশনা শ্রবন করে কিছুটা হৃদয়অঙ্গম করি। কিন্তু পরক্ষনই তা স্মৃতির অতল তলে ডুবিয়ে যায়। তাহলে বুঝা যাচ্ছে আমাদের স্বল্প স্মৃতি, স্বল্প জ্ঞান ও স্বল্প শ্রদ্ধার দরুন তাঁর পারমার্থিক ও গভীর ধর্মদেশনা যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করতে না পারার একমাত্র কারন।

একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জনৈক বিশিষ্ট উপাসক আমার নিকট ন্তের দেশনা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছেন। দেশনাটি হল ঘরে আগুন লেগেছে? তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এস! ঘুমিয়ে থেকো না। এ দেশেনাটির সম্বন্ধে তাঁকে বললাম উক্ত দেশনাটি একাধিক বার শ্রবন করেও আমি যথাযথভাবে উপলব্ধি বা হৃদয়অঙ্গম করতে সক্ষম হইনি। শুধু এ পর্যন্ত জানি মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় ঘরে আগুন লাগলে জাগরিত ব্যক্তি ডেকে দেয়। ঠিক তেমনি শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও আমাদেরকে গভীর ঘুম থেকে ডেকে

দিচ্ছেন। সে ঘুমটি হল লোভ, দ্বেষ ও মোহ। আগুনটি হল জন্ম, জ্বরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। প্রাণ বাঁচানোর উপায় হল আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে হচ্ছেন সর্বদা জাগরিত ব্যক্তি। তিনি আমাদের প্রতি অসীম দয়া ও অনুকম্পা করে জাগিয়ে দিচ্ছেন।

একদিন শ্রদ্ধেয় বনভন্তে দেশনালয়ে উপাসক উপাসিকাদের প্রতি দেশনা দিচ্ছিলেন। সেদিন উপাসিকাদের সংখ্যা বেশী ছিল। দেশনা প্রসংগে তিনি বলেন এগুলি হল এক একটি দুঃখ পুঞ্জমাত্র (দলা)। সবাই মরে যাবে। কিন্তু দুঃখ গুলি থেকে যাবে। তিনি আমার প্রতি বললেন আচ্ছা এগুলি মরে গেলে কি হবে? আমি বললাম- ভন্তে বারবার মরতে হবে। বারবার দুঃখ পেতে হবে। তিনি বললেন- বারবার মরা ও মহাদুঃখজনক সুতরাং যে যত সহসা মরনকে বন্ধ করতে পারে সে এ পৃথিবীতে তত ধন্য। আমার কথা প্রায় লোকে শোনে ও শোনে না। বিশ্বাস করে ও বিশ্বাস করে না। যদি আমার কথা শোনতো বা বিশ্বাস করতো তারা নিশ্চয়ই ঘর থেকে বেরিয়ে আসতো। কেউ তো আমার ডাকে তেমন সাড়া দিচ্ছে না। সবাই জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছে। আমি সব সময় ডাকতে থাকি। ঘরে আগুন লেগেছে। বেরিয়ে এস। ঘুমিয়ে থেকো না। এভাবে কিছুক্ষণ দেশনা করার পর জনৈক উপাসিকা বলল- বনভন্তে ও মরে যাবেন। উপাসিকার উক্তির সাথে সাথেই আমি উচ্চস্বরে হেসে উঠি। তাতে উপাসিকা হতভম্ব হয়ে পড়ে। একটু পরে আমি বললাম- ভন্তে, এ উপাসিকা কেন, প্রায় লোকই আপনার দেশনার ধারে কাছেও অবস্থান করছে না।

অতএব আমি উক্ত উপাসিকার প্রতি বললাম- মানুষের মৃত্যু ৫ প্রকার। যাঁরা ত্রিহেতুক পুদগল তাঁরা মৃত্যু বরন করেন না। জন্ম গ্রহনও করেন না। যাঁর জন্ম মৃত্যু নেই তাঁর কোন প্রকার দুঃখও নেই। সুতরাং শ্রদ্ধেয় বনভন্তে জন্ম মৃত্যুর অধীন নন। তিনি মৃত্যু বরন না করে পরি-নির্বাপিত হবেন। আমার বক্তব্যটি বলার পরও বোধ হয় উক্ত উপাসিকার মরন সম্বন্ধে বোধগম্য হয়নি।

সদ্ধর্ম প্রান উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি আমার একান্ত অনুরোধ আপনারা যেন শ্রদ্ধেয় বনভন্তের অভিজ্ঞান প্রসূত পারমার্থিক ও গভীর ধর্ম দেশনা গুলি যথাযথভাবে হৃদয়অঙ্গম করতে সচেষ্ট হন। এ ব্যাপারে তিনি

বলেছেন যার যতটুকু বুঝার সামর্থ থাকবে তার ততটুকু উন্নতি হবে। যার যতটুকু উন্নতি লাভ করবে তার ততটুকু দুঃখ মোচন বা মুক্তি লাভ হবে। সুতরাং প্রত্যেকের অবিদ্যা তৃষ্ণারূপ গভীর ঘুম থেকে জাগরিত হওয়া অবশ্যই একান্ত দরকার।

- ০ -

দুর্গার খাড়ু

প্রাচীনকাল ছিল মানুষের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়। সে সময় মানুষ অসহায় ছিল। ধর্মের ও কর্মের গতি ছিল এলোমেলো। ধর্মের নামে চলতো নানাবিধ যাগযজ্ঞ, পশুবলি ও পূজার প্রচলন। তাতেই লাভবান হতো এক শ্রেনীর লোক। তারা নানা প্রকার শ্লোক ও মন্ত্রের প্রবর্তন করতো। প্রথমেই শুরু হয় চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র, বায়ু প্রভৃতির পূজা। দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রচলিত হয় পাহাড়, পর্বত, খাল, নদী, বড় বড় গাছ ও হিংস্র জীব জন্তুর। তৃতীয় পর্যায়ে প্রবর্তিত হয় অসংখ্য দেবদেবী ও কাল্পনিক অশরীরির পূজা। মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করতো বলে ধর্মের নামে উজার করে দিত তাদের বিপুল অর্থ সম্পদ।

এমনিভাবে হাজার হাজার বৎসর কেটে যায়। ক্রমে ক্রমে মানুষের মনে জ্ঞানের উদয় হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ উৎকর্ষতা লাভ করে বুঝতে পেরেছে তাদের পূর্বের যাবতীয় ভুলের কথা। ইহাতে লোকের মধ্যে মিথ্যা দৃষ্টি ত্যাগ করে সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হয়। ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারল কুশল-অকুশল, পাপ-পূণ্য, ন্যায়-অন্যায়, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, সত্য-মিথ্যা প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় কিন্তু সংস্কার ত্যাগ করা কঠিন। তাই আধুনিক যুগেও মধ্যে

মধ্যে দেখা যায় পূর্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের কার্যকলাপ। সংক্ষেপে নিম্নে এরূপ একটি ঘটনা প্রকাশ করছি।

বিগত ১৯৮৬ ইংরেজীতে খাগড়াছড়ি ও লউগাং এর সদ্ধর্মপ্রান উপাসক-উপাসিকারা শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বিভিন্ন পুন্যানুষ্ঠানের জন্যে আমন্ত্রন করেন। ভন্তের সঙ্গে ছিলেন ৭/৮ জন শিষ্য। রাঙ্গামাটিবাসী উপাসকদের মধ্য হতে অনুগামী ছিলেন বাবু সুনীতি বিকাশ চাক্‌মা (সক্ক), বাবু জ্যোতির্ময় চাক্‌মা (পরলোকগত), বাবু অশোক কুমার বড়ুয়া (প্রকৌশলী), বাবু সত্যব্রত বড়ুয়া, বাবু কিনা চান তঞ্চঙ্গ্যা (মেম্বার) প্রমূখ ভদ্রলোক সহ আনুমানিক ৩০ (ত্রিশ) জন। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের শুভ আগমনে শ্রদ্ধায় ভরে উঠে সদ্ধর্ম প্রান নরনারীর মন প্রান। খাগড়াছড়ি হতে লউগাং পর্যন্ত শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ পথে পথে ১৮ (আটার)টি তোরণ নির্মাণ ও সুসজ্জিত করা হয়। তোরণের দুপাশে দাঁড়িয়ে সদ্ধর্মপ্রান আবাল বৃদ্ধ বনিতা করজোরে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

পরের দিন সকালে কয়েকজন উপাসক শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বললেন- ভন্তে, পাথরে খোদাই করা একটা খাড়ু বা চুঁড়ি দেখা যাচ্ছে। সে পাথরটি দূর্গার খাড়ু নামে পরিচিত। হিন্দু ও ত্রিপুরারা ঐ খাড়ুর পূজা করে। তাদের দেখাদেখিতে চাক্‌মারাও সেখানে বাতি জ্বালায় ও পূজা করে। সে খাড়ুর পূজারী ব্রাহ্মন লউগাং বাজার হতে যায়। লউগাং বিহার হতে দুই মাইল উত্তরে ভারত সীমান্ত। দূর্গার খাড়ু নামীয় ছড়া, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নির্দেশ করেছে। সে ছাড়ায় উক্ত খাড়ু বা চুঁড়ি বহু বৎসর যাবৎ পড়ে আছে। কাহারো কাহারো মতে সেটা নাকি দূর্গাদেবীই পরিধান করতেন। পরবর্তীকালে সেটি পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। তাদের বিবরণ শুনে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে নির্দেশ দিলেন- যাও, সেটা এখানে নিয়ে আস। দল বেঁধে কিছু লোক ছুটে যায় দূর্গার খাড়ু আনার উদ্দেশ্যে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, বহু চেষ্টা করেও সেটাকে নাড়ানো গেলো না। তারা ফিরে এসে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে বলল- ভন্তে, ও টাকে আমরা একটুও নাড়াতে পারিনি। শ্রদ্ধেয় ভন্তে পুনরায় নির্দেশ দিলেন- যাও, তোমরা শুধু ২ (দুই) জন গেলেই চলবে। সঙ্গে একটা গাছের কচি নিয়ে যাও। নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করা হলো। সত্যি সত্যিই এবার তারা ২ (দুই) জনেই উক্ত খাড়ুটি কাঁধে করে নিয়ে এলো। লউগাং বিহার প্রাঙ্গনে দূর্গার খাড়ু দেখার জন্যে নরনারীর ভীড় জমে যায়। অতঃপর আমিও সেটাকে ভালভাবে নিরীক্ষন করে বুঝতে পারলাম, স্বর্ণকার যেভাবে সোনারূপার চুঁড়ি তৈরী করে, ঠিক সেভাবে কোন

এক সুদক্ষ শিল্পী তার মনের খেয়ালে পাথর খোদাই করে এরূপ পাথরের অলংকার তৈরী করেছে। পরবর্তীতে মনে হয় কে বা কাহারা ঐ টাকে দূর্গার খাড়ু নামে অভিহিত করেছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশে ওটাকে ঘেরা দেয়া হলো। প্রথমেই তিনি খাড়ুর উপর বসে স্নান করেন। পরবর্তীতে ভিক্ষু সংঘ স্নান করায় উহা স্নান ঘরে পরিণত হয়। সেদিনই জানাজানিতে পূজারী ব্রাহ্মন, হিন্দু ও ত্রিপুরাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান বাবু রাজ কুমার চাক্‌মা (পরলোকগত) ও পূঁজগাং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বাবু জগদীশ চাক্‌মা উক্ত জনগনের সে উত্তেজনা ও প্রতিক্রিয়া প্রশমিত করেন। লোক মুখে শুনতে পেলাম সেই রাতেই পূজারী ব্রাহ্মন, হিন্দু ও ত্রিপুরারা স্বপ্নে দূর্গার খাড়ুর নির্দেশ পেয়েছে- "তোমরা আমাকে স্থানান্তর করার চেষ্ট করোনা। আমি যেখানে আছি সেখানেই থাকব।"

অতপর দূর্গার খাড়ু লউগাং বিহার প্রাঙ্গনে স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে লউগাং বিহারের বিহারাধ্যক্ষ শ্রীমৎ বোধিপাল মহাথেরো ও সেক্রেটারী মহোদয়কে আমাদের রাজবন বিহারে দূর্গার খাড়ু প্রদর্শনার্থে দেয়ার জন্যে আমি সবিনয় অনুরোধ জানাই। তাঁরা আমার অনুরোধে গত ফেব্রুয়ারী '৯৫ ইংরেজীতে পাঠিয়ে দেন। বর্তমানে উক্ত খাড়ু রাজবন বিহার সার্বজনীন উপাসনালয়ের দক্ষিন পাশে সুবলং হতে আনীত যে ২ (দুই) টি গোল কাল পাথর আছে সেগুলির পাশেই রক্ষিত আছে। দূর্গার খাড়ুর ওজন আনুমানিক ২ (দুই) মন হতে পারে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তের নির্দেশে বহু নরনারী দূর্গার খাড়ুর পূজা করা বা মিথ্যা দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পায়।

- o -

প্রবারনা পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে বনভন্তের দেশনা

আজ ১৭ই অক্টোবর '৯৪ ইংরেজী রোজ সোমবার। স্থান- রাজবন বিহার সম্মুখ প্রাঙ্গন। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে বাবু অমলেন্দু বিকাশ চাক্‌মা রচিত বৌদ্ধ ধর্মীয় সঙ্গীত গেয়ে সকাল বেলার অনুষ্ঠান উদ্বোধন করা হয়।

সুর দিয়েছেন বাবু রণজিৎ দেওয়ান। অনুষ্ঠানের প্রথমেই পঞ্চশীল গ্রহন করে বুদ্ধ পূজা সংঘদান ও অষ্ট পরিষ্কার দান সম্পাদিত হয়।

সকাল ১০টা ৩০ মিনিট হতে ১০টা ৪৫ মিনিট (মাত্র ১৫ মিনিট) পর্যন্ত শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সমবেত উপাসক উপাসিকাদের প্রতি ধর্মদেশনা প্রদান করেন। দেশনার প্রারম্ভেই তিনি বলেন- মানুষ মাত্রই দুঃখ। অন্যান্য প্রাণীর কথাই বা কি। তাহলে দুঃখময় মানুষ নানাবিধ দুঃখ হতে মুক্তি পাওয়ার উপায় অবলম্বন করতে হবে। মানুষ নানা প্রকার চিন্তা করে। চিন্তার কোন অন্ত নেই। তবে এমন চিন্তা করতে হবে যে চিন্তায় সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারে। তাহলে কি চিন্তা করতে হবে? প্রথমেই অজ্ঞানতা দূর করতে হবে। ভগবান বুদ্ধ সব সময় চারি আর্য সত্য সম্বন্ধে চিন্তা করতে বলেছেন। অন্যান্য বিষয় চিন্তা কর না। মানুষ কিসে দুঃখ পায়? মানুষ অবিদ্যা-তৃষ্ণায় দুঃখ পায়। তা হলে চারি আর্য সত্য চিন্তায় অবিদ্যা-তৃষ্ণা ধ্বংস হয়। অবিদ্যা-তৃষ্ণা ধ্বংস হলে নিজে মুক্ত হয়েছে জানতে পারে। নিজে মুক্ত হয়ে অপরকে মুক্ত করতে পারে। তার আগে নয়। নিজে মুক্ত না হয়ে অপরকে মুক্ত করা এটা একটা অবাস্তব কথা মাত্র। সুতরাং প্রত্যেকের চারি আর্য সত্য চিন্তা করা একান্তই কর্তব্য।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ভগবান বুদ্ধ কি চিন্তা করেছিলেন? তিনি চিন্তা করেছিলেন কিভাবে কুশল ও সর্বজ্ঞতা অর্জন করা যায়। কুশল ও সর্বজ্ঞতা অর্জন করে তিনি সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন। ভগবান বুদ্ধ বলেছেন সবার জন্যে কুশল ও সর্বজ্ঞতা চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। শুধু মুক্ত হওয়ার জন্যে চারি আর্য সত্য চিন্তা কর। চারি আর্য সত্য চিন্তা করলে নীচে পড়বে না। অর্থাৎ অধোপাতে বা চারি অপায়ে পড়বে না। অজ্ঞান ও তৃষ্ণা সবার নিকট থাকে।

তিনি বলেন- তোমরা কার আশ্রয়ে যাবে? উচ্চতর জ্ঞানের আশ্রয়ে যাও। উচ্চতর জ্ঞানের আশ্রয়ে গেলে কোন দুঃখ তোমার নাগাল পাবে না। চারি আর্য সত্য সর্ব দুঃখ হতে মুক্তি দেয়। যেখানে চারি আর্য সত্য নেই সেখানে কোন ধর্মই নেই। এমনকি ভিক্ষু সংঘের যদি তা না থাকে সে ভিক্ষু সংঘ নিষ্ফল। যে ধর্মে মার্গ নেই, ফল নেই এবং নির্বান নেই সে ধর্মে কোন মূল্যও নেই। ভগবান বুদ্ধের ধর্মের আয়ু ৫ (পাঁচ) হাজার বৎসর। এখন ২৫৩৮ বুদ্ধাব্দ চলছে। এখনও অর্হত হওয়ার সময় আছে। এমন কি ৪ (চার) হাজার বৎসর পর্যন্ত অর্হত্ব ফল লাভ করতে পারবে। ইতিমধ্যে যার প্রবল চেষ্টা থাকবে সে সর্ব দুঃখ ধ্বংস করতে পারবে।

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন- দুধ হতে দই, মাখন, ঘি প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। তেমন মানুষ হতে উত্তম হতে উত্তম মার্গ ফল ও নির্বান লাভ হয়। তোমরা শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠত্ব ফল লাভ কর। জ্ঞান সত্য উদয় হলে শ্রেষ্ঠ হতে শ্রেষ্ঠত্ব ফল বা অর্হত্ব ফল প্রাপ্ত হয়। যতদিন পর্যন্ত চারি আর্য সত্য উদয় না হবে ততদিন পর্যন্ত দুঃখ মুক্তি হবেনা। সত্যের মধ্যে চারি আর্য সত্য শ্রেষ্ঠ। মার্গের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই শ্রেষ্ঠ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে উপসংহারে বলেন- পৃথিবী অবলোকন করলে দেখা যায় সত্যের মধ্যে চারি আর্য সত্যই শ্রেষ্ঠ এবং মার্গের মধ্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নির্বান লাভ করার একমাত্র উপায়। তা হলে আজ তোমরা দৃঢ় সংকল্প কর যাতে তোমরা সত্যের আশ্রয়ে থাকতে পার এবং অন্য মার্গে বা পথে না চলে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গে চলে পরম সুখ নির্বান লাভ করতে পার। এ বলে আমার দেশনা এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

বিকাল বেলা শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ৩টা ৫ মিনিট হতে ৪টা ২০ মিনিট পর্যন্ত সদ্ধর্ম প্রান উপাসক-উপাসিকাদের প্রতি ধর্ম দেশনা প্রদান করেন। প্রথমেই তিনি বলেন- কিভাবে সুখ হয়? কিভাবে মুক্ত হয়? আমি যখন গৃহী অবস্থায় ছিলাম তখন বাবু কামিনী মোহন দেওয়ান জিজ্ঞাসা করেছিলেন- এক কথায় অর্হত কিভাবে হওয়া যায়? বর্তমানে তো তিনি এখন বেঁচে নেই। প্রথমেই দৃষ্টি বিশুদ্ধি করতে হবে। এ ব্যক্তি মানুষ এ কথাটি বলতে পারবে না। এ ব্যক্তি নারী, এ ব্যক্তি পুরুষ। এ কথাগুলিও বললে ভুল হবে। মানুষ, নারী ও পুরুষ অজ্ঞান, মিথ্যা, দুঃখ, পাপ ও মুক্ত নয়। এগুলিকে আগুন, পানি, মাটিও বায়ু হিসেবে দেখতে হবে। যতক্ষন পর্যন্ত নামরূপ দর্শন না হবে ততক্ষন পর্যন্ত অজ্ঞান, মিথ্যা, দুঃখ, পাপ ও মুক্ত হতে পারবে না। সেজন্য 'আমি'র মধ্যে সুখ বিশ্বাস কর না। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সুখ আছে সেটা বিশ্বাস কর না। যেখানে আমি নেই ও নারী পুরুষ নেই সেখানে সুখ অন্তরনিহিত থাকে। তাতে উচ্চতর জ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- মানুষ সবাই মরে যাবে। কেউ বেঁচে থাকবে না। সেজন্য প্রত্যেকের মৃত্যু দুঃখ থাকে। মৃত্যু দুঃখ অতি ভয়ংকর।

পিতা পুত্র পরিজন,
কেহ না করে রক্ষন

সুতরাং যে মৃত্যু সম্বন্ধে গবেষনা করে সে কখনো পাপ করতে পারে না।

তিনি আরো বলেন- তোমরা অতীতকে নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করনা। বর্তমান সম্বন্ধে সব সময় সচেতন হও। সাবধানতা অবলম্বন -এ মার নেই।

"অতীতের যাহা কিছু ফেলে দাও অতীতে।
তথাপি না দিও তারে পুনঃ আবির্ভাব হতে।"

ভগবান বুদ্ধ বলেছেন- যে অবিদ্যা তৃষ্ণা ক্ষয় করবে সে আমার সংঘ। তাহলে সংঘ কোথায়? আমি প্রায় বড়ুয়া ও চাক্মাদের মুখে শুনে থাকি- বৌদ্ধ ধর্ম কঠিন। পালন করতে পারছি না ও কষ্ট। যে টেলিভিশন বানাতে জানে তার নিকট অতি সহজ কাজ। অন্যের জন্য মহা কঠিন কাজ। টেলিভিশন বানাতে যেমন শিক্ষা করতে হয়, ট্রেনিং নিতে হয় এবং অভ্যাস করতে হয়, তেমন নির্বান লাভ করতেও নির্বানের শিক্ষা, নির্বানের ট্রেনিং, নির্বানের উপদেশ ও নির্বানের অভ্যাস করতে হয়, তাহলে শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার শিক্ষা, উপদেশ ও অভ্যাস করতে হবে। নির্বান লাভ করতে যেভাবে সহজ হয় সে ব্যবস্থা করতে হবে। যে কোন কাজ করতে হলে প্রথমেই কিছুটা কষ্ট বা দুঃখ সহ্য করতে হয়। নির্বানের শিক্ষা, উপদেশ ও অভ্যাস করতে কিছুটা কষ্ট স্বীকার করতে হয়। যারা টেলিভিশন বানাতে পারে তাদের জন্যে এটা বিশেষ ব্যাপার নয়। তেমন যারা নির্বান লাভ করেছেন তাদের জন্যেও এটা মহা সমস্যা নয়। মানুষ হিসেবে থাকলে নানাবিধ দুঃখে পড়ে, বিপদে পড়ে এবং ভয় শংকুল। মানুষ হিসেবে থাকলে সত্ত্ব মরে, পরান মরে, আত্মা মরে, দেহ মরে এবং মার মরে। কিন্তু নির্বানে সুখ, নিরাপদ এবং স্বাধীন। কেউ কেউ দুঃখ পেলে নির্বান বিশ্বাস করে। বনভন্তের ও সত্ত্ব নেই, আত্মা নেই, দেহ নেই এবং মারনেই। কাহারো কাহারো মনে প্রশ্ন আসতে পারে বনভন্তের দেহ না থাকলে কে কথা বলতেছেন? যার অহংকার থাকে, দুঃখ থাকে তার পুনজন্ম থাকে। যার অহংকার নেই, দুঃখ নেই, পুনজন্ম নেই তার দেহ ও নেই। ছোট, সমান ও শ্রেষ্ঠ বলা উচিত নয়। ধন, জন, পুত্র এবং লেখা পড়ার অহংকার না করলে নিশ্চই সুখ হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- ছোট শিশু আগুন ধরলে পুড়ে যায়। সেজন্য সবাই দুঃখ পায় কেন? অজ্ঞান ও মিথ্যা আছে বলে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সবাই শিশু। একমাত্র বনভন্তেই বৃদ্ধ। জ্ঞানে হিংসা, অন্যায়, ক্ষতি ও অপরাধ করেনা। ধার্মিক, শীলবান ও জ্ঞানী হলে স্বর্গের দেবতারাও সাহার্য

করে। বৌদ্ধ ধর্ম মেনে চললে সুখ হয়, মনে শান্তি পায় ও পুন্য হয়। বৌদ্ধ ধর্ম না মানলে ক্রমান্বয়ে সবকিছু ধ্বংস হয়। তাহলে তোমাদের নির্বানের ট্রেনিং নিতে হবে। নির্বানের ট্রেনিং হল আত্ম দমন, ইন্দ্রিয় দমন ও চিত্ত দমন। যেখানে স্ত্রী-পুরুষ নেই সেখানে আত্ম দমন করতে হয়। নিজে দমিত হয়ে অপরকে দমন করতে পারে। নিজে উদ্ধার হয়ে অপরকে উদ্ধার করতে পারে। মনচিত্তে পাপ না করলে উদ্ধার হতে পারে। দান, শীল ও ভাবনা সম্বন্ধে বিশ্বাস না করলে অক্রিয় দৃষ্টি হয়। ঘর তৈরী করে আগুন লাগিয়ে দেয়া দান, শীল ও ভাবনা বিশ্বাস না করা একই কথা।

উপসংহারে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- বৌদ্ধ ধর্ম মেনে চললে ও গভীরভাবে বিশ্বাস করলে হাতে হাতেই ফল পাওয়া যায়। অবিরত পুন্য কর্ম করলে নানাবিধ শ্রীবৃদ্ধি হয়। তোমরা জ্ঞান বল ও কুশলের বল নিয়ে পরম সুখ নির্বান সাক্ষাৎ কর এটাই আমার একমাত্র কাম্য। এ বলে আমার দেশনা এখানেই শেষ করলাম।

সাধু - সাধু - সাধু।

কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়?

আজ ২৫শে মে '৯৫ ইং রোজ বৃহস্পতিবার। সকাল ৯-০০টা। রাজবন বিহার দেশনালয়। জাপান সরকারের অনুদানে রাজবন বিহারের উত্তর পার্শ্বে ভালেদী বহুমুখী প্রকল্পের উদ্যোগে একটা ক্লিনিক স্থাপন করা হচ্ছে। এ উপলক্ষ্যে জাপান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব ও তাঁর লিয়াঁজো অফিসার বাবু সুজিত কুমার বড়ুয়া উক্ত স্থান পরিদর্শন করার জন্য আসছেন। ওখান থেকে রাজবন বিহারে পরিদর্শন করার পূর্ব নির্দ্ধারিত কর্মসূচী ছিল। তাঁদের আগমন উপলক্ষ্যে অনেক উপাসক-উপাসিকা দেশনালয়ে সমবেত হন।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সমবেত উপাসক-উপাসিকাদের উদ্দেশ্যে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও পারমার্থিক ধর্ম দেশনায় তিনি বিভিন্ন উদাহরণ দিয়ে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায় সে ব্যাপারে বিশ্লেষন করেন।

তিনি বলেন- তোমরা কি অবস্থায় আছ জান? অমাবস্যা রাতে যেরূপ অন্ধকার থাকে তার চেয়েও অধিক অবিদ্যারূপ অন্ধকারে আছ। কোথাও আলো ও পথের সন্ধান পাচ্ছ না। যেমন কোন ব্যক্তি ছোট্ট একখানা নৌকা নিয়ে রাঙ্গামাটি হ্রদ পাড়ি দিচ্ছে, মাঝপথে যাওয়ার পর হঠাৎ তুফানের কবলে পড়ছে। ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন রাতে হ্রদের মাঝপথে তরঙ্গের আঘাতে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে। এখানে বুঝতে হবে অবিদ্যারূপ ঘোর অন্ধকার রাত, তৃষ্ণারূপ হ্রদ এবং তরঙ্গরূপ বিভিন্ন ক্লেশ অবিরত আঘাত করছে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে আমাদেরকে উৎসাহ দিয়ে বলেন- তোমরা বিপুল পরাক্রমের সাথে চারি আর্যসত্য আয়ত্ব কর যাতে তোমাদের ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ঘোর অন্ধকারে যেমন বাতি জ্বালালে অন্ধকার তিরোহিত হয় তেমন অবিদ্যা অন্ধকারে ও ধর্মচক্ষু ও ধর্মজ্ঞান উৎপত্তি হলে নির্বান উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করা যায়। নির্বান অধিগত হলেই সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়।

তিনি বলেন- তোমরা ৪টি পাহাড় অতিক্রম কর। সে ৪টি পাহাড় হল কাম অতিক্রম, সংসার অতিক্রম, সুখ অতিক্রম ও দুঃখ অতিক্রম। কাম অতিক্রম হল রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ। সংক্ষেপে পঞ্চকাম বলে। সংসার অতিক্রম হল দশবিধ বন্ধন। মা, বাবা, ভাই, বোন, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজন, দেশ ও আধিপত্য। সুখ অতিক্রম হল সংসারের যাবতীয় লৌকিক সুখ ত্যাগ বা অতিক্রম করতে হবে। লৌকিক সুখ ত্যাগ করতে না পারলে লোকোত্তর সুখ অধিগত হবে না। দুঃখ অতিক্রম হল ৮ (আট) প্রকার দুঃখ অতিক্রম। জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, আখাংখিত বস্তু অলাভজনিত দুঃখ, পূর্বজন্ম অর্জিত পাপজনিত দুঃখ ও মৃত্যু দুঃখ।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে ঘুচাতে হলে চারি আর্যসত্যকে ভালভাবে জানতে হবে, বুঝতে হবে, চিনতে হবে এবং সাক্ষাৎ করতে হবে। তাতেই বুদ্ধ জ্ঞান প্রদীপ উদ্‌ভাসিত হবে। হ্রদের জল হল ত্রিবিধ তৃষ্ণা ও তরঙ্গ হল দশবিধ ক্লেশকে মহাপরাক্রম দিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

তিনি প্রত্যক্ষভাবে লিচু দেখায়ে বলেন- তোমরা, সার কি? অসার কি? তা জান না? তোমরা সার বাদ দিয়ে অসার খেতে অভ্যাস করছ। লিচুর শাস বা সার হল প্রকৃত বুদ্ধ জ্ঞান। খোলস হল অসার বা হীন জীবন যাপন করা।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে বলেন- সার কি? অসার কি? তা বিভিন্ন উপমা ও অনর্গল কবিতার ছন্দে দেশনা করেন। প্রকৃত সার সাত প্রকার। শীল সার, সমাধি সার, প্রজ্ঞা সার, বিমুক্তি সার, বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন সার, পরামার্থ সার ও পরমার্থ নির্বান সার।

উপসংহারে তিনি বলেন- কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়? তা যদি গভীরভাবে চিন্তা কর, তা হলে ৪ (চার) প্রকার পাহাড় প্রবল উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত অতিক্রম কর এবং ৭ (সাত) প্রকার সার গ্রহন কর, ধারন কর এবং পালন কর। সুতরাং অচিরেই সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হতে পারবে।

শ্রদ্ধেয় বনভন্তে ভোজন করার পূর্বে ঠিক পৌনে ১১.০০ টায় জাপান হাই কমিশনের দ্বিতীয় সচিব বহু সরকারী কর্মকর্তা, ভালেদী বহুমুখী প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ এবং বহু স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিসহ রাজবন বিহার দেশনালয়ে উপস্থিত হন। উভয়ের মধ্যে পরিচয় হওয়ার পর জাপানী ভদ্রলোক বলেন- শ্রদ্ধেয় বনভন্তে পারমার্থিক মহাপুরুষ, তাঁর সঙ্গে আলাপ করার জন্য আমার ততটুকু জ্ঞান নেই। সুতরাং তিনিই অনুগ্রহপূর্বক আমার চিত্তের অবস্থা নিরীক্ষন করে ধর্মদেশনা প্রদান করলে তুষ্টি বোধ করব। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে অতি সংক্ষেপে মাত্র ২ (দুই)টি বাক্য দ্বারা বলেন- সুচিন্তায় মানুষ উর্দ্ধলোকে যায় এবং চিত্তে অনাবিল সুখ ও শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। কুচিন্তায় মানুষ অধোলোকে যায় এবং চিত্তে সব সময় দুঃখ ও অশান্তিতে জীবন কাটায়। এ বাক্য ২ (দুই) টি ইংরেজীতে বুঝিয়ে দেখার পর তিনি উল্লাসিত মনে বললেন- আমি খুবই খুশী হলাম। (আই এম ভেরী প্লিজড)

অতপর উক্ত জাপানী ভদ্রলোক শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে মাথা নুইয়ে সম্মান প্রদর্শন করে বিদায় নিলেন।

- ০ -

অভিমত

বনভন্তের দেশনা প্রথম খন্ড আদ্যন্ত পাঠ করে যাঁরা উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে মতামত, অভিমত শুভেচ্ছা বাণী এবং প্রীতিভাব প্রকাশ করেছেন, তাদের লিখিত মতামত গুলি হতে প্রয়োজনীয় অংশ পাঠকদের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করছি। এ মতামত গুলির মধ্যে অনেকটিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তে সম্বন্ধে নুতন ভাবে জ্ঞাত হয়ে অনেকেই মতামতে প্রীতি উল্লাস প্রকাশ করেছেন বিধায় তাতে উক্ত দেশনা গ্রন্থের মর্যাদা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে মনে করি। প্রাপ্ত সকল মতামত গুলি সীমাবদ্ধতার কারনে এ খন্ডে সন্নিবেশিত করতে না পেরে শ্রদ্ধেয় ভদন্তগন ও সদ্ধর্ম প্রান উপাসক, উপাসিকাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ঐ গুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে ভবিষ্যতে বংশধরদের জ্ঞাতার্থে রাজবন বিহারে সংরক্ষিত রাখার জন্য সংকল্প নিয়েছি।

১। শ্রীমৎ সুগত বংশ মহাস্থবির। বিনয়সুত্র ও গল্প সাহিত্য বিশারদ। সহ-সভাপতিঃ বাংলাদেশ ভিক্ষু মহাসভা ও এশিয়া বৌদ্ধ সম্মেলন, বাংলাদেশ কেন্দ্র। ঘাটচেক, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

আয়ুষ্মান অরবিন্দ বাবুঃ-

আশীর্বাদ করি, নিরাময় দীর্ঘ জীবন যাপন করুন। পর সমাচার আপনার প্রেরিত বনভন্তের দেশনা পুস্তকটি আমি মনযোগ সহকারে পড়েছি। এখানে পুস্তকে লিখিত বিষয় আধ্যাত্মিক এবং গভীর। বিশেষ করে আমার ধারনা এই সব বিষয় সাধনানন্দ ভিক্ষুর। সাধনালব্ধ বিষয়, চতুরার্য্য সত্য, প্রতীত্য সমুৎপাদ নীতি, দশক্লেশ প্রভৃতি সরল ব্যাখ্যা আমার ভাল লেগেছে। আপনি তা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ।

২। শ্রীমৎ প্রিয়দর্শী মহাথের। বিহারাধ্যক্ষ, পশ্চিম আঁধারমানিক নিগ্রোধারাম। গ্রাম- পশ্চিম আঁধারমানিক, ডাকঘর- আঁধারমানিক, থানা- রাউজান, চট্টগ্রাম।

-ঃ সদ্ধর্ম হিতার্থী ঃ-

উপাসক ডাঃ অরবিন্দ বাবু। আমার মৈত্রী ও শুভেচ্ছা নিবেন। আপনার শুচি সুমতি আদর্শ পরিবার পরিজনের প্রতি তাহা জানানলাম, আপনাদের পরমারাধ্য গুরু আচার্য্য আয়ুষ্মান সতীর্থ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাথের মহোদয়ের প্রতি আমার মৈত্রী শুভাশীর্বাদ জ্ঞাপন করাবেন। আশাকরি মহাকারুনিক তথাগতের সত্য ধর্ম প্রভাবে নিরাময়ে কুশলে অবস্থিতি করে স্বকর্তব্যে ব্যাপৃত আছেন।

....

....

আপনার সংকলিত ও আমাদের সজল বাবুর প্রকাশিত বনভন্তের দেশনা নামক গ্রন্থ আনুপূর্বিক অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছি। আমার পরম সুহৃদ লোকিক লোকোত্তর মার্গের অন্যতর পথ প্রদর্শক, জ্ঞানতাপস মহোদয়ের কথাগুলো বুদ্ধের পরবর্তীতে মিলিন্দ রাজ মহাজ্ঞানী অর্হৎ নাগসেনের ন্যায় বিবিধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি উক্তিতে ভরপুর, সরোবর সদৃশ হয়েছেঃ ....

৩। ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশ
শাকপুরা সাধনা কেন্দ্র, বোয়ালখালী।

সদ্ধর্ম প্রান ডাঃ অরবিন্দ বাবুঃ

আপনি আমার আশীর্ষবাদ গ্রহণ করুন। আপনার প্রেরিত শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনার মূল্যবান গ্রন্থটা আমি পেয়েছি। এই পুন্যে নির্বানের হেতু হউক আপনার। বিশেষত বনভন্তেকে আমি সর্ব প্রানভুত হিতানুকাঙ্খী অর্হৎ জ্ঞানেই পূজা-বন্দনা করি। তাই ঐ শ্রীচরনে দ্বিতীয় বার "দাল্লীকর্মে উপসম্পদায়" দীক্ষা নিয়েছি। তদ্ধেতু ঐ ভন্তের প্রস্তর মূর্তি তৈরী করে .... আমার সাধনা কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠা ও পূজা করি। আপনার এই গ্রন্থ প্রকাশনায় পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিচ্ছি। ....

৪। জ্ঞান প্রিয় ভিক্ষু।

রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি। অরণ্যচারী মহান সাধক বনভন্তের ব্যক্তিগত কথোপকথন, কোন বিরাট জনসভায় দেশনা হইতে চয়ন করিয়া বনভন্তের দেশনা নামক গ্রন্থ সংকলনে ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া সমাজে বহু উপকার করিয়াছেন।

মহাপুরুষদের মুখ নিঃসৃত বানী প্রচার ও সম্প্রসারের এবং তাহার পঠন ও পাঠনে বহু মঙ্গলজনক। এই জাতীয় গ্রন্থের মাধ্যমে বনভন্তে তাঁহার দর্শনে ঘনিষ্ঠ পরিচয় পাওয়া যায়। ....

৫। শ্রীমৎ ইন্দ্র গুপ্ত ভিক্ষু
রাজবন বিহার রাঙ্গামাটি ।

....

ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া বনভন্তের আদর্শে অত্যন্ত অনুপ্রানিত হয়ে শ্রদ্ধেয় ভন্তের বিভিন্ন সময়ের দেশনা সমূহ সংগ্রহ করে যে, "বনভন্তের দেশনা" নামে একটা পুস্তকের জন্ম দিয়েছেন এতে বৌদ্ধ শাসনের অনেক উন্নতি হয়েছে সন্দেহ নেই। এটা সকলের একবাক্যে স্বীকার করা উচিত। বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের এ ধরনের অভাব বহু দিনের, তাই এ ধরনের উদ্যোগ দীর্ঘ দিনের প্রতিক্ষিত ও ছিল, তা বর্তমানে পূরন হতে চলেছে। আমি ব্যক্তিগত ভাবে পুস্তকটি পড়ে আনন্দ লাভ করেছি। ডাঃ বাবু শ্রদ্ধেয় বনভান্তের দেশনা হতে সাধ্যানুযায়ী আহরিত করে সদ্ধর্ম পরায়ন এবং মুক্তিকামীদের নিকট পুস্তকাকারে উপস্থাপন করেছেন। ....

৬। শ্রীমৎ জিন প্রিয় ভিক্ষু
রাজবন বিহার, রাঙ্গামাটি।

"বনভন্তের দেশনা" বর্তমান কুসংস্কারে নিমজ্জিত সমাজের পথিকৃৎ একটি অভিনব গ্রন্থ। গ্রন্থ খানি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে সন্দেহ নিরসনে সুদক্ষ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

ধর্মের আলো ব্যতীত দুঃখ মুক্তি অসম্ভব। ত্রিলোক-রাগ-দ্বেষ-মোহ-জর্জ্জরিত। বিশাল বংশজটার ন্যায় প্রানীগণ তৃষ্ণা জটায় বিজটিত। তৃষ্ণা জটায় বিজটিতার কারনে প্রানীগণ দুঃখ মুক্তির পথ খুঁজে পায় না।

জ্ঞানী ব্যক্তি সকলের আশ্রয়স্থল। তাঁরা জগতের পতিতের উদ্ধার কর্তা, তাপিতের শান্তিদাতা, অত্রানের ত্রান কর্তা। ভীরুর অভয় দাতা, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা, অগতির গতি, অশরনের শরন, অজ্ঞানীর জ্ঞান দাতা এবং ভব সমুদ্রে ভাসমান প্রানীদের মহাদ্বীপ স্বরূপ অবস্থান করেন। এরূপ কল্যানমিত্র ও লোকশ্রেষ্ঠ মহামানবের সেবা পূজার মানবের কল্যান ব্যতীত অকল্যান হয় না। মনের ভাব প্রকাশের জন্য যেমন ভাষার প্রয়োজন তেমনি দূরবর্তী লোকের নিকট ভাষা প্রকাশ করার জন্য লেখনি বা গ্রন্থের প্রয়োজন রয়েছে। তাই বনভন্তের দেশনা অপরের নিকট পৌছানোর জন্য সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় এই গ্রন্থখানি অমূল্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে এবং সাহিত্য ভান্ডারে ইহা অনন্য সংযোজন। "ধর্ম্ম দানং সব্ব দানং জিনাতি" এই গৌরবের অধিকারী লেখক। বনভন্তের দেশনা সংগ্রহের ন্যায় দুঃসাধ্য কাজকে সহজ সাধ্য করে সদ্ধর্ম প্রচারের উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। আশাকরি গ্রন্থখানি ধর্ম পিপাসু মানুষকে মুক্তি পথের যথার্থ সন্ধান দিতে সক্ষম হবে।

৭। বাবু হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী
গৌতম নগর মহেশতলা-৭৪৩৩৫২
দক্ষিণ- ২৪ পরগনা
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
সম্পাদক
জগৎ জ্যোতি

১৯০৮ সালে কর্মযোগী কৃপাশরন মহাথের প্রবর্তিত বেঙ্গল, বুড্ডিষ্ট এ্যাসোসিয়েশানের মুখপত্র ১-বুড্ডিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০১২
টেলিফোন-২৬৭১৩৮
সম্পাদকীয় প্রতিনিধি
ডবু এফ বি রিভিউ
বিশ্ব বৌদ্ধ সৌভাতৃত্ব সংঘের মুখপত্র

ব্যাংকক সদস্যঃ-
দলিত সাহিত্য একাডেমী নয়াদিল্লী
নভেম্বর-২৫, ১৯৯৩ ইং
ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়া

মাননীয়ষু,

আপনার প্রেরিত বনভন্তের দেশনা বইটি পেয়ে বিশেষ আনন্দ লাভ করলাম। আপনার নিষ্ঠা ও উদ্যম আমাকে মুগ্ধ করেছে। বইটি প্রেরন করে আপনি আমার কল্যান মিত্রের কাজ করেছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের ধর্ম দেশনার কথা অনেক দিন যাবৎ শুনছি। আমার সৌভাগ্য হয়নি, তাঁর সেই অপূর্ব ধর্মদেশনা শ্রবনের। বইটি পড়ে তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম। পূজ্য ভন্তেকে আমার বন্দনা জানাই।

এই মূল্যবান বইটি সংকলনের জন্য আপনাকে এবং প্রকাশনার জন্য আপনার মাধ্যমে শ্রী সজল কান্তি বড়ুয়াকে অনেক সাধুবাদ জানাই। ধর্মদান সমস্ত দানকে জয় করে। আপনার এই ধর্মদান স্পৃহা অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি। আপনি আমার অনাবিল প্রীতি ও আন্তরিক শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। ....

৮। শিশির কুমার বড়ুয়া
সহকারী অধ্যাপক (বাংলা)
খাগড়াছড়ি সরকারী কলেজ, খাগড়াছড়ি।

সুপ্রিয় অরবিন্দ বড়ুয়া,

শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আমার ভক্তিপূত বন্দনা ও গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনাকে এ চিঠি লিখছি। ....

আপনি বৌদ্ধ সমাজের বিশেষ পূজনীয় বনভন্তের শিষ্য সম্প্রাদায়ের এক বিরাট উপকার করেছেন। আলোচ্য সংকলন গ্রন্থের মাধ্যমে বইটি নমস্য ভন্তের শুধু দেশনা সর্বস্ব নয়, এটি একটি দলিল, আপনারও বটে।

ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য পাথেয়। এ মহৎ কাজের জন্য আপনি সকলের প্রশংসার দাবীদার। আমার ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানাই, তাই ভবিষ্যতে বইটিকে আরো কলেবর সমৃদ্ধ এবং এর ইংরেজী অনুবাদ করতে পারলে উত্তম হবে। ....

৯। সরল বড়ুয়া (সভাপতি)
পক্ষে- মঙ্গলা দৈব্য বিহার কমিটি
গ্রাম- পিঙ্গলা, ডাকঘর- বুদপাড়া
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

প্রিয় বিশিষ্ট বৌদ্ধ উপাসক ও পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সুযোগ্য শ্রদ্ধাবান সেবক ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া ....

আপনার লিখিত পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁর উপদেশ মূলক শীর্ষক "বনভন্তে দেশনা" পুস্তকটি হস্তগত হয়েছে। পাঠান্তে খুবই প্রীতি ও আনন্দিত হয়েছি।

পুস্তকটি গুনীজনের সুন্দর ও সুচারু রূপে লিখিত ভূমিকা, আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা ইহার বাহুল-শ্রীবৃদ্ধি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ইহা সত্যিই গৌরবের ও প্রশংসার্হ। এতে নতুন করে মতামতের বিশেষ অবকাশ নেই।

পরিশেষে ভবিষ্যৎ এ ধরনের পুস্তক ব্যাপক সংকলনের ঘুনেধরা বৌদ্ধ সমাজের মহা উপকারে আসবে বলে মনে করি। এ মহৎ উদ্যোগও প্রচেষ্টায় পরম শ্রদ্ধেয় ভন্তের আর্শীর্বাদে আপনার উত্তরোত্তর দক্ষতা অর্জন, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। ....

১০। আশীষ বড়ুয়া (সহকারী শিক্ষক)
ভুবনজয় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়
জুরাছড়ি, রাঙ্গামাটি।

....

....

বনভন্তে বৌদ্ধ শাসনের যে বানী প্রচার করে আচ্ছেন সে গুলোর সঠিক তথ্য তুলে ধরতে না পারলে সামনের বংশধরদের জন্য ক্ষতি করা হবে।

ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া বনভন্তের দেশনা (১ম খন্ড) নাম বইটিতে যা কিছু লিখেছেন সে গুলো বাস্তব সত্য ও প্রমাণিত। বইটি পড়েই বলছি যে নিঃসন্দেহে পাঠক পাঠিকাদের ক্ষেত্রে গৃহীত হবে। আমি তাঁর লেখনীর সবাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি। ....

১১। পীযুষ কান্তি বড়ুয়া
আয়কর উকিল
১৪, ব্রিক ফিল্ড বাইলেইন
হামেদ কলোনী, পাথরঘাট, চট্টগ্রাম।

....

....

আপনার অনেক শ্রম, অর্থ ও মূল্যবান সময়ের বিনিময়ে বইটি প্রকাশ করেছেন। তা প্রায় ছয় লক্ষ তের হাজার সমতল বৌদ্ধ এবং তিন লক্ষ উপজাতী বৌদ্ধদের জন্যে তা অতীব মঙ্গলজনক বলে আমি মনে করি। বাস্তবিক আপনার আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে যদি আরো অনেকে মহাপুরুষদের বানীকে সর্বস্তরে প্রচারের এই প্রচেষ্টায় ব্রতী হতেন তা হলে বৌদ্ধ সমাজের অনেক কল্যান সাধিত হতো। আপনার এই একক মহতী প্রচষ্টোর জন্য আপনাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ, অজস্র অভিনন্দন। ....

১২। নীল রতন চৌধুরী
পোঃ বক্স নং- ৩৪১৩৯
লুসেকা, জাম্বিয়া (আফ্রিকা)

....

....

বইয়ের প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রস্তাবনা এবং উপস্থাপনা এতো সুন্দর হয়েছে যে সুচীপত্রে নাম দেখলেই বিষয়টি জানার অদম্য ইচ্ছা জাগে, পড়া আরম্ভ করলে শেষ না করা পর্যন্ত বই বন্ধ করা যায় না। শেষ করার পর

বনভন্তের প্রতি মন শ্রদ্ধায় নমিত হয় এবং নিজেকে খুবই রিক্ত বঞ্চিতও মনে হয়। সেদিন সকাল এগারোটা/বারোটা হবে বিছানায় বসে বইটি পড়ছিলাম। চুয়াল্লিশ পৃষ্টায় 'শ্রদ্ধারূপ মূল্য' পড়া শেষ করতে করতে আমার মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে এলো (সে মূল্য আমি দেবো, আমি, আমি। এক অনির্বচনীয় পুলকে সারা শরীর ব্যাপ্ত হয়ে হাত শক্ত হয়ে নাভিতে উঠে এলো, চোখ দুটা বন্ধ হয়ে গেলো আমি গভীর ভাবনায় এক ঘন্টা পরে উঠলাম, সারা মনপ্রান প্লাবিত হয়ে গেলো তৃপ্তির আনন্দে- আমি বনভন্তের স্পর্শ পেয়েছি। আপনার লেখনী সার্থক হয়েছে। ....

আপনার এই লিখা শুধু আমাদের জন্যে নয়। আগামী বংশধরদের জন্যেই বিশেষ করে তারা ভন্তেকে জানবে আপনার এই লিখার মাধ্যমে। ভবিষ্যতে এই রাজবন বিহারের পরিবেশে এবং পারিপাশ্বিক অবস্থার ও পরিবর্তন হবে। তাদের জানতে ইচ্ছে করবে বনভন্তের সময় এই বিহার কি রকম ছিল ইত্যাদি। এটা মনে রেখে আপনাদের বিবেচনার জন্য আমি প্রস্তাব করছি। ....

তথাগত বুদ্ধের প্রতিভূ বুদ্ধপুত্র শ্রদ্ধেয় বনভন্তের দেশনা শোনেন, যথা ইচ্ছা দান দিবেন, শীল পালন করছেন, ভাবনা করছেন ভন্তে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যে, তাঁর সেবা করছেন। বিন্দু বিন্দু বারিপাত নয়। বন্যায় জল প্রবাহের মতো কুশল আহরনের ....

১৩। মুরতি সেন চাক্মা
পাথরঘাট, রাঙ্গামাটি।

আপনার স্মৃতি শক্তি প্রখরতায় বইটিতে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের যে সকল হিতোপদেশ লিপিবদ্ধ করেছেন সে সকল হিতোপদেশ জেনে অনুশীলন করে বৌদ্ধ জনগনের সদ্ধর্ম প্রান লাভে পুরাপুরি সহায়তা হবে বলে আমার বিশ্বাস, এই পূন্যের প্রভাবে আপনি অবশ্যই আপনার অভীষ্ট লক্ষ্যে সহজেই পৌছতে পারবেন বলে আমি ধারন করি। তারপর ও ত্রিরত্ন এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কাছে প্রার্থনা করছি আপনার নিরাময় সাধনার জন্য সার্থকতা বয়ে

আসুক আপনার এই সুস্পষ্ট, সাবলীল ও সহজ ভাষায় লিখিত বইটি গভীর ও শ্রদ্ধার সহিত যারা বারংবার পড়বেন, পড়ে তা অনুশীলনের মধ্যে যে ত্রিরত্ন ও শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সত্যজ্ঞান উপলব্ধি করার চেষ্টা করবেন তারা নিদ্ধিধায় সদ্ধর্ম জ্ঞান উৎপন্ন করে, পাপ বা মিথ্যাদৃষ্টি পরিহার করে সত্যদৃষ্টি বা সত্য জ্ঞানকে উপলব্ধি করে চারি মার্গের যে কোন একটির ফল লাভ করে দুঃখ হতে মুক্তির পথ খুঁজে পাবেন। ....

১৪। অরবিন্দ বড়ুয়া (সহকারী অধ্যাপক)
কক্সবাজার সরকারী কলেজ, কক্সবাজার।

প্রিয় ডাঃ বাবু,

আমার নমস্কার নেবেন। আপনার আর আমার নাম একই। দুজন দুই পেশায় নিয়োজিত। শুধু এটুকু তফাৎ। ....

কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম শহরে ডঃ প্রনব কুমার বড়ুয়ার বাসাতে বেড়াতে যাই। সেখানে কয়েক ঘন্টা কাটানোর সময় আপনার প্রকাশিত বনভন্তের দেশনা বইটি আমার দৃষ্টি গোচর হয়। বইখানা একটানা একাগ্রচিত্তে চোখ বুলিয়ে যাই। পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে। এবং শ্রদ্ধেয় বনভন্তের সম্বন্ধে অজানা তথ্য আমার গোচরী ভূত হয়েছে। বইটার কোন মূল্য ও নির্ধারিত দেখলাম না। আপনাদের মতো পূণ্যবান ব্যক্তিরা এরকম একটা পূণ্যদানের ভার নিয়ে অনেক লোকের প্রভূত উপকার করেছেন তৎজন্য আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ। ....

১৫। তেমিয় ব্রত বড়ুয়া
থানা কৃষি কার্যালয়
ডাকঘর ও থানা- রোয়াংছড়ি।

....

....

আপনার সংকলিত বনভন্তের দেশনা নামক একখানা বই আমার গুরু মহাশ্রমন মারফত পেয়েছি। বইটি আদ্যন্ত আমি পড়েছি। বুদ্ধের

নির্দেশিত দর্শন (অভিধর্ম) ব্যতীত ধর্ম উপলব্ধি কাহারো মতে সম্ভব নয়। তাহা অধ্যয়ন করতে হলে বুদ্ধের ভাষায় উপযুক্ত কল্যান মিত্রের প্রয়োজন। ....

বইটির ১১ পৃষ্ঠায় গভীর শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাগ্রতা, প্রজ্ঞা, ইন্দ্রিয় সংযম ও চিত্ত সংযম, নির্বান গমনের একমাত্র চাবিকাঠি। ....

শেষ পর্যন্ত পূর্বে শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যাহা মনে করিতাম এখন অন্য রকম মনে হইতেছে। বইটি একমাত্র কারন। ....

১৬। মৃদুল কান্তি বড়ুয়া
৭১১/ডি আম বাগান
পোঃ পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

....

....

মহান ত্যাগী পূজনীয় বনভন্তের মুখনিঃসৃত চিরস্মরনীয় বাণী বনভন্তের দেশনা শিরোনামের গ্রন্থখানা পড়ে আমার এতই ভাল লেগেছে তা আমি কিভাবে জানাব বুঝে উঠতে পারছি না। এক একটা বানী মানুষের নির্বান লাভের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। যতই পড়ি না কেন স্বাদ মিটে না। বার বার পড়তে ইচ্ছা হয়েছে। এই জীবনে যত বই পড়েছি তার মধ্যে এই বইটা আমার মনকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছে ইচ্ছা হয় সদ্ধর্ম পুকুরে ডুব দিয়ে আর যেন ফিরে না আসি। ....

আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে আমি শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে যতটুকু জানতে পেরেছি তার চেয়ে আরো অধিক বেশী হৃদয়ঙ্গম করতে পারলাম আপনার সংকলিত বইটি পড়ে। ....

১৭। জবা বড়ুয়া
প্রযত্নে- দুলাল সওদাগর
পোঃ- রমজান আলীহাট, রাউজান, চট্টগ্রাম।

....

....

"বনভন্তের দেশনা" গ্রন্থখানা পড়ে আমি এত যে আনন্দিত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। আপনাকে যে কি দিয়ে ধন্যবাদ জানাই তাও ভেবে পাচ্ছিনা। বনভন্তের প্রতিও আমার যে শ্রদ্ধা জন্মেছে তাও ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। ....

আমি বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে তেমন কিছু জানি না বা জানতাম না। কিন্তু আপনার লিখা বনভন্তের দেশনা গ্রন্থখানা পড়ে আমি অনেক কিছুই জেনেছি। ....

১৮। সাখাওয়াৎ হোসেন রুবেল
সাংবাদিক
দৈনিক পূর্বকোন
রাঙ্গামাটি।

অত্র অঞ্চলের আপামর বৌদ্ধ নর-নারীর মুখে মুখে উচ্চারিত একটি পবিত্র নাম "বনভন্তে"। বনভন্তে বুদ্ধের দেশিত শীল, সমাধি ও প্রজ্ঞার আলোকে দীপ্তিমান ও সিদ্ধ পরম পুরুষ। দায়ক দায়িকাবৃন্দের একান্ত বিশ্বাস তাঁর দর্শন লাভ ও নিকট সংস্পর্শে আসতে পারা পরম সৌভাগ্যের বিষয় এবং এতে মঙ্গল ছাড়া অমংগল নাই।

পরম আর্য পুরুষ শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির "বনভন্তের" মুখ নিঃসৃত পবিত্র ধর্মদেশনা ও বানী সমূহ যথাযথ সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেওয়ায় আমি সংকলক ডাঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার ও প্রকাশক বাবু সজল কান্তি বড়ুয়ার প্রতি জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা।

আমাদের অস্থিরতা পূর্ণ সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য অন্যতম ত্যাগী পুরুষ শ্রদ্ধেয় বনভন্তের কর্মের সাথে তাঁরা ও অংশীদার হলেন।

সকল প্রানী সুখী হউক।

১৯। ডাঃ নীহারেন্দু তালুকদার
প্রাক্তন সিভিল সার্জন ও
অধ্যক্ষ ম্যাটস, রাঙ্গামাটি।

বর্তমান সংঘাতময় ও অশান্ত বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রেম, মৈত্রী ও করুনার পথিকৃত ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় বাণী প্রচার ও প্রসারের যে কোন শুভ উদ্যোগ প্রশংসনীয়। ডাঃ অরবিন্দু বড়ুয়া শ্রদ্ধেয় "বনভন্তের (সাধনানন্দ মহাস্থবির) দেশনা" সংকলন করে বুদ্ধবানী প্রচারের উদ্যোগ নিয়েছেন তা একান্ত ভাবেই প্রশংসার দাবিদার। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে এ উপমহাদেশে তথা সমগ্র বিশ্বে বুদ্ধ বানীর একজন স্বার্থক, ধারক, বাহক এবং একজন মহান সাধক হিসেবে বুদ্ধ শাসনের অকৃত্রিম সেবায় নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে নিয়োজিত আছেন এবং আপামর জনসাধারণকে ধর্ম সুধা পান করায়ে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার কাজে ব্যাপৃত আছেন। তাই শ্রদ্ধেয় বনভন্তের মত একজন মহান সাধকের মুখ নিঃসৃত বুদ্ধ বানী সংকলনের মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের যে শুভ প্রচেষ্টা ডাঃ অরবিন্দ বাবু নিয়েছেন বৌদ্ধ সমাজে তাঁর এ মূল্যবান অবদানের জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিচ্ছি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। "ধর্মদানং সব্ব দানং জিনাতি" বুদ্ধের এ মহান বাণী ডাঃ অরবিন্দ বাবুর এ শুভ প্রচেষ্টার দ্বারা সার্থক হোক এবং ধর্ম পিপাসু জনসাধারণ এতে বিশেষ ভাবে উপকৃত হোক এ আশাই একান্তভাবে পোষন করি।

- ০ -

With bad advisors forever left behind,
From paths of evil he departs for eternity,
Soon to see the Buddha of Limitless Light
And perfect Samantabhadra's Supreme Vows.

The supreme and endless blessings
of Samantabhadra's deeds,
I now universally transfer.
May every living being, drowning and adrift,
Soon return to the Pure Land of
Limitless Light!

~The Vows of Samantabhadra~

I vow that when my life approaches its end,
All obstructions will be swept away;
I will see Amitabha Buddha,
And be born in His Western Pure Land of
Ultimate Bliss and Peace.

When reborn in the Western Pure Land,
I will perfect and completely fulfill
Without exception these Great Vows,
To delight and benefit all beings.

~The Vows of Samantabhadra
Avatamsaka Sutra~

DEDICATION OF MERIT

May the merit and virtue
accrued from this work
adorn Amitabha Buddha's Pure Land,
repay the four great kindnesses above,
and relieve the suffering of
those on the three paths below.

May those who see or hear of these efforts
generate Bodhi-mind,
spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
and finally be reborn together in
the Land of Ultimate Bliss.
Homage to Amita Buddha!

NAMO AMITABHA

南無阿彌陀佛

【孟加拉文：佛法開示（第 1、2 冊合刊）】

財團法人佛陀教育基金會　印贈
台北市杭州南路一段五十五號十一樓
Printed and donated for free distribution by
The Corporate Body of the Buddha Educational Foundation
11F., 55 Hang Chow South Road Sec 1, Taipei, Taiwan, R.O.C.
Tel: 886-2-23951198 , Fax: 886-2-23913415
Email: overseas@budaedu.org
Website:http://www.budaedu.org

This book is strictly for free distribution, it is not for sale.

এই বই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, বিক্রয়ের জন্য নহে।

Printed in Taiwan
3,500 copies; April 2014
BA031-12197